নতুন চিঠি

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৬/১৪২৩

নতুন চিঠি

২০১৬

সম্পাদক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : **শ্যামলবরণ সাহা**

অক্ষরবিন্যাস-পৃষ্ঠাসজ্জা : **মনন শীল**

অলঙ্করণ : **সমর মুখোপাধ্যায়, কুশল বণিক**

মুদ্রক : **নতুন চিঠি প্রেস**, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় : **সাধনা প্রেস**, ১১ জে বি মিত্র রোড ও **সত্যযুগ কর্মী শিল্প সমবায় প্রেস**, কলকাতা

মূল্য : ৫০ টাকা

NC-F1

With best compliments of

A

Well

Wisher

Sl. No. P

সম্পাদকীয়

এবার এমন একটি সময়ে 'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে যখন আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতি গণতন্ত্রের পক্ষে ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের সার্বিক অভিঘাত তো আছেই। সেই সঙ্গে ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তকে রক্তাক্ত, বিপন্ন করে তুলেছে। কতিপয় অভিভাবক রাষ্ট্র তাদের মদতও দিয়ে চলেছে। ভারতও জঙ্গি আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, এমনকি অতি-সুরক্ষিত সেনা-শিবিরও রক্ষা পাচ্ছে না।

ভারতের শাসনক্ষমতা এখন হিন্দুত্ববাদের কবলে। ফলে ধর্মীয় মৌলবাদ একের সঙ্গে অপরের সংঘাতের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে চলেছে।

পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও একদিকে যেমন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে, তেমনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে বিরোধীদের উপর নির্বিচার আক্রমণ ও প্রতিটি গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে বিরোধীশূন্য করার মারণযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সার্বিক পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ না করে 'নতুন চিঠি' তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এগিয়ে চলতে বদ্ধপরিকর। এই বিশেষ সংখ্যার লেখাগুলিতেই এই সার্বিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ রয়েছে। বিজ্ঞাপনের অভাব পত্রিকাকে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন করে তুলেছে। এর মধ্যেও যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের কাছে যাঁরা এই দুর্দিনে নানাভাবে পত্রিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, সাহায্য ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন।

'নতুন চিঠি'র যে গ্রহণযোগ্যতা আমাদের গর্বিত করে, তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে প্রয়াসী। আশা করি এবারও সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হব। নতুন চিঠি পরিবার তার পাঠকবর্গ ও সকল শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শারদ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে।

With best compliments of

JAI BALAJI INDUSTRIES LTD.

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা : সামাজিক জীবন	১	শুভঙ্কর চক্রবর্তী
বহুমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও দাঁড়াতেই হবে	৫	অমল হালদার
সংসদীয় গণতন্ত্র প্রসঙ্গে	৯	শ্রীদীপ ভট্টাচার্য
নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চায় আজকের সময়	১৩	সলিল আচার্য
দিনবদলের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখো	১৭	আভাস রায়চৌধুরী
এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়	২১	রথীন রায়
অশনি সংকেত	২৭	পার্থ মুখার্জী
উন্নয়ন : তখন এবং এখন	৩১	অভিজিৎ কোঙার

কবিতা

অংশুমান কর, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, অনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রণব চট্টোপাধ্যায় ৩৭; জিয়াদ আলী, মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক ৩৮; সলিল ভট্টাচার্য, অরবিন্দ সরকার, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, শ্যামলবরণ সাহা ৩৯; সতীরঞ্জন আদক, পম্পা দাস কান্ত, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, মলয় রায়, রামানুজ মুখোপাধ্যায় ৪০; রাজকুমার রায়চৌধুরী, কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু ৪১; তন্ময় ভট্টাচার্য, সৌম্য দত্ত, অমিত কাশ্যপ, কালীময় মৈত্র ৪২; উৎপল সাহা, নমিতা পোদ্দার, পরেশনাথ কর্মকার ৪৩; গৌতম সাহা, দেবাশিস প্রধান, মনামী ঘোষ, প্রভাতরঞ্জন ঘোষ ৪৪; দেবেশ ঠাকুর ৪৫; সুজাতা সান্যাল চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুরঞ্জন সাহা, বিশ্বনাথ কয়াল, পরিমল ঘোষ ৪৬; সুনির্মল কুণ্ডু, পঙ্কজ পাঠক, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ ৪৭; মণিশংকর রায়, বৈদ্যনাথ মিশ্র, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ মাজিলা ৪৮

প্রবন্ধ

খেতমজুর সংগঠন গড়া জরুরি	৪৯	মদন ঘোষ
দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও তার ভূমিকা	৪৯	সন্তোষ দেবরায়
গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের নতুন পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ	৫৫	নিশীথ অধিকারী
বর্তমান পরিস্থিতি ও বামপন্থীদের কর্তব্য	৫৭	সুকান্ত কোঙার
ফেসবুকের একটি পোস্ট ও কিছু কথা	৫৯	পঙ্কজ রায় সরকার

নাটক

চার্জশিট	৬১	মৃদুল সেন

প্রবন্ধ

সোশ্যাল মিডিয়া ও সন্ত্রাসবাদ	৬৯	মইনুল হাসান
বিভেদেরে মানো যদি	৭৫	সুকৃতি ঘোষাল
শিক্ষার চালচিত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা	৭৭	সেখ সাইদুল হক
লোকবৃত্ত ও লোকশিক্ষার সম্মিলন	৮৫	ভব রায়

কবিতা

গৌতম চট্টোপাধ্যায়, অজয়রঞ্জন বিশ্বাস, গণেশ চৌধুরী ৮৯; শেখ জয়নাল আবেদিন, আমির উল হক, বিদ্যুৎ ভৌমিক, বিকাশ বিশ্বাস ৯০; নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ৯১; বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ চাকী, গণেশ ভট্টাচার্য ৯২; সুস্মেলী দত্ত, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত দে, রীতা বসু (ধর) ৯৩; প্রকাশ দাস, পান্নালাল মল্লিক, নিমাই মান্না, অনন্য ভট্টাচার্য, প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৪; দিশা চট্টোপাধ্যায়, সোমনাথ বেনিয়া, সুভাষচন্দ্র ঘোষ, বিতস্তা ঘোষাল, কালিদাস ভদ্র ৯৫; জমর সাহানী, তাপস রায়, অনিন্দিতা বসু সান্যাল, দেবাশিস মাঝি ৯৬; প্রণবকুমার পাল, রীণা কুণ্ডু, মৌসুমী মুখার্জী, বিমলেন্দু দাস, শম্ভু ঘোষ ৯৭; মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল কর, নির্মল নিয়োগী, মিনতি গোস্বামী ৯৮;

TRUST THE BEST FOR YOUR FAMILY'S HEALTH

HOPE NURSING HOME, RANIGANJ

হোপ নার্সিং হোম, রানীগঞ্জ

A/88, N.S.B. ROAD (EAST) RANIGANJ, PIN : 713347

Contact : 7407403153, 9475745869, 0341-2440109

Sl. No. 94

সূচিপত্র

গল্প

রঙ ৯৯ মণি মুখোপাধ্যায়
এক ধাপ অনুন্নয়ন ১০৩ তপোময় ঘোষ
অজানা দেবতা ১০৭ স্বপন ঘোষচৌধুরী
কল্পতরু ১১১ মানিকলাল অধিকারী
মদিনার খেজুর আর তারাপীঠের প্রসাদ ১১৫ কৌশিক লাহিড়ী
সুনীলের রাতদিন ১১৭ গীষ্পতি চক্রবর্তী

বিজ্ঞান

এক সুরশিল্পী ও এক বিজ্ঞানী ১২৩ শামল চক্রবর্তী
জীবাণু ও মানুষ ১৯৫ সুকুমার ঘোষ

প্রবন্ধ

প্রেমচন্দের ছোটোগল্প : বাঙালি পাঠক ১২৯ সুমিতা চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথের নাটকে যাত্রার উপাদান ১৩৩ অশোক দাস
আজও রবীন্দ্রনাথ ১৩৭ সুধীর রায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) :
সেদিনের ও আজকের নান্দনিক প্রাসঙ্গিকতায় ১৩৯ কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
কৈলাসবাসিনী দেবী : উনিশ শতকের এক নারীকণ্ঠ ১৪৩ কল্যাণী ভট্টাচার্য
নারী শুধু নারী নয়, কন্যা জায়া জননী ১৪৭ মধুছন্দা মিত্র ঘোষ
বিশ্বসৃষ্টি ও লোকপুরাণ ১৫১ রত্না রশীদ
কবিতার গান, গানের কবিতা ১৫৩ শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

কবিতা

যযাতি দেবল, অমিয়কুমার সেনগুপ্ত, মাধুরী অধিকারী, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী ১৫৯; দীপেন ভাদুড়ী, সোমনাথ রায়, তপন দাস, দীপেন রায় ১৬০; উজ্জ্বলকুমার ঘোষ, রসুল করিম, নরেশ মণ্ডল, মুরারী মণ্ডল, তপন মণ্ডল ১৬১; কণিষ্ক আচার্য, সুকমল ঘোষ ১৬২; অমিত বাগল, পুষ্পজিৎ রায়, মানস মণ্ডল ১৬৩; অনিল মাইতি, বিশ্বজিৎ সরকার, তপনজ্যোতি চৌধুরী, অতনু ঘোষ ১৬৪

গল্প

খুশি ১৬৫ দেবদত্ত রায়
কৃকলাস ১৬৭ গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী
সাদা কাপড় ১৭৩ কাকলি ঘোষ
গ্লোরিয়াস রিট্রিট ১৭৫ শিবানন্দ পাল
ঝড়ের পাখি ঝড়ের গান ১৭৯ রথীন ব্যানার্জী

বর্ধমান চর্চা

ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমান শহরে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার :
একটি অবলোকন ১৮৩ প্রবাল সেনগুপ্ত
কিংবদন্তী-জনশ্রুতি-লোককথায় বর্ধমানের দুর্গা ১৮৭ সর্বজিৎ যশ

ভ্রমণ

এক পথে দুটি বুগিয়াল : নওয়ালী ও বাগচী ১৯১ বিলাস চ্যাটার্জি

With best compliments of

SHIVAM METALLIC LTD.

Sl. No. P

প্রবন্ধ

সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা : সামাজিক জীবন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মানুষ সমাজবদ্ধ সামাজিক জীব। তার যে সামাজিক জীবনবৃত্ত তার মধ্যে থাকে জন্মগত নানান মানসিক শক্তি এবং তাড়না। তা যেমন ভালো হতে পারে, মন্দও হতে পারে। মানুষকে তা যেমন সম্মুখে এগিয়ে দিতে পারে, ভালো কাজে প্রেরণা দিতে পারে, আবার পেছনে টেনে ধরতেও পারে, খারাপ কাজে উদ্যোগী করতে পারে। তা যেমন সৃষ্টি করতে পারে, ধ্বংসও করতে পারে। সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতা হল মানুষের একইরকম দুটি ভালো-মন্দ, সৃষ্টিক্ষম-ধ্বংসক্ষম শক্তি ও তাড়না।

সহিষ্ণুতার প্রতিশব্দ—ক্ষমাশীলতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, অনৃশংসতা, অক্রোধ, অপরে অবিদ্বেষ। সহিষ্ণুতা মানুষের ভালো প্রকৃতি। এ কারণেই তা মানুষের প্রকৃত উপকার করে। সামাজিক জীবনে সমুন্নতি আনে। অসহিষ্ণুতা তা করে না বলেই মানুষের মন্দ প্রবৃত্তি। সহিষ্ণুতার সরাসরি বিপরীতে অসহিষ্ণুতা।

অসহিষ্ণুতার প্রতিশব্দ—ধৈর্যহীনতা, সহনশক্তিহীনতা, ক্ষমাগুণহীনতা, নৃশংসতা, ক্রোধ, অপরে বিদ্বেষ।

দুয়ের মধ্যে যদিও দৃশ্যমান সংঘাত রয়েছে তবু দুইয়ে মিলে একও বটে, একটি সমন্বয়ও বটে। সামাজিক জীবনের প্রত্যাশা হল সামাজিক মানুষ যেন এই সমন্বয় ঘটাবার শক্তি অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, বিশেষ করে, সামাজিকীকরণের শিক্ষার মধ্য দিয়ে। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে যেন সহিষ্ণুতার স্তরকে বাড়াবার চেষ্টা করে এবং অসহিষ্ণুতার এই প্রবৃত্তিকে সহিষ্ণুতার মানবিক বোধে উত্তীর্ণ করতে পারে। মানুষ যেন সহিষ্ণুতার নির্মলতা দিয়ে অসহিষ্ণুতার দুর্বলতা ও মালিন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক জীবনকে বাসযোগ্য, সমুন্নত, অগ্রসর করে তোলে। বাসযোগ্য উত্তম সমাজের জন্য সহিষ্ণু মানুষ অপরিহার্য। তারাই অসহিষ্ণুতার সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে উজ্জীবিত প্রতিরোধ। ব্যক্তির জীবনে বলুন, পরিবারজীবনে বলুন—ধর্মে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে বলুন—সহিষ্ণুতার শক্তি যখন অসহিষ্ণুতাকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রতিষ্ঠা পায়, তখন ব্যক্তি তার মনুষ্যত্বের সুন্দর গুণে উজ্জ্বল হয়। তার জীবনীশক্তি বাড়ে। সংবাদে প্রকাশ—ইন্দোনেশিয়ার তথা বিশ্বের প্রবীণতম নাগরিক ১৪৫ বছরের 'এমবাহ গথো'র কাছে যখন সাংবাদিকরা তাঁর এমন দীর্ঘায়ুর রহস্য জানতে চাইলেন, গথো বললেন—''সহিষ্ণুতা আমার জীবনের রসদ। একমাত্র ওটাই ছিল।'' আমাদের পারিবারিক জীবনেও সদস্যদের মধ্যে সহিষ্ণুতার গুণের সঞ্চার হলে পরিবার সুন্দর হয়। সহিষ্ণুতা ধর্মীয়তায়, রাজনীতিতে ঔদার্যের দীপ্তি এনে দেয়। সহিষ্ণুতার মূল্যবান মূল্যবোধ দেশের সংস্কৃতিতে গৌরবী পরম্পরার প্রবাহ গড়ে দিয়ে উত্তরপুরুষের কাছে আলোর খোঁজ রেখে যায়।

কিন্তু আমাদের সামাজিক জীবনে সে প্রত্যাশা কি পূরণ হচ্ছে? বিরোধীর মতামত, যার সঙ্গে আমি একমত না-ও হতে পারি, বিরোধী শক্তি, যাকে এবং যার ব্যবহার আমি পছন্দ না-ও করতে পারি, তার কথা শোনার, তার সঙ্গে মত বিনিময় করার সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি আমি কি আয়ত্ত করতে পেরেছি? দার্শনিক ভলতেয়ারের মতো কি বলতে পারছি—''তুমি যা বলছ তার সঙ্গে আমি একমত না-ই হতে পারি। কিন্তু তোমার কথা বলার অধিকারের সপক্ষে আমি আমৃত্যু দাঁড়াব।'' এ হল সহিষ্ণুতার অনুকরণীয় দীপ্ত এক দৃষ্টান্ত। গান্ধীজি যখন বলেন, ''একথা মানতেই হয় যেখানে পরমতসহিষ্ণুতা, হৃদয়ের ঔদার্য ও সত্যনিষ্ঠা থাকে, সেখানে মতভেদে কিছু আসে-যায় না, বরঞ্চ তা সৌহার্দ্যের সহায়ক হয়।'' এ হল সহিষ্ণুতার শিক্ষার আর এক আলোকিত দৃষ্টান্ত। সামাজিক জীবনে একজন সামাজিক মানুষ যুক্তি বুদ্ধি বিবেকের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অর্জন করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে যেমন সহিষ্ণু মানুষ হন, আর একজন তা অর্জন করার চেষ্টা না করে অসহিষ্ণু হন। সহিষ্ণু হবার মানবিক দায় আমরা কি যথেষ্ট বোধ করছি? সামাজিক জীবনে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতার মারমুখো হিংসাশ্রয়ী এমন সব ঘটনা সংবাদের শিরোনামে উঠে আসছে যা দেখে শুনে পড়ে মনে হয় অসহিষ্ণুতাই যেন আমাদের সামাজিক জীবনের ধরন হয়ে উঠছে। তার ওপর বাজার অর্থনীতির দাপে মানুষ যত বেশি বেশি আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ স্বার্থমগ্ন হচ্ছে এবং বৈষয়িক উন্নতির লোভের শিকার হচ্ছে, তার আত্মসর্বস্বতার মানসিক জমিতে সহিষ্ণুতার শিক্ষা যেন দাঁড়াতে পারছে না।

২.

বিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনে পাঠ্যবইয়ে মহান বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের জীবনের একটি ঘটনার কথা পড়েছি।

'ডায়মন্ড' নামে নিউটনের অতিপ্রিয় একটি কুকুর ছিল। এক সকালে প্রাতরাশের সময় ডায়মন্ড নিউটনের মূল্যবান এক গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি একেবারে নষ্ট করে ফেলে। স্তম্ভিত নিউটন কুকুরটিকে লাঠিপেটা করলেন না। কেবল গভীর মানসিক উদ্বেগ ও বেদনায় বললেন—ডায়মন্ড, আমার ডায়মন্ড, তুমি জানো না কী অপূরণীয় ক্ষতিই না তুমি আমার এবং ভবিষ্যতের মানুষজনের করলে। নিউটনের এই কাহিনি আমার বুকে সহিষ্ণুতার মহৎ গুণকে ফসলের দানার মতো বুনে দিয়েছিল। তাকে সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত হিসেবে আজও রক্ষা করার চেষ্টা করে চলেছি।

বিপরীতে সামাজিক মানুষের অসহিষ্ণুতার কতসব ভয়ংকর ঘটনার খবর কাগজে পড়ছি, টিভিতে দেখছি, শুনছি। উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

▫ বাড়িতে ঢোকার রাস্তা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের জেরে স্বামী-স্ত্রীতে শলাপরামর্শ করে জয়নগরের উমা চক্রবর্তীকে শায়েস্তা করতে তার গায়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারল। উমার চিকিৎসা

চলছে হাসপাতালে। বীভৎস পোড়া দাগ তার সারা সঙ্গে। এ তো সমাজের গায়ে-মুখেই অসহিষ্ণুতার কলুষ দাগ।

□ পাঁচ বছরের শিশুটির অবরাধ সে পড়তে বসে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছিল। এমনকি দিদিমণি বলার পরও প্যান্ট খুলে তা দিয়ে মুছে দেয়নি ঘরের মেঝে। অভিযোগ, এই অপরাধেই শিশুটিকে পর্দা-টাঙানোর একটি স্টিলের রড দিয়ে বেধড়ক পেটালো শিক্ষিকা।

□ কোলাঘাটের শান্তিপুরে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পাঁচ বছরের প্রতিবেশী এক শিশুকে দুপুরে মাংসভাত খাইয়ে সন্ধ্যায় তাকে গলা টিপে খুন করল কিশোরী। সন্দেহ, টিভি দেখায় বিরক্ত করায় কিশোরী শিশুটিকে এই মরণশাস্তি দিয়েছে।

□ স্কুল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। বন্ধুত্বের সৌরভকে দুর্গন্ধময় করে তুলছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ছাত্র ছাত্রকে ছুরি মারছে। তার জেরে কলেজ বন্ধ রাখতে হচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। সামাজিক জীবনে ব্যক্তি-মানুষের অসহিষ্ণুতার তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে।

আমাদের পারিবারিক জীবনে মা বাবা অভিভাবকের আচরণে সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতার প্রশ্ন সন্তানকে মানুষ করতে বড় ভূমিকা নেয়। পরিবারে ছোটোরা যে উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে তার পেছনে অনেক উপাদানের মার অছে ঠিকই। বিশেষ করে, টিভি-বাহিত বাজার সংস্কৃতির। কিন্তু পরিবারে বড়দের আচার ব্যবহারে অসহিষ্ণুতাও যে দায়ী, তা অস্বীকার করা যাবে না। ছোটোদের সামনে মা-বাবা পরিজনদের মারমুখো উত্তেজক ভঙ্গিতে ঝগড়া, কুৎসিত গালিগালাজে রাগের প্রকাশ ছোটোদের অনুকরণপ্রিয় মনে বাল্যেই অসহিষ্ণুতার বিষবৃক্ষের বীজ বুনে দেয়। বিপরীতে পরিবারে যদি মা-বাবা পরিজন এবং ছোটোদের মধ্যে বোঝাবুঝির একটা সহিষ্ণু পরিবেশ তৈরি করা যায় তা ছোটোদের সুন্দর জীবনধারা গঠনে সহায়ক হয়। মা-বাবার হাসিমুখ, ধৈর্যশীল স্নেহপূর্ণ চোখের চাহনি দেখলে ছোটোরা উদ্বেল হয়ে ওঠে। শিশুকে শাসন চাই ঠিকই, কিন্তু দরদি সহিষ্ণু পিতামাতা অভিভাবকের শাসন যেমন হয়, তেমনটিই হওয়া কাম্য। পরিবার সুখের হয় মা-বাবা, অভিভাবক এবং সন্তানের মধ্যে সহনশীল সুন্দর বোঝাবুঝির পথে। পরিবার-সমাজ থেকে ছোটোরা যখন বিদ্যালয়-সমাজে আসে, বিদ্যালয়কেও একইভাবে ছোটোদের দরদি, সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল পরিবেশ দিতে হয়। ছাত্রশিক্ষকের মধ্যে বোঝাবুঝির সহিষ্ণু পরিমণ্ডল তৈরি করতে হয়। ছোটোদের সুন্দর বিকাশে পরিবার-সমাজ ও বিদ্যালয়-সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। প্রকৃতি আমাদের দুটি কাঁধ দিয়েছে যেন এ-জন্যই যে ওর একটি কাঁধে হাত রাখবে সহিষ্ণু দরদি পরিবার এবং অন্য কাঁধটিতে বিদ্যালয়ের ধৈর্যশীল দরদি শিক্ষক-শিক্ষিকা। পরিবার এবং বিদ্যালয়—এই দুই শক্তি ছোটোদের আগলে থাকলে অসহিষ্ণুতার ধ্বংসাত্মক শক্তির হামলাকে বড় একটা লড়াই দেওয়া যাবেই। সহিষ্ণু উত্তরপুরুষই মানবসম্পদ।

৩.

রাজনীতিতে সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা এক বড়ো জিজ্ঞাসা। আমাদের সামাজিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে রাজনীতি। মানুষের ভালো থাকা, সুখে থাকা, দুঃখ কষ্টে থাকা সবই নির্ভর করে রাজনীতির ওপর। হাতির পদচিহ্নে অন্য প্রাণীর পদচিহ্ন যেমন ঢাকা পড়ে, তেমনি রাজনীতির পদচারণায় সামাজিক জীবনের প্রয়োজনগুলি আবৃত ও গভীরভাবে আলোড়িত হয়। রাজনীতি চলে আগে আগে, ধর্ম-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয় তদনুযায়ী। রাজনীতিতে যদি অসহিষ্ণুতার ঘাত লাগে আমাদের সামাজিক জীবনে তার বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

রাজ্যের ও দেশের রাজনীতিতে সহিষ্ণুতার চেয়ে অসহিষ্ণুতার এমনসব ঘটনা প্রতিদিন সংবাদ শিরোনামে উঠে আসছে যা টিভিতে শুনে দেখে, সংবাদপত্রে পড়ে, অভিজ্ঞতায় দেখে উদ্বেগ জাগছে—অসহিষ্ণুতাই কি রাজনীতিতে প্রবল হতে থাকবে? দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এ-কথা বুঝতে সহায়ক হবে।

□ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সরকারের অসহিষ্ণুতার রাজনীতি। বাম-মনোভাবাপন্ন কবি-গায়ক কোভালকে জয়ললিতার পুলিশ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে জেলে পুরল। কবি-গায়কের অপরাধ—তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে দ্রোহমূলক কবিতা লিখে গান বেঁধেছিলেন। এখানেই জয়ললিতা সরকারের অসহিষ্ণুতার রাজনীতির শেষ নয়। ঔপন্যাসিক পেরুমাল মরুগানের উপন্যাস সরকারের অসহিষ্ণুতার রাজনীতির শিকার হল। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর জয়ললিতার সরকারের এই অসহিষ্ণু রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজনীতিতে সহিষ্ণুতার পক্ষ নিয়ে এক ঐতিহাসিক সর্বপ্রশংসিত রায় দিয়েছেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 'কাউল'। দার্শনিক ভলতেয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে রাজনীতিতে পরমতসহিষ্ণুতার শিক্ষা শোনালেন বিচারপতি—"I may not agree with what you say, but will defend to the death your right to say." বিচারপতি কাউল তাঁর রায়ে রাজনীতিতে সহিষ্ণুতার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন—মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রে এক প্রাপ্তি। ভারতের সংবিধান সে অধিকার আমাদের দিয়েছে। নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা থাকবে। কিন্তু লেখকের মনের ভাবনা প্রকাশ করার প্রসারিত চৌহদ্দিকে মান্য করার সহনশীলতা রাজনীতিকের থাকতেই হবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার অভাবকে ভর্ৎসনা করে দেশের সুপ্রিম কোর্টের এক ডিভিসন বেঞ্চ শুনিয়েছে—পাবলিক ফিগার হলে সমালোচনা সহ্য করতেই হয়। এটা গণতন্ত্রের অঙ্গ। কোনো সরকার কখনও ফৌজদারি মানহানির মামলা করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে পারে না।

□ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পাবলিক ফিগার মমতা ব্যানার্জির রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতার পরিচয় বার বার আমরা পেয়েছি। কার্টুন 'অপরাধ'-এর নামে অভিযুক্ত করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ লকআপে পুরেছে। মুখমন্ত্রী নিজে শিলাদিত্য, টুম্পা, মৌসুমী কয়ালকে মাওবাদী বলে শাসিয়েছেন। কদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বিধিতে যুক্ত হয়েছে—সরকারের নীতির বিরোধিতা করে গণমাধ্যমে মতামত প্রকাশ করলে এবং তা রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের পরিপন্থী হলে শিক্ষক, কর্মচারী শাস্তির মুখে পড়বেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অসহিষ্ণু হুংকার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের মতো গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার উগ্র পরিচয়। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা থেকে শাসকের একাধিপত্য কায়েমের মানসিকতা জন্ম নেয়। এই মানসিকতা থেকেই মমতা ব্যানার্জির সরকার দখলদারির অসহিষ্ণু রাজনীতির খেলায় মেতেছে। বিরোধী দলের বিধায়ক, পঞ্চায়েত সদস্য, পৌরসভার সদস্যদের মতো সর্বস্তরে বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের খুনের ভয় দেখিয়ে এবং বিক্রয়যোগ্য মানসিকতার কতগুলি জনাদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতককে মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে শাসকদলে যোগ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এখানে পছন্দের পুলিশ অফিসারদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

লক্ষ্য হল সংসদীয় রাজনীতিকে বিরোধীশূন্য করা। একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করা। দলত্যাগবিরোধী আইনের ফাঁকের সুযোগ দিয়ে আয়ারাম-গয়ারাম রাজনীতিকে মদত দেওয়া। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আত্মসাৎ করা। রাজনীতিতে সহিষ্ণুতার মূল্যবোধের ওপর, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর এ-এক ভয়ংকর আক্রমণ। দেশের সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সমালোচনা সহ্য করার, বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ না করার, রাজনৈতিক সহিষ্ণুতাকে মর্যাদা দেবার পরিচয় পাবলিক ফিগারকে দিতেই হবে।

□ এই সমালোচনার অভিমুখ নরেন্দ্র মোদি সরকারের দিকেও ধাবিত। গো-রক্ষার নামে, হিন্দুধর্মের নামে, জাতীয়তাবাদের নামে একদিকে মানবতার প্রতি অসহিষ্ণুতা, বৈরিতা প্রশ্রয় পাচ্ছে। অন্যদিকে মুক্তমনের, মত প্রকাশের স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করা হচ্ছে। গত দু-বছরে মোদি সরকারের অসহিষ্ণু রাজনীতির শাসনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে যেমন বিতর্ক ও উদ্বেগ বাড়ছে, তেমনি উদ্বেগ ও বিতর্ক বাড়ছে হিন্দুদের মধ্যেই উচ্চবর্ণ ও দলিতদের সম্পর্ক নিয়ে। হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদের নেশা মাপা হচ্ছে বিজেপি, আর.এস.এস-এর জাতীয়তাবাদ মাপার তুলাদণ্ডে। জে.এন.ইউ-র ছাত্র কানহাইয়া কুমার আর তাঁর সাথীরা যদি সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে 'আজাদি' চাই শ্লোগান তোলে, আর সে আজাদির ব্যাখ্যা যদি মোদি-অমিত শাহ, আরএসএস-এর হিন্দুদের জাতীয়তাবাদের তুলাদণ্ডের মাপে না উতরায়, কানহাইয়া রাষ্ট্রদ্রোহী হন। কর্নাটকের অভিনেত্রী তথা প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রামইয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পারিকরের মতে মত দিয়ে পাকিস্তানকে নরক ভাবেন নি বলে তাঁর গায়ে রাষ্ট্রদ্রোহের ছাপ লাগানো হয়। হিন্দুত্বের জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললে তাকে আলাদা ও একঘরে করে দেবার নিদান দেন বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, কী বই পড়ব, কিসের মাংস খাব, মন ও মননের কথা কতটা গ্রন্থে লিখে প্রকাশ করব—সব ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারের ওপর মোদি সরকার তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের দম্ভের অসহিষ্ণুতা ও অপরবিদ্বেষীর ছায়া দুলিয়ে যাচ্ছে। ছায়া যে-কোনো ছলে কায়া হয়ে হিংস্র শাণিত দন্তনখরে কণ্ঠরোধ করে টেনে হিঁচড়ে জেলে পুরতে পারে। জীবনকে স্তব্ধও করে দিতে পারে।

□ রাজনীতির ইতিহাসে অসহিষ্ণুতার সন্ত্রাস সৃষ্টির দুই ফ্যাসিস্ট নায়কের কথা আছে। একজন মুসোলিনি। অপরজন তাঁর শিষ্য হিটলার। ইতালি ও জার্মানির মানুষের সামাজিক জীবনে এদের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা প্রেতনৃত্য করেছে। ফ্যাসিস্ট রাজনীতির হিংস্র অসহিষ্ণুতা কী ভীষণ রূপ নেয় মুসোলিনির গর্জনে তার প্রমাণ—''দরকার হলে মুগুরপেটা বা লোহাপেটা করা হবে। এক উঠতি রাজনীতি অসহ্য হতেই পারে। হয় আমার নীতি সত্য কিংবা আপনাদের। যদি আমারটা সত্য হয় তাহলে আমি গোপন ফিসফিসানি, অতর্কিত আক্রমণ, কুৎসা রটনা, মিথ্যা কলঙ্ক লেপন—এ সমস্ত সহ্য করব না। এ সমস্তই ঝেড়ে ফেলে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।'' মুসোলিনি নিজেকে বলতেন সততার প্রতীক। সোসালিস্ট নেতা ও সাংসদ মাত্তেয়ত্তি যখন মুসোলিনির সততা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন, মুসোলিনি চিৎকার করে উঠলেন—ওটাকে কেউ উচিত শিক্ষা দাও। উচিত শিক্ষাই দেওয়া হল—প্রতিবাদী ও বিরোধী নেতা মাত্তেয়ত্তিকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হল। এভাবেই বিরোধী কণ্ঠ রোধ করতে সোসালিস্ট নেতা আমেন্দোলাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছিল। হিটলারের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ছিল আরও ভয়ংকর। ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের উগ্র প্রকাশ ছিল তাঁর রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সব বিরোধীদের, বিশেষ করে কমিউনিস্ট, সোসালিস্ট, ইহুদিদের কণ্ঠ নিষ্ঠুরভাবে রোধ করেছেন হিটলার। হিটলারের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ কতখানি অসহিষ্ণু এবং অপর-বিদ্বেষী ছিল তার দৃষ্টান্ত সোভিয়েত জনগণের প্রতি তাঁর মনোভাব—যত ছোটোলোক। ছোটোলোক জনগণ কীটপতঙ্গের মতো বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। এই ছোটোলোকগুলিকে সাবাড় করার অধিকার নিশ্চিতভাবেই আমাকে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দল সোসাল ডেমোক্র্যাটরা তাঁর নীতির সমালোচনা করতে উঠলেই হিটলার ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের ভয় দেখাতেন—ওদের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছে। বিরোধী নেতা অটোভেলস্-কে বললেন, তোর মৃত্যুঘণ্টা বেজেছে। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে বা ক্ষমতার পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে এই ভয়ে হিটলার তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু এবং সহযোদ্ধা রোয়েমকে পর্যন্ত হত্যা করালেন প্লেনে উড়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। হিটলারের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার চরম বর্বর প্রকাশ গ্যাসচেম্বারে প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি সহ অন্য মানুষদের হত্যা। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতাই ছিল হিটলারের শাসনে জার্মানির, এবং মুসোলিনির শাসনে ইতালির রাজনীতি-ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

৪.

মানুষের সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব প্রসারিত। ধর্মে সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে দেখা যাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে অসহিষ্ণুতা তো আছেই, একই ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতাব প্রকাশ প্রকট হয়েছে যুগে যুগে। হীনযান মহাযানে, ক্যাথলিক প্রোটেস্টানে, শিয়া সুন্নিতে, বৈষ্ণব শাক্তে, হিন্দু মুসলমানে দ্বন্দ্ব সংঘাত, কণ্ঠরোধ, রক্তপাত ধর্মীয় সহিষ্ণুতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। অথচ প্রধান প্রধান সব ধর্মই সহিষ্ণুতার কথা, ধৈর্যের কথা বলেছে। বৌদ্ধধর্মের সহিষ্ণুতা গৌতম বুদ্ধের একটি বাণীতে মূর্ত হয়ে রয়েছে—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে—নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। যীশুখ্রিস্ট সহিষ্ণুতা, পরোপকার, মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব, শান্তির কথা শুনিয়েছেন। ইসলাম সম্প্রীতির কথা, ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতার কথা প্রচার করেছে। ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হও। ধৈর্য ধরা এবং ক্ষমা হল বীরত্বের কাজ। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার কাছে প্রিয়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার কী মহৎ কথা ইসলামে। ধর্মীয় সহিষ্ণুতার এরকম মহৎ কথা হিন্দুদের উপনিষদে, মহাকাব্যে নানানভাবে শোনানো হয়েছে। মহাভারতের কর্ণপর্বে কৃষ্ণ বলছেন—যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম। অনুশাসনপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—অহিংসা, সত্য, অক্রোধ ও দান এই চারটিই সনাতন ধর্ম। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম বলছেন—যার যে ধর্মে শিক্ষা, সেই ধর্মই তিনি অবলম্বন করেন। সকলের সঙ্গে মিত্রতুল্য আচরণ করবে। এই মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শত্রুতা করবে না। মহাভারতে সনৎকুমার বলছেন—অনৃশংসতাই পরম ধর্ম। ক্ষমাই পরম বল।

কিন্তু মানুষের সামাজিক জীবনে সহিষ্ণুতার প্রশ্নে ধর্মের এসব কথা কতটা কার্যকর হয়েছে? ধর্মগ্রন্থের এসব মানবীয় গুণের মহৎ কথা ভুলিয়ে দিয়ে, ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ধর্ম কারবারিরা ধর্মীয় রাজনীতিতে উৎসাহ যুগিয়েছে। ধর্মীয় পার্থক্যকে খুঁচিয়ে তুলে মানুষে মানুষে বিভাজন সৃষ্টি করেছে। ধর্মের বুলি দিয়ে মানুষকে বশ করে, ঘুম পাড়িয়ে নিজেদের নিহিত স্বার্থ সাধন করেছে। এবং সে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে।

৫.

সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতার প্রশ্নে ভারতীয় সামাজিক জীবনে রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বিশেষ চরিত্রবৈশিষ্ট্য রয়েছে। সে হল, এমন একটি সমাজব্যবস্থার উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি যার গঠনতন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে সহিষ্ণুতা এবং অসহিষ্ণুতার সহাবস্থান। অভ্যন্তরীণ বিন্যাসেই ভারতীয় সমাজ একই সঙ্গে সহিষ্ণু এবং অসহিষ্ণু। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরমত, পরধর্মসহিষ্ণুতার মহান প্রচারক সম্রাট অশোক, মহান প্রচারক মোঘল সম্রাট আকবর যেমন রয়েছেন, পাশাপাশি রয়েছেন চরিত্রগতভাবে পরমত, পরধর্ম অসহিষ্ণু ঔরংজেব। মহাকাব্য মহাভারতে (মহাভারত কেবল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম অনুশীলনের আধার নয়) ধৈর্য, স্থৈর্য অনিষ্ঠুরতার প্রতীক নায়ক যুধিষ্ঠির যেমন রয়েছেন, বিপরীতে রয়েছেন অসহিষ্ণুতা ও হিংসার প্রতীক প্রতিনায়ক দুর্যোধন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধের প্ররোচনা যাতে না হয়, পরন্তু শান্তির পক্ষে আবহ তৈরি হয় তার জন্য কতবার যে দৌত্য হয়েছে! কৃষ্ণের রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার দৌত্য যেমন রয়েছে, পাশাপাশি রয়েছে মহাভারতের খলনায়ক শকুনির পুত্র উলুকের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার দৌত্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়েছে এবং সর্ববন্দিত হয়েছে আলাপ, আলোচনা, মতামত বিনিময়ের গুরুত্ব। রাজনৈতিক জীবনে, সামাজিক জীবনে গুরুতর সমস্যা বা সংকট দেখা দিলে আলাপ আলোচনা সভায় বসে যুক্তির, বুদ্ধির, বিবেকের আলোয় নিষ্পত্তির পথ খোঁজাকে যেমন মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়েছেন অশোক, আকবর, একইভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন মহাভারত রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। এই গুরুত্বের ও মর্যাদার উপলব্ধিই হল ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির শক্তিশালী ও উজ্জ্বল ঐতিহ্য।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের যে সংবিধান রচিত হল, সেখানে যে সংসদীয় গণতন্ত্রকে আমাদের মূল রাজনৈতিক ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নিয়েছি তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির সহিষ্ণুতার এই কল্যাণকর উত্তরাধিকার এবং তার বিচারপূর্বক আত্মীকরণ।

ভারতের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে কখনও কখনও অসহিষ্ণুতার নিকৃষ্ট লজ্জাজনক নজির সৃষ্টি হলেও পাশাপাশি রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও স্থাপিত হয়েছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অসহিষ্ণুতার অপকৃষ্ট উদাহরণ ১৯৭৫-৭৬ সালের জরুরি অবস্থা কায়েম। যাবতীয় সহিষ্ণুতার, মতবৈচিত্র্যের ভারতীয় ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে একাধিপত্য স্থাপনের পথ নিষ্কন্টক করতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতির সহিষ্ণুতার মর্যাদার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ। দিল্লিতে যখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির হত্যার প্রতিক্রিয়ায় শিখনিধন যজ্ঞ চলছিল, তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার উদ্যোগ নিলেন পশ্চিমবঙ্গের সে-সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই উদ্যোগ গ্রহণে সাড়া দিয়ে, এই উদ্যোগের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির সহিষ্ণুতার মূল্যবোধকে উপলব্ধি করে, আহিমাচল ভারতবাসী তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল।

সংঘ পরিবারের, তার রাজনৈতিক শাখা বিজেপির এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারের রাজনীতির বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ—তারা ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই উজ্জ্বল ঐতিহ্যের মূলে আঘাত হানছে। ভারতের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার অভিমানকে বিকৃত করছে হিন্দুত্ববাদের আবেগ জাগিয়ে। ভারতকে হিন্দুসভ্যতার দেশ হিসেবে নতুন করে লিখতে চাইছে। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পুনঃপ্রচারের ভীতি সৃষ্টি করছে। তাদের বুঝতে হবে রাজনীতি থেকে পরমত, পরধর্মসহিষ্ণুতা, মতবৈচিত্র্যের মান্যতার মূল্যবোধ স্খলিত হলে রাজনীতির শক্তি ভিন্নমুখী হয়ে সামাজিক জীবনে এবং জাতীয় জীবনে সংকট ডেকে আনে। আমাদের বহুত্ববাদী সহনশীল মানসিকতার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকেই দুর্বল করে।

সহিষ্ণুতার ওপর ভিত্তি করে সংসদীয় গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি রূপে আরও নতুন নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। এর মধ্যে অন্যতম হল উপায় ও লক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন। রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ের মধ্যে যদি সহিষ্ণুতার মূল্যবোধ একইভাবে কাজ না করে, তাহলে রাজনীতির মধ্যে ঢুকে পড়ে ছলচাতুরি, অপকৌশল, মিথ্যাচার, সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির নেশা। আর রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরে দলীয় জমি শক্ত করার নিকৃষ্ট প্রয়াস। মুখের গণতন্ত্র তখন পদ্ধতিতে স্বৈরতন্ত্রের রূপ নেয়। 'আচ্ছে দিন' দেবার, উন্নয়ন করার জনদরদি সব কথা হয়ে ওঠে ভণ্ডামি, শ্লোগানসর্বস্ব চটকদার বুলি। এর সম্পর্কে দেশবাসী সচেতন ও প্রতিবাদী না হলে সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে সংঘাত, বিশৃঙ্খলা প্রকট হয়ে ওঠে। রাজনীতিই নিহত হয়। নিহত রাজনীতিতে দেশের সর্বনাশ, দেশবাসীর সর্বনাশ ঘটছে।

আমরা প্রত্যাশা করব রাজ্যবাসী এবং ভারতবাসী সকলের স্বার্থে সহিষ্ণুতার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর অসহিষ্ণুতার রাজনীতির হামলার বিরুদ্ধে উজ্জীবিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

With Best Compliments of

A Well Wisher

Sl. No. 24

বহুমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও দাঁড়াতেই হবে

অমল হালদার

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের পর আমাদের রাজ্যে শাসকদলের আক্রমণের তীব্রতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত জনগণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষাকারী অংশটিকে চিহ্নিত করে তাদের ওপর ভয়ানক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। ঘরবাড়ি লুঠ ও ভাঙচুর, বিপুল অঙ্কের টাকা জরিমানা, ঘরছাড়া করা, নিজের জমিতে চাষের কাজে নিষেধাজ্ঞা, এমনকি বাড়ির মহিলা ও শিশুদেরও রেহাই নেই। এই ধরনের চরম স্বৈরাচারী কায়দায় নির্মম আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এই আক্রমণ আমাদের বামপন্থীদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে। এই চ্যালেঞ্জের মধ্যই একটা সুযোগও আসছে। মনে রাখতে হবে প্রতিটি আক্রমণ ও বিপদের মধ্যে একটা সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। আমাদের দায়িত্ব হল হতাশায় না ভেঙে পড়ে সেই সম্ভাবনাকে খুঁজে বের করা। সারদা, নারদা সহ একটার পর একটা কেলেঙ্কারির ঘটনায় এই সরকার ছিল বিপর্যস্ত। রাস্তাঘাটে, ট্রেনে, বাসে একটা আওয়াজও উঠেছিল—একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা ছিল উন্নয়নের ঘাটতি মানুষ মেনে নেয়, কিন্তু ন্যায় ও নীতির ঘাটতি কখনও মানুষ মেনে নেয় না। নির্বাচনের এই ফলাফল নিয়ে নানা স্তরে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, হয়তো আরও করতে হবে। সেখানেও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয়েছে জনগণের সঙ্গে সম্পর্কের দুর্বলতা। অন্যান্য বহু প্রসঙ্গ আলোচনায় এসেছে। তা নিয়ে এই পরিসরে উল্লেখ করছি না, যা মূলত রাজনৈতিক। প্রবল সন্ত্রাসের কারণে জনগণের কাছে পৌঁছোনোর দুর্বলতা কিংবা আমাদের কাজের ধারায় গতানুগতিকতা বা যান্ত্রিকতা কোন্ কারণগুলি বাস্তবসম্মত তা গভীরভাবে অনুসন্ধান করা দরকার। মূলত গ্রামের গরিবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ঘাটতি অনেক বেশি নজরে আসছে। বেশ কয়েক বছর আগে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি গ্রামের গরিব পাড়ায় গ্রুপ বৈঠকে সভাপতির আসনে বসা গ্রামের গরিবদের পোড়খাওয়া নেতারা বক্তব্য রাখতে গিয়ে গরিব ঘরের তরুণ প্রজন্মের কাছে জটিল শব্দ বাদ দিয়ে অতীত দিনের তাঁদের জীবনকথা বুঝিয়ে বলতেন। শ্রেণিঘৃণা কাকে বলে ফুটে উঠত তাঁর বক্তৃতায়। তরুণ প্রজন্মের ছেলেদের চোখগুলো যেন জ্বলে উঠত। সংগ্রাম-আন্দোলনের পোড়খাওয়া মানুষগুলো প্রকৃতির নিয়মে বিদায় নেওয়ার পর যে শূন্যতা তৈরি হল আমরা অনেক ক্ষেত্রেই তা ভরাট করতে পারলাম না। গরিব ঘর থেকে যোগ্য কর্মী গড়ে তোলার জন্য আলোচনা যত হয়েছে বাস্তবে কাজ হয়েছে অনেক কম। বলিয়ে কইয়ে অংশটা মধ্যবিত্ত অংশ থেকেই আসে। তারাই নেতৃত্ব দেয়।

আমরা যেসব শ্রেণি থেকে এসেছি আমাদের নজর থাকে সেদিকেই। ফলস্বরূপ নীরব অথচ দক্ষ সংগঠক আমাদের নজরের বাইরে চলে গেছে। এটা ঠিকই—সব অংশের মধ্যে ইতিবাচক নেতিবাচক দুটো দিকই আছে। শ্রেণিচ্যুতি উভয় অংশের মধ্যেই ঘটতে পারে কিন্তু নজরদারির একটা ভূমিকা তো থাকেই। দুটো সন্তান সমান স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মায় না। লালনপালনে ত্রুটি হলে সবলও দুর্বল হয়ে যায়। লালন-পালনের ত্রুটিটা কতটা গভীরে তা উভয়কেই খুঁজে বের করতে হবে।

আজকের সময়টা বড় জটিল। স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা, জীবনপ্রণালী, নীতি আদর্শে একনিষ্ঠ কর্মী ছাড়া বর্তমান সময়ে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। আমাদের কর্মক্ষেত্রে দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের শক্তিবৃদ্ধি কেউ অস্বীকার করতে পারব না। বাস্তব ক্ষেত্রটা যা তাতে ওদের কথা মিষ্টি লাগতেই পারে যদি আমরা সচল না থাকি।

গোটা দেশে চলছে বিশ্বায়ন উদারীকরণের ভয়ঙ্কর আগ্রাসন। কেন্দ্রের মোদি সরকার নয়া উদারীকরণ নীতির নামে সারা দেশটার সর্বনাশ করে দিচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সহ, ব্যাঙ্ক-বিমা ধ্বংসের মুখে। সদ্য বর্ধমান জেলায় হিন্দুস্থান কেবল্স, দুর্গাপুরের ডি.সি.এল. বন্ধ হয়ে গেল। বেকাল হল কয়েক হাজার শ্রমিক। বিলগ্নিকরণ করছে, দেশের রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে, প্রত্যক্ষ করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে, কয়েকটা তাঁবেদার পুঁজিপতির বাড়বাড়ন্ত, পরোক্ষ করের বোঝা চাপানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপর। নির্বাচনী প্রচারে কালো টাকা বিদেশ থেকে এনে গরিবদের দেওয়া হবে বলা হয়। প্রতি গরিব নাকি ১৫ লক্ষ করে টাকা পাবে। কোথায় গেল সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি! অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর আগ্রাসনের মুখে সারা দেশ।

এই আক্রমণ আমাদের মননকে বিবশ করে দিচ্ছে। বিশ্বায়ন-উদারীকরণ সম্পর্কে চমৎকার কথা বলা মানুষও নিজেকে কেবলমাত্র বাঁচাতে ধর্মঘটের দিনে কাজে যোগ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে দুর্বল করতে সাহায্য করে। নয়া উদারনীতি কেবল অর্থনীতি নয়, তার সাথে সমঞ্জস রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং জীবন দর্শনের একটি সামগ্রিক প্যাকেজ। মানুষের রাজনৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুবিধার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। সমষ্টিগত সুবিধার চেয়ে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানই মুখ্য। প্রতিটি মানুষই যেন একা, তাঁকে জীবনে টিকে থাকতে হবে বাকিদের সাথে লড়াই করে। লড়াইতে নেমে হয় জয়লাভ কর নতুবা বাঁচার দরকার নেই। যোগ্যতমের টিকে থাকার এই জীবনদর্শনে একটাই কথা—আমি কী পেলাম? বামপন্থী সরকারের সাফল্যে আমাদের 'ঘরেতে অভাব' নেই, তাই পৃথিবীটাকে 'কালো ধোঁয়া' মনে হয় না। সেজন্যই দূরদর্শনের পর্দায় উন্নত ভালো সামগ্রী দেখে মনে বাসনা জাগে আমাকে এই সামগ্রী পেতে হবে। এই বায়নাকেই ব্যবহার করছে বর্তমান সরকারের প্রধান। ওদের উন্নয়নের নামে কী চলছে মানুষ তা প্রত্যক্ষ করছেন। মেলা, খেলা, উৎসব, দান খয়রাতি—এগুলিই প্রধান। সবক্ষেত্রেই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক। জনগণকে ভিখারি বানানোর চেষ্টা চলছে। সাইকেল, চাল, কন্যাশ্রী—সব ক্ষেত্রেই ভিক্ষে নাও আর বিনিময়ে শাসকদলের প্রতি আনুগত্য দেখাও। বামপন্থীরা সরকারি সাহায্য করত কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন করা। জনগণের করের টাকায় অর্জিত এই সম্পদ জনগণই ভোগ করবে, এর মধ্যে ব্যক্তি বা দলের প্রতি বাহবা কেন? আসলে আমরা চেয়েছিলাম অধিকারবোধ জাগ্রত করে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। ওরা চায় আনুগত্যের প্রকাশ। এই চরম সত্যগুলি বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি কিংবা আমরা অন্যমনস্ক হয়ে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়েছি।

শরীরবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদিন মানুষ নানা জিনিস গ্রহণ করে আবার বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে, অন্যথা শরীর অসুস্থ হয়। উদারীকরণের এই যুগে মননের ক্ষেত্রে একই জিনিস দরকার। আমি চাই বা না চাই প্রতিদিন আমাদের মননে নানা জিনিস ঢুকছে। আমাদের চেতনা দিয়ে তার মধ্যে বর্জনীয় জিনিস পরিত্যাগ না করলে বিচ্যুতি আসতে বাধ্য। নতুন পরিস্থিতিতে এ কাজ সম্পন্ন করতে চাই নিজেদের পরিবর্তন সাধন, অসীম ধৈর্য, সচেতনতা, দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা, বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুততার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণ। কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতেই হবে। সহকর্মী বিপদে পড়লে তার কাছে না পৌঁছে মোবাইল ফোনের সাহায্যে কথা বলে যেন দায়িত্ব না সারি। সহকর্মীর বিপদে তার পিঠে হাত রাখলে সে উত্তাপ দেহমনে সঞ্চারিত হয়। মোবাইল ফোন তা পারে না। গরম কাঁসার বাটির সাথে ঠান্ডা কাঁসার বাটির যোগ হলে ঠান্ডা কাঁসার বাটি গরম হয়ে যায়। সাহসী, আত্মবিশ্বাসী কর্মী অপেক্ষাকৃত দুর্বল চেতনার কর্মীরও উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়। সেদিন একজন বুদ্ধিজীবী আলোচনায় বললেন, পশ্চিমবাংলায় এখন ভয়ও বিক্রি হচ্ছে। এই দুর্বলতা সর্বস্তরে কাটাতেই হবে। নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেক বেশি। কর্মীরা হল আমাদের গচ্ছিত সম্পদ। লেনিন বলতেন, গর্ভযন্ত্রণার চেয়ে সন্তান মানুষ করা কঠিন। একজন কর্মীকে সযত্নে গড়ে তুলতে হয়, আদর্শবোধে দীক্ষিত করতে হয়, বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে হয়—অর্থাৎ আজকের পরিস্থিতিতে কর্মীকে রক্ষা করাটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শাসকদলের পক্ষ থেকে বিপুল টাকার হাতছানি, ভোগ-লালসা কিছু জনকে সাময়িক বিভ্রান্ত করবেই। এই কর্মীরা চলে যাওয়ায় কোনো ক্ষতি হবে না। এখনও অনেকে আছেন যাঁদের আমরা অজস্র অপরাধের কারণে সরাতে পারিনি তাদের চলে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে ভালো। এই ধরনের কর্মীদের শরীরটা ছিল, মস্তিষ্কটা অনেক আগেই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কেউ হয়ত মিথ্যা মামলা বা সন্ত্রাসের কথা বলতেই পারেন—সে সবই অজুহাত। আসলে ওই অংশ আরও উন্নত ভোগ চান, এই কথা চেপে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের ঢাক পেটাচ্ছেন। জনগণ কিন্তু এদের ছাড়বে না, দিন বদলের পালা শুরু হবেই। সেদিন তাদের আসামীর কাঠগড়ায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। পঞ্চায়েত সদস্যদের চলে যাওয়ায় খুব একটা আশ্চর্য লাগে না। কারণ ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের মুখে। আক্রমণে বিপর্যস্ত বহু কর্মীরই প্রার্থী হবার ক্ষেত্রে মানসিক বাধা ছিল। কাজেই আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা, সততার প্রশ্ন, উন্নত আদর্শবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলি বাদ দিয়ে সাহসে ভর করা একগুচ্ছ কর্মীকে প্রার্থী করতে হয়। ভাবনাটা ছিল চাপের মুখে যেন শেষ মুহূর্তে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার না করেন। যে পঞ্চায়েতগুলি বামপন্থীদের ছিল তাদের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনোভাব ছিল ভয়ানক। জেলা প্রশাসন প্রতিক্ষেত্রেই অসহযোগিতা করেছে, পুলিশ প্রশাসন মিথ্যা মামলার ভয় দেখিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয়েছে দল পরিবর্তনে।

বর্তমান শাসকদলের এক পোয়া থেকে চারপোয়া—সব স্তরের কর্মীদের ভোগলালসা তীব্র আকার ধারণ করেছে। তোলাবাজি, সিন্ডিকেট, প্রমোটারি, পঞ্চায়েত পৌরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি জনগণও প্রত্যক্ষ করছেন। জনগণ সরব হচ্ছেন না, তার অর্থ এই নয় জনগণ খোঁজ রাখেন না। সরকারের প্রধান যখন বলেন, যার মূল কথা হল, চুরি করো ক্ষতি নেই, বেশিদিন টিকে থাকতে হলে তা অল্প অল্প করে, যেন চোখে পড়ার মতো না হয়—এই বক্তব্য শোনার পর তাঁর কর্মীরা বড়ই উল্লসিত। ফলস্বরূপ গ্রামে গ্রামে কতজন প্রধান, সভাপতি, নিদেনপক্ষে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার জন্য বসে আছেন। একবার পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারলেই কেল্লা ফতে।

সর্বত্রই তার তোড়জোড় চলছে। হবে না কেন, ৬ বছর আগে কোনো একজন তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে দুবেলা খাবার জুটত না, দোকানে চা খাবার পয়সা ছিল না। তিনি প্রধান হবার পর বিশাল অট্টালিকা, নিজস্ব গাড়ি, জীবন-যাপনের বিশাল উন্নতি জনগণ দেখছেন। প্রধান সহ সর্বস্তরে পদাধিকারীদের কার্যত একই অবস্থা। কোটি কোটি টাকা পঞ্চায়েতে আসছে। কেউ তার হিসেব জানেন? কোথায় কী স্কিম চলছে, বরাদ্দ কত আমরা কেউ জানি না। এই ধরনের পুকুরচুরি কেউ অতীতে দেখেছেন? গর্ব করে আমরা বলি আমাদের দু-চারজন ছাড়া প্রায় সকল অংশ সততার সঙ্গে পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান, বিশেষ করে গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে, তাঁদের জীবনকথায় বলা যায় যে আজ তাঁদের ঘরে খড় নেই, বর্ষায় জল পড়ে। অপরের জমিতে খাটতে যায়, কেউ সুযোগ পেলে ১০০ দিনের কাজে যায়। ১০ বৎসর প্রধান ছিলেন এমন কর্মীর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বড় কাছ থেকে দেখেছি। গ্রামের গরিবদের কাছে এদের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে। পঞ্চায়েত পরিচালনার সময় নেতৃত্ব দেওয়ার নামে অনেক ক্ষেত্রে খবরদারি করায় এদের মধ্যে কেউ কেউ অভিমানী ছিলেন, খেলা ছেড়ে গ্যালারিতে স্থান নিয়েছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে এই অংশটি গ্যালারি ছেড়ে মাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন। চোখের সামনে পঞ্চায়েত-বাবুদের রমরমা আর গরিবের জন্য এক মুষ্টি ভিক্ষা এটা বেশিদিন চলবে না। ২ টাকা কেজি দরে চাল বন্ধ হবে কিংবা সীমিত হবে। ভোট চুকে গেছে এখন সাইকেল, কন্যাশ্রী কোথায়? ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রও সংকুচিত হবে। যতই বলা হোক শিল্পায়ন হবে না, কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকবে না। দুর্গাপুর-আসানসোলের মতো শিল্পাঞ্চলে কাজ পাওয়া তো দূরের কথা, শ্রমিক ছাঁটাই চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পড়াশুনা লাটে উঠে গেছে। হাসপাতালগুলির দৈন্যদশা বাড়ছে। আবার মেডিকেল র‍্যাঙ্ক কোনো প্রশ্ন নয়, স্বল্পমধার ছেলেরা বাপের টাকায় ডাক্তারি পড়বে। ভবিষ্যতে এরা কী চিকিৎসা করবে কে জানে? গ্রামে কৃষকের ফসল বিক্রি করতে দুবেলা ঘাম ঝরছে। ডিজেল, বিদ্যুৎ, সার, বীজ ও কীটনাশকের দাম বেড়েই চলেছে। কৃষির ওপর থেকে ভর্তুকি কমানো হচ্ছে। ফলে উৎপাদন খরচ দ্বিগুণ। বর্তমানে কৃষক দিশেহারা। জিনিসপত্রের দাম লাগামছাড়া। ডাল, তেল, চিনি সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। মহিলাদের ওপর আক্রমণ নিত্যদিনের ঘটনা। বারো বছরের মেয়েরও রেহাই নেই। নারী পাচারে এ-রাজ্য এখন প্রথম স্থানে। মহিলাদের কোনো নিরাপত্তা নেই। প্রচারমাধ্যমও নীরবতা পালন করছে। আর বুদ্ধিজীবীরা তো দীর্ঘদিন নীরব। এই ধরনের ঘটনাগুলি জনগণকে ভাবাবেই। যত সংকট বাড়বে, মানুষের পেটের জ্বালা বাড়বে, আমাদের মস্তিষ্কটা পচিয়ে দেবার মতো সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের সুড়সুড়ি দেওয়া হবে। এই ধরনের সংকটের পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে সতর্ক থেকে শ্রমজীবী মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বামপন্থীরা যে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি ইতিহাসের বহু ঘটনা তা প্রমাণ করেছে। এত আক্রমণের মুখে আমরা ছাড়া কেউ বুক চিতিয়ে লড়তে পারব না। মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে হবে। আমরা যেন মেরুদণ্ড হরিয়ে না ফেলি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় বিশিষ্ট কবি শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতা :

ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। বাইরে কি ঝড়
হচ্ছে?
দাপাদাপি করছে জানালার পাল্লা দুটো
মাঝে মাঝে বিজলি ঝলকাচ্ছে
ফের শুয়ে পড়তে গিয়ে সেই বিদ্যুতের
ছটফটে আলোয় মনে হল ঘরের মধ্যে যেন
হামা দিচ্ছে কেউ।
'কে ওখানে? কে?'
হামা কোনো শব্দ করে না
উঠে আসি কাছে, আবারও জিজ্ঞেস করি
'কে আপনি? কী চান?'
সে তবু নিশ্চুপ থেকে এ কোণে ও কোণে
ঘুরছে
মাথা তুলছে না কিছুতেই চোখে চোখ নয়
'কিছু কি খুঁজছেন আপনি?'
শুনতে পাচ্ছি : 'খুঁজছি ঠিকই খুঁজতে তো
হবেই—
পেলেই বেরিয়ে যাব, নিজে নিজে হেঁটে'
'কী খুঁজছেন?'
মিহি স্বরে বললেন তিনি : 'মেরুদণ্ডখানা'
সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকালো ফের! চমকে উঠে দেখি
একা নয়, বহু বহু জন
একই খোঁজে হামা দিচ্ছে এ কোণে ও কোণে ঘর জুড়ে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উন্নত মানের ধান ও আলু বীজের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

কালনা-২ সি.এ.ডি.পি. ফার্মার্স সার্ভিসকোঅপারেটিভ সোসাইটি লি.

রেজি নং. ১৩, কাটোয়া, তাং : ২৭-০৭-১৯৭৬

ফোন : (০৩৪৫৪) কোল্ড স্টোরেজ : ২৪৫২৭১, সার্ভিস সেন্টার : ২৪৫৩২১, অফিস : ২৪৫২৩১

পোঃ বৈদ্যপুর, বর্ধমান-৭১৩১২২, *E-mail : kalna2fscs@gmail.com*

Sl. No. 19 Mob. 9564687825, Secretary

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381
Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 90

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রসঙ্গে

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশে সংসদ নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচন সহ বিভিন্ন যে নির্বাচনগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রেরই অংশ। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া গণতন্ত্র। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা—যার মর্মবস্তু হল পুঁজির শোষণ, সেই ব্যবস্থার অঙ্গ হল সংসদীয় গণতন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বৈরাচারকে পরাস্ত করে দেশে দেশে যখন বুর্জোয়া বিপ্লব অগ্রসর হচ্ছিল তখন গণতন্ত্রের পতাকা উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছিল। সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বুজোয়া বিপ্লব সফল করতে জনগণকে সামিল করার জন্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শ্লোগান প্রাধান্য পেয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল।

সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে গণভিত্তি দেওয়া ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অর্থ পুঁজিবাদী শোষণ। সেই শোষণকে চ্যালেঞ্জ না জানিয়ে গণতন্ত্রের লক্ষ্যে অন্য যে-কোনো কার্যধারা সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত। এটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা। পুঁজিবাদী শোষণকে মেনে নিয়ে গণতান্ত্রিক কর্মধারা, এটাই হল এই ব্যবস্থার মূল কথা। অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় জনগণের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল শোষিত জনগণ।

আমাদের ভারতে স্বাধীনতার পর বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পুঁজিপতি-জমিদাররা ভারত রাষ্ট্রকে পরিচালনা করছে। স্বাধীনতার পর এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদের ব্যবস্থা থাকলেও এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সি পি আই(এম)-এর কর্মসূচিতে বলা হয়েছে—

> ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং জনগণকে কিছু মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। এইসব অইধকারের অনেকগুলিকেই রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে, বিকৃত করে, এমনকি লঙ্ঘনও করে থাকে। যখন শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অংশের সংগ্রামের প্রশ্ন আসে, তখন তাদের মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এমনকি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিধিনিষেধ জারি রেখে এক একটা গোটা এলাকায়, লক্ষ লক্ষ লোক অধ্যুষিত এক একটা গোটা অঞ্চলে সভা সমাবেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়। শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষ যখন তাদের নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও দাবি-দাওয়া রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে ওঠেন, তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন যন্ত্রের হিংস্রতা তাদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে উগ্র হয়ে ওঠে।... [৫.১৮ ধারা]

সংসদীয় সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখের সাথে সাথে এর মধ্যেকার ইতিবাচক দিকগুলির কথাও সিপিআই(এম) কর্মসূচিতে তুলে ধরা হয়েছে—

> অবশ্য গণতন্ত্রের জন্য এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, সংসদ ও রাজ্য আইনসভা জনগণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারে। যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ হয়েছে, যেমন অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সময়ে হয়েছিল, তখন জনসাধারণ সেই স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। বুর্জোয়াদের শ্রেণি শাসনের একটি রূপ হলেও, ভারতের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থা জনগণের পক্ষে একটি অগ্রগতির প্রতীকও বটে। জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য, কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তা জনগণের কাছে কিছুথুটা সুযোগ এনে দিয়েছে। [৫.২২ ধারা]

সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি

সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কর্মসূচি থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হয়েছে তার থেকে এটা তো পরিষ্কার যে এ সম্পর্কে কোনো মোহ পার্টির নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রামকে সফল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে কমিউনিস্টরা কাজ করছে। ভারতের বুকে কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অবিচল থেকে দেশের শ্রেণিশক্তিগুলির ভারসাম্যের কথা বিবেচনায় রেখে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আশু বিপ্লবী কর্তব্য হিসেবে উপস্থিত করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে বুর্জোয়া-জমিদার শাসক গোষ্ঠীকে অপসারিত করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কমিউনিস্টরা কাজ করছে। সমাজের এই বৈপ্লবিক রূপান্তর শাসকশ্রেণিরা কখনই মেনে নিতে পারেনি, পারে না। বিশ্বের দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে বিপ্লবী সংগ্রমের অগ্রগতিকে তারা বাধা দেয়, পরাস্ত করতে চেষ্টা করে। বিপ্লবী সংগ্রামের জয় সুনিশ্চিত করতে কমিউনিস্ট পার্টিকে যে কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। পার্টি-কর্মসূচিতে বলা হয়েছে,

> ...কিন্তু এটা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে, শাসকশ্রেণিরা কখনো স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। তারা জনগণের ইচ্ছাকে অস্বীকার করে, অরাজকতা ও হিংসার সাহায্যে তা উল্টে দিতে চেষ্টা করে। সেজন্য বিপ্লবী শক্তিগুলির হুঁশিয়ার থাকা দরকার এবং এমনভাবে তাদের কাজকর্মের ধারা স্থির করা দরকার যাতে তারা সমস্ত রকম জরুরি পরিস্থিতির এবং দেশের রাজনৈতিক জীবনের যে কোনো বাঁক ও মোড়ের সম্মুখীন হতে পারে। [৭.১৮ ধারা]

বাম বিচ্যুতির যারা শিকার তারা সংসদীয় গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ করা, তাকে ব্যবহার করার চরম বিরোধী। লেনিনকে বাম বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। মানব সমাজের বিকাশ ধারায় পুঁজিবাদ বাতিল হবেই। পুঁজিবাদের অবসানকে নানাভাবে বিলম্বিত করা যেতে পারে। কিন্তু পতনের অনিবার্যতাকে কেউ আটকাতে পারবে না। সংসদীয় গণতন্ত্র যা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে, সেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি সম্পর্কে কমিউনিস্টরা অবহিত হলেও জনসাধারণের চেতনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। লেনিন এভাবেই আলোচনা করেছেন। ১৯০৫ সালে রুশ দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার পর রুশ সংসদ ডুমায় প্রথম দিকে অংশগ্রহণ না করলেও পরবর্তীকালে বলশেভিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তার ফলে শক্তিশালী হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষের চেতনায় বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য কমিউনিস্টরা যতখানি সম্ভব শ্রমিকশ্রেণি সহ মেহনতি জনগণের স্বার্থে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যবহার করবে, কাজে লাগাবে এবং এই ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরবে।

শ্রেণি আন্দোলন ও গণসংগ্রামকে শক্তিশালী করার যতখানি সুযোগ এই ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে কমিউনিস্টরা কোনো ইতস্তত ভাব দেখাবে না। এটা তো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে সংসদীয় গণতন্ত্রে, বিশেষ করে নির্বাচনী সংগ্রামে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নীতি ও বক্তব্য সম্পর্কে মানুষের বর্ধিত আগ্রহ লক্ষ করা যায়। এই সময়কালের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণে রেখে কমিউনিস্টদের সঠিক কার্যধারা জনগণের চেতনাকে কিছুটা উন্নত করতে পারে। শুধুমাত্র নির্বাচনী সংগ্রামই নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী লক্ষ্য ও আদর্শের কথা শ্রমজীবী মানুষ সহ জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সুযোগকে ব্যবহার করতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনো মোহ না রেখেই বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে একে ব্যবহার করা সম্পর্কে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাকে আত্মস্থ করতে বাম সংকীর্ণতাবাদীরা ব্যর্থ। আমাদের দেশেও সংকীর্ণতাবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে শ্রেণি ও গণআন্দোলনের বিকাশে তথা জনগণের চেতনা বিকশিত করার প্রয়াসের চরম বিরোধী। ধারাবাহিকভাবে নিরন্তর জনগণের মধ্যে কাজের মধ্য দিয়েই তাদের চেতনাকে বিকশিত করা সম্ভব। ধৈর্য ধরে কাজের মধ্য দিয়েই শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণি আন্দোলনকে গড়ে তোলা সম্ভব। শুধুমাত্র বিপ্লবী বুলি আউড়ে এ কাজ হয় না।

আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে সিপিআই(এম)-কে বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠন করতে হয়েছে। এগুলি কোনো বিপ্লবী সরকার নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে সরকার। সংসদীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই ধরনের সরকারগুলি গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচিগত বোঝাপড়া হল—

> ...বর্তমান শাসকশ্রেণিগুলিতে ক্ষমতাচ্যুত করে শ্রমিক-কৃষকের দৃঢ় মৈত্রীর উপরে প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সরকার স্থাপনের কর্তব্যকে জনগণের সামনে অবিচল রেখেও, যদি তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, জনগণের সমস্যাবলী প্রশমনের এক কর্মসূচিতে অঙ্গীকারবদ্ধ কোনো সরকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, তা হলে পার্টি তেমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে ও বর্তমান সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিকল্প নীতিগুলি তুলে ধরা ও প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। অবশ্য এই ধরনের সরকারগুলি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মৌলিক সমাধান কোনোভাবেই করবে না। তাই পার্টি সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজ্যগুলিতে অথবা কেন্দ্রে এই ধরনের সরকার গঠনের সুযোগ গ্রহণ করেও বর্তমান বৃহৎ বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্র ও সরকারের অপসারণের আবশ্যকতা সম্পর্কে ব্যাপকতম জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে থাকবে এবং এর দ্বারা গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করবে। (নিম্নরেখ লেখকের) [৭.১৭ ধারা]

যে দিকটি বিশেষভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন

সংকটের তীব্রতার কারণে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনতে দ্বিধা করে না। সংসদীয় গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন-সংগ্রামের যখন অগ্রগতি ঘটতে থাকে তখন সংসদীয় গণতন্ত্র বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়।

> সংসদীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের বিপদ শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের স্বার্থরক্ষাকারী পার্টিগুলির কাছ থেকে আসে না। এই বিপদ আসে শোষকশ্রেণির কাছ থেকে। নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য তারাই সংসদীয় ব্যবস্থাকে একটি হাতিয়ারে পরিণত করে ভেতর ও বাইরে থেকে এই ব্যবস্থাকে খর্ব করে। যখন জনগণ তাদের লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করতে শুরু করেন এবং বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রণি ও জমিদারদের প্রভাব থেকে দূরে সরে যান, এইসব শ্রেণিগুলি সংসদীয় গণতন্ত্রকে পদদলিত করতে দ্বিধাবোধ করে না।... [সিপিআই(এম) কর্মসূচির ৫২৩ ধারা]

বর্তমান সময়ে সমগ্র দেশের সাথে আমাদের দেশেও দক্ষিণপন্থী রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। ফ্যাসিস্ত-সুলভ রাজনৈতিক দলগুলির শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তো ফ্যাসিস্ত চরিত্রের সংগঠন। এরা সরাসরি কেন্দ্রের সরকার পরিচালনায় ভূমিকা পালন করছে। সংসদীয় গণতন্ত্রও সুরক্ষিত ভাবার কোনো কারণ নেই।

আমাদের রাজ্যে সরকার পরিচালনা করছে এক চরম স্বৈরাচারী রাজনৈতিক শক্তি—তৃণমূল কংগ্রেস দল। ফ্যাসিবাদী কায়দায় এরা বিরোধীদের আক্রমণ করছে। বিরোধী দলগুলির স্বাধীন কার্যকলাপও এরা বরদাস্ত করতে রাজি নয়। বিরোধী পরিচালিত জেলা পরিষদ সহ পঞ্চায়েতগুলি এবং পুরসভাগুলি এরা প্রলোভন, গায়ের জোর খাটিয়ে দখল করছে। এমনকি বিরোধী দলের বিধায়ক সহ বিভিন্ন

নির্বাচিত সদস্যদেরও এরা নানা পন্থায় দলত্যাগ করাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যূনতম সৌজন্য, মূল্যবোধগুলি তৃণমূল কংগ্রেস দল ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এ হেন পরিস্থিতিতে সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রমের সমন্বয়

ভারতে বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতি নির্ভর করছে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামের সমন্বয়ের ওপর। সংসদীয় সংগ্রামের গুরুত্বকে যেমন বিবেচনায় রাখতে হবে, সাথে সাথে সংসদ-বহির্ভূত যে সংগ্রাম, বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ, ধর্মঘট, এগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। একথা স্মরণে রাখতে হবে যে সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রাম ব্যতিরেকে এমনকি সংসদের অভ্যন্তরের সংগ্রামও অগ্রসর হতে পারে না। ভারতের সংসদের অভ্যন্তরে বিজেপি-র চরম জনবিরোধী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাইরের গণসংগ্রাম ব্যতিরেকে শক্তি অর্জন করতে পারে না। আমাদের রাজ্যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিধানসভার অভ্যন্তরের লড়াইকে ব্যবহার করতে হবে। মাঠে-ময়দানে-কলে-কারখানায়-রাস্তায় সন্ত্রাস-বিরোধিতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে বিধানসভার অভ্যন্তরের সংগ্রামের সাথে যুক্ত করতে হবে।

সংসদ-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে

সংসদীয় গণতন্ত্র ও সংসদ-সর্বস্বতাকে গুলিয়ে ফেলা হবে মারাত্মক ত্রুটি। সংসদ-সর্বস্বতা হল এক সংস্কারবাদী বিচ্যুতি। এ সম্পর্কে ১৯৯৬ সালে সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির শুদ্ধিকরণ অভিযান সংক্রান্ত দলিলে বলা হয়েছে—

> সংসদ-সর্বস্বতার রোগকে শুধুমার নির্বাচিত পদে ও ক্ষমতায় থাকার জন্য নেতা ও কর্মীদের ব্যক্তিগত বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি একটি পুরোপুরি সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির কার্যকলাপকে শুধুমাত্র নির্বাচনী কাজকর্মের মধ্য সীমাবদ্ধ রেখে এই মোহ ছড়াতে চায় যে, কেবল নির্বাচনী লড়াইতে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই পার্টির অগ্রগতি সুনিশ্চিত করা সম্ভব। গণআন্দোলন সংগঠত করা, আন্দোলন-সংগ্রাম চালানো এবং পার্টি গড়ে তোলার কাজে অবহেলা করাটা এই সংসদসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ফসল।
>
> নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় না করানোর জন্য কোনো কোনো কমরেডের বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।... অবাঞ্ছিত বুর্জোয়া প্রভাবের অনুপ্রবেশের একটা বহিঃপ্রকাশ সংসদীয় সুবিধাবাদের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। সংসদ-সর্বস্বতার প্রসার আবার যুক্ত বৈষয়িক অবস্থা আরও বাড়ানো এবং আরও উন্নত জীবনপ্রণালীর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে।

নির্বাচনে জেতার আকাঙ্ক্ষায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্টি ও প্রার্থীর পক্ষ থেকে বুর্জোয়া পার্টিগুলির পদ্ধতি অনুসৃত হয়। নির্বাচনে টাকা ও মদ অঢেল ব্যবহার করে বুর্জোয়া পার্টিগুলি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্টি ও প্রার্থী এই পদ্ধতি-প্রকরণের দিকে ঝুঁকছে এমন রিপোর্ট নেই তা বলা যাবে না। এইগুলি সংসদ-সর্বস্বতার প্রতিফলন। এই বোধ সমস্ত পার্টিকর্মীদের মধ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন যে, নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে জেতার জন্যই পার্টি লড়াই করে, সম্ভাব্য যে-কোনো উপায়ে জেতাটা তার লক্ষ্য নয়। জনগণের সমর্থনকে মূলধন করে জেতাটাই পার্টির লক্ষ্য। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও অনেক সময়ে এই ঝোঁকের প্রতিফলন ঘটে।

বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্বজুড়ে দক্ষিণপন্থা মাথা চাড়া দিতে চাইছে। সেই সময়ে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী পার্টির কার্যধারা পরিচালনা করা ও তাকে শক্তিশালী করা, জনগণকে বেশি বেশি করে বিপ্লবী আন্দোলনের পাশে জমায়েত করা একটা চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে অগ্রসর হতেই হবে। শোষণের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কমিউনিস্টরা বদ্ধপরিকর। সংসদীয় গণতন্ত্রের সুযোগ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করেই অগ্রসর হতে হবে। ছুৎমার্গ বা মোহ কোনোটাই নয়, সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে সংসদীয় পথের সংগ্রামের সাথে সংসদ-বহির্ভূত সংগ্রামকে সমন্বিত করে অগ্রসর হওয়াই পরিস্থিতির চাহিদা। নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এই শিক্ষাই উপস্থিত করেছে। পরিস্থিতির ভিন্নতাকে খেয়ালে রেখে ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় রেখে কমিউনিস্টদের অগ্রসর হতেই হবে। দুনিয়াটাকে পাল্টানোর ঐতিহাসিক দায়িত্ব কমিউনিস্টদের।

With Best Compliments of

Baba Kalu Roy Heemghar Pvt. Ltd.

Regd. Office : TRK-BDN Road, Tarakeswar, Hooghly-712410

Heem Ghar : Jaragram, Burdwan, PIN : 713404

Ph : (03212) 276323, (03213) 258556

Sl. No. 16

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 92

নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চায় আজকের সময়

সলিল আচার্য

তুমিই তো সেই—
নিশ্চিত প্রত্যয়ে যে বলেছিল,
যতো কেন হারো
বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো শক্তি নেই
হাত ধরে পৌঁছে দেয়
এগোবার পথে...।

(অনিল ঘোষ)

'বিজয়ীদের উৎসব চলছে, তাতেও আক্রান্ত বিরোধীরা। কারণ উৎসবটাই আক্রমণের! বাংলার মানুষের সম্মান এভাবেই বাড়ানো হবে? —না! এভাবে চলতে দেওয়া যাবে না! রুখতে হলে প্রতিবাদ—রুখতে হলে প্রতিরোধ মানুষের হাতিয়ার।' হোয়াটস্ অ্যাপ-এ লেখা এলো—এক বন্ধু পাঠিয়েছে। একবার পড়লাম। দু-বার পড়লাম। তিন বার পড়লাম। তারপর। তারপর মনে হল এটা রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচকমণ্ডলীকে জানাবার বুদ্ধি বের করা প্রয়োজন।

আরও এলো—'সন্ত্রাসের মোকাবেলায় ব্যাপকতম ঐক্যই হাতিয়ার।' অপূর্ব নায়েকের কবিতা, 'মুখোশ' এল—

মুখোশের আড়ালে মুখটাকে চিনতে পেরেছে
রুক্ষ পাথর
কাঁটা ঝোপ প্রান্তর
ধু ধু বালি

তবু ভাল
আমার মুখ এবং মুখোশ আলাদা
নিজস্ব একটা মুখ আছে অন্তত

তারা ভয়ঙ্কর
মুখ নেই মুখোশও নেই যাদের—
মুখোশটা মুখের ওপর সেঁটে বসে আছে।

খুঁজছিলাম এসবেতে সামঞ্জস্য কতটা বিরাজিত বা ভাবনায় গদ্যের শরীর ছুঁয়ে কবিতার গন্ধই বা আছে কিনা। আসলে জীবনটা যেমন সংগ্রাম ক্ষেত্র বা অভিনয় মঞ্চ তেমনি কবিতাও তো মস্তিষ্ককে নাড়িয়ে দেয়।

বাংলার মাটি মানেই তো গোটা অঞ্চলটা নিয়েই একটা সম্প্রীতির উঠোন। অস্বীকারের ক্ষমতা কারোর আছে বলেই শুনিনি। এ বাংলা বাংলাই। শাসকশ্রেণি বা বিরোধী বিপ্লবী শক্তি যাঁরাই রাজপাটে থাকুন না কেন—এই মাটি সম্প্রীতির মাটি। নোংরামো আছে। শ্রেণিস্বার্থেই। তাকে প্রতিরুদ্ধ করতে জানে বাংলার মানুষ। যে মানুষ অগণন। যে মানুষই হল আসলে সর্বশক্তিধর। জাত-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ ইত্যাদির ফারাক থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বাংলায় সবাই মিলেই আমরা সমবেত স্বরে গাইতে জানি—'মুক্ত করো ভয়/আপনা মাঝে শক্তি ধরো/নিজেরে করো জয়।' সেই সংগ্রাম জারি আছে যুগ যুগ ধরে। চলবে। চলতে থাকবে। সেখানে আমি থাকি বা না থাকি 'আমরা' আছি।

কিন্তু ভয়ঙ্কর এক শক্তি যারা হিটলার-মুসোলিনিদের তত্ত্বকে নিজেদের দলীয় মতাদর্শ হিসেবে প্রচার করতে পিছপা হয় না, তেমন এক শক্তি দেশের মাথায় এসে বসেছে আমাদের মতো কিছু (২৯ শতাংশ) মানুষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে। দেশকে এখন মার্কিন মুলুকের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করার দিকে ছুটছে। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক- সামাজিক-সামরিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত দিক দিয়ে চলছে এই ভয়ংকর কার্যক্রম। কৃষি-শিল্প-কৃষ্টি ইত্যাদি সবই সাগরপারের সাদা চামড়ার মানুষেরা দখল নেবে অচিরেই। তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন আর.এস.এস.-এর প্রচারক দেশের প্রধানমন্ত্রী। রাজনীতির এই দক্ষিণমুখিনতার দায় বইতে হচ্ছে ১২৫ কোটি ভারতবাসীকে। বাদ শুধু ক-জনা যারা আদানি বা আম্বানি নামে পরিচিত। অর্থাৎ লগ্নিপুঁজির আন্তর্জাতিক মানের হাতে-গোনা ক-জনা।

মন্দার জমানায় আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি কতো জবরদস্ত হামলাবাজ হয় তার হাজারো-হাজারো দৃষ্টান্ত গোটা দুনিয়া জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

এরই মাঝে সাগরপারের অকৃত্রিম বন্ধুদের সহায়তায় দেশের সবকিছু উৎসর্গ করতে চাইছে দেশপ্রভুরা। সামাল সামাল রব উঠেছে।

অর্থাৎ যেকথা বলতে চাইছি, তা হল বিগত লোকসভা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশের সামনে যে বিপদ ঘনীভূত তা শুধু অর্থনীতি বা রাজনীতিতেই থাবা বসাচ্ছে তা নয়। এই বিপদের গভীরতা আরও সুতীব্র। আড়াই বছরেই সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে, নিজেদের মালিকদের প্রতি ভোগ সাজাবার প্রক্রিয়ায়। সবটাই হচ্ছে আর এস এস-এর সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় এবং তার ১০০ শতাংশই তাদের ভাবাদর্শকেন্দ্রিক। আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি ইত্যাদি সবই প্রতিদিন নতুন নতুন করে বিপদ বৃদ্ধি করছে। শুধু মুসলিম সংখ্যালঘুরাই আক্রান্ত হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে? —না তা তো নয়। খ্রিস্টানরা, দলিত মানুষরা, ব্যাপক আক্রমণের শিকার। পাঠ্যক্রমে হাত দিয়েছে। কোনো মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এসব হচ্ছে

না। ভারতকে ভবিষ্যতে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে, সমস্ত পরম্পরা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে। তাই এত সব চলছে। বাম-গণতান্ত্রিক- ধর্মনিরপেক্ষ-প্রগতিশীল যে-কোনো মানুষকেই জড়ো করা দরকার প্রতিবাদ সংগ্রামে। বিভিন্ন আঙ্গিকের সেই সংগ্রামই প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধের সংগ্রামে অংশীদার হয়ে উঠতে পারবে তো? আর যদি তা না হয় তবে...? আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, পারব। নিশ্চিতভাবেই পারব, আমরাই।

বামপন্থীদের শক্তি এই দেশে খুবই দুর্বল। তথাপি দেশপ্রেমিক মানুষের অগ্রণী অংশ হিসেবে তাদের দায় অনেক বেশি। যখন এসব নিয়ে চর্চা চলছে ঠিক তখনই এই দেশে আর এস এস-নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রের সরকার যা করতে চাইছে তা হল—''আমাদের দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম করার লক্ষ্যে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে বল্গাহীন মাত্রা দিয়ে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আগ্রাসনের পথ প্রশস্ত করে দেওয়াই হল বর্বর আর এস এস, তার রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি সংঘ পরিবারের সকল সদস্যদের ধ্যান-জ্ঞান।'' তারা মানুষকে অমানুষ বানাবার মারণ খেলা শুরু করেছে। বিভ্রান্ত মানুষদের নিয়েই তাদের চলাচলে অস্থির হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। চেষ্টা চালাচ্ছে—''মানুষকে যদি বিশ্বাস করানো যায় ধর্মগ্রন্থ, পুরাকাহিনি বা প্রাচীন কাব্যে যা কিছু বর্ণিত বা কথিত আছে তার সবটাই সত্য এবং বাস্তবে ছিল, তাহলে হিন্দু অতীতের মহত্বের সীমা পরিসীমা থাকবে না। তখন এই বিশ্বাস নতুন করে দানা বাঁধবে হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানই সর্বশ্রেষ্ঠ। বাকিরা সব নিকৃষ্ট ও অধঃস্তন। জার্মানিতে এবং ইতালিতে এমনটা ভাবাতে পেরেছিলেন হিটলার, মুসোলিনিরা। ভারতে একই কাজ করছে আর এস এস এবং বিজেপি অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদী সংঘ পরিবার।'' বাড়ছে ওরা। দেশে। এই রাজ্যেও। রাজ্যের শাসকদল এ বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারণে রয়েছে, তাতেও বেশ কিছু দলীয় স্বার্থ ক্রিয়াশীল। মানুষ জানে। হয়ত অনেকটাই জানে। হয়ত সবটা জানে না বা জানাবার জন্য যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন, যে রাজনৈতিক বীক্ষার প্রয়োজন তাতে খামতি থাকতে পারে। তবে এটা ঠিক এই ধরনের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে সাহসের আওয়াজ তুলতেই হবে—ব্যাপকতম জনগণের ঐক্য গড়েই সন্ত্রাস ও আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে মানুষকে। যে বিপদ জড়িয়ে রয়েছে আমাদের যাপিত জীবনের পরতে পরতে।

নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় বসার পর আড়াই বছরে এই বিপদ ব্যাপক মাত্রা পেয়েছে। ওদেরই পরিচালিত বিগত সময়ের সরকার এতটা উগ্রতা নিয়ে হিন্দু রাষ্ট্র বানাবার কাজকে এভাবে গতিবেগ সম্পন্ন করেছিল, তা নয়। আজকের গতিবেগ বাজপেয়ি-আদবানীদের নতুন করে হিন্দুত্ব বোঝাচ্ছে। ''মোদি সরকার আসার পর থেকে পুরাণের জয়জয়কার নতুন মাত্রা নিয়েছে। প্রক্রিয়া হিসেবে বিজ্ঞানকে এভাবেই নস্যাৎ করে সংঘ পরিবার। সংঘের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি সরকারে আসীন হলেই চালু হয় মৌলবাদ চালিত অন্ধত্বের দর্শন নিয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সেই লক্ষ্যেই ব্যবহার করছেন সরকারি পদকে। প্লাস্টিক সার্জারির আদি রূপ হিন্দু দেবতা গণেশ—নরেন্দ্র মোদির এমন ভাষণ সংঘের ছক মেনেই। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুম্বইয়ের চিকিৎসকদের সম্মেলনে এমন দাবিই করেছিলেন মোদি। এখানেই থেমে যাননি প্রধানমন্ত্রী। আরও বলেছেন, মহাভারতের কৌরবরা সকলেই 'টেস্টটিউব বেবি'। কারণ মহাভারত মোতাবেক তাঁরা সকলেই মাতৃগর্ভের বাইরে জন্মেছে।'' যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন কথার মালা সাজাতে সাজাতে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে চলেছেন, সেই দেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর সংঘ পরিবার, তাঁর রাজনৈতিক দলকে জবাব দিতে হবে। মানুষ ছেড়ে কথা কইবেন কেন? জবাব দিতে হবেই।

দেশের সামনে বিপদ প্রতিদিন বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করে ভিনদেশি সন্ত্রাসবাদী শক্তির কার্যক্রমে শাসকদলের সংযোগের চিত্র মানুষ দেখছে। কাজেই বোঝা যায় মৌলবাদের বিপদ এই রাজ্যেও ঘনীভূত হচ্ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে সাধারণ বোঝাপড়া এই বিপদকে আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে।

এসবের মাঝেই তরুণ-তরুণীরা সোস্যাল মিডিয়ায় বলতে শুরু করেছেন—'গো-হত্যায় মহাপাপ/মানুষ হত্যায় অল্প/দলিত মারলে পুণ্যি আছে/সাবাস প্রজাতন্ত্র।' এর উপর মন্তব্য আছে : 'আর এস এস নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্র তাই...।'

দেশের হালচাল দেখে প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল থেকে। কী প্রশ্ন? প্রশ্ন, ভারতের ভবিষ্যৎ কোন পথে? হিন্দুরাজ না সমাজবাদ? পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া উচিত—আজকের দিনেও যুক্তি ধ্বংস হলে, গণতন্ত্র ধ্বংস হলে, নাগরিক স্বাধীনতা ধ্বংস হলে, মানবিকতা-মূল্যবোধ ক্ষয়ে গেলে, হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক পথ অনায়াসে প্রশস্ত হতে বাধ্য। কাজেই নবজাগরণের সময়ের বাংলার মতো, পরাধীনতার জ্বালা জুড়োবার বাংলার মতো, ফের দেশকে পথ দেখাতে চেতনার মশাল হাতে অগ্রসর হতে হবে, এই বাংলাকেই। তাই জড়ো করতে হবে মানুষকে। সমাজের সমস্ত অংশের মানুষকে। 'এখন বুঝে নেবার পালা।/... বুক খালি করা হা-হুতাশে ভরা / মড়া কান্নার সময় নয় এখন।/এখন হাতিয়ারে ধার দিয়ে/ধার পরখের বেলা/তাক্ করি এসো—শিকারের চোখে/এভাবেই বাঁচা এবং বাঁচানোর/ টাটকা গল্প এসো বলাবলি করি।'

দেশের সামনে বিপদ প্রতিদিন বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিকে ব্যবহার করে ভিনদেশি সন্ত্রাসবাদী শক্তির কার্যক্রমে শাসকদলের সংযোগের চিত্র মানুষ দেখছে। কাজেই বোঝা যায় মৌলবাদের বিপদ এই রাজ্যেও ঘনীভূত হচ্ছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে সাধারণ বোঝাপড়া এই বিপদকে আরও গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। অচিরেই এসবের সমাপ্তি মানুষ দেখতে চায়। বিপদটি শুধু তত্ত্বগত নয়। এর প্রয়োগ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনকে ধাক্কা দিচ্ছে। তৈরি করছে নেতিবাচক পরিমণ্ডল। মানুষের জীবনের শান্তি, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্ন মৌলবাদী কাজকর্মের ফলে আক্রান্ত, রক্তাক্ত।

সংখ্যালঘু ধর্মীয় মৌলবাদও প্রশ্রয় পায় সংখ্যাগুরু মৌলবাদের প্রকোপ বৃদ্ধিতে। এ দেশে, এই রাজ্যে এসব বিভাজন প্রক্রিয়া চলছে। কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার বাতিল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, রামমন্দির নির্মাণ, গোমাংস সংক্রান্ত বিষয় অর্থাৎ 'বাবরি থেকে দাদরি' ইত্যাদি আমাদের যে দুর্বল করছে সেকথা বুঝে নেবার সময় এসে গেছে। অন্যদিকে দেশের প্রতিটি প্রান্তে আওয়াজ উঠেছে—'দো-সাল জনতা বেহাল'। মানুষ যতই হাহাকার করুক, সে-সবে মতিগতি নেই প্রধানমন্ত্রীর। তিনি এক অবিবেচক এমন ব্যক্তি যাঁকে প্রতিদিন বিদেশেই থাকতে হয়। আর মাঝে মধ্যে ফাইলে স্বাক্ষর

করার জন্যই যেন আসতে হয় এই দেশে। তথ্য বলছে ২৫ মাসে তাঁর বিদেশ সফরে দেশবাসীর করের ৫৭৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকায় কত মানুষের পানীয় জলের ব্যবস্থা হত? এই টাকায় কত শিশুর দুধের ব্যবস্থা হত?

দর্শনের দেশ ভারতবর্ষ। ভাববাদ আর বস্তুবাদ এই দুয়ের দ্বন্দ্বের কথা কে না জানে? এই দার্শনিক সংঘাত নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবেও। পাঁচ হাজার বছর ধরে এই সংঘাত জারি আছে। শেষের দিককার তিন হাজার বছরের সংঘাতের কথা লিপিবদ্ধ করা আছে। তার আগের দু-হাজার বছর এখনো মৌখিক পর্বেই থেকে গেছে। আসলে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হচ্ছে—এই বিষয়ে জ্ঞানের অস্পষ্টতা থাকার অর্থ ওই সংঘাতে ভাববাদীদের সমর্থনপুষ্ট করা। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক শক্তি উপাদান পায় বিস্তার লাভের। ইতিহাস বিকৃত করার কাজেও ওঁদের সাহায্য করা হয়ে যায়।

বামপন্থীরা দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী ভূমিকায় থাকলেও আর এস এস বা সংঘ পরিবার দেশের স্বাধীনতার সাথে নানান ভাবে 'গদ্দারি' করে গেছে। আজ তারা নিজেরাই নিজেদের সব থেকে বড়ো দেশপ্রেমিকের শিরোপা পরায়, লজ্জাহীন ভঙ্গিমায়। ইতিহাস তো নীরব নয়। ইতিহাস নির্বাক নয়। ইতিহাস কথা বলে।

১৯২০-র সময়টা বুঝতে হবে কারণ তখন প্রতিষ্ঠা হয় এই দেশে কমিউনিস্ট পার্টির। যদিও তার আগে আগে বিক্ষিপ্তভাবে অবিভক্ত দেশে কমিউনিস্টদের নড়াচড়া করার তথ্য পাওয়া যায়। ১৯২৫-এ আর এস এস জন্ম নেয়। আর এস এস-এর জন্মের চার বছর আগেই কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলে। তাহলে কারা দেশপ্রেমিক তা তো স্ট্যাম্প মেরে দেবার বিষয় নয়। কাজের মূল্যায়নই বলে দেয়—যার সাক্ষী এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস। বাংলা কাঁপছিল আবেগে, পাঞ্জাব কাঁপছিল আবেগে—স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা। যুগান্তর, অনুশীলন দল ইত্যাদি স্বাধীনতার সংগ্রামে একটা ধারা। ১৮৮৫-র পর থেকে স্বাধীনতার জন্য গঠিত মঞ্চটিও একটি ধারা। আবার শ্রেণিসংগ্রাম, গণআন্দোলনের পথও—একটা ধারা। দেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়াবার সংগ্রাম 'ত্রিস্রোতা' প্রবহমান ছিল। আরও একটি ধারা ছিল যা গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বইতো। তারা কারা? দেশবাসী তা খুব ভালো ভাবেই জানেন। এই দেশদ্রোহীরা, পৃথিবী জুড়ে ১৯২৯-এর মহামন্দার সুযোগে জন্ম নেওয়া হিটলার-মুসোলিনি-ফ্রাঙ্কোদের কাছ থেকে পেয়েছিল হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত। সেটাই হয়ে ওঠে তাদের বেদবাক্য। আজও সেই পথেই 'বাবরি থেকে দাদরি' জন্ম নেয়। ফ্যাসিবাদী কায়দায় চালানো হচ্ছে দেশ, চালানো হচ্ছে রাজ্য।

হিন্দু মৌলবাদের বাড়বাড়ন্তের সময়ে দাঁড়িয়ে মুসলিম মৌলবাদও জীবন্ত হতে পারছে। সম্প্রীতি চেতনায় নেমে আসছে আঘাতের পর আঘাত। আর আমাদের মনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির মাতব্বর-মুরুব্বিরাও এটাই চায়। ফলে দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে দেশের বিপদ বাড়ানোর কাজে গতি বাড়ছে। যে-কোনো রাজনীতির মানুষ বা রাজনীতি থেকে যোজন দূরে বিরাজিত মানুষও বিপদের আঁচ পাচ্ছেন। যার প্রবল ধাক্কা অর্থনীতি-রাজনীতি-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রগুলোকেই কঠিনভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। দেশের মাথা তুলে কথা কইবার শক্তি হ্রাস পেয়েছে, ওদের শ্রেণি অবস্থানজনিত কারণেই।

কাজেই, আমাদেরও পথ ঠিক করে পথে নেমেই পথকে প্রশস্ত করার কাজে আরও অনেক বেশি আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত নির্মাণ করতে হবে। এ লড়াই চালাতে হবে সংসদের অভ্যন্তরে এবং সংসদের বাইরে। কারণ মানুষ আক্রান্ত। দেশপ্রেমিক মানুষের অংশ হিসেবে লড়াইটাই আমাদের পথ দেখায়। 'ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্য' সেই কথাগুলো মাথায় নিয়েই চলবে সংগ্রামের বিভিন্ন কৌশলী গতিবিধি। পথই দেখাবে আমাদের পথের দিশা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি দার্শনিক-সংঘাতের বিষয়টি। আসলে এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার—সমস্ত সচেতন মানুষেরই রয়েছে এক একটি দার্শনিক পরিমণ্ডল। আমাদের কাজ সেই মানুষকে এমনভাবে সচেতন করে তোলা যাতে সে বুঝবে শ্রেণি কী, শোষণ কী, কেন শোষণ, কী জন্য শোষণ? কেনই বা উদ্বৃত্ত তত্ত্বের সৃজন? আর এই যে 'শোষক-শোষিতের' পরিমণ্ডল এখানে মৌলিক পরিবর্তন কেন প্রয়োজন এবং তার জন্য চলার পথটাই বা কী হবে! একই সাথে বুঝে নিতে হবে—কমিউনিস্টদের জীবনচর্চার প্রয়োজনীয় অধ্যায়। এঁরা যে স্রোতের সাথে ভেসে যান না তা তাঁদের শিখতে হয়। আদর্শবোধে উদ্দীপ্ত হওয়া কেন প্রয়োজন তা শিখতে হয়। শ্রেণি-মিত্র, শ্রেণি-শত্রু চিনতে হয়।

মনে রাখতে হয়, সমাজ বিকাশের ধারায় অর্থনৈতিক কাঠামোতে চূড়ান্ত বিপ্লবী পরিবর্তনের প্রয়োজন হাজির হয় এবং পরিবর্তনের (আমূল) পথ প্রস্তুত হয় অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই, উৎপাদিকা শক্তির অগ্রগতি ও নতুন উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের অসামঞ্জস্যতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এইসব আমূল পরিবর্তন বাস্তবের মাটিতে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, মানে কার্যকর হয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, সমস্যা যাই ঘটুক না কেন, এবং সংগ্রাম যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ অর্থনৈতিক বিরোধ এবং শ্রেণি-বিরোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সংগ্রাম করেই এই বিরোধের সমাপ্তি ঘটায়।

আর প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন যে, সমাজবিপ্লব হচ্ছে পুরোনো শ্রেণির কাছ থেকে উদীয়মান শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। লেনিনের মতে—রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করাটাই হল প্রত্যেকটি বিপ্লবের মূল কথা।

কাজেই সামান্য কোনো ঘটনা থেকেই বা কোনো নির্বাচনী ধাক্কা থেকে সাময়িকভাবে দুর্বল হবার কথা মাথায় যে আসে না তা নয়, কিন্তু কমিউনিস্টদের জীবনে হতাশার কোনো স্থান নেই। তারা জানে 'জীবন নিজেকে প্রতিষ্ঠা' করবেই। তারা এটাও জানে, কোনো ঘটনাই চিরকালীন ঘটনা নয়। কাজেই বিশ্বাস রাখতে দেখি : 'বিপর্যয়ই শেষ কথা বলে না,—শেষ কথা বলে জনগণ।'

সমস্যাটা হল, ওটা একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। হুট করে আজ বললেই কাল হয়ে যাবে—এমনটা নয়। লাফ দিয়ে পাহাড় ডিঙোবার কাজ এটা নয়। সময় লাগবে। ধৈর্য লাগবে। লেগে থাকতে হবে। এই অধ্যায় কবে কখন শুরু হবে কেউ বলতে পারেন না। এর কোনো নির্দিষ্ট টাইমটেবল নেই। মানুষ নিয়ে কারবার। মানুষের মস্তিষ্ক আর হৃদয় নিয়ে কারবার। মানুষের ইচ্ছে নিয়ে কারবার। মানুষের মন নিয়ে কারবার। সুইচ টিপে দিলাম আর...। মানুষের চিন্তাধারা যাতে করে পরিবর্তিত হয় তার জন্য, ধীর, স্থিরভাবে কাজ করে যাওয়াটাই বড়ো কথা। মনে রাখতে হবে—আমি চাইলেই হবে না, চাইতে হবে মানুষকে। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা। আমাদের আদর্শ অবিনশ্বর যার কোনো মৃত্যু নেই। জন্মায় প্রতিদিন নতুন করে। সম্ভবত সেই কারণেই আমরা বলি—

বিশ্বাসের চেয়ে বড়ো শক্তি নেই
হাত ধরে পৌঁছে দেয়
এগোবার পথে...

কলকাতাবাসীর স্বপ্নের শহর আজ হাতের মুঠোয়.....

শহর সাজছে নতুন উদ্যানে, সবুজের সাজে, চলছে বস্তী উন্নয়ন, মৌলিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, শহরকে পরিচ্ছন্ন করে তোলায় সুদৃশ্য জঞ্জাল আধার নির্মাণের নিরলস প্রয়াস, পৌর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে-

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার।

উজ্জ্বলময়...

কলকাতা

নাগরিকরা পাচ্ছেন ও পাবেন বেশি জল,
উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তা ও আলো।

আমাদের লক্ষ্য...

জনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন ও সকলের জন্য উন্নততর পরিষেবা

কলকাতা পৌরসংস্থা

দিনবদলের স্বপ্নটাকে বাঁচিয়ে রাখো

আভাস রায়চৌধুরী

সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতির সার্বিক লুম্পেনীকরণ ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চালাচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি ও সাধারণ জনগণের ওপর সর্বব্যাপী আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে এরা। রাজনীতিবিজ্ঞানের পণ্ডিত থেকে রাজনৈতিক সংগঠকেরা, প্রায় সকলে একমত যে এ-রাজ্যের বর্তমান সরকার ও শাসকদল ফ্যাসিস্ত মনোভঙ্গিতেই পরিচালিত হচ্ছে। নয়া উদারবাদের তীব্র সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেস তাদের তীব্র কমিউনিস্ট- বিরোধিতার জন্যই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশি-বিদেশি কর্পোরেট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। এটা বলা বাহুল্য যে ক্ষমতায় আসতে ও ক্ষমতা ধরে রাখতে দেশীয় শাসকশ্রেণির সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলদুটির ও তাদের পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারগুলির পর্যায়ক্রমিক সমর্থন পেয়ে চলেছে এ-রাজ্যের শাসকশ্রেণির প্রধান রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন থেকে দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী নয়া উদারবাদের সংকট থেকে উদ্ভূত এর তীব্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াটি এখন সারা বিশ্বেই ক্রিয়াশীল, হয় দেশে দেশে সংকীর্ণ রাজনীতির আধারে, নচেৎ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের অঙ্গরূপে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নরমেধ যজ্ঞে। এখানে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা বিজেপি আর এ-রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস উভয়েই মেরুকরণের রাজনীতিকে প্রয়োগ করে জনসমাজকে পশ্চাৎমুখী করে তুলছে। এই দুটি দলের পারস্পরিক বোঝাপড়া শুধু তাদের ক্ষমতায় থাকাকে নিশ্চিত করছে না, দেশের মানুষের অনৈক্যের পরিবেশে নয়া উদারবাদকেই সুরক্ষিত রাখছে। পঁচিশ বছর ধরে দেশে নয়া উদারবাদের আধিপত্য ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দ্রুত বৃদ্ধি বর্তমানে দেশে 'কর্পোরেট হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যের জন্ম দিয়েছে। শ্রমিজীবী মানুষের জন্য এই বিপজ্জনক প্রেক্ষাপটে এ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাসিস্ত মনোভঙ্গির শাসন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম রাজ্যের সাধারণ মানুষের জন্য বাড়তি বিপদের জন্ম দিয়েছে। দেশের কোনো আঞ্চলিক দলের সরকারের সাথে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের কোনো মিল নেই। সাধারণ মানুষকে একই সাথে আতঙ্কগ্রস্ত ও করুণাপ্রার্থী করে, অর্থাৎ একই সাথে সন্ত্রাস অথবা সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করে ও ব্যক্তিগত বেনিফিসিয়ারি গড়ে তুলে রাজ্যের এক বড় অংশের মানুষের মধ্যে সরকার ও শাসকদলের প্রতি আত্মসমর্পণের পরিবেশ গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এইভাবে 'ফ্যাসিবাদী কায়দার' রাজনৈতিক হেজিমনি' নির্মাণ করে ওরা দ্বিতীয়বারের জন্য বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। অন্যদের থেকে এদের পার্থক্যের ক্ষেত্রটি হল, শুধু সরকারি ক্ষমতা লাভ নয়, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরেই যে-কোনো ধরনের বিরোধিতা বা বিরোধী দলের অস্তিত্বকেই ধ্বংস করতে উদ্যোগী তৃণমূল কংগ্রেস। জনগণের ভোটে নির্বাচিত বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদেরও দখল করার সর্বব্যাপী কার্যক্রমী এখন এ রাজ্যে জলভাত। আজ পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দেশের অন্য অংশের থেকে ব্যতিক্রম। তাই এখানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের সাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করতে সমস্ত গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলনমুখী করা বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের এখন অন্যতম প্রধান কাজ। সামাজিক, রাজনৈতিক সংকটের সূতিকাগার যেহেতু অর্থনীতির সংকট, জীবনজীবিকার ওপর নিরবচ্ছিন্ন আক্রমণ, সেহেতু শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনজীবিকার সংগ্রামকেও নিরবচ্ছিন্ন করতে হবে। এই সংগ্রামের শক্তি ও তীব্রতা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে শক্তিশালী ও ধারাবাহিক রাখতে সাহায্য করবে। আবার গণতন্ত্রের সংগ্রামও জীবিকার সংগ্রামকে উপাদান ও শক্তি জোগায়। সে কারণে এই দুটি সংগ্রাম পরস্পর সংযুক্ত। বামপন্থীদের সচেতনভাবে এই ক্ষেত্রদুটির সংযুক্তি ও বিযুক্তি ঘটাতে হবে।

শ্রীমতীর রাজত্বের প্রথম পর্বে দলভাঙানোর সর্বগ্রাসী কাজের লক্ষ্য ছিল ওঁর রাজনৈতিক আঁতুড়ঘরটি। দ্বিতীয় পর্ব শুরু করেছে বিভিন্ন স্তরে বামপন্থী জনপ্রতিনিধিদের ভাঙানো। নিঃসন্দেহে বামপন্থীদের পক্ষে এটা লজ্জার। বামপন্থী জনপ্রতিনিধিরা, রাজনৈতিক সংগঠক ও কর্মীরা অন্য ধাতুতে গড়া—এই শব্দবন্ধগুলি কি বাতিল হয়ে যাবে? বামপন্থীদের একাংশ ভয়কে জয় করতে পারছেন না এটা কঠিন বাস্তব। আবার একাংশ নিজেদের ক্রীতদাসের মতো বিক্রি করে দিচ্ছেন। ভুল বললাম, দাসযুগে ক্রীতদাসরা বিক্রি হতে বাধ্য ছিলেন, বাধ্য ছিলেন বলেই বাধ্যতার বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর স্পার্টাকাস আর তাঁর সাথীরা। যাঁরা বামশিবির ত্যাগ করেছেন তাঁদের বামপন্থার প্রতি প্রকৃতপক্ষে কোনো বিশ্বাস কি ছিল? যে-কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হওয়া যায় ভিতরের জোর থেকে। ভিতরের জোর আমরা পাই কোথা থেকে?

বিভিন্ন আন্দোলন, ঘটনা পরম্পরার কার্যকারণ সম্পর্কে মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আসে, ঘনিষ্ঠ হয়, আন্দোলন-সংগ্রামে যোগ দেয়, পার্টির কাজে যুক্ত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা পার্টি কিংবা পার্টির কাজে 'কমিউনিস্ট' হয়ে তবেই যোগ দেয় এমনটা নয়, কাজের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট হয়ে উঠতে পারে। তাই কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, কর্মী, সংগঠকদের প্রতিদিনের রাজনৈতিক কাজের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট হবার সংগ্রাম চালাতে হয়। কমিউনিস্টরা কোথা থেকে পায় চোখের আলো, মনের জোর, কাজের লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস আর

ভালোবাসা? একটাই উত্তর, মতাদর্শ সম্পর্কে স্পষ্টতা আর প্রতিদিনের মতাদর্শের সংগ্রাম।

আমাদের প্রজন্মের খুব কম মানুষ আছেন যাঁরা মতাদর্শ, রাজনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন। পরিবেশগত প্রভাবে উত্তাল সত্তরের উথালপাথাল শিশু বয়সেই বামপন্থী রাজনীতির প্রতি অসচেতন টান সৃষ্টি করেছিল বোধ হয়। পরে যখন স্কুলছাত্র, সেদিনের ছাত্ররাজনীতি, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতি আমার মতো অনেককে আকর্ষণ করেছিল বামপন্থার প্রতি। পরে যখন বড় হতে শুরু করলাম, সেদিনের অধিকাংশ বাঙালি কিশোর যুবকের মতো হাতেখড়ি ঘটেছে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে। ক্রমশ প্রবেশ ঘটেছে কমিউনিস্ট রাজনীতিতে। পরিবেশের প্রভাব, বামপন্থী সংগঠকদের জীবন ও কর্মধারার প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ রাজনীতি বুঝতে শেখায় পরিণত হতে শুরু করেছিল। শৈশবের অ-আ-ক-খ শেখার মতো না হলেও শ্রেণি, শ্রমিকশ্রেণি, বুর্জোয়া, রাষ্ট্র, আন্দোলন, রাজনীতি, শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজ ইত্যাদি ইত্যাদি আরো কত কত শব্দ, কোনোটা বোঝা, কোনোটা না বোঝা—কিন্তু সব মিলিয়ে একটা বিপ্লবীবোধ কখন যেন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রথম পাঠ। এগুলো ছিল সেদিনের উপলব্ধি। এখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের একজন সংগঠক হিসেবে বুঝি আমাদের নেতৃত্বরা কেমনভাবে আমাদের শিক্ষিত করেছিলেন রাজনৈতিক শিক্ষায়। রাজনৈতিক বোধ, মতাদর্শ একজন কর্মীর মধ্যে আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। গড়ে তুলতে হয়। গড়ে ওঠে প্রতিদিনের আন্দোলনের আন্তরিক অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা আর রাজনীতির তত্ত্বের জ্ঞান অর্জন আর অনুশীলন থেকে। এভাবেই অসচেতন কর্মী হয়ে ওঠেন সচেতন কর্মী। তরঙ্গ তোলা নদীর জলে যেমন শ্যাওলা জন্মায় না, তেমনই আন্দোলনের তরঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের নিজেদের লক্ষ্যের ওপর শ্যাওলা জন্মাতে দেয় না। লক্ষ্যের ধারণাটা স্পষ্ট হয়।

কমিউনিস্ট আন্দোলন তরঙ্গের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে নেমে আসে কার্যত বিগত শতকের আশির দশক থেকে। ভূমি-সংস্কারের ঐতিহাসিক কাজ গ্রামবাংলার সমাজ অর্থনীতি রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়। সে-দিনের সেই পরিবর্তন ছিল বামপন্থীদের অনুকূলে। গ্রামীণ শ্রমজীবী ও গরিবদের পথের এই পরিবর্তনকে স্থায়িত্ব দিয়েছিল নতুন পঞ্চায়েত। দেশীয় বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র-কাঠামোর স্বাভাবিক সংকট থেকে এ রাজ্যও বাইরে নেই, ফলে বামফ্রন্টের প্রথম দিকের ঐতিহাসিক সাফল্যও সংকটের অনিবার্যতাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারে নি, পারার কথাও ছিল না। এ রাজ্যের আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের দিনে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম জয়লাভ করার পর রাজ্যের বামপন্থী, কমিউনিস্টদের সামনে কর্তব্য উপস্থিত হয় অর্জিত গণতন্ত্রকে রক্ষা করার। প্রায় ৩ হাজার শহিদের প্রাণের বিনিময়ে এ রাজ্যের গণতন্ত্র সুরক্ষিত ছিল, প্রসারিত ছিল। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশকের সময় যত এগিয়েছে ততই গণতান্ত্রিক পরিবেশ রাজ্যের জনসমাজ ও নতুন একটা প্রজন্মের জনচেতনায় স্বাভাবিক ও চিরকালীন ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার জন্য বামপন্থীদের ঘাম-রক্ত-জীবনের কত দাম দিতে হয়েছে তা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি শ্রেণিস্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত কাঠামোয় একটা প্রাদেশিক সরকারকে চালাতে গিয়ে রাজ্যের কমিউনিস্টদের কী প্রবল সংগ্রাম করতে হয়েছে বা হচ্ছে, সাধারণ জনগণ তো বটেই, এক উল্লেখযোগ্য অংশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব, সংগঠক ও কর্মী বোধহয় ভুলে গিয়েছিলেন। আন্দোলনের সহায়ক শক্তি বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা যে একটা তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ছিল তা উপলব্ধির বাইরে চলে গিয়ে আমরা অনেকেই এ-রাজ্যের বামপন্থীদের সরকারি পার্টি ভাবতে শুরু করেছিলাম। সাড়ে তিন দশকের সরকার, স্থানীয় সরকার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়েই আসা হাজার হাজার পার্টিকর্মী দরদি আজকের তীব্র প্রতিকূলতায় পার্টিকে রক্ষা, শ্রমজীবী জনগণকে রক্ষার আন্দোলনে বীরের মতো লড়াই করছেন, জীবন দিচ্ছেন, আবার অনেকে চলে গেছেন এবং চলে যাবেন। এতে আমাদের কর্মী ও অনুসারী মানুষদের মন খারাপ হচ্ছে। আমরা বলি, মন খারাপ কোরো না, মন যদি খারাপ করলে তবে তুমি হেরে গেলে, তোমার শ্রেণিশত্রুদের খুশি করলে। বন্ধু, মনকে শক্ত কর, নিজের তেজ বিক্রি হতে দিও না, আর চলো ভালো করে খোঁজ করি আজকের লখীন্দরের বাসরঘরে কোন ছিদ্রপথে কালনাগিনী ঢুকল।

সাড়ে তিন দশকের সরকার, স্থানীয় সরকার সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ। এটাই স্বাভাবিক। এই সময়েই আসা হাজার হাজার পার্টিকর্মী দরদি আজকের তীব্র প্রতিকূলতায় পার্টিকে রক্ষা, শ্রমজীবী জনগণকে রক্ষার আন্দোলনে বীরের মতো লড়াই করছেন, জীবন দিচ্ছেন, আবার অনেকে চলে গেছেন এবং চলে যাবেন। এতে আমাদের কর্মী ও অনুসারী মানুষদের মন খারাপ হচ্ছে। আমরা বলি, মন খারাপ কোরো না, মন যদি খারাপ করলে তবে তুমি হেরে গেলে, তোমার শ্রেণিশত্রুদের খুশি করলে।

পঁচিশ বছরের নয়া উদারবাদ আমাদের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতিকে ওলটপালট করে দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক। দেশে এখন রাষ্ট্রীয় পাহারায় আন্তর্জাতিক লুম্পেন পুঁজির দাপাদাপি। এই অর্থনীতির পরিবর্তনের স্বার্থেই রাজনীতি ও ব্যক্তিমানুষের নৈতিকতার নবনির্মাণ ঘটেছে, যেখানে সব কিছুই পণ্য। সামাজিক মানুষ, মানুষের সামাজিক দায়বদ্ধতা—এসব পুরোনো ধারণা। এখন মানুষ তার নিজের প্রয়োজনে নিজেকে বিক্রি করতে পারে, অন্যকে কিনতে পারে, ক্ষমতা থাকলে কামনার বস্তুকে লুঠ করতে পারে, আর ক্ষমতা না থাকলে বস্তুটি পাবার জন্য ক্ষমতাশালীর কাছে নিজেকে করুণাপ্রার্থীতে পরিণত করাও কোনো লজ্জাজনক আচরণ নয়। সুপার-ইন্ডিভিজুয়ালিজ়মের এই বিশ্বে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, তবে তা সাধারণ প্রবণতা নয়। কমিউনিস্ট পার্টির এক বড় অংশের সংগঠক, কর্মী, অনুসারী মানুষ নয়া-উদারবাদের চরম ব্যক্তিবাদী জীবনবোধের বিপরীতে নিজেদের স্থির করে রাখতে পারছেন। আবার অন্য দিকে এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের জীবনধারা, জীবনবোধ, চিন্তা ও কাজে নয়া-উদারবাদের গভীর প্রভাব

পড়েছে। এটা কোনো নতুন কথা বলা হল না, আমরা সবাই মানি বা না মানি, সবাই এটা জানি বোধহয়। পৃথিবীতে এমন কোনো ‘মানুষ’ নেই যার কোনো ত্রুটি, দুর্বলতা, ক্ষুদ্রতা নেই। মানুষ চিন্তা করতে পারে, চিন্তা অনুযায়ী কাজ করতে পারে। এই চিন্তার উপাদান সে পায় তার পরিবেশের দ্বান্দ্বিকতা থেকে। ফলে দ্বান্দ্বিক নিয়মেই ভালো আর মন্দের মিলন আর দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রতিটি মানুষ, তিনি যত বড় বা ক্ষুদ্র মাপের হোন না কেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠকরা রোবট নয়, সব অর্থেই একজন সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ। পার্টি তার সংগঠন ও কর্মীদের এই মানুষ সত্তা নিয়েই দেখতে চায়। জনগণও তাই। শৈশব থেকে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতে অন্য মানুষের মতোই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী-সংগঠকেরা বড় হয়, গড়ে ওঠে। তবে আসল কথা হল কমিউনিস্ট কর্মীদের নিজেকে চলার পথে ও লক্ষ্যে অবিচল থাকতে হলে প্রতিদিন প্রতিক্ষণে নিজের সাথে লড়াই চালাতে হয়। এই লড়াইয়ের শক্তি আর মাপকাঠি হল কমিউনিস্ট মতাদর্শ।

আমাদের সমাজের আধিপত্যবাদী মতাদর্শটি হল বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির মতাদর্শ যার নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার অর্থনীতির স্বার্থ পূরণ করা—যে অর্থনীতি ক্রমশ বেশি বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের কাজকে সহজ ও জনসম্মতিমূলক করে তুলতে সেই মতো জীবনবোধ, নৈতিকতা, শিক্ষা-সাহিত্য, মনোরঞ্জন সব মিলিয়ে সংস্কৃতি গড়ে নেওয়া হচ্ছে। গণমাধ্যমগুলিতে দৃষ্টি দিলেই তা বেশ বোঝা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য এর ঠিক বিপরীত। বিশ্বের সব দেশের কমিউনিস্টদের মতো আমাদেরও মূল লক্ষ্য বর্তমান শোষণমূলক সমাজের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন।

মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মতাদর্শ হল রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সুসংবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ এক চিন্তাভাবনা। মতাদর্শের নির্দিষ্ট শ্রেণিচরিত্র আছে। কোনো এক সমাজের বিশেষ এক সময়ের মতাদর্শ হল সেই শ্রেণির, যে-শ্রেণি অর্থনীতি-রাজনীতিতে আধিপত্য কায়েম করেছে। মতাদর্শের পিছনে থাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যার কাজ হল নির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুষ্টিসাধন করা। এদিক থেকে আমাদের সমাজের আধিপত্যবাদী মতাদর্শটি হল বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির মতাদর্শ যার নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার অর্থনীতির স্বার্থ পূরণ করা—যে অর্থনীতি ক্রমশ বেশি বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। এই অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণের কাজকে সহজ ও জনসম্মতিমূলক করে তুলতে সেই মতো জীবনবোধ, নৈতিকতা, শিক্ষা-সাহিত্য, মনোরঞ্জন সব মিলিয়ে সংস্কৃতি গড়ে নেওয়া হচ্ছে। গণমাধ্যমগুলিতে দৃষ্টি দিলেই তা বেশ বোঝা যায়। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য এর ঠিক বিপরীত। বিশ্বের সব দেশের কমিউনিস্টদের মতো আমাদেরও মূল লক্ষ্য বর্তমান শোষণমূলক সমাজের উচ্ছেদ ঘটিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য সমাজ-অর্থনীতিতে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়। আমাদের দেশেও হচ্ছে। তবে এই লক্ষ্যের দিকে পথ চলতে কমিউনিস্টদের বিরোধিতামূলক সমাজ-অর্থনীতিতে নিজস্ব মতাদর্শগত আধিপত্য নির্মাণ করাটা আবশ্যিক। এর দুটি স্তর রয়েছে। প্রথমত, কমিউনিস্ট কর্মীদের নিজের মতাদর্শের সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, জনসমাজ ও রাজনৈতিক সমাজে মতাদর্শের প্রচার। সামগ্রিক এই প্রক্রিয়ার নামই হল মতাদর্শগত সংগ্রাম। এই সংগ্রাম সঠিকভাবে চালাতে পারলে কমিউনিস্ট কর্মীদের নিজ কাজের লক্ষ্য ও জীবনবোধ সঠিক পথে চলতে পারে, ভবিষ্যতে যাঁরা যুক্ত হবেন কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তাঁরাও ক্রমশ বুঝতে পারবেন তারা কোথায় এসেছেন, কেন এসেছেন। আর এই সংগ্রামের দুর্বলতার ফলাফল কী আমরা তা সকলেই দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি।

কমিউনিস্টদের মতাদর্শগত সংগ্রাম জনগণের মধ্যে শাসকশ্রেণির মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। জনগণের মধ্যে পার্টির প্রভাবকে বৃদ্ধি করে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই পার্টির নিজস্ব শ্রেণিরও অনুসারী শ্রমজীবী মানুষ সচেতন হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ মতাদর্শগত সংগ্রাম কোনো অ্যাকাডেমিক বিষয় নয়, প্রবহমান শ্রেণিসংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গ। আর কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরের মতাদর্শগত সংগ্রামটাও হল আসলে বাইরের শ্রেণিসংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। পার্টির ভিতরে কেন মতাদর্শগত সংগ্রাম নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাতে হয় সে সম্পর্কে কতদিন আগে লিউ শাউ চি যে মন্তব্য করেছিলেন তা আমাদের দিন-প্রতিদিনের চেনা পরিবেশে আজও প্রাসঙ্গিক—

‘‘জন্মের প্রথম দিনটি থেকেই আমাদের পার্টি এক মুহূর্তের জন্যও গুরুতর সংগ্রামের পরিবেশ ছাড়া অন্য কোনো পরিবেশে বাস করেনি। শ্রমিক নয় এমন শ্রেণির, যথা বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া, কৃষক, এমনকি ধ্বংসাবশিষ্ট সামন্ততান্ত্রিক শক্তির পরিবেশের (আমাদের দেশে ধংসাবশিষ্ট শব্দটা প্রযোজ্য নয়।—লেখক) ভিতরে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণিকে সব সময় বাস করতে হয়েছে। এই শ্রেণিগুলি যখন শ্রমিকশ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, অথবা যখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করে, তখন তারা পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণির ভিতরকার অস্থিরচিত্ত লোকগুলিকে ব্যবহার করে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণির প্রাণকেন্দ্রের ভিতর প্রবেশ করতে চায় এবং আদর্শে, জীবনের চলাফেরায়, তত্ত্বে ও কাজে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণিকে অনবরত প্রভাবিত করে। পার্টির ভিতরকার সব রকমের ভুল ও অবাঞ্ছিত ঝোঁকের জন্ম এখান থেকেই। পার্টির ভিতরে সব রকমের সুবিধাবাদের সামাজিক ভিত্তি এই-ই। আর এই হল পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের উৎস।’’

মতাদর্শগত সংগ্রাম সম্পর্কে লিউ শাউ চি যখন কথাগুলি বলছেন, সে সময় থেকে পৃথিবী এখন অনেক বদলে গেছে। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যের বদল হয়েছে। বিশ্বায়নের নামে নয়াউদারবাদের অমানবিক, অনুৎপাদক ও কর্মনাশা পুঁজিবাদী অর্থনীতি আমাদের দেশের জনগণের ওপরে চেপে বসেছে। তার সাথে আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্রের শক্তিশালী অবশেষ সমানভাবে ক্রিয়াশীল। ফলে আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির সামনে প্রতিকূল মতাদর্শের সমস্যাটি আরও জটিল ও বহুমুখী। ফলে এখানে ভিতর বাইরে কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শের সংগ্রামটিও বহুমাত্রিক।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কলকাতা প্লেনামের গৃহীত ‘রেভলিউশনারি পার্টি উইথ অ্যা মাস লাইন’কে কার্যকর

করতে ভিতরে বাইরে যে নেতিবাচক প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে পার্টি মতাদর্শগত সংগ্রাম চালাতে চায় তার মধ্যে অন্যতম একটি হল 'সংসদীয় ঝোঁক'। এই ক্রটিটি আনেক পুরোনো, বহুচর্চিত। তবে 'সংসদীয় ঝোঁক' বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের অনেকের ধারণা অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং সংকীর্ণতায় আক্রান্ত। পার্টি এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলছে, ''সংসদীয় ঝোঁক' হল একটি সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যা পার্টির কাজকর্মকে নির্বাচনী কাজের মধ্যে আবদ্ধ রাখে এবং মূলত নির্বাচনে লড়ার মধ্য দিয়ে পার্টির অগ্রগতি সুনিশ্চিত হতে পারে এমন মোহকে উৎসাহ যোগায়, যা গণআন্দোলন সংগঠিত করার কাজ, পার্টি গড়া এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম সংগঠিত করার কাজকে অবহেলা করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।" এই সমস্যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা নয়, একটা সামগ্রিক ভুল প্রবণতা। পার্টির অনেক দুর্বল চেতনার কর্মী, যাঁরা মনে করেছিলেন অথবা করেন যে নির্বাচনে পরাজয়ের পর কমিউনিস্ট পার্টির সামনে সবকিছু অন্ধকার, তাঁরা হতাশ হয়ে পড়ছেন। আসলে বিভিন্ন দুর্বলতা ও ক্রটির ঘাতপ্রতিঘাতে এই অংশের সংগঠক ও কর্মীদের চেতনায় কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্যটা বিস্মৃত হয়ে গেছে। এটাও কোনো ব্যক্তিবিশেষের সমস্যা নয়, পার্টির সামগ্রিক জীবনেরই সমস্যা, দুর্বলতা। পার্টির কর্মসূচির মধ্যে একমাত্র কৌশলগত অংশটি হল ৭.১৭ ধারাটি, যেখানে পার্টি সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও সংসদকে ব্যবহার করতে আমাদের ভূমিকা কী হবে তার দিকে নির্দেশ করেছে। ভবিষ্যতের সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বর্তমান কাজের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সংসদকে ব্যবহার করা। সংসদকে ব্যবহার করতে হবে, আবার সংসদীয় ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। পার্টি বলছে, ''গণআন্দোলন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করার জন্য সংসদীয় এবং সংসদবহির্ভূত কাজকে একসাথে মেলাতে হবে।"

সঠিক রাজনীতি চর্চা ও অনুশীলনের দুর্বলতা পার্টির মধ্যে যে সব অবাঞ্ছিত ঝোঁকের জন্ম দেয় তা প্রকাশিত হয় একাংশ সংগঠক ও কর্মীদের কাজ ও আচরণে। পার্টি যখন সরকারি ক্ষমতার অংশীদার ছিল তখন এই ঝোঁকগুলিই পার্টিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আর আজকে যখন সরকারি ক্ষমতা থেকে অনেক দূরে পার্টি, তখন এই বৈশিষ্ট্যযুক্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের এবং দুর্বল চেতনার অনেকে শিবির বদল করছেন। হ্যাঁ, তাতে পার্টি সম্পর্কে, রাজনৈতিকভাবে সৎ পার্টিকর্মীদের সম্পর্কে, সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সম্পর্কে জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। যা সাময়িকভাবে পার্টির সামনে পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। কিন্তু তা পার্টির মূল লক্ষ্য, পার্টিকর্মীদের করণীয় দায়িত্বকে বদলে দেবে না, পার্টির সংগঠনটাও ভেঙে পড়বে না, কিংবা কমিউনিস্ট পার্টি প্রাসঙ্গিকতা হারাবে না। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি সংগঠক, কর্মী, সমর্থক গর্ববোধ করতেই পারেন যে আজকের পৃথিবীতে চোখ ঝলসানো মন বদলানো প্রচার যতই শোষণশাহীকে আড়াল করতে চেষ্টা করুক, কমিউনিস্টরাই সারা পৃথিবীতে, আমাদের দেশে এই শোষণশাহীকে উচ্ছেদ করতেই লড়ে যাচ্ছেন। তাই দিন বদলের স্বপ্নটাকে মরতে দেওয়া যাবে না। হতাশা কিংবা বিহ্বলতা নয়, পার্টির ভেতরে বাইরে আদর্শের সংগ্রাম, সঠিক রাজনীতিক অনুশীলন করে যেতে হবে। চিন্তার স্তরের এই সংগ্রাম আর শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার সংগ্রামই শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী গুণকে উন্নত করে। কলকাতা প্লেনাম এটাই চাইছে। আমাদের সকলকে এর উপযুক্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। ব্রেখটের কথাগুলি এখানে মানানসই হবে বলে আমার ধারণা...

কোনো অ-মনোযোগ আর নয়।
আর নয় অ-প্রেম।
অনুশোচনাও অর্থহীন।
দুঃসময়ের ছবিটা আঁকতে হবে
নতুন সময়ের রঙে।

(ব্রেখটের 'দুঃসময়' কবিতাটির বাংলায় অনুবাদ হাতের কাছে উপস্থিত করার জন্য 'সমন্বয়', জুলাই, ২০১৬ সংখ্যাটির প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা।)

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আপনাদের স্বপ্নের ইমারত গড়তে

দামোদর ইটভাটার 'D.B.F.' মার্কা পগমিল ইট ব্যবহার করুন

দামোদর ব্রিক ফিল্ড

শম্ভুপুর, বর্ধমান, মোবাইল : ৮০০১৭৬৯১৫০, ৯৪৭৬২৩৬১৯৪, ৯৭৩২১৬১২০৬

Sl. No. 17

এখন ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময়

রথীন রায়

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। প্রথমবারের তুলনায় অধিকতর সমর্থন ও আসন দখল করতে পেরেছে। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের আসন বন্টন ও যৌথ প্রচার এবং নেতৃত্বের পক্ষে বিজয়ী হওয়ার সাড়ম্বর ঘোষণা কার্যে পরিণত হয়নি। হতাশা বেড়েছে। শহরাঞ্চলে তৃণমূলের শতকরা ভোট কমেছে। গ্রামাঞ্চলে বেড়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের তুলনায় বিজেপির ভোট কমেছে। এর একটা বড় অংশ তৃণমূলের কংগ্রেসের পক্ষে গিয়েছে। বামপন্থীদের পক্ষে তুলনামূলকভাবে কম এসেছে। তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের সমর্থন ধরে রাখতে পেরেছে। বিপরীতে, গ্রামাঞ্চলে বামপন্থীদের যে স্বাভাবিক মিত্র, সেই গরিবদের একটা ভালো অংশের সমর্থন তাদের পক্ষে নিতে পেরেছে। কন্যাশ্রী, ২ টাকা কেজি দরে চাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি জনমানসে প্রভাব ফেলেছে। ফলে বিরোধীদের অনুন্নয়নের প্রচার কোনো কাজে আসেনি। অপপ্রচার হিসেবেই তারা দেখেছে। নির্বাচনের পর অনেকে বলেছেন ডোল দিয়ে, কিছু পাইয়ে দিয়ে তৃণমূল সমর্থন আদায় করেছে।

২০০৬ সালের পর বাম নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী কোনো শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে ওঠেনি, যদিও অসংখ্য বিষয় ছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফসলের দাম না পাওয়া, লাগাতার সন্ত্রাস, ঘরছাড়াদের অসহায়তা, বামপন্থী হওয়ার কারণে জীবিকা থেকে উচ্ছেদ, পাট্টাপ্রাপ্ত জমি থেকে বর্গা থেকে উচ্ছেদ, কলেজে ভর্তি হতে তোলাবাজি, টেট ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের চাকরি না দেওয়া, ফল প্রকাশ না করা, নতুন নিয়োগ না করে অবসরপ্রাপ্তদের কাজ দেওয়া ইত্যাদি অসংখ্য সমস্যা ছিল এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও পঞ্চায়েতে ও পৌরসভায় ব্যাপক দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে টাকা বকেয়া রাখা ইত্যাদি অসংখ্য স্থানীয় সমস্যা ছিল।

ছাত্রনেতা সুদীপ্ত গুপ্তর পুলিশি হেফাজতে হত্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য, ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতন, কামদুনির ঘটনা, চা শ্রমিকদের মৃত্যু-মিছিল ইত্যাদি নিয়ে উত্তাল আন্দোলন গড়ে তোলা গেল না।

সারদা, রোজভ্যালির মতো চিটফান্ড, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতারিত হয়েছে, তা নিয়ে ঠিকমতো আন্দোলন হল না। বামপন্থীদের অনেকেই 'এবিপি আনন্দ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পূর্বাভাষের ওপর ভরসা করেছিলেন।

বামপন্থীদের নানা দুর্বলতা ছিলই, যার মধ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতাও ছিল। যার ফলে তৃণমূলি সন্ত্রাসের সঠিক মোকাবিলা করতে পারেনি। নির্বাচনও অবাধ হয়নি। সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল বজায় ছিল। বামপন্থী হিসেবে চিহ্নিত ভোটদাতাদের ভোটকেন্দ্রে যেতেই বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। কোথাও গোটা পাড়াকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। বুথের ভেতরে যারা বামপন্থী পোলিং এজেন্ট ছিল বাইরে দলের শক্তিহীনতা তাদের সাহসী হতে দেয়নি। তারা চুপ করে থাকাই নিরাপদ মনে করেছে। এবার প্রক্সি ভোট দেওয়া খুবই সহজ ছিল। বিলি না হওয়া ভোটার স্লিপ বুথের বাইরেই পাওয়া গিয়েছে। তৃণমূল তা ব্যবহার করেছে। যেসব এলাকায় বামপন্থীদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানে ফলাফল ভালো হয়েছে। ভোটার পরিচয়পত্র ছাড়া নির্বাচন-এলাকাতে ঢোকাই যাবে না—এই বিষয়ে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে যত গর্জন ছিল তত বর্ষণ হয়নি। শাসকদলের আজ্ঞাবহ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের ওপর নির্ভর করা অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে।

২.

২ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষের সমর্থন পেয়েছে বামপন্থীরা। এটা কোনো মামুলি সাফল্য নয়। অভূতপূর্ব এবং ভয়ংকর প্রতিকূলতার মধ্যেও অসংখ্য কর্মী সংগ্রামের ময়দানেই আছেন এটাও মামুলি সাফল্য নয়। নির্বাচনের সময় এবং নির্বাচন-পরবর্তী সময়েও কলকাতা বা জেলা সদর কিংবা মহকুমা শহরে বড় বড় মিছিল সমাবেশ হচ্ছে ঠিকই। প্রয়োজনও আছে। কিন্তু এইসব জমায়েত বা মিছিল দেখেই সামর্থ্য বিচার করা যাবে না। বাসস্থানে বামপন্থার পক্ষে কথা বলার সাহস ও পরিস্থিতি অনেক অনেক জায়গাতে নেই।

দ্বিতীয় বার সরকার গঠনের পর তৃণমূল দল সন্ত্রাসকে বহুমাত্রিক এবং তীব্র ও ব্যাপক করে তুলেছে। জীবন, জীবিকা, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা আজ আক্রান্ত। শাসকদলের বশ্যতা স্বীকার না করলে বামপন্থী মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন দুরূহ হয়ে উঠছে।

এখন মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য রাজধর্ম পালনের কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে একজন কাউন্সিলার-কাম-তোলাবাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। (পরে অবশ্য উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাব দেখিয়ে মুক্তিও পেয়ে যায়।) সেই নিয়ে প্রচারের ফানুস ফুলছেই। একজন ঘরছাড়া মানুষ ঘরে ফিরেছে? বামপন্থী ইউনিয়ন করার অপরাধে চাকরি যাওয়া একজন শ্রমিকও কাজ ফিরে পেয়েছে? পাট্টা অথবা বর্গা থেকে উচ্ছেদ হওয়া গরিব কৃষক জমি ফেরত পেয়েছে? নিজের জমিতেই চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—এমন একজন কৃষকও কি চাষের অধিকার ফিরে পেয়েছে? গ্রামে থাকার বিনিময়ে যাদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে তাদের একজনও কি টাকা ফেরৎ পেয়েছে? শহিদবেদী, গণসংগঠনে ও সিপিআই(এম) পার্টি অফিসগুলি কি দখলমুক্ত হয়েছে? এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে যার সুরাহা হয়নি। এই জমানায় হবেও না। বহুমাত্রিক সন্ত্রাসে আরও বৈচিত্র্য আনা হবে এবং তাকে বিস্তৃত করা হবে। শুধুমাত্র বামপন্থীরা নয়, কোনো বিরোধী দলকেই এই ফ্যাসিস্ট শক্তি বরদাস্ত করতে

রাজি নয়। শাসকদলের এই অতিসক্রিয় কর্মীবাহিনী জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে। সাধারণ মানুষ, ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছে এমন মানুষ, ভয় পাওয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় মানুষকে অনেকটা বোঝাতে সফল হয়েছে যে মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নের জোয়ারে বাধা দিতে সবই বিরোধীদের অপপ্রচার।

৩.

প্রথমেই যুব সমাজকে ধরা হয়েছে। কারখানা নেই, চাকরি নেই। প্রতিবাদও প্রায় নেই। সমগ্র যুবসমাজকে লুম্পেনে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। চাকরি নেই—তাহলে তোলা আদায় কর। যাদের ওরা চাকরি দিচ্ছে সেখান থেকে আয়ের একটা অংশ নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বাইকে চেপে সর্বত্র দাদাগিরি। সাধারণ মানুষ ভয়ে কথা বলার সাহস পায় না, কারণ পুলিশই তো ভয়ে অস্থির।

'কন্যাশ্রী'র সাইকেল নাও, কিন্তু কলেজে ভর্তি হতে গেলে কলেজ ও বিষয় অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা তোলা দাও। না পারলে অন্য কিছু দাও। প্রতিবাদ করা যাবে না। কারণ এটাই এখন নিয়ম। প্রতিবাদ করলে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া হবে। এই আক্রমণ বহুমাত্রিক। একদিকে সন্ত্রাস, যে-কোনো উপায়ে বিরোধীশূন্য কর। নির্বাচনে হার তো কী হয়েছে? যেমন আজিম-জিয়াগঞ্জ পৌরসভায় তৃণমূল একটিও আসন পায়নি, কিন্তু সেই পৌর বোর্ড এখন তৃণমূলের দখলে। বিধায়ক থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র একই চিত্র। সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো মূল্য কি থাকছে? গণতন্ত্রের কথা আমাদের রাজ্যে এখন অর্থহীন।

৪.

বর্তমান সরকার শুধু চমক দিচ্ছে, যেমন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, অথচ ডাক্তার বা পরিকাঠামো নেই। কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সব বিশ্ববিদ্যালয়ই বামফ্রন্ট আমলের। ফ্লাইওভারগুলি সব বাম সরকারের সময়ে তৈরি অথবা পরিকল্পিত। শুধু নীলসাদা রং করা হয়েছে। বামফ্রন্টের সময়কালে বিদ্যাসাগর সেতু, বঙ্কিম সেতু, নিবেদিতা সেতু প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সেতুগুলি নিঃশব্দে তৈরি হয়েছে। ওরা তাতে টুনিবাল্ব লাগাচ্ছে। আর একটা ফ্লাইওভার খোদ কোলকাতায় ওদের জমানায় তৈরি হচ্ছিল। ভেঙে পড়ল সেটা। প্রাণ গেল অনেকের। এই তো ওদের উন্নয়নের নমুনা। নবান্ন ভবনও বামফ্রন্ট আমলে তৈরি।

১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে তখন গ্রামে কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারই গ্রামে রাস্তার নেটওয়ার্ক তৈরি করে। প্রথমে মাটি, তার পরে মোরাম। অনেক গ্রামেই ঢালাই রাস্তাও তৈরি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা ও রাজ্যের নিজস্ব তহবিলের টাকায়। সেই রাস্তায় এখন তৃণমূলের গেস্টাপো বাহিনী বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

৫.

শিক্ষাক্ষেত্রে সত্তরের দশকে নৈরাজ্য প্রতিহত করে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছিল বামফ্রন্ট সরকার। এখন নৈরাজ্য আরও গভীরে। কলেজের অধ্যক্ষ থেকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকা সকলেই প্রহৃত হন তৃণমূলের ছোট্ট-দুষ্টু ছেলেদের হাতে। এটাই এখন শিক্ষাঙ্গনের সংস্কৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এই সদম্ভ ঘোষণায়—আমি তো টাকা দিই। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। সর্বত্রই দখলদারি এবং ছাত্রাবস্থা থেকেই লুম্পেন বানাও।

বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যেক বিদ্যালয়হীন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিল। মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং আধুনিক সিলেবাসের প্রবর্তন করা হয়েছিল যাতে প্রতিযোগিতার জগতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা জায়গা করে নিতে পারে। স্থাপিত হয় আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বস্তরের শিক্ষকদের বেতনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছিল। এটা কি ভুলে যাওয়ার কথা।

শিক্ষার প্রসারে গ্রামে গ্রামে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই সাফল্য নয়, প্রধান কৃতিত্ব হল সাক্ষরতা আন্দোলনের মাধ্যমে হাজার হাজার পশ্চাৎপদ অংশের মানুষ যাদের শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশাধিকারই ছিল না তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলগুলিকে ভরিয়ে তুলেছে। 'প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়া' শব্দবন্ধটাই নতুন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের শ্রেষ্ঠ অবদান।

এখন প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকে হাজার হাজার শিক্ষকপদ খালি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শত শত অধ্যাপক পদ খালি। আংশিক সময়ের শিক্ষক-অধ্যাপকদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এটাই শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন। বামফ্রন্টের সময় প্রতি বছর প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শূন্যপদে নিয়োগের জন্য রাজ্যব্যাপী পরীক্ষা নেওয়া হত স্কুল ও কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল স্বশাসিত। নিয়োগ হত মেধার ভিত্তিতে। তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার সুষ্ঠুভাবে এমন কোনো পরীক্ষাই নিতে পারল না। প্রাথমিকের একটা পরীক্ষা নিয়েছিল যাতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। বিষ্ণুপুরের ছেলের সিট পড়ল কাকদ্বীপে। আর কাকদ্বীপের মেয়ের সিট পড়ল কুলপিতে। কিছু প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত হল। মেধার ভিত্তিতে নয়, তৃণমূলের দেওয়া লিস্ট অনুযায়ী। স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতির এমন উদাহরণ বিরল।

৬.

বামফ্রন্ট সরকারের সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমলাসোল গ্রামে অনাহারে একজন বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। এ নিয়ে 'আনন্দবাজার' সহ অনেক পত্রিকায় লেখালেখি হয়। কিন্তু একবারও কেউ বলেনি গ্রাম পঞ্চায়েতটি ও পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালনায় ছিল ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা। কংগ্রেসের সহযোগী। যাই হোক, ঘটনাটি দুঃখজনক এবং বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে অনভিপ্রেত।

তৃণমূল কংগ্রেসের গত ৫ বছরের রাজত্বে শতাধিক কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে ফসলের দাম না পেয়ে, ঋণের বোঝায় বিপর্যস্ত হয়ে।

বামফ্রন্ট আসার আগে জমিদার-জোতদারদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল হাজার হাজার বিঘা জমি। সেচসেবিত জমির পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। বৃষ্টির জলে একবারই ধানচাষ হত। বছরে তিন মাসের বেশি কৃষিতে কাজ ছিল না। মজুরি বা ভাগ ছিল যৎসামান্য। কোনো স্থায়ী কিষাণ-বর্গাদার ছিল না, বছরে বছরে পালটাতো। এরা ছিল প্রধানত বাউরি, বাগদি, রুইদাস, সাঁওতাল এবং গরিব মুসলমান।

বামফ্রন্ট সরকারের মৌলিক সাফল্যগুলির অন্যতম আংশিক ভূমি-সংস্কার। সিলিং-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি যা সরকারের খাস এবং আইন ফাঁকি দিয়ে চোরাই জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হল। জমি পেল গরিবরা। কাজটা সহজে হয়নি। বহু সংঘর্ষ, রক্তক্ষয়ের পথে যেতে হয়েছে। সব গরিব মানুষই জমি পায়নি। কিন্তু সামন্তপ্রভুদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত শ্রেণিঘৃণা প্রায় অভ্যুত্থানের আকারে ফেটে পড়ে।

এর সাথেই যুক্ত হল বর্গারেকর্ড ও মজুরি-বৃদ্ধির আন্দোলন। মানুষের মতো বাঁচার পথ খুঁজে পেল গরিব মানুষ। সবথেকে বড়

যেটা পেল তা হল আত্মসম্মান, মর্যাদাবোধ, মানুষের অধিকার। সামন্ততন্ত্রের জোয়ালমুক্ত গরিব কৃষক, সে জমির পরিমাণ যত ক্ষুদ্রই হোক, নিজের জমিতে প্রাণ উজাড় করে শ্রম দিয়েছে। এই শ্রমের বৈশিষ্ট্য হল অপরের জন্য নয়, নিজের জন্য।

বামফ্রন্ট সরকার জমির বিকেন্দ্রীকরণের থেমে থাকেনি। পুঁজির জন্য কৃষি সমবায়গুলিতে সর্বজনীন সদস্যপদ চালু করেছিল। ছোটো কৃষকদের বিনামূল্যে মিনিকিট বিতরণ করা হত। ক্ষুদ্র সেচের প্রসার ঘটিয়ে সেচসেবিত জমির পরিমাণ প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি করা গিয়েছিল, ধানচাষ ভিন্ন সবজি সহ অন্যান্য চাষে উৎসাহ দেওয়া হত। কৃষিনিবিড়তা ১৫০ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ধান উৎপাদনে দেশে প্রথম, সবজিতে দেশে দ্বিতীয় স্থানে রাজ্যকে নিয়ে গিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। হেক্টরপ্রতি উৎপাদনশীলতায় হরিয়ানার পরই স্থান করে নিতে পেরেছিল। ধান ও আলু রপ্তানি করার তৎপরতা সরকারকে নিতে হয়। এই উত্তরণের কারিগর বামফ্রন্ট সরকার। এর সাফল্য কি ভুলে যাবার বিষয়?

৭.

বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি অবিস্মরণীয় সিদ্ধান্ত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন। আসন সংরক্ষণ করা হল তপশিলি জাতি-উপজাতিদের জন্য এবং এই অংশের মহিলাদের জন্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতা ও অর্থের বিকেন্দ্রীকরণ। পঞ্চায়েতের হাতে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে এই ধারণা ও তার প্রয়োগ সাফল্যে রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে সংবিধানেরও সংশোধন হয়েছিল।

৮.

বামফ্রন্ট সরকারের সাহসী পদক্ষেপ ছিল কৃষির বিকাশকে ভিত্তিকে করে শিল্পের বিকাশ। প্রথম থেকেই ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সংখ্যায় ও কর্মসংস্থানে দেশে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল।

জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে আধুনিক শিল্প গড়ার জন্য হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল ও সল্টলেকে ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা করা হয়। পেট্রোকেমিকেল প্রকল্প গড়তে ভারতে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম উদ্যোগী হয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের অনুমোদন পেতে ১০ বছর সময় লেগেছিল। আম্বানিদের কারখানা তৈরি ও বাজার দখলের প্রয়োজনীয় সময় করে দিতেই ছিল এই গড়িমসি। আজকের বিজেপি সরকার আম্বানি-আদানি-টাটাদেরই সরকার। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মুকেশ আম্বানিদের খুবই স্নেহধন্য। কিন্তু কারখানা করতে এগিয়ে আসছে না এ রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা আর তোলাবাজির ভয়ে।

হলদিয়া অঞ্চলের এক ভদ্রলোক, এবারই রাজ্যের মন্ত্রী হয়েছেন, যার নারদাকাণ্ডে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আছে, তিনি নির্বাচিত সমস্ত সংস্থা বিরোধীশূন্য করে দেবার দম্ভোক্তি করে থাকেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে হলদিয়া শিল্প শহরটা বামফ্রন্ট আমলেই বিকশিত হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স গড়ার পরিকল্পনা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরোধিতায় বানচাল হয়। যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল সীমান্তবর্তী রাজ্য বলে। হাস্যকর এই যুক্তির কারণে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে পড়তে হয়েছিল অন্যান্য রজ্যের থেকে। বামফ্রন্ট সরকারের নিজের উদ্যোগেই তৈরি হয়েছে সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স। গত ৫ বছরে একটাও শিল্প আসেনি। বামফ্রন্টের পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্গাপুর কল্যাণী শিলিগুড়িতে একটা করে কমপ্লেক্স গড়ে ওঠেনি। সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছে। তবও উন্নয়নের ঢাক পেটাতে হবে?

বামফ্রন্টের সময় এমএএমসি পুনরুজ্জীবনের জন্য একটি কনসর্টিয়াম গঠিত হয়। হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নিলামে মাত্র ১০০ কোটি টাকায় কারখানার স্বত্ব যায় কনসর্টিয়ামের হাতে। তারপর থেকে সব চুপ। বর্তমান রাজ্য সরকার একটি চিঠি পর্যন্ত দেয়নি তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে নিয়ে গঠিত কনসর্টিয়ামকে। স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া (সেইল) এক সময়ে ভারতে সব থেকে প্রাচীন কুলটি কারখানার, যার সম্পদ, জমি এখনও বিপুল, পুনরুজ্জীবনে আগ্রহী ছিল। জমি সংক্রান্ত জটিলতার সুরাহা সরকার করে দেয়নি। অন্ধ্র উপকূল থেকে গ্রাম সরবরাহের জন্য পাইপলাইন টানছে গ্যাস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (গেইল)। সেই গ্যাসে বারাউনি ও সিন্ধ্রির সার কারখানার পুনরুজ্জীবন ঘটানো হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত। হলদিয়া-দুর্গাপুরের পাশ দিয়েই লাইন যাবে—অথচ এই দুটি কারখানার পুনরুজ্জীবন হবে না। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা তদ্বির নেই। কেন্দ্রে তো মিত্র সরকার!

দুর্গাপুরে ডিপিএল-এর কোকওভেন প্ল্যান্ট বন্ধ। কয়েকশো কর্মী কাজহারা। পুনরায় চালু করার কোনো উদ্যোগ নেই। চাহিদা নেই তাই বিদ্যুৎ উদ্বৃত্ত। সব কারখানাই তো বন্ধ! বামফ্রন্টের সময় যে সমস্ত ছোটো ও মাঝারি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও অনেকগুলি বন্ধ নানা কারণে। শুধু গৃহসংযোগে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে না।

দুর্গাপুরে এডিবি কারখানায় আগে পাওয়ার প্ল্যান্টের বয়লার তৈরি হত। পূর্ব ভারতে একমাত্র বয়লার তৈরির কারখানা ছিল। এখন বয়লার উৎপাদন হয় না। শুধু স্পেয়ার পার্টস হয়। অতীতের জৌলুস শেষ। সামান্য কিছু কর্মী নিয়ে কাজ চলছে। এখন বহুজাতিক সংস্থা জেনারেল ইলেকট্রিকের মালিক।

দুর্গাপুরের আর একটি বড় কারখানা অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট। অ্যালয় স্টিল উৎপাদন বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কিছু স্পেশাল স্টিল উৎপাদনে সক্ষম বলে টিকে আছে। বামফ্রন্ট সরকার এবং বামফ্রন্টের সাংসদরা বহুবার চিঠি, সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করে গেছেন। বর্তমান সরকার ও ভোট লুটেরা সাংসদরা কি একবারও দেখা সাক্ষাৎ করেছেন দিল্লিতে সমস্যা সমাধানের জন্য? কিছু না করলে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ইতিমধ্যেই সেইল-এর অন্তর্ভুক্ত ইস্পাত কারখানাগুলির সব থেকে ছোটো। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এই কারখানারও ভবিষ্যৎ ভালো নয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানাকে স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অতীতের অনেক উজ্জ্বল রেকর্ড সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জনকে এড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্র বারানসীতে একটি বৃহৎ ইঞ্জিন কারখানা তৈরি সমাপ্তির পথে। বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা কারখানাটির মালিক।

হলদিয়াতেও অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। একদা খ্যাত বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কথা না বলাই ভালো। জেসপ, টেক্সম্যাকো, উইমকো ইত্যাদি কয়েকটি মাত্র উদাহরণ।

প্রতি বছর হাজার হাজার ছেলেমেয়ে দুটি বলিষ্ঠ হাত দিয়ে কাজ খুঁজছে—তাদের কী হবে? কলেজ থেকে পাশ করে তারা কী করবে? কৃষিতে যন্ত্রের প্রয়োগে হাজার হাজার শ্রমিক উদ্বৃত্ত। এদের ভবিষ্যৎ কী?

কংগ্রেসি জমানায় দেখা যেত চাষের সময় বাঁকুড়ার গরিব মানুষরা দলে দলে বর্ধমানে আসত কাজের জন্য। বামফ্রন্ট জমানায় চিত্র পাল্টে গিয়েছিল। বাঁকুড়া থেকে কাউকে আসতে হত না। কৃষির বিকাশে কাজ সেখানেই জুটত।

এখন মাইগ্রেশন অন্য ধরনের। মেধাবী ছেলেরা অনেকদিন

আগে থেকেই অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। কাজের জন্য। মেধার জোরে তারা কাজও পাচ্ছে। অনেকে বিদেশও চলে যাচ্ছে। আর ফিরছে না। ব্যাপক হারে বঙ্গপ্রদেশ থেকে 'ব্রেন ড্রেন' হয়েই চলেছে।

এখন গায়েগতরে হাতে কলমে কাজ করা ছেলেরা ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে হাজারে হাজারে। কেরালা, মহারাষ্ট্র হরিয়ানা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে। এদের মধ্যে কেউ যদি মুসলিম হয় তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাদেশি বলে উৎপীড়িতও হচ্ছে। এদের জীবনযাত্রা অনেকটাই দাস শ্রমিকের মতো। গ্রামে গঞ্জে বৃদ্ধ বাবা মা, স্ত্রীপুত্র কন্যারা অসহায় দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। উন্নয়ন বোধহয় এই রকমই হয়। আর না হয় শাসকদলের লাঠিয়াল হয়ে হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীর মতো সন্ত্রস্ত করছে যে-কোনো বিরোধিতাকে। সিন্ডিকেট, মাটিমাফিয়া, বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়াদের বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো চপ শিল্পের প্রসার না হলেও বোমা শিল্পের খুবই রমরমা।

৯.

কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আর পাঁচটা বুর্জোয়া পার্টির সংসদীয় সরকারের মতো নয়। এ এমন একটি সরকার যে খোলাখুলি উগ্র হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং একই সঙ্গে কর্পোরেট সেক্টরের সমস্ত দাবি নির্দ্বিধায় কার্যকর করতে চায়। এ কারণেই শ্রম আইন সংশোধন, রাজ্যগুলির যেটুকু ক্ষমতা সেটাও কেড়ে নেওয়া ইত্যাদির শেষতম জি.এস.টি আইন, যাতে রাজ্যগুলির কোনো কর বা সেস বসানোর ক্ষমতা থাকবে না। সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কট্টর মনুবাদী ছাত্রসংগঠনকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারের হেনস্থা, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভেমুলার আত্মহত্যা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজেপির অভিযান, বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলী প্রমাণ করে ছাত্রদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী তত্ত্বে দীক্ষা দেওয়া এবং সেটাই দেশপ্রেম। পুরাণকে ইতিহাস, পৌরণিক কাহিনির ঘটনাকে সে-যুগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদিকে প্রচারে এনে বিজ্ঞানমনস্কতাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় উদোগে চলছে। ইতিহাসের বিকৃতি ঘটান হচ্ছে।

সংবিধানের মৌল চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষতার মূলেই কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে দাঙ্গা বাধানো হচ্ছে। গোমাংস আছে (যদিও ছিল না) ধুয়ো তুলে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। সংবিধানে রাজ্যগুলির আইনে এরকম কোনো বিধান আছে নাকি?

আরএসএস-বিজেপির অনুপ্রেরণায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গো-রক্ষক সমিতি তৈরি হয়েছে। তারা এখন মরু গরুর চামড়া ছাড়াতেও দেবে না। এই কাজ করে যে দলিতরা তাদের ধরেও বেদম মার দেওয়া হচ্ছে।

গো-হত্যা নিয়ে সংঘ পরিবার ও বিজেপির এত মাতামাতির কারণ বুঝতে কারোরই অসুবিধা হয় না। এ হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের প্রতি ঘৃণাকে উস্কে দেওয়া। দুর্ভাগ্যবশত সংবিধান-বিরোধী এই কাজ করছে সংবিধানের তথাকথিত রক্ষকরা। দেশের দলিত সম্প্রদায়ের মানুষরাও আক্রান্ত। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে হোক অথবা গ্রামে গঞ্জে মৃত গরুর ব্যবস্থাপনা করে যারা—সবাই। কমিউনিস্টরা যেহেতু সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সবথেকে সরব সেজন্য কমিউনিস্টরাই বিজেপি-সংঘ পরিবারের প্রথম শত্রু। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী শক্তির সাথে তাদের ভাবগত ও ব্যবহারিক সখ্য।

সেজন্যই দেখা যায় সারদা চিটফান্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে সিবিআই অনুসন্ধান চলছিল—সেটা হিমঘরে পাঠানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে শতকরা হারে ভালো ভোট পাওয়ার পর খুব হম্বিতম্বি করল। 'ভাগ মমতা ভাগ, ভাগ মুকুল ভাগ' বুলি আওড়ালো। তারপরই মুকুলবাবু কিছুদিন দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করলেন। তারপর সব চুপ। বিজেপির রাজ্য কেন্দ্রীয় সব নেতৃত্ব মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছেন।

সংঘ-ঘনিষ্ঠদের বেছে বেছে রাজ্যপাল করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায়। সময় বুঝে মমতাদেবীও হুংকার ছেড়েছেন—ত্রিপুরা চাই বলে।

নারদা ঘুষকাণ্ডে তৃণমূলের কয়েকজন সাংসদ জড়িত। ভিডিও ক্লিপিং-এ এই দৃশ্য মানুষের চোখে ভাসছে। বিষয়টি সংসদের এথিকস্ কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। এথিকস্ কমিটির চেয়ারম্যান লালকৃষ্ণ আদবানী। সেই কমিটির ১০ মাসে একটিও মিটিং ডাকা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিসন বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলায় নারদ ভিডিও ক্লিপিংগুলি ঠিক না জাল পরীক্ষার জন্য চণ্ডীগড়ে পাঠানো হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ ভিডিওগুলি জাল নয়। এও জানা গেল যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে মুম্বই হাইকোর্টে বদলি করে দেওয়া হল। এসব কিসের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও দেশীয় কর্পোরেট হাউসের তোষণ নীতি—যার অনেকগুলিরই বিরুদ্ধে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিষোদগার করে থাকেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই নীতিগুলির বিরুদ্ধে যখন ভারতব্যাপী ধর্মঘট ডাকা হয় তার সর্বাত্মক বিরোধিতায় নেমে পড়েন।

১০.

তৃণমূল কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী আক্রমণ এবং বিজেপি-সংঘ পরিবারের ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপের সঙ্গমস্থল হল আমাদের রাজ্য। উভয়েরই লক্ষ্য বামপন্থী ভাবধারাকেই অপ্রাসঙ্গিক করা। বামপন্থীরা যেহেতু তাদের ধ্বংসাত্মক মতাদর্শকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে এবং ধারাবাহিক ও আপসহীন, সেহেতু শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও দেশীয় কর্পোরেট পুঁজির লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও সতত সংগ্রাম মুখর—তাই বামপন্থাকেই নির্মূল করতে চায়। এই পরিকল্পনায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও যুক্ত। সেজন্যই মার্কিন প্রতিনিধিদের সঙ্গে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর হৃদ্যতা।

সংখ্যাগরিষ্ঠের মৌলবাদ মাথাচাড়া দিলে সংখ্যালঘিষ্ঠের মৌলবাদও সক্রিয় হয়ে ওঠে। মার্কিন সাম্রাজ্যের বোম্বেটে নীতির ফলে আরব দেশগুলি সহ প্রায় পৃথিবীর সব দেশে মুসলিম মৌলবাদী উগ্রপন্থীরা নাশকতার কাজ করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য প্রকৃত ধার্মিক মুসলমানরা সাধ্যমতো এসবের বিরোধিতা করছে। সাম্রাজ্যবাদীরা তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলিতে অপছন্দের সরকার উৎখাত করার জন্য সরকার বিরোধী মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে। কোথাও সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করছে—সিরিয়া ইরাক লেবানন লিবিয়া প্রায় সর্বত্র। বিজেপি-সংঘ পরিবার এবং তৃণমূল কংগ্রেস আমেরিকার এই সব অপকর্মগুলির কোথাও সমালোচনা করেনি। শুধুমাত্র বামপন্থীরাই সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ আন্দোলন করে চলেছে।

মুসলিম মৌলবাদীরা কমিউনিস্টদের শত্রু মনে করে কেননা তারা বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদে বিশ্বাস করে।

সুতরাং এই ত্রিবিধ শক্তি ও তাদের নেতা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। লড়াইটা হচ্ছে বামপন্থাকে টিকিয়ে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে। এক কথায় পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থা পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম। এই

সংগ্রামকে নির্বাচনে জিতে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার সংগ্রামে সীমিত রাখলে সর্বনাশ হবে।

দীর্ঘদিন ক্ষমতার অলিন্দে থাকায় সংসদ-সর্বস্বতা বাম রাজনীতির অতি গভীরে প্রবেশ করেছে—নেতৃত্ব থেকে সমগ্র কর্মী বাহিনীর মধ্যে। অতি গুরুত্বপূর্ণ হল মতাদর্শগত সংগ্রাম। মতাদর্শগত সংগ্রামের অর্থ শুধু পার্টিক্লাস নয়। পার্টি নেতৃত্বের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু নিঃশব্দে জনগণের মধ্যে কাজ করার জন্য কর্মী বাছাই করে মতাদর্শগতভাবে শিক্ষিত বাহিনী তৈরি করতে হবে। স্থানীয় দাবি, এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাবি নিয়ে জনগণকে সমবেত করার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে শুধু কর্মীদের নয়, নেতৃত্বকেও।

আজকের পরিস্থিতিতে যেটা প্রয়োজন সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষায় ব্যাপকতম ঐক্য—ব্যাপকতম মঞ্চ। ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রাজনীতি। এই ঐক্যবদ্ধ মঞ্চে সমবেত করার চেষ্টা করতে হবে সব বামপন্থী সংগঠন, তারা ভিন্ন ধারার হতে পারে। সব বিষয়ে ঐক্যমত্য না হতে পারে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। গণতন্ত্রী এবং ফ্যাসিবাদী প্রবণতা ও আক্রমণের বিরোধিতা করতে আগ্রহী এমন সমস্ত শক্তিকে সমবেত করতে হবে। এর জন্য ধৈর্য, পরমতসহিষ্ণুতা ও দক্ষতা দরকার।

লেনিন তাঁর ‘Leftwing Communism: An Infantile Disorder’ (অতিবামপন্থা : একটি শিশুসুলভ বিকার) গ্রন্থে লিখেছিলেন, ‘‘প্রয়োজনে তুমি যদি লাইন পরিবর্তনেব প্রস্তুত না থাক, শত্রুকে তোমার দিকে টানতে, তার সঙ্গে সমঝোতা করতে প্রস্তুত না থাকো, তাহলে তুমি কোনো বিপ্লবী পার্টির নেতা হবার যোগ্য নও। ১৯০৩ সাল থেকে শুরু করে আমাদের পার্টির ইতিহাস তো অবস্থান বদল আর সমঝোতায় ভরা। তারও আগে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা জারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সাহায্য নিয়েছে। পরে আমরা চাষিদের সঙ্গে আঁতাত করেছি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে, আবার একই সঙ্গে বুর্জোয়াদের সমর্থন করেছি জারের বিরুদ্ধে। এত সবের মধ্যেও কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক কাজ চালিয়ে যেতে অসুবিধা হয়নি।’’

চিয়াংকাইসেক শত শত কমিউনিস্ট হত্যা করছে, মাও-জে-দং জাপানকে প্রতিহত করার জন্য তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছেন। ফ্রান্সের সোস্যালিস্ট লুই ব্লাংকি বলেছিলেন, আমরা কমিউনিস্ট, কারণ আমরা কম্প্রোমাইজ করি না, লক্ষ্যে পৌছাবার আগে কোথাও থামি না। এঙ্গেলস্ বলেছিলেন এমন অধৈর্য লোক যে মার্কসের থিয়োরিটাই দিলে পাল্টে।

সংবাদে দেখলাম শ্রদ্ধেয় সুহাসিনী আলি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষা নিয়ে উত্তর প্রদেশের আসন্ন নির্বাচনে বামপন্থীরা একাই লড়বে। কংগ্রেস তো নয়ই, সমাজবাদী পার্টি বা বহুজন সমাজ পার্টি কারও সঙ্গেই যাবে না। যদিও উত্তরপ্রদেশ সব বামেদের জমায়েতের ক্ষমতা খুবই কম। বিহার থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন না কেন? ইরফান হাবিব যেমন পরামর্শ দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত। প্রতিরোধও হচ্ছে। সেই প্রতিরোধকে আরও শক্তিশালী করার জন্য বৃহত্তম ঐক্য দরকার। ঐক্যের প্রয়োজন বামপন্থাকে রক্ষার জন্য। শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নয়, বামপন্থার পুনর্নির্মাণের জন্য।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ মালডাঙ্গা, বর্ধমান, দূরভাষ : (০৩৪২) ২৭৫০৫৮৭

(মন্তেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি)

আমাদের লক্ষ্য

১. Safe Drive Save Life, ২. প্রতি ঘরে শৌচাগার তৈরি করে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত করা। ৩. নিরক্ষরতা দূর করা। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েতের সার্বিক উন্নয়ন। ৫. এই পঞ্চায়েতকে কাজের মাধ্যমে সেরা পঞ্চায়েতে পরিণত করা।

গৌরপদ দাস *নির্বাহী সহায়ক* — **স্বপনকুমার রায়** *উপপ্রধান* — **টুম্পা মণ্ডল** *প্রধান*

Sl. No. 138

অনলাইন পেমেন্ট-এ অতিরিক্ত ১% ছাড়

WBSEDCL গ্রাহকদের জন্যে ই-পরিষেবা

যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এবং গ্রাহকদের জীবন আরও সহজ করতে WBSEDCL নিয়ে এলো উন্নতমানের e-পরিষেবা ও m-পরিষেবা

- গার্হস্থ্য এবং বাণিজ্যিক গ্রাহকরা নতুন সংযোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করুন এবং কোটেশন মূল্য (50 কেভিএ পর্যন্ত) জমা দিন ও অনলাইনে আবেদনের সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখে নিন
- লোড বৃদ্ধির জন্য (6 কিলোওয়াট পর্যন্ত) অনলাইনে আবেদন করুন এবং কোটেশন মূল্য জমা দিন ও আবেদনের সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখে নিন
- শিল্প সংস্থাগুলি নতুন সংযোগের জন্য অনলাইনে আবেদন করুন
- নতুন সংযোগ এবং লোড বৃদ্ধির (50 কেভিএ পর্যন্ত) যে কোন ধরনের আবেদনের কোটেশন মূল্য জমা দিন
- e-বিল দেখুন এবং নেট ব্যাঙ্কিং / ক্রেডিট / ডেবিট কার্ডের সাহায্যে কুইক পে-অপশনের মাধ্যমে পেমেন্ট করুন। ডিউ ডেট-এর মধ্যে বিল জমা দিন এবং অতিরিক্ত ছাড়ের সুবিধা নিন
- নথিভুক্ত গ্রাহকদের জন্য WBSEDCL ওয়েবসাইটে অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করার সুবিধা। সকল গ্রাহকদের জন্য SMS মারফত ডকেট নিস্পত্তির খবরের সুবিধা
- বিলিং / পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য SMS-এর মাধ্যমে পাওয়ার জন্য মোবাইল নম্বর / ই-মেল-এর সাহায্যে আপনার কনজিউমার আইডি নথিভুক্ত করুন। ডুপ্লিকেট বিল / রসিদ / বিদ্যুৎ ব্যবহার বা পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যেরও সুবিধা পান

ডিউ ডেট-এর মধ্যে L & MV বিল e-পেমেন্ট-এর মাধ্যমে জমা করুন ও অতিরিক্ত ১% ছাড়ের সুবিধা নিন

লাইনে নয়। অনলাইনে www.wbsedcl.in

WBSEDCL

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)

রেজিস্টার্ড অফিস: বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক – ডি জে, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১

CIN: U40109WB2007SGC113473, cecorpmont@gmail.com, www.wbsedcl.in

অশনি সংকেত

পার্থ মুখার্জী

স্বাধীনতার পর এত খারাপ সময়ের মুখোমুখি কখনোই হইনি আমরা। তার অর্থ এই নয় যে আগে আমরা খুবই সুখে আনন্দে ছিলাম। তবে বর্তমানের আক্রমণ শুধু শারীরিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে তা প্রবল আকার পাচ্ছে। এই আক্রমণের সমর্থনে কিছু কিছু মানুষের মদত জুটে যাচ্ছে। আক্রমণের বর্তমান প্রকৃতিতে প্রথমেই মনে পড়ে যাচ্ছে সৈয়দ মুজতবা আলির লেখা এক প্রবন্ধের কথা। তিনি লিখছেন : ''আমার বয়স তখন ছোট, নীচু ক্লাসে পড়ি। পরীক্ষার আগে কখনো রচনা মুখস্থ করা হয়ে ওঠেনি, বেশ ভয়ে আছি। পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্রে দেখি গরুর রচনা এসেছে। খুব সোজা প্রশ্ন। আমার স্কুলের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখি মাঠে গরু চরছে। ভাবলাম চটপট কয়েক পাতা লেখা যাবে। যথেষ্ট উৎফুল্ল হয়ে লিখতে শুরু করি। গরু চতুষ্পদ প্রাণী, তার দুটো কান, দুটো শিং, একটা ছোট ল্যাজ আছে। এরকম দু চার কথা লেখার পর দেখি আর একটাও কথা আসছে না। ঘেমে নেয়ে একাকার কাণ্ড। শেষে মনে হল আমিই যেন একটা গরু।''

পাঠকবর্গ আপনাদের মনে হতেই পারে ধান ভানতে কেন শিবের গীত গাইতে শুরু করলাম। কারণ তো স্পষ্ট। সংবাদপত্রে চোখ রাখলেই দেখি কে খেতে পাচ্ছে, আর কে খেতে পাচ্ছে না সেদিকে দৃষ্টি না রেখে কে ফ্রিজে গরুর মাংস রেখেছে বা রাখেনি তার হিসেব নিকেশ চলছে। কোন মহিলার ব্যাগে গরুর মাংস রয়েছে তার তল্লাশি চলছে। দেখা গেল একটা গরুকে বাঘে মেরেছে তার দায় বর্তাচ্ছে মানুষের ওপরে। দেওয়া হচ্ছে ধর্মপরিচয়। গোলওয়ালকারের শিষ্যরা মানুষের থেকে গরু নিয়ে বেশি চিন্তিত।

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন 'গোরক্ষিণী সভা'র এক সদস্য, হাতে একখানা গরুর ছবি। জানালেন দেশের সব 'গো মাতা'দের কসাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করা, রুগ্ন, অকর্মণ্য গরুর সেবা করাই তাঁদের ব্রত। বিবেকানন্দ বললেন, সে ঠিক আছে, কিন্তু মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষে ন-লক্ষ মানুষ মারা গেছেন, তাঁদের সাহয্যে আপনারা কিছু করছেন না? লোকটি বললেন, না। তাঁরা শুধু গরুদের জন্যই কাজ করে থাকেন। তাছাড়া, দুর্ভিক্ষ হয়েছে লোকের কর্মফলে, তাঁরা কী করবেন? বিবেকানন্দ বললেন, তবে তো এও বলা যায় যে গোমাতারাও নিজ কর্মফলেই কসাইয়ের হাতে মরছেন। থতমত খেয়ে লোকটি বললেন, তা বটে, তবে কি, শাস্ত্র বলে, গরু আমাদের মাতা। সহাস্য বিবেকানন্দের জবাব : তা বটে, নইলে এমন সব কৃতী সন্তান আর কে প্রসব করবেন?

একবিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে মানুষ চাঁদে পা রেখেছে। মঙ্গলগ্রহের মাটির পরীক্ষা করে তাকে বুঝে নিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নতুন এই যুগটাকে বলা হচ্ছে 'Revolution in Time'। দ্বিতীয়ত বলা হচ্ছে 'Death of Distance'—দূরত্বের মৃত্যুর যুগ। পৃথিবীটা নিজের পেটের মধ্যেই ঢুকে গেছে। ভয়ঙ্কর গতিতে পৃথিবী গঠিত হচ্ছে। সময়ের স্তরে এ এক বিস্ফোরণ। আধুনিক সমাজে দাঁড়িয়েও চলছে ঊনবিংশ শতাব্দীর পিছিয়ে থাকা রাজনীতি। ধর্মীয় মৌলবাদ এখন এক ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। বিশ্বায়ন হল Enemy from Outside। একে প্রত্যক্ষ করা যায় বিভিন্ন ভাবে। উল্টো দিকে সাম্প্রদায়িকতা হল Enemy from Inside। এটি একটি ভাইরাসের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ে জ্যামিতিক গতিতে। বলা যায় এটি একটি ভয়ঙ্কর শক্তি। সাম্রাজ্যবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ চরিত্রগত দিক থেকে আলাদা হলেও এদের উৎপত্তিস্থল এক। এরা পরস্পর-পরস্পরের সমার্থক হয়ে একটি ত্রিভুজ রচনা করে দেশে-বাইরে আক্রমণ চালাচ্ছে।

বুর্জোয়ারা বর্তমানে রাষ্ট্রকে 'Nation State' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় এই রাষ্ট্রের স্পষ্ট রূপ হল এটি এমন একটি ভূখণ্ড যার মধ্যে জনগণের ভাষা মোটামুটি এক, তাদের আচার ব্যবহার, সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য মোটামুটি এক, সর্বোপরি জনমানসের মার্কেটের চরিত্রও এক। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে চাহিদা ও ভোগের প্যাটার্ন এক। রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখন সেই ধর্মকে ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সেটাকে টিকিয়ে রাখছে। কবিগুরুর ভাষায়—''ধর্ম যদি কোনো জাতির প্রাণ হয়, তবে সেই জাতির এই বিষয়ে কেন সাবধানতা? কারণ একটু অন্ধ হলেই তাঁর মৃত্যু এই দিক থেকে আসবে। যদি এ বিষয়ে একটুও জড়তা থাকে, তবে মিথ্যা সংস্কার যুক্ত সম্প্রদায় বুদ্ধি, নিরর্থক আচার, অন্ধ আবর্জনা এসে ধর্মের সিংহাসনকে অধিকার করে ধর্মকে চেপে মেরে ফেলে।'' তাঁর ভাষায়—''এই মোহযুক্ত ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো।''

পৃথিবীর যে-কোনো সভ্যদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আধার আছে। আমাদের দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর আমাদের দেশনায়করা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান তা করেনি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাবরি মসজিদকে ভেঙে ফেলা হল। পিছিয়ে দেওয়া হল ইতিহাসকে। সারা বিশ্বের সামনে মাথা নিচু হল আমাদের। কিন্তু যারা করলেন তারা তো দেশের কর্ণধার। তারাই তো দীর্ঘদিন ধরে এই প্রচার করেছেন। ৬ ডিসেম্বরের ঘটনা তো আকস্মিক নয়, পরিকল্পিত। কতকগুলি ঘটনার দিকে চোখ রাখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঘটনার বিবরণে পাওয়া যায় সাড়ে তিন লক্ষ লোক সমবেত হয়েছিল। এত মানুষ সেখানে ছিল কিন্তু একটাও অপরাধের ঘটনার উল্লেখ করা

হয়নি, একটু জলের জন্য কেউ হাহাকার করেনি। কেউ আহত হবার ঘটনা নেই, কোনো ছেলে হারিয়ে যায়নি। পড়ে থাকতে দেখা যায়নি কোনো চটি বা মাফলার। এরা ছিল একেবারে সংগঠিত শক্তি। ঘটনার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও বলেছিলেন, আমি ওদের ওপর বিশ্বাস করেছিলাম। অথচ অধিকাংশ রাজনৈতিক দল, বিশেষত বামপন্থীরা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারকে বাবরি মসজিদ অক্ষত রাখতে কার্যত 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়েছিলেন। সে রাজ্যে তখন বিজেপি সরকার। বর্তমানে এরাই কেন্দ্রে। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির অন্ধ আস্ফালন এদের একটি মতাদর্শ। তার প্রতিফলন সর্বত্র। ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতিতে নতুন এক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। গড়া হচ্ছে দর্শন। নান্দনিক ভাষায় বলা যায় 'Passivist Determination' দর্শন। এই দর্শনে মধ্যপন্থা বলে কিছু নেই। হয় তুমি আমার কথা শুনে চলো নতুবা তুমি আমার বিরোধী। যেমন আমেরিকার নীতির বিরোধিতা করলে তুমি সন্ত্রাসবাদী, অন্যদিকে তালিবানদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেই তা হয়ে যায় ইসলাম-বিরোধী। আবার আমাদের দেশে কেউ প্রকৃত হিন্দুদের কথা বললেই সে হয়ে যাচ্ছে দেশদ্রোহী। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় ফোটো-ইলেকট্রন তত্ত্বের জন্য অ্যালবার্ট আইনস্টাইন নোবেল পুরস্কার পান। বিশ্ববিখ্যাত এই বিজ্ঞানীকে তৎকালীন জার্মান সরকার 'জার্মান সাম্মানিক নাগরিক' উপাধি দান করেন। তিনি ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাশিয়ান বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। নাৎসিদের ক্ষমতা দখলের সময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজে গিয়েছিলেন। নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পরই তাঁর সাম্মানিক নাগরিক উপাধি কেড়ে নেওয়ার জন্য রাশিয়ান আকাদেমি থেকে জানানো হল... ''আপনি যদি স্বেচ্ছায় সদস্যপদ ত্যাগ না করেন তবে আকাদেমিতে তিক্ততার সৃষ্টি হবে।'' আইনস্টাইন আর দেশে ফেরেননি, ডাকে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়ে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে থেকে গেলেন। এবং মার্কিন নাগরিকত্ব পেলেন। এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক। ১৯৩৩ সালে রাইখ চেম্বার অব প্রেস থেকে একটি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তাতে নাৎসি সরকারের চরম শত্রুদের নাম ছিল। এই তালিকায় প্রথম নাম ছিল আইনস্টাইনের। আইনস্টাইনের মাথার দাম ঠিক করা হয়েছিল ১ হাজার পাউন্ড। বহু বিতর্কিত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের আবিষ্কার করে যিনি হিটলার বাহিনীর বিরাগভাজন হয়েছিলেন। আর রাতারাতি এই আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে জার্মান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১০০ জন বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে লিখলেন—'Hundred Authors Against Relativity'।

জার্মানিতে ফ্যাসিস্ত শাসকরা সর্বদা ব্যস্ত ছিল শিক্ষাকে নিজ স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করতে। ফলত নানা ধরনের ফতোয়া জারি হয়েছে শিক্ষায়। শিক্ষাব্যবস্থার ওপর চলছে বহুবিধ কাটাছেঁড়া, একের পর এক অপারেশন। তার অনুরূপ নিদর্শন আমাদের দেশের মৌলবাদী সরকারও রেখেছে।

হিটলার তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'মেইনক্যাম্ফ'-এ শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন। শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ নয়, শরীর গঠন। ফলে স্কুলের শিক্ষার শারীরশিক্ষার স্বাভাবিক সময়ক্রমকে বাড়িয়ে দুই থেকে তিনগুণ করা হয়। উঁচু ক্লাসে বক্সিংকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এইভাবে আস্তে আস্তে গোটা সমাজকে যুদ্ধবাজের দর্শনে বিষাক্ত করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। উল্টোদিকে আমাদের দেশের সরকারও তার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শারীরশিক্ষার কথা খুবই গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এ ব্যবস্থাটি আর.এস.এস নামক সংগঠনের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন, যাতে খুব সহজেই আর.এস.এস-এর মতো দাঙ্গাবাজ হয়ে উঠতে পারে। এ কার পদধ্বনি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে হিটলার বলেছেন, মেয়েদের শিক্ষার প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে শরীর গঠনে। এরপর চরিত্র গঠনে এবং সবশেষে মেধায়। বোঝানো হল শিক্ষান্তে চাকুরির অর্থ পুরুষের দাবিতে হস্তক্ষেপ। তাই নারীদের অন্দরমহলে ফেরানোর ব্যবস্থা পাকা করা হল। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতেও শিক্ষায় প্রায় অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। এ কোন দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা হয় না।

যাঁরা সবকিছুকেই ধর্মের মাপকাঠিতে ফেলে বিচার করতে চান, তাঁরা কি স্বামী বিবেকানন্দকে মানেন, যিনি কর্মকে ধর্ম বলেছেন, যিনি মানুষের মেধার কথা বলেছেন, যিনি দরিদ্র ভারতবাসীকে এবং নিচু জাত বলে পরিচিত মানুষকে কাছে টানার কথা বলেছেন? আর.এস.এস, যারা হিন্দুদের একমাত্র ঠিকাদার বলে দাবি করে তারা কি স্বামীজির এই দাবি মানে? না। তারা ছড়ায় অন্ধ ধর্মীয় বিদ্বেষ।

একবিংশ শতাব্দীতে আমরা নতুন করে শিখেছি গুজরাত কাণ্ডের মধ্য দিয়ে কীভাবে একটি নতুন সভ্যতার জন্ম নিয়েছে। বিপরীত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলে কীভাবে অমানুষের মতো অত্যাচার এমনকি খুনও করা যায়। গুজরাট কাণ্ড তা দেখিয়েছে। বিধর্মী মায়ের পেট চিরে শিশুকে হত্যা করা, শিশুকে আগুনে ঝলসে মায়ের কোলে ছুঁড়ে দেওয়া, এটাই নাকি সভ্যতা। আরও বড় করে বলা যায় রাম রাজত্ব।

তাই আফগানিস্থানকে জ্বালিয়ে খাক করে দেওয়া যায়, ভিয়েতনামকে নাপামে দগ্ধ করা যায়। বিজ্ঞানের নাম করে, সভ্যতার নাম করে ইরাক ও আফগানিস্থান এবং প্যালেস্তাইনে গণকবর দেওয়া যায়। সমাজতাত্ত্বিক সৌমিত্র বসুর মতকে গ্রহণ করে বলা যায়—হান্টিংটন সাহেব স্থির করে দিলেন একটা সভ্যতা টিকবে, একটা টিকবে না, তিনি গণকের মতো ভবিষ্যদ্বাণী করে দিলেন পৃথিবীটা কোন পথ চলবে কারণ সেটাই নাকি বৈজ্ঞানিক। আইনস্টাইন পোটেনসিয়াল ওয়ালের উভয় পাশেই কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। কার্ল পপার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিলেন তাকে যা পরিবর্তনশীল এবং যাকে ভুল প্রমাণিত করা যায়। চলমান বিজ্ঞানকে যারা ধর্মের অচলায়তনের নিগড়ে বেঁধে রাখলেন তারাই নিজেদেরকে বৈজ্ঞানিক

একবিংশ শতাব্দীতে আমরা নতুন করে শিখেছি গুজরাত কাণ্ডের মধ্য দিয়ে কীভাবে একটি নতুন সভ্যতার জন্ম নিয়েছে। বিপরীত ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলে কীভাবে অমানুষের মতো অত্যাচার এমনকি খুনও করা যায়। গুজরাট কাণ্ড তা দেখিয়েছে। বিধর্মী মায়ের পেট চিরে শিশুকে হত্যা করা, শিশুকে আগুনে ঝলসে মায়ের কোলে ছুঁড়ে দেওয়া, এটাই নাকি সভ্যতা। আরও বড় করে বলা যায় রাম রাজত্ব।

বলে বেড়াচ্ছেন। যাঁরা বিজ্ঞান অনুশীলন করেন তারা জ্ঞানের চৌহদ্দির থেকে পশুশক্তি ও অস্ত্রবলকে সরিয়ে রাখতে চাইলেন। আর যাঁরা বিজ্ঞান অনুশীলন থেকে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অস্ত্রের জোরে নিজেদের ধর্মীয় চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক বলে অন্য সব চিন্তাকে ধ্বংস করতে চাইলেন।

গুজরাট কিন্তু গুজরাতেই আছে। গুজরাতের স্রোত আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। গুজরাতে ছিল গণহত্যা। হননের নারকীয় তৎপরতা। আর এখন দেশজুড়ে চলছে স্মৃতিহনন, মেধাহননের প্রচেষ্টা। ইতিহাসকে খুন করা হচ্ছে। খুন করা হচ্ছে দর্শন, সাহিত্য, কাব্যকলা, বিজ্ঞান। মানুষের নান্দনিক বোধ, সৃজনশীলতা, বৌদ্ধিক বিচারবুদ্ধির নিস্তার নেই। এটাকে কি ফ্যাসিবাদের প্রবণতা বলা যায় না? এর বিচার অবশ্য করুন তাত্ত্বিকেরা। কিন্তু ধরো, মারো, কাটো, পোড়াও, শিকড় থেকে নির্মমভাবে ছিঁড়ে আনো, বেজন্মা করে দাও, আদিম জৈবিক প্রবৃত্তিকে জাগাও, বুদ্ধিকে লণ্ডভণ্ড করে দাও, প্রতিবেশী ভাইকে শত্রু বানাও—এ মত্ততার প্লাবনে যেন মহাবিনাশের 'অশনি সংকেত'।

প্রসঙ্গত, আদর্শগত প্রশ্নে ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রিভ বলেছিলেন, ''ফ্যাসিবাদ যে-কোনও মুখোশই ধারণ করবে, যে-কোনও রূপেই নিজেকে প্রকাশ করবে এবং যে-কোনও পথেই ক্ষমতায় আসুক তবু ফ্যাসিবাদ হল শ্রমিকশ্রেণির এবং সমস্ত মেহনতি মানুষের অভিন্ন শত্রু।'' তবুও ''ফ্যাসিবাদ অনেকাংশে জনগণকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, কারণ জনগণের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ও দাবিগুলির কাছে সে বাগাড়ম্বরে আবেদন করে। ফ্যাসিবাদ শুধু জনগণের মধ্যে গভীরভাবে বদ্ধমূল সংস্কারগুলিকেই উস্কে দেয় না, উপরন্তু নানাভাবে তাদের বিপ্লবী ঐতিহ্যকেও কাজে লাগায়।'' এছাড়াও তিনি সতর্ক করেন, ''ফ্যাসিবাদের ক্ষমতালাভ এক বুর্জোয়া সরকার থেকে অপর এক বুর্জোয়া সরকারের মামুলি উত্তরণ নয়, বুর্জোয়াদের শ্রেণি কর্তৃত্বের একটি রাষ্ট্রীয় রূপ। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্থানে অন্য এক রাষ্ট্রীয় রূপে প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।'' ওই সপ্তম কংগ্রেসেই ডিমিট্রিভ বললেন, ''ফ্যাসিবাদ হল নিপীড়িত মানুষের ওপর লগ্নিপুঁজির আক্রমণ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ ও তার দ্বারা প্ররোচিত আগ্রাসী যুদ্ধ...। সবচেয়ে রক্ষণশীল সংকীর্ণ প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব। ফ্যাসিবাদ হল শ্রমিকশ্রেণি ও নিপীড়িত সমস্ত মানুষের পয়লা নম্বর দুশমন।''

উপরোক্ত কথাগুলি স্মরণে রেখে বর্তমান বিজেপি সরকারের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে প্রতিহত করতে হবে এই ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান।

উপরোক্ত কথা স্মরণ রেখেই কবিগুরুর ভাষায় বলা যায়—''এই মোহমুক্ত ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলি পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে, তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এর চেয়ে ভীষণ, এর চেয়ে কলুষিত আর কী হতে পারে?'' তাঁরই কথায়, ''রুদ্র এসে মোহের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দিন। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত ও দুঃখের মধ্যে মোহের ক্ষয় হতে থাকুক। আজ দয়াময়কে নয়, আজ রুদ্রকে চাই—তাঁর প্রলয় আগুনে সব দগ্ধ হয়ে যাক। তাঁর কাছেই প্রার্থনা আমাদের 'অসতমাসদ্গময়'।''

With best compliments of

OVER 30 YEARS RESPONSIBLE SERVICE

WORMS & INSECT CONTROL

Govt. Authorised Pest Controller

Specialist in :
Soil Treatment, Whiteants & Insecticidal Treatment
Rodent & Mosquito Control Fumigation Roof Treatment etc.

H.O. : 27, G.T. Road, Lower Chelidanga, Asansol-4, Dist. Burdwan
Resi. : Kalyanpur Housing Estate, Asansol-4, Dist. Burdwan. Mob. 9333109597

Sl. No. 103

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে
পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়নই
আমাদের লক্ষ্য

কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত

দেবাশিস গাঙ্গুলী
উপপ্রধান

নির্মল কাউর ভামরা
প্রধান

Sl. No. 22

উন্নয়ন : তখন এবং এখন

অভিজিৎ কোঙার

উন্নয়ন শব্দটি এখন ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার মহাযজ্ঞ চলছে। আধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে চারিদিকে উন্নয়নের জোয়ার দেখাতে কোটি কোটি টাকা ঢালা হচ্ছে। এমন একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে যেন এই সরকার রাজ্যে আসার আগে 'উন্নয়ন' শব্দটি কেবল বাংলা অভিধানে ছিল কিন্তু তার প্রয়োগ ছিল না। এই সরকার আসার পর শব্দটি অভিধান ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে। 'শ্রী', 'সাথী', 'হাব' 'স্পেশালিটি', 'সুপার স্পেশালিটি' ইত্যাদি শব্দের ঝংকার চলছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলীয় বক্তব্য অনুযায়ী ২০১১ সালের আগে আমাদের রাজ্যে উন্নয়নের কোনো কাজই হয়নি। 'উন্নয়ন' তো দূরের কথা, ৩৪ বছরে রাজ্যকে পেছিয়ে দিয়েছে সরকার—এমনটাই দাবি।

এখন কয়েকটি ক্ষেত্র ধরে ৩৪ বছরের সরকারটা সত্যিই অপদার্থ ছিল কি না সে কথার সত্যতা যাচাই করা যাক।

গণতন্ত্র

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার যখন রাজ্যে ক্ষমতায় এল তখন জেলখানা ভর্তি রাজনৈতিক বন্দি। শুধু বিরোধীরা নয়, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কংগ্রেস কর্মীদেরও অনেকে জেলে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম সিদ্ধান্ত—সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি ও বিনা বিচারে আটক প্রথা রদ। আগে আন্দোলন ছিল নিষিদ্ধ, যার অবসান হল এবং সিদ্ধান্ত হল জনজীবনের আন্দোলনে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই-এর ঘটনা ঘটল কী করে? জনস্বার্থে কোনো দাবি নয়, ২১ জুলাই-র একটাই শ্লোগান ছিল—রাইটার্স দখল (রাইটার্স অভিযান নয়)। গায়ের জোরে অস্ত্র হাতে নির্বাচিত একটা সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার দখল কি গণআন্দোলন হতে পারে? বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ফসলের দর না পাওয়া, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কর্মসংস্থান ইত্যাদি দাবিতে নবান্ন অভিযান করেছে, দখল নয়। রাজ্যে নতুন সরকার এসেই '২১শে জুলাই' নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কিন্তু পূর্বতন সরকারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়নি।

বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়মিত নির্বাচন হয়েছে এবং নির্বাচনে বিরোধীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং প্রাপ্ত আসন ও ভোটের হার গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বহু পঞ্চায়েত ও পৌরসভা জনগণের রায়েই বিরোধীদের দখলে ছিল। কিন্তু আজ প্রায় সবক্ষেত্রেই নির্বাচন বন্ধ। মরুভূমিতে মরুদ্যানের মতো নগণ্য ক্ষেত্রেও নির্বাচন যদি হয় তাহলে সেখানে সরকারি দলের বাইরে কারোর প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ।

গণতন্ত্রে দু-ধরনের অধিকার জনগণ ভোগ করে—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মূল কথা হল রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে থাকা বিভিন্ন সংস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণ যা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটে। গণতন্ত্রের সঙ্গে উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ড. অমর্ত্য সেন মনে করেন—''অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতার অভাবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা তথা উন্নয়নে বিঘ্ন ঘটে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা উন্নয়ন আমরা যাই বলি না কেন তা কঠোর রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সহানুভূতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করে।''

কিন্তু বর্তমান তৃণমূল সরকার এর বিপরীত মুখে চলেছে, যেখানে গণতন্ত্রের কোনো লক্ষণ নেই। তাহলে কি এখন উন্নয়নের কোনো কাজ হচ্ছে না? হ্যাঁ, হচ্ছে। তবে এই সরকারের সেই কাজকে আমরা বলতে পারি—চাকচিক্যময় বা জৌলুসের উন্নয়ন বা 'কসমেটিক ডেভেলপমেন্ট'।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য সম্প্রীতি, যা রক্ষায় বাম সরকার সব সময় সতর্ক ছিল। বাম রাজনীতি ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে কখনও মিশতে দেয়নি। এখন রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করার ফলে হিন্দু ও মুসলিম উভয় মৌলবাদীরা এবং তাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রশ্রয় পাচ্ছে। ৩৪ বছরে রাজনৈতিক কারণে বিরোধী দলের কর্মীকে জেলে বন্দি হতে হয়নি। কিন্তু বর্তমানে বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর মিথ্যা মামলা, নির্যাতন, জেলে বন্দিজীবন কাটানোর ঘটনা অসংখ্য ঘটছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের প্রশ্নে বাম আমলের উন্নয়ন এখন অবনমনের দিকে ধাবমান। ১৯৯৫ সালে দেশের মধ্যে মানবাধিকার কমিশন প্রথম গঠিত হয়। এখন এই রাজ্যে তা দলীয় ভারে নিষ্ক্রিয়।

ভূমিসংস্কার

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই আইনি ফাঁক পূরণ করে জমিদারদের বেনামি ও সিলিং-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন মানুষদের পাট্টা বিলিতে উদ্যোগ নেয়, উদ্যোগ নেয় বর্গাদারদের আইনি অধিকার সুনিশ্চিত করতে।

সারা দেশের মোট জমির ৩ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু দেশের মোট জমি বন্টনের ২২ শতাংশ এ রাজ্যে। ভূমিসংস্কারের ফলে রাজ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের হাতে ৮৪ শতাংশ জমি এল, যা জাতীয় স্তরে ৩৪ শতাংশ। কেবলমাত্র সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই ১৬,৭০০ একর জমির পাট্টা বিলি হয়। বাম আমলেই ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার বর্গাদার নথিভুক্ত হন। এ-সবের ফলে ২০১০-১১ সালে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শিল্পপণ্যের বাজার ছিল ২৭,০০০ কোটি টাকা। তথ্যভাণ্ডার ঘাঁটলেই দেখা যাবে এই কাজে ভারতসেরা পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা এবং কৃতিত্ব সিপিআই(এম)-এর।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসতেই রাজ্য জুড়ে পাট্টাদার,

বর্গাদার উচ্ছেদ শুরু হয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে বাম আমলে এই পাট্টাদান বা বর্গা রেকর্ড হল 'জমিচুরি'। তাই জমিচোরদের হাত থেকে তিনি জমি কেড়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা

১৯৫৬ এবং ১৯৬৩—দুবার পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন প্রণীত হয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি। ১৯৭৩ সালে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের আইন হল কিন্তু কার্যকর হয়নি। ১৮বছর পর ১৯৭৮ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গোটা দেশকে পথ দেখিয়েছে বামফ্রন্ট সরকারই।

ভূমিসংস্কার গ্রামীণ মানুষকে দিয়েছিল আর্থিক ক্ষমতা, আর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা দিল রাজনৈতিক ক্ষমতা। ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার প্রদানের কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকারের, যা পরে গোটা দেশে চালু হয়েছে। বাধা পেরিয়ে সারা দেশের মধ্যে প্রথম ১৯৯৩ সালে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও মহিলাদের আসন সংরক্ষণ হয় এবং ১৯৯৮ সালে পদগুলিও সংরক্ষিত হয়। মহিলাদের সংরক্ষণ বেড়ে ৫০ শতাংশ হয়, যা দেশে এখনও চালু হয়নি। রাজ্য বাজেটের ৩৫ শতাংশ খরচ হত পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, যা গ্রামবাংলার চিত্র পালটে দিয়েছিল। বহুবিধ কাজের ফলে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর্মসংস্থান হল প্রচুর। ১৯৯২ সালে 'গ্রাম সংসদ' তৈরি হয়, সেখানে গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে পরিকল্পনা রচনা করেন। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বছরে দুবার নাগরিকদের কাছে হিসাব দেওয়া দেশে প্রথম। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতব্যবস্থার নেতৃত্বে উঠে এসেছিল দুর্বলতর মানুষের প্রতিনিধিরা, যা একটা নজির। পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সূচনা করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে অনেক টালবাহানার পর হওয়া ২০১৩ সালের নির্বাচনে বহু স্থানে বিরোধীদের প্রার্থী হতে না দেওয়া, ভোটের দিন সন্ত্রাস, গণনায় লুঠ দেখল জনগণ। এখন তো গোটা রাজ্য জুড়ে বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের হুমকি ও প্রলোভনের মাধ্যমে কিনে পঞ্চায়েত দখলের মহাযজ্ঞ চলছে, যা অভাবনীয়।

পৌর ব্যবস্থা

কংগ্রেস আমলে পৌরসভা থাকলেও তার আর্থিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না, যা এসেছে বাম আমলে। অনেক নতুন পৌরসভা হয়েছে, বেড়েছে সুযোগসুবিধা, জন্ম দিয়েছে নতুন চাহিদার। ৩৪ বছরে বামপন্থীরা জিতেছে বা কংগ্রেস হেরেছে, কিন্তু নির্বাচন বন্ধ হয় নি বা প্রশাসক বসেনি। ১৯৭২ সালে সব নির্বাচিত পৌরবোর্ড ভেঙে প্রশাসক বসানো হয়েছিল। আর তৃণমূল সরকারে এসে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট না করে মেয়াদ উত্তীর্ণ বোর্ড ভেঙে দীর্ঘ ৯ মাস প্রশাসক বসিয়ে দখলদারি চালায়। শেষ পর্যন্ত কোর্টের নির্দেশে নির্বাচন হলেও গণতন্ত্র লুঠ হল। এখন ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে পঞ্চায়েত ও পুরসভা দখলের পালা চলছে, যাতে একটিতেও কোনো বিরোধীদের অস্তিত্ব না থাকে।

১৮ বছরে ভোটাধিকার, আসন সংরক্ষণ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন বাম রাজত্বেই প্রথম হয়েছে। দেশের মধ্যে বাম আমলেই প্রথম ওয়ার্ড কমিটি ও বেনিফিসিয়ারি কমিটি গঠন, বছরে দু-বার নাগরিক সভা ডেকে পরিকল্পনা তৈরি ও হিসাব পেশ, যার মধ্যে স্বচ্ছতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। বর্তমানে এসব বন্ধ, কেবলমাত্র সাইনবোর্ডে 'স্বচ্ছতা' শব্দটি ঢুকেছে।

কৃষি

কংগ্রেস আমলে ঘাটতি রাজ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ। তাই খাদ্যের দাবিতে গ্রাম থেকে কলকাতা গিয়ে পুলিশের লাঠির আঘাতে ৮০ জনের মৃত্যু হয়। কংগ্রেস আমলে খাদ্য আন্দোলন হতো। অন্যদিকে, বাম আমলে গরিবরা বিদ্যুতের দাবিতে সোচ্চার হতো—তফাৎটা এখানেই।

রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-১১ সালে বেড়ে হয় ১৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। অ্যাসোচেম ২০১০ সালের রিপোর্টে বলছে—দেশে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের ৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গের, যেখানে জমির পরিমাণ মাত্র ৩ শতাংশ। বিশ্বায়নের দৌলতে দেশজুড়ে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে ছিল। বাম আমলেই দেশের মধ্যে চাল ও সবজি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম, আলু উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। দেশের উৎপাদিত আলুর ৩৫ শতাংশ এ রাজ্যের। আনারস লিচু ও আম উৎপাদনে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় এবং অষ্টম স্থানে ছিল।

কংগ্রেস আমলে সমবায় ছিল গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের স্বার্থবাহী। বাম আমলে তা একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। বাম আমলেই প্রথম বিভিন্ন স্তরের সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিরা নানা উপকরণে সহযোগিতা পেতে শুরু করল। ১৯৯৮-৯৯ সালে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণদান ব্যবস্থা চালু হয়। ২০০০-০১ মরশুম থেকে রাজ্যে চালু হয়েছে রাষ্ট্রীয় কৃষিবিমা যোজনা। আর বর্তমানে? অধিকাংশ সমবায় ও সমবায় ব্যাঙ্ক ধুঁকছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা বন্ধ করে প্রশাসক নিয়োগ বা গায়ের জোরে দখল নিয়ে তৃণমূলীরা সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করছে।

চাষিদের ফসলের ন্যায্য দামের ব্যাপারে বাম সরকার ছিল সদা সতর্ক। মজুতদার প্রতিরোধে এবং মিড-ডে-মিল, রেশনের জন্য রাজ্য সরকার নিয়মিত সরকারি দরে সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে পঞ্চায়েত ও সমবায় মাধ্যমে ধান কিনত। এখন তা আর হয় না।

১৯৭৭ সালে সেচের ব্যবস্থা ছিল ৩২ শতাংশ জমিতে, ২০১১ সালে তা বেড়ে হয় ৭৩ শতাংশ। ১৯৫২ সালে পরিকল্পিত দামোদর, ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী প্রকল্পের সেচ ক্ষমতা অনেক বেড়েছে বাম আমলে। তিস্তা, মহানন্দা ইত্যাদি নদে ব্যারেজ তৈরি হয়েছে।

কংগ্রেস আমলে সমবায় ছিল গ্রামের বর্ধিষ্ণু পরিবারের স্বার্থবাহী। বাম আমলে তা একটি আন্দোলনে পরিণত হয়। বাম আমলেই প্রথম বিভিন্ন স্তরের সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক চাষিরা নানা উপকরণে সহযোগিতা পেতে শুরু করল। ১৯৯৮-৯৯ সালে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণদান ব্যবস্থা চালু হয়। ২০০০-০১ মরশুম থেকে রাজ্যে চালু হয়েছে রাষ্ট্রীয় কৃষিবিমা যোজনা। আর বর্তমানে? অধিকাংশ সমবায় ও সমবায় ব্যাঙ্ক ধুঁকছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালনা বন্ধ করে প্রশাসক নিয়োগ বা গায়ের জোরে দখল নিয়ে তৃণমূলীরা সঞ্চিত সম্পদ লুঠ করছে।

তিস্তা প্রকল্পের ১১০০ কোটি টাকার ৭৬ শতাংশ রাজ্যের। মহানন্দা ব্যারেজের জলাধার থেকে শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। ১,১৪,২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সম্বলিত সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্পের কাজ বাম আমলে শুরু হলেও বর্তমান সরকারের আমলে কাজ আর এগোয়নি। পুরুলিয়া জেলায় ৩৩টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচ প্রকল্প চালু হয়েছে। সেচের জন্য বাম আমলে বিপুল সংখ্যায় সাবমার্সিবল, গভীর নলকূপ, আরএলআই হয়েছে এবং একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ জারি ছিল।

মৎস্যচাষ

রাজ্যে মাছের উৎপাদন ১৯৭৭ সালে ছিল ২ লক্ষ ৩৪ হাজার মেট্রিক টন যা ২০১০ সালে ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে যায়। অন্তর্দেশীয় উৎপাদিত মৎস্যের ৩০ শতাংশ এবং দেশের মোট চাহিদার ৬২ শতাংশ মৎস্যবীজ পশ্চিমবঙ্গের। বাম সরকার শেষ ১৮ বছর একটানা জাতীয় উৎপাদনশীলতার পুরস্কার লাভ করেছে। মৎস্য চাষ নিয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে ১৯৯৫ সালে, যা আজ খ্যাতির শীর্ষে। মাত্র ১৪৮ কিমি দীর্ঘ সমুদ্রতট নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য রপ্তানিতে পশ্চিমবঙ্গ চতুর্থ ছিল। বাম আমলে মোট ৭টি মৎস্য বন্দর ও ১৩টি মৎস্য অবতরণ ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। অসংখ্য বিভিন্ন স্তরের মৎস্যজীবী সমিতির শীর্ষ সংস্থা 'বেনফিশ', যার মূলধন জন্মলগ্ন ১৯৭৮ সালে ছিল ২ লক্ষ টাকা, ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০০ কোটি টাকা। বিপুল কর্মসংস্থানের ভাণ্ডার এই ক্ষেত্র। মৎস্যজীবীদের নানা ধরনের সামাজিক সহায়তা প্রকল্প আছে।

সামাজিক বনসৃজন

এই প্রকল্পের সূচনা ১৯৮১ সালে। রাস্তা বা নদীর ধার, সরকারি জমিতে গাছ লাগানোর সঙ্গে ব্যক্তিগত জমিতে গাছ লাগাতেও এই প্রকল্প উদ্বুদ্ধ করত। গাছ রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম অনুসৃত 'জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট' আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়। এই ব্যাপারে বনাঞ্চলে ব্যাপক সংখ্যায় গ্রুপ তৈরি হয়, যা তাদের অর্থনৈতিক মান বাড়ায়। এই সাফল্যের নিরিখে ১৯৯২ সালে রাজ্য সরকার বনসংরক্ষণে নোবেল পুরস্কার বলে খ্যাত 'পল গেটি' পুরস্কার পায়।

বিপরীতে বর্তমান সরকার আসায় রাজ্যজুড়ে বৃক্ষ নিধনের যজ্ঞ চলছে। চারদিকে সরকারি নিয়ম না মেনে চোরাই পথে গাছ কেটে লোপাট হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য খুন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র খুন, বর্ধমান রাজ কলেজে শিক্ষাকর্মী খুন, দুর্গাপুরে স্কুলে পাঠদানের সময় চেয়ারে বেঁধে প্রধান শিক্ষককে পুড়িয়ে হত্যা ইত্যাদি ঘটনাবলি কংগ্রেস আমলের শিক্ষা পরিস্থিতির জানান দেয়। গণটোকাটুকির মাত্রা এমনই ছিল যে কংগ্রেস আমলের শেষ পর্বে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় চাকরির বিজ্ঞাপনে বলতে হয়েছে—'The graduates of Calcutta University need not apply.' অর্থাৎ ১৯৭১-এর পর যারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন তাঁরা দরখাস্ত করবেন না।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে বাম সরকারে এসে শিক্ষায় সুস্থ পরিবেশ ফেরানোর লক্ষ্যে সমস্ত স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার পরিচালনায় সর্ব অংশের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ায় জোর দিলেন। উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, প্রাথমিক স্কুলের গরিব বাড়ির ছাত্রছাত্রীদের বিনা মূল্যে পোশাক, গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক স্কুল, বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ি নির্মাণ বাম সরকারের অবদান। নিরক্ষর গরিব পরিবারের প্রথম প্রজন্ম স্কুলে এল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৭৭ সালে ছিল ২ লক্ষ, যা ২০১১ সালে হল ১০ লক্ষেরও বেশি। অনেক ভারতীয় ভাষায় মাধ্যমিক পরীক্ষার সুযোগ হল।

১৯৯৫ সালে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমকে মাধ্যমিকের সমতুল করা হল। পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে স্বশাসিত মাদ্রাসা বোর্ড তৈরি হল। হাইমাদ্রাসা ও আলিম উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় মেধা পরীক্ষায় বসার অধিকার পেল। উচ্চশিক্ষায় সংখ্যালঘু ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে বাম সরকার। মাদ্রাসা সহ সব ধরনের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন, পেনশনের দায়িত্ব নিল বাম সরকার। এই সরকারের আমলে ২০০-র বেশি নতুন কলেজ, ১৪টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, একটি ডিম্ড্ ইউনিভার্সিটি, অসংখ্য প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-মাদ্রাসা স্কুল অনুমোদিত হয়। এই ক্ষেত্রে নিয়োগে ধারাবাহিকতা ছিল।

বাম সরকারের শিক্ষানীতির সাফল্য—সাক্ষরতার হার ৩৮.৮৬ শতাশ থেকে বেড়ে ৭৭ শতাংশ হয়। সাক্ষরতার সাফল্যে সরকার ১৯৯১ সালে ইউনেস্কোর বিখ্যাত 'নোমা' পুরস্কার পায়। কিন্তু রাজ্যে তৃণমূল সরকার আসায় আবার আঁধার নেমেছে। সব প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন বন্ধ, পরীক্ষায় টোকাটুকি, মারপিট, শিক্ষক নিগ্রহ চলছে। স্বাভাবিক নিয়োগ বন্ধ। বাম আমলের মতো মেধা নয়, অর্থের বিনিময়ে এখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি চলছে। পশ্চিমবঙ্গে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন স্থাপন বর্তমান সরকারের বাধায় বন্ধ।

স্বাস্থ্য

নয়া উদারনীতির মূল লক্ষ্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে খোলা বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু প্রবল চাপ সত্ত্বেও বাম সরকার এই ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা নস্যাৎ করেনি। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ১৯৭৭ সালে ছিল ১৩২৬, যা ২০১০ সালে বেড়ে হল ১২০০০-এর বেশি।

রাজ্যের ৭৩ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালে আসতেন, যেখানে দেশের গড় ৪০ শতাংশ। জাতীয় ক্ষেত্রে গড় আয়ু পুরুষ ৬৫.৮ ও মহিলা ৬৮.১.৯ বছর হলেও রাজ্যে তা পুরুষদের ক্ষেত্রে ৬৮.২৫ বছর এবং মহিলাদের ৭০.৯ বছর। জন্মহার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ২২.৮, যা এ রাজ্যে ১৭.৫ ছিল। অন্যদিকে মৃত্যুহার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ৭.৪, যা এ রাজ্যে ৬.২ এবং সব রাজ্যের মধ্যে প্রথম। শিশুমৃত্যুর হার জাতীয় স্তরে প্রতি হাজারে ৫৩ জন, যা রাজ্যে ৩৫ জন। রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বেড়ে পৌঁছেছিল ৬৯.৫ শতাংশে এবং শিশুদের টীকাকরণের হার বেড়ে ৭৫.৮ শতাংশ হয়েছিল।

তৃণমূল সরকার এসে এই মূল ভিত্তিকে লঘু করে, প্রচারের চমকে 'সুপার স্পেশালিটি' হাসপাতালের বাজনা বাজাচ্ছে। মূল ভিত্তিকে লঘু করার ফলে প্রায়শই রাজ্যে ব্যাপক হারে শিশুমৃত্যু ঘটছে, ডেঙ্গু সহ নানা মারণ রোগের দাপট বাড়ছে। সরকারের খামখেয়ালিপনা ও হুমকিতে বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত ৪১টি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের প্রচার হলেও সব তৈরি হয়নি। যেগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি নীল-সাদা রঙে খাড়া আছে। এখনও পর্যন্ত এগুলির জন্য সরকারি নিয়োগ শূন্য। চতুর্থশ্রেণি ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ হবে ঠিকাদার মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক ন্যূনতম মজুরিতে। আধিকারিক ও

ডাক্তার নিয়োগ করবে সরকার চুক্তির ভিত্তিতে। এই হল সুপারস্পেশালিটির নমুনা।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশ হয়েছিল উচ্চমাত্রায়। আমাদের রাজ্যে ২০০৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ ৮০ হাজার, যা ২০১১ সালে বেড়ে হয় ১৫ লক্ষ। এর সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি, যার মধ্যে ৯০ শতাংশ মহিলা। এদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০০০ কোটি টাকা। সপ্তম বাম সরকার গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাঙ্ক ঋণের ১১ শতাংশ সুদের মধ্যে ৭ শতাংশ ভর্তুকি দিত, যা অভাবনীয়। সরকার চাষির কাছ থেকে সরকারি ধার্য মূল্যে ধান কেনার এজেন্ট হিসেবে গোষ্ঠীগুলিকে যুক্ত করে, যা দেশের মধ্যে নজির। সরকার দেশের মধ্যে প্রথম 'স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি প্রকল্প' বিষয়ে একটি পৃথক দপ্তর চালু করে। এই কাজে দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্য উঠে আসে শীর্ষে।

বর্তমান রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় বড় সংখ্যক গ্রুপ এখন মৃত। বহু ক্ষেত্রে তৃণমূলী খবরদারিতে টাকা বেপথে চলে যাচ্ছে। গোষ্ঠীগুলির জন্য ব্যাঙ্কঋণের সুপারিশ কমেছে।

শিল্প

এক সময় লাইসেন্স প্রথা ও মাসুল সমীকরণ নীতি রাজ্যে বড় শিল্প স্থাপনে অন্তরায় ছিল। এই পটভূমিতে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এল। ওই দুটি বাধার প্রতিবাদে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে আপাতত রাজ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রসারে জোর দিল। এক সময় ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ও কর্মসংস্থানের বিচারে রাজ্য শীর্ষে উঠেছিল। এর মাঝেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের সাফল্য হিসেবে রাজ্য সরকার হলদিয়া পেট্রোকেম, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সল্টলেক ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স স্থাপন করে, যা রাজ্যের সমৃদ্ধি আনে। সপ্তম বাম সরকারের আমলে রাজ্যে ২৮ লক্ষ ক্ষুদ্রশিল্প ইউনিটে ৫৫ লক্ষ মানুষ কাজ করত। কিন্তু বড় শিল্প না এলে ছোটো শিল্প টিকতে পারে না। ইতিমধ্যে উদারনীতির ফলে দুটি বাধাই অপসারিত হয়ে যায়। তখন রাজ্যের উন্নতি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে বড় শিল্পস্থাপনের লক্ষে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ রাজ্য সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে।

১৯৯১-২০০৮ শিল্প বিনিয়োগে রাজ্য সারা দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে উঠে আসে। রাজ্যে বিনিয়োগ ২০০৫ সালে ২৫১৫.৫৮ কোটি টাকা থেকে ২০১০ সালে বেড়ে ১৫,০৫২.২৩ কোটি টাকায় পৌঁছায়। বাধা আসে অন্ডাল বিমানবন্দর ও কাটোয়া তাপবিদ্যুৎ কারখানা তৈরিতে।

শিল্পের প্রয়োজনে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাম সরকার বিশেষ নজর দেয়। ১৯৭৭ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১৬১৫ মেগাওয়াট, যা ২০০১ সালে হয় ১১,৩০০ মেগাওয়াট। প্রান্তিক বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সুবিধার্থে বাম সরকার ২০১০ সালে ১২০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়েছিল। আর তৃণমূল সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভেঙে ইতিমধ্যে ১৫ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে ও দামে দেশের মধ্যে শীর্ষে পৌঁছেছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দেশেবিদেশে বিপুল ব্যায়ে শিল্প সম্মেলন করছেন, কিন্তু শিল্প কোথায়?

সামাজিক সুরক্ষা

বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষার কর্মসূচি নেয় যা বিগত কংগ্রেস আমলে ছিল না। তবে বর্তমান সরকারের মতো প্রচারের ঢাক পেটানো ছিল না। বার্ধক্যভাতা (১৯৭৯), প্রতিবন্ধী ভাতা (১৯৮০), আদিবাসী বার্ধক্যভাতা, কৃষক ভাতা, বিধবাভাতা, ভূমিহীন কৃষকদের জন্য প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্প (১৯৯৮), বন্ধ কারখানা ও চা শ্রমিকদের মাসিক ভাতা প্রকল্প (১৯৯৮), দেশের মধ্যে প্রথম অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্প ইত্যাদি বাম আমলেই চালু হয়।

প্রভিডেন্ড ফান্ড প্রকল্পে ২ বছর ধরে যুক্ত শ্রমিকদের জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রকল্প, পরিবহন ও নির্মাণ কর্মীদের জন্য এক গুচ্ছ প্রকল্প রাজ্য সরকারই চালু করেছিল। কেন্দ্রের অনুসরণে নেওয়া হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প। কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে শ্রমিকদের দেয় অর্থ রাজ্য সরকার দিয়ে দিত।

বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম ২ কোটি ৬৪ লক্ষ গরিব মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দিত। শহর ও গ্রামের গরিবদের জন্য বাড়ি নির্মাণ প্রকল্প চালু হয়েছিল। রাজ্যে প্রথম বাম আমলেই (২০১০ সাল) জঙ্গল মহলের ৪৭১৬ জন গরিব তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রীদের (নবম থেকে দ্বাদশ) সাইকেল দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার তার সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছে। তবে অর্থের অপচয় ও দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠেছে।

গরিব সংখ্যালঘুদের ওবিসি-র অন্তর্ভুক্ত করে সংরক্ষণের আওতায় আনার কাজ দেশের মধ্যে প্রথম করে বাম সরকার। ওবিসি-দের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ এসব আক্রান্ত।

সংস্কৃতি

কংগ্রেস আমলে পুলিশ বিভাগ থেকে নাটকের স্ক্রিপ্ট অনুমোদনের প্রথা বামফ্রন্ট সরকার বাতিল করে নজর দিল সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায়। প্রাক্‌বাম যুগে লোকরঞ্জন শাখা, রবীন্দ্র সদন, মহাজাতি সদন ও কয়েকটি জেলায় রবীন্দ্রভবন ছাড়া কিছু ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি (১৯৮২), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১৯৮৭), রাজ্য চারুকলা পর্ষদ (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি পর্ষদ (১৯৭৯), লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (১৯৯৪) চালু করে। পৃথকভাবে চালু হয় হিন্দি, উর্দু ও সাঁওতালি আকাদেমি।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল সরকার ১৯৮৫ সালে অধিগ্রহণ করে। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চ, কলকাতার গিরিশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, শিশির মঞ্চ, অহীন্দ্র মঞ্চ বাম সরকারের তৈরি। দুঃস্থ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়াতে সরকার ১৯৮০ সালে একটি তহবিল গঠন করে। রাজ্য সরকারের প্রযোজনায় অনেকগুলি ভালো চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। ১৯৮৩ সালে সরকার টেকনিসিয়ান্স স্টুডিও অধিগ্রহণ করে যা আজও বেঁচে আছে। রঙিন চলচ্চিত্র সৃজনাগার 'রূপায়ণ' দৃশ্যশ্রাব্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রশিক্ষণের জন্য 'রূপকলা কেন্দ্র', চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্র হিসেবে 'নন্দন' বাম সরকারের তৈরি। ১৯৯৫ সাল থেকে আয়োজিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পশ্চিমবঙ্গের অহংকার। এছাড়া পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে অনেক হল বা মঞ্চ তৈরি হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে এইজাতীয় সৃজনশীল কাজ দেখা যাচ্ছে না।

উল্লিখিত সমস্ত আকাদেমি বা চর্চাকেন্দ্র স্বাধীনভাবে পরিচালিত হত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কঠিত কমিটি বা পর্ষদের মতামতের ভিত্তিতে। সরকারের কাজ ছিল শুধু ব্যবস্থাপনা ও অর্থজোগান।

আজকের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু নিজেই সব বিষয়ে জ্ঞানী তাই যুক্ত জ্ঞানীগুণীর অনেকেই নীরবে সরে গেছেন, পরিবর্তে এসেছে জৌলুষময় অনুগত তারকামণ্ডলী।

রবীন্দ্র, বঙ্কিম, নজরুল পুরস্কার বাম আমলেই চালু। মেলা বা উৎসব বাম আমলেও ছিল, যেমন লিটল ম্যাগাজিন মেলা, কথাসাহিত্য উৎসব, কবিতা উৎসব, শিশুসাহিত্য উৎসব, বইবাজার, নাট্যমেলা, শিশুনাট্য উৎসব, পথনাটক উৎসব, বহিরঙ্গ নাট্য উৎসব, চারুকলা উৎসব, লালন উৎসব, রণনৃত্য উৎসব, কবিয়াল মেলা, আন্তরাজ্য লোকসংস্কৃতি উৎসব, সঙ্গীত মেলা, তিস্তাগঙ্গা উৎসব ইত্যাদি। কিন্তু সেখানে বে-আব্রু, অশ্লীল নৃত্যের সঙ্গে মঞ্চে টাকা উড়ত না।

সততা

২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে জিতে এসেই 'বাম সরকারের ৩৪ বছরের দুর্নীতি ধরে সব মন্ত্রীকে জেলে ঢোকাবেন' বলে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখলেন বাম সরকারের কেউ নয়, জেলে ঢুকলেন তৃণমূলের মন্ত্রী ও সাংসদরা। সারদা, নারদা, চিটফান্ড, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট ইত্যাদি কত অলংকার উঠে এল। বিগত সরকারের চোর ধরতে তৈরি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আজ বাক্সবন্দি। শোনা যাচ্ছে যে তারা বাম সরকারের কোনো দুর্নীতি না পাওয়া রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। রাজ্যে 'সততার প্রতীক'-এর হোর্ডিং এখন বেপাত্তা। কেন্দ্রীয় সরকারকে ম্যানেজ করে সব চাপা দিতে পারলেও 'ডেলোর বৈঠক', 'জঙ্গলমহলে সারদার টাকায় কেনা অ্যাম্বুলেন্স উদ্বোধন', 'রাতারাতি অ্যাম্বুলেন্সগুলি উধাও' জাতীয় ঘটনাগুলিকে মানুষের মন থেকে কি ম্যানেজ করা যাবে?

১৯৮৪-র লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজের নামের আগে 'ডক্টরেট' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে তিনি আমেরিকার ইস্ট জর্জিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে 'ডক্টরেট' করেছেন। জয়ের পর ১৯৮৫-র মার্চ মাসে আমেরিকা জানায় ওই নামে তাদের দেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ধরা পড়ে জালিয়াতি। গুণ্ডা কন্ট্রোল করা মুখমন্ত্রীর গুণ্ডারা এখন পাড়া পর্যন্ত দুর্নীতিকে পৌঁছে দিয়েছেন।

পূর্বতন কংগ্রেস আমলে নিয়োগ ছিল, তবে তা ছিল দলীয় ও নীতিবিরুদ্ধ। বামফ্রন্ট সরকার সুনির্দিষ্ট নিয়ম ঘোষণার মাধ্যমে নিয়োগ শুরু করে। প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল, স্কুল সার্ভিস কমিশন, কলেজ সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি স্বশাসিত সংস্থার মাধ্যমে নিয়মিত নিয়োগ হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পঞ্চায়েত, সমবায়, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পেনশন, পারিবারিক পেনশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দায়িত্ব নিয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার।

আর এখন? সমস্ত ক্ষেত্রে নিয়োগ কার্যত বন্ধ। রাজ্য সরকার খুব পরিকল্পিতভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে যাতে কোর্টে কেস হয়ে নিয়োগ বন্ধ হয়। তাতে অনেক টাকা সাশ্রয় হচ্ছে, যে টাকায় চুক্তির ভিত্তিতে কম মজুরিতে দলীয় কর্মী নিয়োগ, বেলেল্লাপনার উৎসব, নানা চমকপ্রদান কর্মসূচি নেওয়া যাবে। পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীদের অর্থ উপার্জনও হবে।

আলোচনা আর না বাড়িয়ে এখন পর্যন্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে ৩৪ বছরের লক্ষ্য ছিল 'আমরা চলি সমুখপানে'। আর বর্তমান সরকারের লক্ষ্য—'নিজের পৌষমাস, রাজ্যের সর্বনাশ।'

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে
সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত

রায়না-১ পঞ্চায়েত সমিতি। শ্যামসুন্দর, বর্ধমান

মমতা মলিক
উপপ্রধান

অসীম নায়েক
প্রধান

Sl. No. 43

With Best Compliments of

KHANDRA COLLIERY EMPLOYEES CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Reg. No. 477 Dt. 10-04-79

Vill. & P.O. Khandra
P.S. Andal, Dist. Burdwan

Sl. No. 116

শরত

অংশুমান কর

দেবদারু পাতার তলদেশ,
খড়ের ছাউনির ওপর শুয়ে থাকা লাউ
লম্বা পরিখার শেষ প্রান্তের বাঁক,
মাঠের ভেতর হঠাৎ জেগে ওঠা নদীর সামনে
শিশুদের গড়ে তোলা বাঁধ,
জঙ্গলের উদাসীন চোখ,
তোমার থমথমে মুখ—
বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর
সব—সব
দস্যুর মতো লুঠ করে নিচ্ছে সোনা রঙের রোদ...

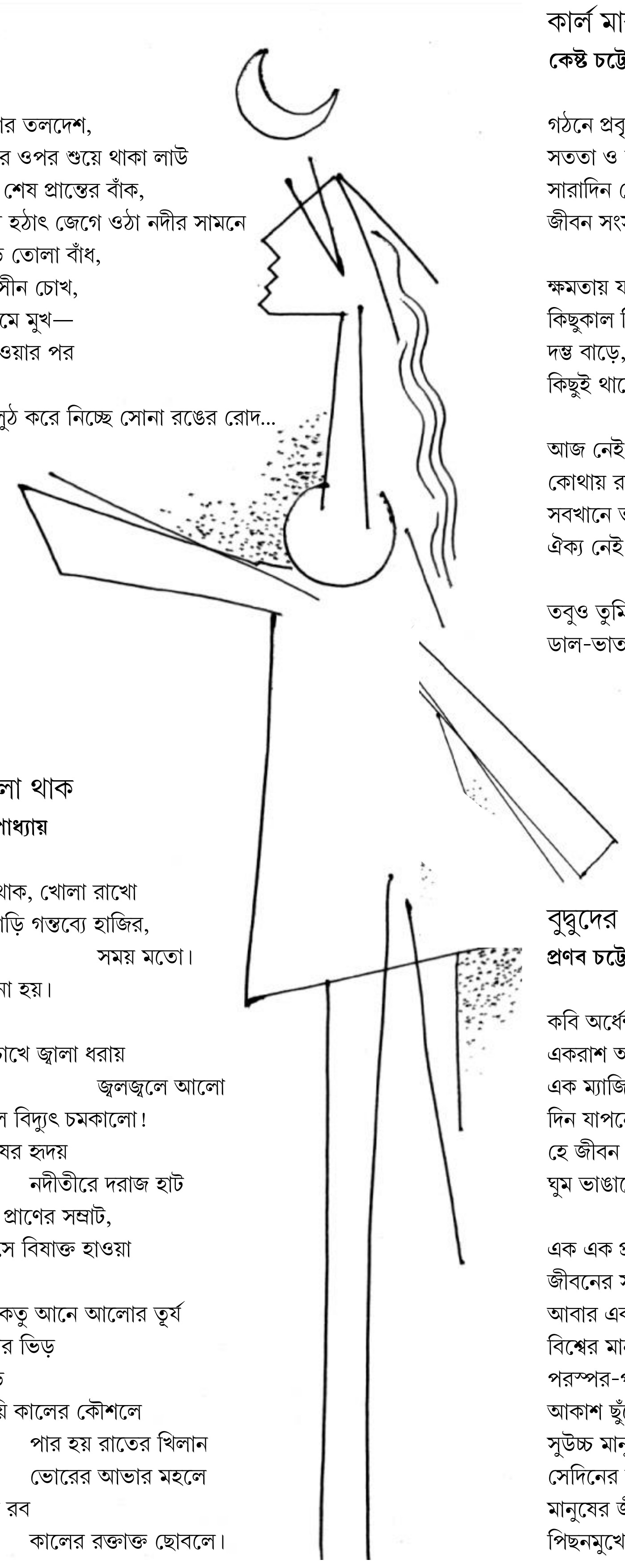

আহা, খোলা থাক

অনাথ মুখোপাধ্যায়

রাস্তা খোলা থাক, খোলা রাখো
যেন কথার গাড়ি গন্তব্যে হাজির,
সময় মতো।
এলোমেলো না হয়।

বেইমানের চোখে জ্বালা ধরায়
জ্বলজ্বলে আলো
মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকালো!
পরিপূর্ণ মানুষের হৃদয়
নদীতীরে দরাজ হাট
খোলা হাওয়া প্রাণের সম্রাট,
সস্তায় নিঃশ্বাসে বিষাক্ত হাওয়া

ধমনীতে ধূমকেতু আনে আলোর তূর্য
জমলো যন্ত্রণার ভিড়
মনে ধরে চিড়
মুখ চাওয়াচায়ি কালের কৌশলে
পার হয় রাতের খিলান
ভোরের আভার মহলে
পাখিসব করে রব
কালের রক্তাক্ত ছোবলে।

কার্ল মার্কস

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

গঠনে প্রবৃত্ত থাকি সূচনায় যথাযথ ঠিক
সততা ও নিষ্ঠা থাকে চারিদিকে প্রখর নজর
সারাদিন লেগে থাকি পাশে থাকি ছায়ার মতন
জীবন সংসার তুচ্ছ আমাদের বিশ্বময় ঘর।

ক্ষমতায় যখন আসি পাই ধীরে সব রাজ্যপাট
কিছুকাল ঠিক চলে তারপর আসে ধীরে ভাটা।
দম্ভ বাড়ে, গোষ্ঠী বাড়ে, ভোগে লিপ্ত, দ্বন্দ্বে ভাঙে পথ
কিছুই থাকে-না আর, ফুল নয় শুধু থাকে কাঁটা।

আজ নেই ঐক্য কিছু বিশ্বময় ভাঙা, ধ্বংস সব
কোথায় রাশিয়া চিন কোথা সেই দৃঢ় ভিয়েৎনাম
সবখানে ভাঙাচোরা সবখানে যন্ত্রণার মুখ
ঐক্য নেই, ছিন্ন সব, চারিদিকে রটে বদনাম।

তবুও তুমিই আছ দ্বার খোলা গরিবের ঘরে
ডাল-ভাত যত্নে দেব খেও তুমি প্রসন্ন অন্তরে।

বুদ্বুদের জীবন বিষয়ক

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কবি অর্ধেন্দু বুদ্বুদের জীবন দেখেছেন
একরাশ অনিশ্চয়তা; জীবন ও সমাপন...
এক ম্যাজিক-অস্তিত্ব; প্রাত্যহিকের—
দিন যাপনের জীবনকে স্থায়ী করে দাও
হে জীবন! ভোরের বিহঙ্গ কূজনে!
ঘুম ভাঙানোর বার্তা ছড়াও

এক এক প্রশ্নের জবাব খুঁজতেই
জীবনের সমাপ্তি ঘোষণা
আবার এক শতবর্ণ জন্মকথা;
বিশ্বের মানুষের সকল সময়ের পরিশ্রান্ত সমারোহ
পরস্পর-পরস্পরের হাতে হাত রেখে
আকাশ ছুঁয়ে থাকে; আকাশলগ্ন
সুউচ্চ মানুষটাকে দেখতেই পায় না মরণ
সেদিনের মতো মরণের কোটা-পূরণ হয় না...
মানুষের জীবন-সুষমায় অনাসৃষ্টি
পিছনমুখো হাঁটে!!

হত্যাকারীর ইশ্বর

জিয়াদ আলী

ধর্মীয় পুরাণ বলছে কবরে গেলে ঈশ্বরের বাণীবাহক
এসে প্রশ্ন করবেন কী তোমার ধর্ম, তোমার প্রভু কে,
কে তোমার নবী।
মনের মতো উত্তর দিতে না পারলে আজীবন নরকবাস।
শুদ্ধ ধর্মাচারী নয় বলে জ্যান্ত মানুষকে যারা হত্যা করে
তাদের ঈশ্বর কে, ধর্ম কী?
তারা কোন্ স্বর্গ বা বেহেশতের ঠিকেদার?

ধর্ম ও ঈশ্বর ছাড়া মানুষ কি বাঁচিতে পারে না!

বড়ো একা

কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায়

বড়ো একা—
এই পৃথিবীতে মানুষ
চেনে না নিজেকে—
কাটায় জীবন বিপাকে
নেই কোনো হুঁশ,
ক্লান্ত এক বিপন্ন নায়ক
দিকে দিকে ছোঁড়ে সায়ক
পথভ্রষ্ট হয় শেষমেশ
তার নেই কোনো সুস্থ চিন্তাশীল স্তাবক,
এ একা, বড়ো একা,
—বেপথু, বেহুঁশ!

শপথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

হৃদয়নীলে, নীল অতলে, আনন্দগান
বুকের তলায় শাশ্বত সুর, পথের ভাষা
অঙ্গীকারে আকাশলীনা, মিলেছে প্রাণ
বাইরে ঘরে, এ অন্তরে, যাওয়া আসা

প্রাণের শিকড়, এই চরাচর, সার্থকতায়
রক্তে চিঠি, আমন্ত্রণের বসন্তদিন—
তন্ময়তায় তোমার আসন, দীপ জ্বলে যায়
এই প্রভাতে, চিত্ত মাতে, বেজেছে বীণ

বীণার তারে, বারে বারে, আত্মীয়তা
প্রার্থনাতে পলাশ শিমূল, দুঃখ ও সুখ
সমর্পণে, শুভক্ষণে, তোমার কথা
চোখের তারায়, স্বপ্ন হারায়, দেখেছি মুখ।

দোলনা

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

আমাকে দোলাতে থাকে স্বপ্নের দোলনা
দোলায় দুলতে থাকে ঘরবাড়ি বাগান
চেয়ার টেবিল বইপত্র কলম আয়না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে আমার স্ত্রী পুত্র সমগ্র পরিবার

দুলছে আকাশ দুলছে মাটি জন্ম মৃত্যু সঙ্গম
চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলছে আনন্দ স্ফূর্তি উল্লাস।

বাতাস একটু স্তব্ধ হও
পৃথিবী তুমি ঘূর্ণন থামাও
শীত বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ তোমার ঝুমঝুমি বাজাও
আমি দুলছি আমি দুলব
দুলতে দুলতে ফুলের দোলনায়
আগুনের উপর আগুন হয়ে ঝাঁপ দেব

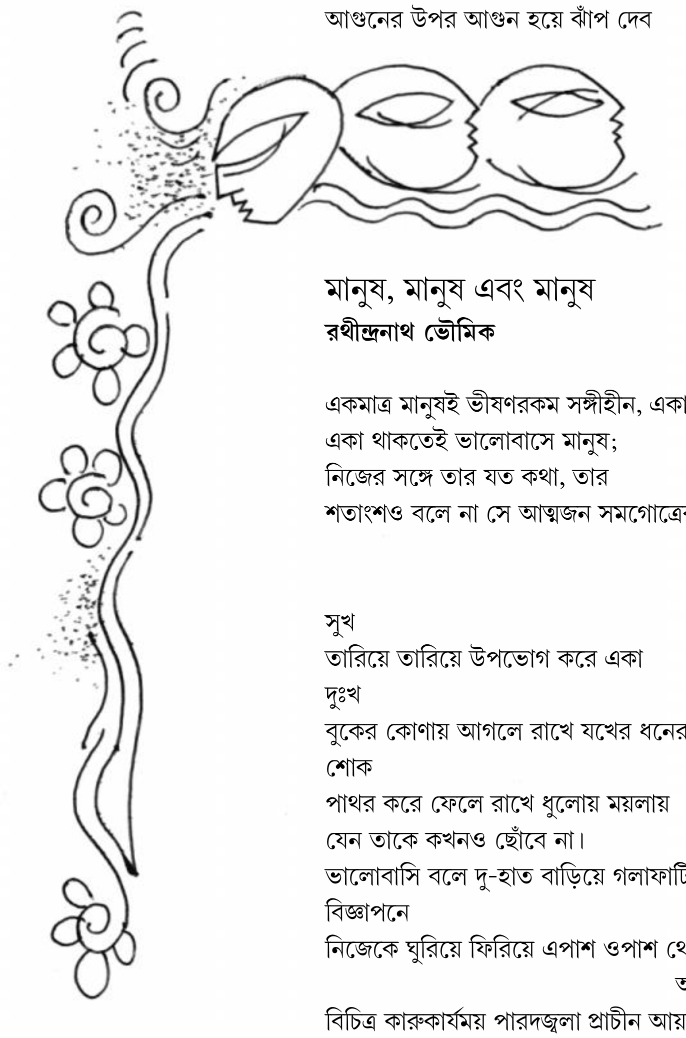

মানুষ, মানুষ এবং মানুষ

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

একমাত্র মানুষই ভীষণরকম সঙ্গীহীন, একা।
একা থাকতেই ভালোবাসে মানুষ;
নিজের সঙ্গে তার যত কথা, তার
শতাংশও বলে না সে আত্মজন সমগোত্রের কাছে
সমগ্রজীবনে।

সুখ
তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে একা
দুঃখ
বুকের কোণায় আগলে রাখে যখের ধনের মতো
শোক
পাথর করে ফেলে রাখে ধুলোয় ময়লায়
যেন তাকে কখনও ছোঁবে না।
ভালোবাসি বলে দু-হাত বাড়িয়ে গলাফাটিয়ে চেল্লায় মানুষ
বিজ্ঞাপনে
নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ থেকে দেখে
আর দেখে
বিচিত্র কারুকার্যময় পারদজ্বলা প্রাচীন আয়নায়।

দ্রোহ দাঙ্গা যুদ্ধ বিপর্যয়ে কিছু যূথবদ্ধ মানুষ দেখা যায়।

এই প্রহর গোনার সময়
সলিল ভট্টাচার্য

ঝড় আসিতেছে
আপনি কি নিতান্তই বধির?
বিদ্যুতের দীপ্তি অস্ত্র শানাইতেছে।
আপনি কি বড়োই অধীর?
তবু বলি
এভাবেই যাহারা উদাসীন থাকিতে চায়
যাহাদের সহিত আমরা পথ চলি
সময়ের সাগরে যাহারা লখিন্দরকে ভাসায়
সেই সমর-সমুদ্র যখন হইয়াছে উত্তাল
তখন তাল-বেতালের কণ্ঠস্বরে
আগামীর দিনগুলি
কেবল ভাঙে আর গড়ে
আর কফিনের ভেতর থেকে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বেরিয়ে আসে
হায় ভারতবর্ষ,
ইহাতে তোমার বিষাদ অথবা হর্ষ
দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া পড়ে জাহাজের মাস্তুল
এতই যদি ভুলের মাশুল
দিতে দিতে দিতে দিতে বাতাসে বারুদ-গন্ধ আসে
আর বাতাসে বারুদ-গন্ধ কিসের আশ্বাসে
তুমি কি স্বপ্নের মূর্ছনায় ধানসিঁড়ি নদীতীরে
এই বাঙলায়
ধ্বংসস্তূপে একা একা প্রহর গুনিবে?
এই পরাভবে কমরেড তুমি কি ব্যথিত?
এই ক্লান্তি একদিন তোমাদের বারুণীর ক্লেদ মেখে
পুনরায় পিশাচেরা অট্টহাস্যে
শরশয্যায় ভ্রান্তিবিলাস লিখিয়া
পশ্চিম-আকাশে সূর্যোদয় দেখাইবে?
পরাজয়ে রুদ্ধবাক্ দুর্যোধন স্তব্ধ
যন্ত্রণার হলাহলে হয়ে যায় ক্ষুব্ধ।

মহাশূন্য খেলা
সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

ঐ আকাশ
ঐ রাষ্ট্র শূন্য শূন্য উন্নত জীবের,
নক্ষত্র ও মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
লুকোচুরি খেলে শিব ও শিয়াল
শক্তি আহ্লাদিত।
কালপুরুষের সাথে অলস যাপন সারে
স্বাধীন রমণীরা।
এই দৃশ্য দেখতে দেখতে
অন্য এক পাহাড় মেঘ
কেড়ে নেয় লুকোচুরির চাবি।

এই খেলা
অরবিন্দ সরকার

যাও। কোথায়?
এই নির্বাণে, এই নির্মাণে
নিবিড় অন্ধকারে কী সুরে রুদ্রবীণা
বাজাও।
এই খেলা, এই খেলা
নিরন্তর ওঠানামা
যন্ত্রের সমূহ ধ্বনি সবদিক হতে উঠে এসে
কী নরম ঢেউ তুলে চলে যায়।

যাদুকর
শ্যামলবরণ সাহা
(যাদুকর শম্ভু সরকারের জন্য)

রূপকথার পোশাক পরে আমাদের কাছে ফিরে এসেছে—
যাদুকর! মুখে তার অং বং চং যাদুমন্তর...

অসময়ে পাকা চাঁদ কেটে আমাদের হাতে তুলে দেয়—
ফালি তরমুজ।
শূন্য বাক্স থেকে শূন্য এনে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেয়—
রোগা কবুতর।
একটা আধুলি থেকে হাজার আধুলি...
ঝন্‌ঝন্ মুদ্রার শব্দে নাচায় মায়া করোটি!

মম্‌ফলি সামলে আমরা ক'জন হাততালি দিই।

রূপকথার পোশাক খুলে আমাদের কাছে আবার ফিরে এসেছে—
যাদুকর। মুখে মন্ত্র নেই। চুন মুখে তার শাদা কথা :
শ্যামলদা, আর এভাবে চলে না।
স্কুলেটুলে কিছু কল-শো দেখে দাও!

আমি মাথা নাড়ি, শুধু ভদ্রলোকের মতো মাথা নাড়ি...
চোখে তার চোখ রাখি—

তাহার চোখেতে দেখি আশ্চর্য যাদু—ওয়াটার অফ্ ইন্ডিয়া!...

জীবন
সতীরঞ্জন আদক

শিশির ঝরছে টুপটুপ করে মাটির বুকে
আমার চোখের সামনে জন্ম ও মৃত্যু
আমি দাঁড়িয়ে দেখি
সত্তার ভেতর আর এক সত্তা হারিয়ে যায়।

জীবনটা এরকমই
কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে না।
পাখির ঠোঁটেও বীজ কাঁপে
জন্ম নেয় একটি চারাগাছ।

আমি কিছুই বলতে পারি না
আকাশের মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামে
সবুজ ধানের খেতে, জলে শাপলা কুঁড়িটি
তার মুখ স্বপ্ন সুখ
এটাই জীবন, ছবি আঁকি
হাওয়ায় দোলে।

শূন্যতে
বিশ্বজিৎ মণ্ডল

যেভাবেই শুরু করি, প্রত্যাবর্তন—
অনবদ্য গতিতে ফিরে আসে প্রাক্তন চিহ্নের মুখ

অত্যাচারী রাজার মতো মসনদ ভেঙে ছুটে গেছি—
হলুদ-রঙা যুদ্ধের ভেতর
একে একে মুছে গেছে, যুদ্ধবাজের উল্কি,
বরকন্দাজের শিরস্ত্রাণ

অপভ্রংশ ইচ্ছের গায়ে লিখেছি নামাবলীর শব্দ
কোথায় যুদ্ধ? অনভ্যস্ত হাতে সামলাচ্ছি—
সালতামামির অভিনব দশক

আমার বাংলা
রামানুজ মুখোপাধ্যায়

রুখুশুখু মাঠ, চেনা পথঘাট, ধুলো পড়ে থাকা ঠেকে
নীল শাদা রঙে কারা যেন তার অতীত রেখেছে ঢেকে
নেই লঘুশাল, মিছিল মশাল, সাবেক কালের জোট
হুংকারে কাঁপে দিনের আলোয় লুঠ হয়ে যাওয়া ভোট
আমাদের গ্রামে যে-আঁধার নামে হিসাব রাখি না তার
মাপা ঘাসে ঘাসে চাপা সন্ত্রাসে কে যে কার প্রতিকার
হারিয়ে গিয়েছে মিঞা তানসেন, রেখাবের প্রিয় রূপ
ছায়াটুকু তার মাদল বাজায় কায়া তবু নিশ্চুপ।

ভালোবাসা খণ্ডিত হয়
পম্পা দাস কান্ত

শুধুই একটা ঢিল
অথবা
পাটকেল

ভালোবাসা ভাঙে
ভাঙতেই থাকে
চলতে থাকে
অ্যামিবার মতো

তারপর
হাইড্রা হয়ে
তোমাকে খুঁজে নেয়
জড়িয়ে ধরে তোমাকে...

আশ্রয় পেতে পেতে
আহ্লাদী হতে হতে
আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে যায়

তবুও তো
মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মনে হয় সব আছে
আমি... তুমি...

নটরাজ ব্রহ্মাণ্ড তখন
সাহারায় জেগে ওঠে
জ্বলে ওঠে
মোম-নির্ভরতায়

খণ্ডিত হতে হতে
সাবুদানা প্রেম
বারবার বেঁচে ওঠে
সমগ্রের ক্যানভাসে।

তিনটি অনুভব
মলয় রায়

১.
মাঝরাত্তির। দু-জন হাঁটি।
সঙ্গী-সাথী ঝিঁঝির ডাক।
দু-জনেরই পকেট খালি
ভয় করি না ডাকাত হাঁক।।

২.
গরম তাওয়া
দিন মজুরির রোজে।
তবু ভাবনার কথা
না ভাবলে চলে।

আপন পর সঙ্গে নিয়ে
তাই তো আছি।
মরা মানুষের মিছিল তবু
জ্যান্ত মানুষই খোঁজে।

৩.
কাপ ডিস চা।
সামনে মা।
চায়ের কাপে আর
ঝড় উঠবে না।

সামনে আবাদের মাঠ।
ঝড় তুলছে অগ্নিকোণ
সত্যি করে ধরতে হবে দা।
খিল দেওয়া ইজ্জতে
লাথি মেরে
কলার ভেলায় চেপেছে

হাজার বেহুলা বোন।।

দু-চার লাইন
রাজকুমার রায়চৌধুরী

১ গায়ে গতরে কবি আসছেন ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কারখানা থেকে পদ্য হাতে

২ শরীর শরীরকে চায় তুমুল অন্ধকারের ভাষায় দু-চার লাইন...

৩ অভাবের দুটি করতলে নাগরিক পরিচয় ভেজে কালো চোখের জলে...

৪ ভূতের ভবিষ্যৎ আছে কিন্তু আমাদের?

৫ তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবতা খিদে, সে থাবা মারে বর্শা ফলার মতন মারাত্মক জোরে।

৬ বুদ্ধিজীবী কার কাছে দিয়েছেন নিজের মেধাকে বন্ধক?

৭ কলকাতা আবেশকে চেনে, পাঁচু বাগদির বেটা আমাদের আদরের পঞ্চুকে চেনে না।

৮ অশিক্ষার দারুণ দাপটে—ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতন জীবন অন্ধকারে ওড়ে...

৯ অল্প সময়ের এ জীবন ভয়ে না মরে, সাবমেরিনের ছায়া ফেলো বন্দরে।

১০ চমক দিয়ে যাও ২১ বছর, শ্রাবণের ভাষা শেখায় বৃষ্টি তোমায়...

১১ মরুভূমির উত্তাপে স্বপ্ন মরে প্রতিদিন দুঃখ কষ্টের ওপর অন্ধকারে।

১২ রহস্য জড়িয়ে ঘুরে বেড়ান, সবুজ রং মেশান বসন্ত বেলাটিতে,
গাঁয়ের বাঁকে কে ডাকে, দূরের পথে

১৩ অজস্র সাবান এসো বিদ্যাসাগরের কাছে যাই, বলি :
দুর্গন্ধ তোলার সুমতি দিন আপনি আমাদের।

১৪ তুমুল ভালোবাসার প্রথম বর্ষ ভুলে,
চলো জীবন একথালা ভাতের সঙ্গে...

১৫ পাঠাও মরে যাওয়ার আগে বেঁচে থাকার উষ্ণতা।

১৬ আয়না মিথ্যে দিনলিপিগুলি অতর্কিতে খুলে দিচ্ছে মুখের একই প্রান্তে।

১৭ স্বপ্নে সাক্ষাৎ পাই তোমার, বাস্তবেও দূরে নও তা তো জানে তৃষ্ণার অন্তর।

১৮ চকচকে লোভী একটি হাঁ-মুখের ভিতর আমি আমাকেই দেখি অভয়ারণ্যে।

১৯ বিষাদ ঠোঁটে লেখা থাকে সিগারেটের সঙ্গে বেকারের রহস্য ও মানসিক স্ট্রেস।

২০ অন্ধকীটে কাটা জীবন লিখে যাও—এই গ্রহে অবশেষে ভালোবাসার অজস্র কথা।

২১ মনে তোমায় আপন মেনেছি তা জানো না সংসারের ভাঙা খেলাঘর।

২২ খুচরো জীবন মরুভূমির আকাশে উঁকি দেয় স্বপ্ন বিচ্যুত ডানায়...

২৩ ভিতরে ভিতরে মানুষ জমালাম অনেক, ওগো মানুষ পেলাম কোথায়?

২৪ 'মন ছাড়ো, মন ছাড়ো, ছাড়ো গো কুনজর,
মন খোঁজো, মন খোঁজো, ভাবেরও দোসর'
নিজের তৈরি করা জগতের ভিতর খুঁজতে থাকি নিজের মন...

২৫ বেঁচে আছি, অতুলনীয় ইতিহাস মনে রেখো, আমি—
দু-এক লাইন লিখেছিলাম রৌদ্র ছায়ার মধ্যে মূর্খ কলম হাতে।

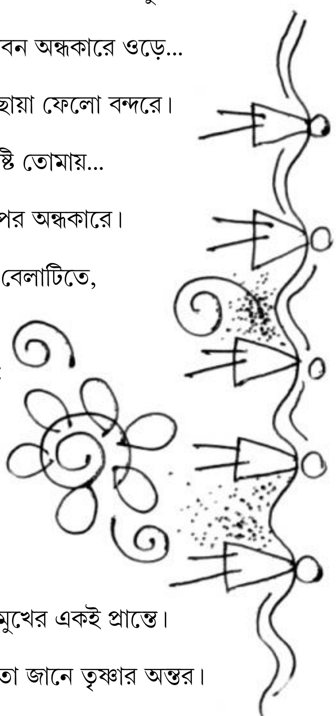

গুচ্ছ কবিতা
কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

১.
তুমি যাবার পর
এক টুকরো আলো জেগে থাকে
সেখানে ডুব দিই
অন্ধকারে একলা আমি।

২.
ফচকে মেঘ উড়ে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায়
বৃষ্টি ঝরায় না।
শুকনো মাঠ শুকনো পুকুর গুমরে কাঁদে
আকাশ তবু দেখতে পায় না।

৩.
ছেলেটি
কার্তুজের খোলগুলো
কুড়োচ্ছে গুণে গুণে।

গত বছর
বাবা লাশ হয়ে
পড়েছিল এই উঠোনে
ছেলেটি
কার্তুজের খোলগুলো
কুড়োচ্ছে গুণেগুণে...

৪.
ওদিকে তাকিও না
ওদিকে আগুন
এদিকেও তাকিও না
এদিকে বুলেট।
সোজা যাওয়াই ভালো
হয়তো মৃত্যুকে এভাবে
হারাতেও তো পারো একদিন!

৫.
ভেদশক্তি ছিল না তোমার
প্রতিদিন টার্গেট ফসকাচ্ছ
প্র্যাকটিশও তো করলে না!
টার্গেট ক্রমশ পিছিয়ে যায়...
চরাচর বিস্তৃত কুয়াশায়...
যাদের ভেদশক্তি আছে
টার্গেটই তাদের কাছে এগিয়ে আসে
জাতির পিতা কাগজেই হাসে
একথা তুমি বুঝবে কবে?

উত্থান
তন্ময় ভট্টাচার্য

রূঢ় বাস্তবের কাছাকাছি চলে এসেছি
আর পঞ্চাশ কিলোমিটার। তারপর গনগনে আগুন...

আমি দলিত, তাই প্রতীপ পথের অভিযাত্রী
প্রিয়তমা জানত না এই পরিণতি...

চোখের জলে ভিজতে ভিজতে শহর
হেঁটেই এলো অনেক মাইল পথ।
মৃত্যু ছেঁড়া তুলোর মতো শব
বইতে বইতে আর্দ্র মনোরথ।

গলতে থাকা ভালোবাসার গান
উৎসারিত আত্মপরিচয়ে—
বুকের খাঁচায় কষ্ট চাপা দম
কাঁদছে শুধু আবেগে বিহ্বলে।

দানা মাঝি দানব ছিল না তো
খুঁজেছিল মানুষ-চরিত্র—
আত্মহনন থেকে রোহিত
জানিয়েছে—দলিত অপবিত্র।

কবির পাঠে কি ছিল ভুল?
নেশন কি গোলাকার? চৌকো? মসৃণ?
চেতনায় গাঁথা শরীরের দৃঢ়তায়
রাষ্ট্রনায়কের মুখে, লাথি মেরে হেঁটে যায়;
কালাহান্ডি থেকে এক ভারতীয় গ্রামে
মহারথী দলিতের প্রেম ছোঁওয়া প্রবল উত্থান।

স্ত্রীর লাশ দ্রোহের পতাকা
সভ্যতার মুখ থাকে ঢাকা।

লিবার্টি বল না
অমিত কাশ্যপ

তুমি রাগ কর না কেন ভেবে অবাক হই
ট্রাফিক পুলিশ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে আটকে
লাল-সবুজ গোনে, কেন শুধু সবুজ করে বাড়ি গিয়ে
ভাতঘুম জড়িয়ে বলে না লিবার্টি শব্দের অর্থ

আমি কালো চশমা পরে শববাহকের দ্রুততা দেখি
মন ভার করা আর একটা ভোর
জগৎ সংসার অচল হল ভেব না
তুমি তাকিয়ে থাকতেই পার

শ্রাবণী মেলায় হাত ছাড়িয়ে চলে গেল যে বালক
তাকে আমি চিনি না, তবে জানি সে আর ফিরবে না
গৃহশিক্ষক বসে থাকবেন
গরমের ছুটির পর নিরীহ গাছগুলি দেখ কেমন সজীব

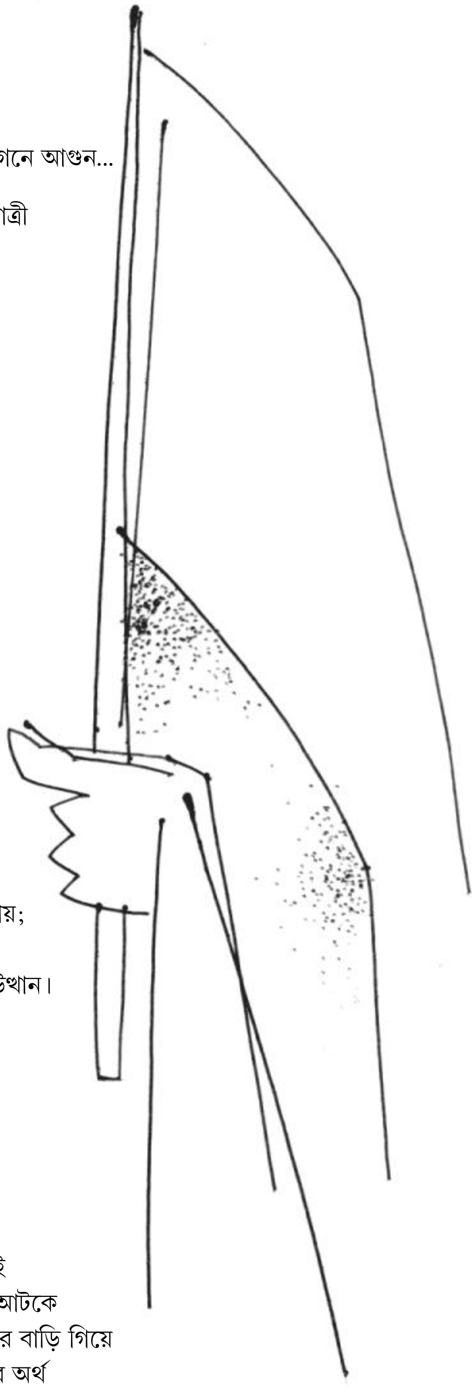

কবিতাযুদ্ধ
সৌম্য দত্ত

একটি কবিতা লিখি জলপাই রঙে
সীমান্তে প্রহরা থাক পর্যাপ্ত বারুদ,
একটি কবিতা হোক লুকানো মাইন...
বুঝে নিক জন্মদাগ, আসল ও সুদ।

একটি কবিতা লিখি ঠা ঠা পোড়া রোদ
একটি কবিতা যেন খুলে শিরস্ত্রাণ
বুলেটে বুলেটে ছিন্ন ভিন্ন কুয়াশায়
একা যে মেয়েটি—তার ধ্রুপদী নির্মাণ।

একটি কবিতা হোক ট্রেঞ্চে বসে থাকা
ব্যারেলের মাছি হোক কবিতার মতো
একটি কবিতা যেন অসহিষ্ণু ট্যাঙ্ক
নদীর গর্ভের মেঘ আকাশে প্রণত!

একটি কবিতা যেন সাঁজোয়া বাহিনী,
অক্ষর বৃত্তের মত নিঃশব্দ ড্রোন—
প্রতি ইঞ্চি বুঝে নেয় সাইবার ম্যাপ...
পাঠায় সংকেত মেপে শব্দের ওজন।

সমহিত যুদ্ধক্ষেত্র মেখে কবিতায়
আকাশে বোমারু নয়, কবিতা গর্জায়।

দলত্যাগীদের প্রতি
কালীময় মৈত্র

লাল পতাকা কাঁধে নিয়ে
হঠাৎ ফেলে দিলে!
পারতে তুমি এমন করে
সত্যি 'মানুষ' হলে!
'মানুষ' হতে গেলে অনেক
রক্ত লাগে ভাই
রক্তের রঙ লাল, তুমি
ভয় পেয়েছে তাই!
অনেক দিনের অনেক 'লোকের'
অনেক রক্ত আছে,
উত্তোলিত উজ্জ্বল ওই
লাল পতাকার মাঝে।
তোমার মতো 'অমানুষের'
স্থানটা কোথায় জানাই
জায়গাটা সেই ইতিহাসের
নোংরা আবর্জনাই।

বাঁশি

উৎপল সাহা

(শতবর্ষে কবি সমর সেনকে)

কেন আমি বুড়ো বয়স পর্যন্ত
বেঁচে আছি
কমবয়সী তোমরা প্রাণ দিলে যখন

বলা শেষ না হতেই
বুড়ো মানুষটি
বেঘোরে কাঁদলেন
রাস্তায় লুটোপুটি খেলেন ক্রমাগত
আমরা থ
পা শেকড় হয়ে যাচ্ছে নিমেষে

তুলকালাম ঘটনাটা ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না
আমাদের মাথায় ফুটে উঠছে।
হাজার চোখ

তবে
বীর না হয়েও
বীরের পেছন পেছন ছুটে বেড়ালে
উড়ে বেড়ালে
আজো গায়ে কেন কাঁটা দেয়
রবীন্দ্রনাথও বুঝতেন

কালিঘাটের ব্রিজের ওপর
লম্পটের পদধ্বনি
সহে না সহে না
জনতার এ জঘন্য মিতালি

বাপকে গভীর পর্যবেক্ষণ করাও তো
এক অর্থে উত্তরাধিকার

গান্ধিগুজব
গান্ধিদেবতা
হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে
একদিন তো বুকে গেঁথে গেলো

আন্দোলনের স্বার্থে
মায়েরা সোনাদানা উজাড় করে দিলে

ঘরের বাচ্চাটিকে
একটি ছোট্ট কমলালেবু দিতে হয়
গান্ধীজি জানতেন

সেই কচিকাঁচাদের কেউ কেউ তো
আজ ভারতবিখ্যাত
এক হাতে লেবু, অন্য হাতে গহনা

কবিতার ভেতরে
অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট ডুবুরি কবিতা থাকে
এখানে ওখানে ভাসে আর ডোবে

ওদিকে সেই বুড়ো মানুষটি
আবার কঁকিয়ে উঠলেন

কেন আমি বুড়ো বয়স পর্যন্ত
বেঁচে আছি
কম বয়েসী তোমরা প্রাণ দিলে যখন

মাথায়-গুলি, ভাই আমার
বেড়া টপকাতে, বেড়া টপকাতে
ধরা পড়ল শেষে
নখসুদ্ধু লম্বা আঙুল চালাল
বিশাল ঘায়ে

কোথাও ধরা দেবে না
পালিয়ে বাঁচল

ঠিক ওইদিনই
আমি বাঁশিটি পুঁতে এলাম
ঘাস-জলার মাঠে
ধরা পড়ার ভয়ে
পালিয়ে গেলাম
দেশান্তরী হলাম

মা আজও দুটো পাত পেড়ে
তালপাতার পাখাটি নাড়েন

ঘুমিয়ে পড়লে
মাছিগুলো লম্বা শুঁড় মেলে
তাঁকেই গিলতে আসে

গিলেও ফেলে

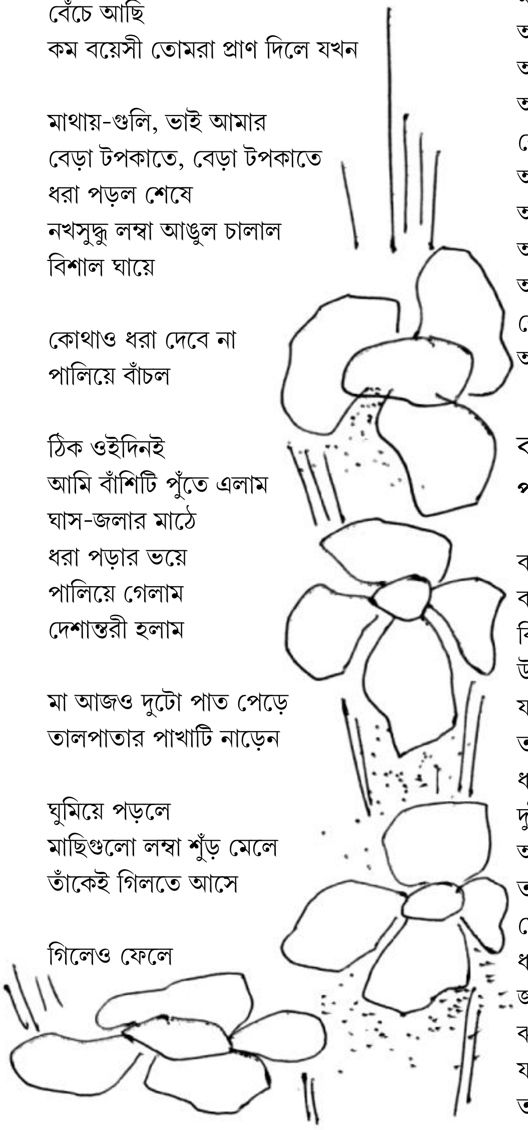

আমি ঘরে ফিরতে চাই

নমিতা পোদ্দার

আমার ঘরের সমস্ত পথই বন্ধ
যেদিক দিয়ে প্রবেশ করার
চেষ্টা করি না কেন,
সব পথই গিয়ে শেষ হয় সেখানে—
দেখি, দাঁড়িয়ে আছে বিষধর সাপ।
জ্বলন্ত কয়লা সারা রাস্তা জুড়ে
রক্ত হিম হয় আতঙ্কে।
অথচ, আমি আমার নিজের
ঘরে ফিরতে চাই—
কতকাল আর খোলা আকাশের নীচে
উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝখানে
দাঁড়িয়ে রাত কাটাব।
বিষণ্ণতার কান্না মিলিয়ে যায়
মরুভূমির বুকে।
আমার আরও কাজ বাকি
আমি রোদ্দুর থেকে রং ধার করে
আঁকতে চাই আলোর ছবি।
রেখে যাব সে ছবি আমি
আকাশের সংগ্রহশালায়
আগামী পৃথিবীর সমস্ত পাখিদের জন্য।
আমি ফিরতে চাই—
আমি শান্তিতে ঘুমোতে চাই
শেষ কয়েকটা রাত—
আমি ঘরে ফিরতে চাই।

কবে সোজা হবে...?

পরেশনাথ কর্মকার

বদলেছে দিন, বদলেছে সময়
বদলায়নি স্বভাব, তাই—
বিবেকহীনতার প্রকাশ রোজ।
উন্নয়নের বার্তা চারিদিকে
যা চোখে দেখা যায় না
তবুও চলেছে নতুন রাজ।
ধর্ষণের নীতি, সন্ত্রাসের ভীতি
দুই হাতিয়ার
অথচ—তুমি আমি নির্বিকার
তবে কবে? কবে শিরদাঁড়া
সোজা হবে
ধর্ষণের টর্নেডোকে রুখতে?
জান তো—
ঝড়ের পরেও পৃথিবী শান্ত হয়
যদি—
তাকে সঠিকভাবে বুঝতে পারি।

বাঁধন ছাড়া
গৌতম সাহা

ভাসছে বাতাসে পুজোর গন্ধ, দুটো দিন পরে পুজো,
আমাকে পাবে মা আকাশে-বাতাসে, শিউলির ফুলে খুঁজো।
কাশফুলে রোজ দোল খেয়ে যাব, পদ্মে ভরবে জলা,
শ-য়ে শ-য়ে শত শালুকের সাথে চলবে মা কথা বলা।
ওরা বলবেই পুকুরের কথা, আমি বললেও শুনবে,
কার ক-টা হল হিসেবের কড়ি বলো কে-বা এসে গুণবে?
অজস্র হবে মা কথার মালিকা, প'রে সেজে যাব ঘরে,
তোমাকে শোনাব সে কথার ঝুলি ঠিক সন্ধ্যার পরে।
আকাশে তখন চাঁদ উঠে যাবে, তারা-রা মারবে উঁকি,
বলবে তারাও, 'গল্পের মাঝে আমরাও এসে ঢুকি!'
আসুক-না মা, দলে ভারি হবো, তারারাও খুব ভালো,
ওরা আছে বলে রাত্তিরে মা তবুও কিছুটা আলো
জ্বলে চারিদিকে, জোনাকিও আছে
সকলে তখন জ্বলে গাছে-গাছে।
সূর্য উঠলে যায় হাওয়া হয়ে, ডাকলে মেলে না সাড়া,
আবোল-তাবোল অনেক বকেছি, এবার মা ঘুমপাড়া।

তবে ফিরে এসো, এই বাংলায়
দেবাশিস প্রধান

স্টেশন ছাড়ার শাঁখ বাজিয়ে চলে যাচ্ছে যে ট্রেন
তাকে ডাকবো মাছরাঙা
চলন বিলের জলে পা ডুবিয়ে যে মেয়ে রোদ্দুর কুড়োচ্ছে
তার কানে কানে বলেছি কোথায় নাটোর
নগরঘরের থেকে হাঁকুশপাঁকুশ ছুটতে ছুটতে দৌড়ে আসছে
রূপা রহমান, ভারতীয় হাওয়ায় উড়ছে তার শাড়ি
তার শরীরের নিঃশ্বাসে বাজছে টুলটিহাটের বাঁশি
বনপাড়ার হে, পাখপাখালিরা, উড়ে যাচ্ছো কাশফুল মিষ্টি বিতানে
সজনে ডাঁটার রসে শরীর ভিজিয়ে ভ্রমণ আবেগ নিয়ে
যারা আজও আউলবাউল হয়ে ঘুরে ফিরে
ঈশ্বরডিহি, দর্শনা, গেদের পিরিত পর্দায়
আটকে আছো—দু-দেশের কাঁটাতারে, তোমাদের জন্য থাকুক
গঙ্গা পদ্মা যমুনার শীতল জলের স্পর্শাতীত ছোঁওয়া...

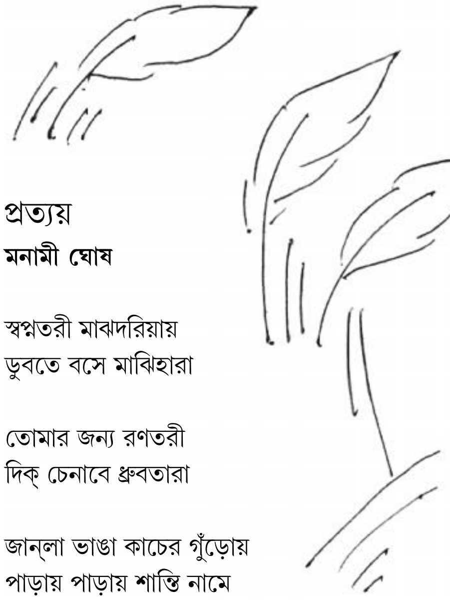

প্রত্যয়
মনামী ঘোষ

স্বপ্নতরী মাঝদরিয়ায়
ডুবতে বসে মাঝিহারা

তোমার জন্য রণতরী
দিক্ চেনাবে ধ্রুবতারা

জান্‌লা ভাঙা কাচের গুঁড়োয়
পাড়ায় পাড়ায় শান্তি নামে

আঘাত করে ঋজু পিঠে
মুঠো ভেজে রক্তে ঘামে

তবু তোমার দৃপ্ত চোখের
আগুন দিয়ে জ্বালাই মশাল

সেই আলোতে আঁধার রাতে
পথ চলবো হে মহাকাল

১৯৮৯ সালে লায়ন বন্ধুদের সঙ্গে মিয়ামিতে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স যাবার পথে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ। সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ি শহর লুসার্নে (ওরা বলে 'জুয়েল অব সুইজারল্যান্ড') গিয়ে খুব ভালো লেগেছিল। সেই কবিতা হল 'লুসার্নে'। তার আঠারো বছর পর আবার যাত্রা সুইজারল্যান্ডে, চিকাগো যাবার পথে এবং অবশ্যই লুসার্নে—তারই ফসল 'ফিরে দেখা'। **ডা. প্রভাতরঞ্জন ঘোষ**

লুসার্নে

কী ভালো যে লাগছে আমার
এইখানে এই লুসেরানে
সূর্যদেবের সপ্ত বাহন
অষ্টপ্রহর কিরণ হানে।
সাড়ে নটা বাজার পরেই
এই খানেতেই রাত্রি নামে,
তবু আলোর রেশ থেকে যায়
সূর্য সারথ কখন থামে।
পাইনবনের ঘন ছায়ায়
গহিন আঁধার লুকিয়ে আছে
লেকের জলে ছায়া ফেলে
পাহাড় এবং পাইন গাছে।
কী যে শোভা টিটিলাসের
তুষার ধবল পাহাড়চূড়োয়
হঠাৎ হঠাৎ মুখ ঢেকে যায়
মেঘে এবং বরফগুঁড়োয়!
প্রকৃতি তার ঢালছে সুধা
প্রাণভরে আর অকারণে
কী ভালো যে লাগল আমার
আজ সকালে লুসেরানে।

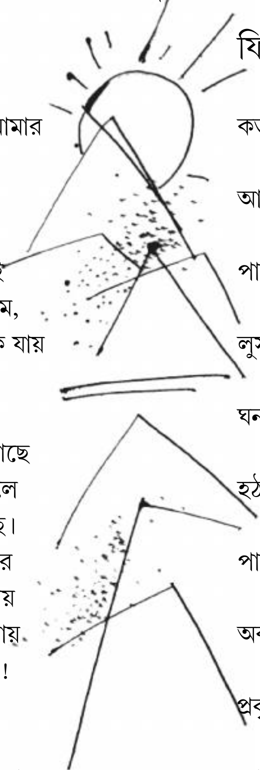

ফিরে দেখা

কতদিন পর লুসার্নে এলাম
বছর আঠারো হবে,
আরো কি সবুজ এখানের মাঠ
ফসল ধরেছে সবে।
পাহাড়ের গায়ে পাইনের সারি
সবুজের সমারোহ
লুসার্নের লেকে টিটিলিস চূড়া
ছায়া ফেলে অহরহ।
ঘন নীল জলে তেমনি মরাল
আজও চলে ঘাড় বেঁকে
হঠাৎ মেঘেতে, তুষারকণায়
পাহাড়ের মুখ ঢাকে।
পাবেতে কাফেতে যুবক-যুবতী
গল্পেতে মশগুল
অকারণে আসা দমকা হাওয়ায়
এলোমেলো কারো চুল!
প্রকৃতি তেমনি ঢালে আজো সুধা
প্রাণভরে অকারণে
আরো যেন ভালো লাগল আমার
এইবার লুসেরানে।।

নবজাগরণ

দেবেশ ঠাকুর

শান্তিপুরের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে
তীব্র তর্ক চলছে নবদ্বীপের ছোকরা বিশ্বম্ভর মিশ্রের
জ্ঞান বড়ো না ভক্তি বড়ো—
অদ্বৈত ছাড়ার পাত্র না।
শ্রীহট্ট থেকে বিদ্যাতীর্থ নবদ্বীপে আসা এই প্রজ্ঞাশীল মানুষটি
ন্যায় ব্যকরণ কাব্য অলঙ্কার মীমাংসা—সবেতেই দীপ্ত
কিন্তু হাঁটুর বয়সী ছেলেটির সঙ্গে পেরে উঠছেন না
আশেপাশে ভিড় জমে গেছে
স্মার্ত রঘুনন্দনের দলবল তারিয়ে উপভোগ করছে
শ্রীবাস আর হরিদাসের বিস্ময় গগনচুম্বী—
কে এই ছোকরা!
অদ্বৈত আচার্যের মুখে মুখে তর্ক করে
এমন পাণ্ডিত্য আর যুক্তির ধার কার আছে!
এ কি শ্রীহট্ট বনাম নবদ্বীপের লড়াই? পূর্ব-পশ্চিমের?
গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়া বিশ্বম্ভরের দুই সহপাঠী
সঞ্জয় আর মুকুন্দ সমানে উৎসাহিত করে চলেছে,
বাঙাল বুড়োকে ছাড়িস না, গোরা
একেবারে কচুকাটা কর—

মাধাই নামে এক নৈকষ্য কুলিন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল
মদ্যাসক্ত শাক্ত যুবক বললে, বোষ্টুমরা কাটে না বাওয়া, বানায়—
তে-ফেরেঙ্গা গাছের নিচে বাবাজিকে এমন বনান বনালে

এক বৃদ্ধ স্মিত হেসে বললেন,
বিশ্বম্ভরও বাঙালের বংশ। ওর বাবা-মা শ্রীহট্টীয়।
গোরাপন্থী গোঁড়াগণ বলে, কে মশয় আপনি?
বাঙাল দেখলেই গোরা মস্করা করে,
বাঙ্গালের পিছে হুনার বাতি-জ্বলতাছে—
গৌর বাঙাল! হতেই পারে না।
বৃদ্ধ বললেন, আমি জানব না গৌরের পরিচয়!
—মহাশয়ের পরিচয়?
—আমি নীলাম্বর চক্রবর্তী। গৌরের মাতামহ।
ছোকরাগুলি চুপ্‌সে গেল,
যেমন করে শুকিয়ে যায় পৌর্ণমাসী কুয়াশাতে প্রবল শীতে
ধীরে ধীরে ঘিরে দাঁড়ায় গোরাচাঁদের বন্ধুরা সব
বদ্যিপাড়ার মুরারী গুপ্ত, স্বরূপ দামোদর, কবি কর্ণপুর

নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে প্রদীপ ভাসায় এয়োস্ত্রীগণ
মনসামঙ্গলের গান গাইছে কথকঠাকুর
বাসুলিপুজোর ফুল ভেসে যায় গঙ্গাজলে
কালীতলায় ঢাক বাজছে চড়াম্ চড়াম্।
বলিদানের প্রস্তুতি শেষ।
মাতাল-গাঁজাল নবদ্বীপের আকাশ ভরায় ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়
কাছের বন্ধু ছায়া ছায়া। অদৃশ্য প্রায়—
ভদ্রজনে দেখতে যাবে লক্ষহীরার নাচ,
কুলার্ণবতন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেন ভাঙখোর এক তন্ত্রচারী

অদ্বৈতের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের তর্ক থামছে না,
ওদিকে রাত বেড়ে চলে। বড়ো অন্ধকার। জোনাকিও অপ্রতুল।
জগন্নাথ মিশ্রের বিধবা স্ত্রী কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।
যেমন থাকতেন বিশ্বরূপের অপেক্ষায়

প্রাজ্ঞ অদ্বৈত পরাজয়ের মুখে
বুঝছেন, বিদ্যাসাগর উপাধিধারী এই যুবক অপরাজেয়
বুঝলেন, ভুবনকে যে ভবন করে—এ সেই নেতা

লালপাড় শাড়ি পরিহিতা এক প্রৌঢ়া
গৌরের মুখে তুলে দিলেন প্রিয় চাঁপাকলা। বললেন,
অনেক বকেছ বাছা। খিদে পেয়েছে নিশ্চয়। একটা কিছু মুখে দাও।
আবার তর্কে মাতো।
প্রৌঢ়া অদ্বৈতের সহধর্মিণী সীতাদেবী।

অবশেষে পরাস্ত হলেন অদ্বৈত।
জয়ের অহং-এ বিশ্বম্ভর উজ্জ্বল। চোখ বন্ধ করে শুনলেন
অন্তরের আমির বর্ণমালা, গাছের থেকে সহিষ্ণু হও, তৃণের থেকে দীন

অদ্বৈত হাত জোড় করে বললেন,
তোমার জন্যে বসে আছি অপেক্ষাতে, রাজাধিরাজ

নবদ্বীপের পুব আকাশ আলো করে সূর্য উঠছে।

আলো ক্রমে আসিতেছে।

ঝোড়ো দিন

সুজাতা সান্যাল চট্টোপাধ্যায়

আবার এসেছে সেই ঝোড়ো দিন
সভ্যতার সব আবরণ উড়ে গিয়েছিল
সেই সব দিনে—শুধু প্রতিশ্রুতিই ছিল
আর ছিল না কিছু, অপাত্রে দান
অমোঘ পরিণাম। পারলাম না তো
ঠেকাতে সেই বিষম দিনের ফিরে আসা!
কত সধবার সিঁথি হল সাদা, কত সন্তান
হল পিতৃহীন—এ আমাদেরই পাপ!
বিষাক্ত ক্ষত ঢাকতে ঝকঝকে পালিশ,
আঙুল তুলে শাসন—যে শাসনে দেশ হয় চমকিত,
যুক্তিতর্ক সব বৃথা। বাংলা মার সন্তান আমরা
বলতে লজ্জা হয়—সেই মা যার এলো চুলে
অনেক ধুলো, জট, পরন শত ছিদ্র।
কেউ তো আমরা পারলাম না মাকে সাজাতে।
দুঃশাসনের কবলে পড়ে দিশাহারা মায়ের সন্তানরা।
হাতে ধরে নাও ভিক্ষার দান ঝুলি ভরে
আর জয়গান গাও সেই সব শকুনি আর
সংসপ্তক বাহিনীর—অভিমন্যু আজ মৃত্যুপথযাত্রী।
রক্তাক্ত কোমল কৈশোর!
তৃতীয় পাণ্ডব কতদূরে!

ডাক দিলে

বিশ্বনাথ কয়াল

ডাক দিলে ঈশান কোণে বজ্র মেঘে ডাক দিও
কেশর ফোলানো দৃপ্ত পদচারণায়
পিছু নিয়ে বিদ্যুৎ লাফে লুম্পেন বুকে
কাঁপন ধরাতে ডমরুধ্বনি কাল ভৈরবের মতো ডাক দিও।

ছোটো বড়ো ঢেউ নিয়ে সাগর বাতাস কখনও তীরে
কখনও বাঁধের ওপারে আছড়ে পড়ে
বালিয়াড়ি ছুঁয়ে বনাঞ্চল পার হয়ে গ্রামগঞ্জ
খালবিল ভরে যায়, ডাক আসে জোয়ারে বিক্রমে।

প্রতিদিন প্রতিবেশী শব্দ শুনি সকরুণ আর্তনাদ
জানালা দরজা দ্রুত বন্ধ হয়, কখনও অলিগলি কোলাহলে
ভরে যায়, না দেখার, না শোনার যন্ত্রণা সংবেদে
কাঁপন ধরাতে সিংহগর্জনে ডাক দিও।

মানচিত্র ছিঁড়ে খায় তামাম মুখোশ

সুধাংশুরঞ্জন সাহা

আমার নষ্ট বয়েস জুড়ে খেলা করে
বিগত মেঘের দিবারাত্রির কবিতা।
বর্ষার বাগানে অচিন পাখি আসে না
সারা রাত চাঁদ রাশি রাশি শূন্য দিয়ে
বুনে দেয় অংকের অনিশ্চিত আগামী।
টানারিক্সার কথা সভ্যতার তোরণে
ঝুলিয়ে দিয়ে যায় অযুত প্রশ্নমালা...
দু-একটি গাছ সারারাত বৃষ্টি ভিজে
উসকে দেয় অচেনা পাখির সংলাপ
অথবা শিল্প সম্ভাবনার রূপকল্প।
তবু মাটি উৎসবের বার্তা ছাপিয়ে
মানচিত্র ছিঁড়ে খায় তামাম মুখোশ।
পাঠশালাহীন নানা ঘরে শুরু হয়
রঙ পেন্সিলের যাত্রা—সরুভুরু পথে।

আগুন নিয়ে খেলা

পরিমল ঘোষ

উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডবে মেতে
আগুনটাকে খেলা ভেবে
একদল মস্তান উদ্বাহু হয়ে নাচছে।
ক্ষমতার দাপট দেখাতে
তারা নির্দয়ভাবে পুড়িয়ে দিচ্ছে
একের পর এক ঘরবাড়ি,
ধর্ষণের পর দেহ পুড়িয়ে দিচ্ছে
প্রমাণ লোপের জন্য।

এইসব কুকর্মের জন্য
চারপাশের লোকজন তাদের দোষী ভাবলেও
তাদের লজ্জা নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই।
একদল নেতা-নেত্রীর ছত্রছায়ায়
তারা বেড়ে উঠছে দিনে দিনে,
প্রশাসন দাঁড়িয়ে রয়েছে সঙ সেজে

আগুন কিন্তু সব সময় বশ মানে না।
হাওয়া যদি কখনো প্রবল হয়ে
উল্টোদিকে বয়ে চলে,
তখন লেলিহান হয়ে
ধেয়ে যেতে পারে এইসব দোষীদের দিকে,
প্রতিবাদী স্পর্ধায় ঘটতে পারে চরম বিপদ।

আমি থেকে আমরা হতেই
সুনির্মল কুণ্ডু

যে-রকম উদারতা মুগ্ধ করে না আজকাল
তেমনটি দেখে থাকি—পেয়ে থাকি সামাজিক নিয়মরক্ষায়,
নিজেরও পূর্ণতা নেই—নেই বলে নির্জন সকাল
ভ্রমণের সাহচর্যে হয়ে ওঠে নীরব কথায়
বড়ো জোর ফুল-পাখি-শিশুদের চপল সময় :

আমি থেকে আমরা হতেই
হৃদয় কোথাও যেন আন্দোলিত না-হলে-যে-নয়—
ঘটনাবহুল সব প্রাচীন নির্মাণ ভাঙনেই
শুরু হতে থাকে সমাবেশ
কথা হতে থাকে মানুষের...
দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দুঃখ যত ব্যথিত প্রদেশ
সেখানেও দেখে থাকি দেয়াললিখন শ্লোগানের :

সাধারণভাবে সব মানুষের উদ্বেগ-শঙ্কার শীতলতা
যা হতে পারতো কোনও মর্গের স্পর্শকাতরতা
যা থেকে নদী বা হ্রদ পাহাড়-সমুদ্র-হিমবাহ
মিলত না, অ্যাতো সবে মিটত না কারও গাত্রদাহ!

আমি থেকে আমরা হতেই
তখন রৌদ্রের জন্য শ্রাবণবৃষ্টিকে বলতাম—
ক-টা দিন চুপ থাকো... চুপ থাকা মানে ফিরতেই
কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই, আমরা সে-ভাবে চলতাম
যে-রকম চললেই বৃক্ষ-বন-তৃণেও জীবন
বহু যুদ্ধে বেঁচে থাকা পোড়খাওয়া সৈনিক যেমন...

তার উদারতা পেতে আমি বা আমরা কাছাকাছি
থেকে যেতে পারি—যেমনটি শ্রাবণবৃষ্টির দিনে আছি।

অধিকার
বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

গাছ থেকে টুপটাপ স্বপ্ন ঝরে পড়বে...

তুমি এসে দাঁড়িয়েছ থলি নিয়ে
শিথিল বাতাসে কাঁপে তোমার দুহাত
দুলে ওঠে নয়নের মণি

এই তো এখনই
দেখো কী সুন্দর ঝরে পড়বে
ধুলো পথ, ফ্যাকাশে আকাঙ্ক্ষা, কষ্টবোধ, গ্লানি
ছায়ার সম্পাত থেকে স্বপ্ন তবু সরেও সরে না।

তুমি শুধু বসে আছ তলে
রিক্ত অপেক্ষার পথ

আর ওই দামাল ছেলেটি সোজা মগডালে উঠে গেছে...

কথকতা
পঙ্কজ পাঠক

এখন কথকতা শোনা যায় না
ফোনে ফোনে কথাবলা তো আর কথকতা নয়
প্রেম, ধান্দা, রান্নাবান্নার গপ্পসপ্প, শরীর ভালোমন্দের ফিরিস্তি এইসব
শহরে বাঁশঝাড় নেই, সরু সরু নদী নেই, বুলবুলির ওড়াউড়ি নেই
বরং মধ্যবিত্তরা বউয়ের বুকে মাথা রেখে
পটলের দাম নিয়ে আলোচনা ভালোবাসে
রাস্তাটাও এখন ময়ালের গা-ঝাড়া দেওয়ার মতো দুলে ওঠে না
তাই সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্ষোভের সমাধান খুঁজি টিভির টক-শোতে
আমরা এবং কাকেরা কত সুখে আছি শুনতে শুনতে
ঘরের টেবিলল্যাম্পগুলো পর্যন্ত ঝুঁকে পড়েছে
সে আটচালাও তো নেই
কথকতা হবে কোথায়
কেউ কেউ হয়তো বলবেন এখন চুপ করুন, পাঁচ বছর পরে
আমাদের সবজিবাগান ছাগলে মুড়িয়ে খাওয়ার গল্প
আর কথকতা শুনব।

পৃথিবীর কাছে
অনন্ত দাশ

পৃথিবীর কাছে আমার অনেক কথা
হয়নি আজও বলা
আমার অনেক স্বপ্ন যদিও অপূর্ণ
রয়ে গেছে
সন্দেহের শেষটুকু হয়নি আজও জানা

বৃষ্টিভেজা রাতে
কেন যে জানালার পাশে
বসে থাকি একা
একটা নক্ষত্র নিয়ে উড়ে গেল একখণ্ড মেঘ
বারান্দায় এসে দেখি
পৃথিবী নিঃঝুম
মৃত্যুকোলে দেয় যেন নিশ্চিন্তের ঘুম

অথচ আমার চোখে ঘুম নেই
ভাবি এতগুলো বছর
কোথা দিয়ে গেল চলে
আবার নতুন করে শুরু করা যাবে কি জীবন
কোথা থেকে কেমন করে
দূরাকাশে নক্ষত্রেরা রয়েছে নীরব

ভাঙন
মণিশংকর রায়

অভিমান ঘন হলে
থরে থরে ভেঙে যায় কষ্ট নীরবতা,
তুমিও তো নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে
অর্বাচীন আবেগে একদিন ভেঙে দিলে সব
ভেঙে দিলে নিষিদ্ধ বাগানের বেড়া
সুগন্ধি শরীরের ঢেউ এবং চিত্রকলা যত।

সূর্য ভাঙলেই সন্ধ্যা নামে ধীরে,
ভালোবাসার শর্ত ভেঙে গেলে
তখন কী সকরুণ নিরুপায় তুমি!
সুখের পরে দুঃখ বড়ো নির্মম জল্লাদ।

রাতের ভাঙন জানে রাতের কাহিনি,
অন্ধকারের ভাঁজ ভেঙে ভেঙে
উপদ্রুত শরীরের আলপথে নিঃশব্দে
অশ্লীল হামাগুড়ি দেয় অন্য এক রাত।

তোমার শরীর মেঘলা হলে
ভাঙতে ভাঙতে তুমিও একদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিদিন।

শর্ত
স্বপনকুমার চক্রবর্তী

পরাজয় মেনে নিতে পারি
যদি তুমি আমাকে জিতিয়ে দাও
পূর্ব নির্ধারিত কোনো শর্ত ছাড়াই।
শর্তাধীনে দুঃখকে ভুলে যেতে চাই না আমি
শর্ত ছাড়াই হেসে খেলে কাটাবো পুরোটা জীবন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আঙুলের ফাঁকে
ধরে থাকা স্বৈরতান্ত্রিক কলম
গাদা গাদা শর্ত লিখে দেয়
পরাজিত মানুষের কাছে,
সম্মানজনক সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়
শর্তাধীনে দায়িত্ব পালন মৃত্যুর চেয়েও অধিক।

পরাজয় মেনে নিতে পারি
যদি আমাকে জিতিয়ে দাও
যে কোনো শর্ত ছাড়াই

জলের মতো সহজ দৃশ্য
বৈদ্যনাথ মিশ্র

সমুদ্রের জলে এক চিলতে রোদের বিস্তার এক ঝাঁক মাছের ঝিলিকে
ভাঙছে ঢেউ
ক্রমশ খালি ডাবের খোল তীরে থিকথিকে ভিড়
কোল্ড ড্রিংক্সের বোতলে ভর্তি সৈকত মদ ভাজাবাদাম
নুলিয়া ছবিওয়ালা অনভ্যস্ত চুড়িদার জিনস্ কুর্তি টপ ডিজিটাল
দু-একটা ফচ্‌কের অশ্লীল শিস সত্ত্বেও বেপরোয়া স্নান
প্রিয় অবগাহন তুমি কি ভবিষ্যতের সঞ্চয়
আত্মীয় অনাত্মীয় নিজের লোক অন্য লোক মুহূর্তের আপনজন

কাঠামোর বাইরে লাল কাঁকড়ার সঙ্গে খেলছে ভ্রমণ
সান্ধ্য আকাশের খোঁজে দাঁড়িয়ে দিশাহীন মানুষ
সূর্যালোক সেও তো চলে যাবে চাঁদের আলোয়
সি-বিচের বালির ভেতরে ঝিনুকের সন্ধানী বিমুক্ত আশায়
অনবরত ঘটে চলেছে জোড় বিজোড় এসপার ওসপার
দৃশ্যেরা অপেক্ষায় আছে দেখবে বলে কেউ অনুরোধের আসর
মজেছে পুকুর বসেছে মজলিশ...

বদ্ধভূমি
সত্যনারায়ণ মাজিলা

তোমার লাল মৃত্তিকার দেশে
রক্তবন্যায় সংস্কৃতি গড়ে যারা
ধন্য মাটির ফলেফলে ভরা বৃক্ষ
মেঘছায়া কালো কেশে
সবুজের ডগে যতগুলি ফুল—দুঃখ।

জেনেছি যখন হায়নার হাত
ছিল নাকো প্রেম-রাজশক্তি
ক্ষমতায় কাঁপে ভব্যতাবোধ
অভুক্ত চোখে গোনে কড়িকাঠ
হাতিয়ার তোলে নিতে প্রতিশোধ।।

চেনা যায় নাকি সাধু-শয়তান
পাশাপাশি যদি হাঁটি
পায়ে পায়ে এসে অনেকটা পথ
তবুও আচেনা চেনা ময়দান
অবিরাম ছোটে ধ্বংসের রথ।

এখানে এখন কৌরব-ভূম
দুর্যোধন আর দুঃশাসন
শতপুত্রের আর যারা আছে
নৈরাজ্যের নিরবধি সেনা
নিঃঝুম রাত দুচোখে ঘুম।

খেতমজুর সংগঠন গড়া জরুরি

মদন ঘোষ

স্বাধীনতা-পরবর্তী অবস্থা

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে উদারীকরণ পর্বে। এর ফলশ্রুতিতে প্রভাবিত হয়েছে সমগ্র দেশের সমাজ ও অর্থনীতি। স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশটা কোন অবস্থায় ছিল সে প্রসঙ্গে সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচির 'স্বাধীনতা ও পরবর্তী সময়' শীর্ষক অধ্যায়ের ৩.২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''শ্রমিকশ্রেণি, কৃষকসমাজ, মধ্যবিত্ত শ্রেণিগুলি, বুদ্ধিজীবী, মহিলা, ছাত্র, যুবদের গণ অংশগ্রহণের ফলেই স্বাধীনতার লক্ষ্যে জাতীয় আন্দোলন সফল হয়েছিল। কিন্তু নেতৃত্ব থেকে যায় বুর্জোয়াদেরই হাতে। নতুন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকা বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌল কর্তব্য সম্পন্ন করতে অস্বীকার করে। ভারতীয় সমাজের পুনর্জাগরণের পথ ছিল উৎপাদিকা শক্তির সমস্ত শৃঙ্খলকে চুর্ণ করা। প্রয়োজন ছিল পরজীবী জমিদারতন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে কৃষিমজুর ও গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টনের। বিদেশি পুঁজির শ্বাসরোধী আধিপত্য থেকে শিল্পকে মুক্ত করতে পারলে আমাদের শিল্পের বিকাশ ঘটত, স্বনির্ভর অর্থনীতি সম্পন্ন এক অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশের ভিত্তি তৈরি হতে পারতো। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য পুরোপুরি সম্পাদন করলে তার সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে তাতে শঙ্কিত হয়ে বৃহৎ বুর্জোয়া ভুস্বামীদের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ হলে এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করলে। কংগ্রেস শাসকদের নীতিতে বুর্জোয়া-জমিদার মৈত্রীর প্রতিফলন ঘটেছে। পরবর্তী দশকগুলিতে পুঁজিবাদী পথের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে শাসকশ্রেণির এই চরিত্র দ্বারাই।''

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ গ্রহণ করে। রাষ্ট্রের হাতে পুঁজির যোগান কম থাকায় দেশের সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বাড়তে থাকে।

কিন্তু এর মাধ্যমেও পুঁজির যোগানের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না বুঝেই তারা ব্রিটেন সহ অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাহায্য চায়। কিন্তু তারা সেভাবে আগ্রহ না দেখানোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়। এক্ষেত্রে স্মরণে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের হাতে পুঁজির যোগান কম থাকায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্য যে পরিকাঠামো ও ভারি শিল্পের দরকার সেটা করা সম্ভব ছিল না। তাই সে সময় এমনভাবেই পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে দেশের ভবিষ্যৎ পুঁজিবাদী বিকাশের রাস্তা প্রশস্ত হয়। সেজন্যই তারা পরিকাঠামো ও ভারি শিল্প গঠনে জোর দেয়। এই লক্ষ্যেই তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত সহায়তাকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার সাথে দর-কষাকষির কাজে ব্যবহার করে এবং সে কাজে তারা সফলও হয়। পুঁজিবাদী বিকাশের লক্ষ্যে তারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করে এবং একই সাথে জমিদারদের সাথে মৈত্রী রক্ষা করে।

পরিকাঠামো, ভারি যন্ত্রশিল্পের বিকাশের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ প্রশস্ত করার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক, বিমা, কয়লা ও তেল শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করায় সে সুযোগ আরও প্রসারিত হয়েছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিকাশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে সম্পদের কেন্দ্রীভবন দ্রুত বেড়েছে। বেড়েছিল একচেটিয়া কারবার। বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার কাজেই তারা ব্যবহার করেছিল। এই সময়কালে এবং এখনও ব্যাঙ্ক ও সরকারি ঋণের বেশিটাই গেছে ও যাচ্ছে বৃহৎ বুর্জোয়াদের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ও করনীতির মূল লক্ষ্য ছিল এবং এখনও চলছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সম্পদ নিয়ে বুর্জোয়া-জমিদারদের ছোটো একটা অংশের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে। বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকির সুযোগ করে দিয়ে কালো টাকার পাহাড় গড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই কালো টাকা উদ্ধার না করে যেমন সমান্তরাল অর্থনীতি চালানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, তেমনই সরকার বারবার কালো টাকা ঘোষণার সুযোগ দিয়ে ওই অংশকে মূলধন সঞ্চয়ের সুযোগ করে দিয়েছে। এরই সাথে পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের নামে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ কর সংগ্রহ করে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকেই প্রশস্ত করেছে।

ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিকাশের পর থেকে বারে বারে সংকটের মুখে পড়েছে। প্রতিবার সংকটদশা থেকে মুক্তির জন্য নানা রাস্তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে রাস্তাই গ্রহণ করুক না কেন তার প্রধান দিক থেকেছে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষর ওপর বাড়তি বোঝা চাপানো। ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ, সস্তা কাঁচামাল ও শ্রমসম্পদকে ব্যবহার করার রাস্তা নেয়।

আমাদের দেশের অবস্থা বিশ্লেষণ করে সিপিআই(এম)-এর কর্মসূচির ৩.৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ''পঞ্চাশের দশক থেকে শাসকশ্রেণি ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে পথ নিয়েছিল তা সংকট-জর্জরিত হতে বাধ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত তা বদ্ধদশায় পৌঁছেও যায়। ভূস্বামীদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সমঝোতার ফলে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ল না, তার ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হল না। শিল্পায়নে অর্থ যোগান এবং রাষ্ট্রের ব্যয়নির্বাহে বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য এবং ফিসক্যাল ঘাটতি উভয় ক্ষেত্রেই গুরুতর

সংকট ডেকে আনল। অবশেষে এই আর্থিক সংকটের পরিণতিতে কংগ্রেস সরকার আই.এম.এফ-বিশ্বব্যাংকের শর্তাবলী মেনে নিল। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণি বিদেশি ফিন্যান্স পুঁজির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং অর্থনীতি উন্মুক্ত করে দিয়ে এই সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করছে।"

এই পদক্ষেপের ফলেই ১৯৯১ সালের জুলাই মাস থেকে আমাদের দেশে চালু হয়েছে উদারীকরণের নীতি। বিগত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের দেশে এই নীতি চালু থাকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বিপুলভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়েছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন

উদারীকরণ পর্বে কৃষি ও কৃষি-নির্ভরশীল শ্রেণিগুলিকে উদারীকরণ পর্বে যে-সব কারণগুলি প্রভাবিত করেছে সেগুলি হল—

- ভূমিসংস্কারের বিপরীত রাস্তায় হাঁটার লক্ষ্যে আইন পরিবর্তন ও কৃষি জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছে।
- কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রদ করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ দাম দেওয়া হচ্ছে না।
- গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামীণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমামো হচ্ছে।
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাত করার সরকারি পরিকাঠামো দুর্বল করা হয়েছে।
- গণবন্টন ব্যবস্থাকে দুর্বল করা হয়েছে।
- কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা দুর্বল করা হয়েছে। জাতীয় বীজবৈচিত্র্য ও জীববৈচিত্র্য সম্পদ সংরক্ষণে শিথিলতা আনা হয়েছে।

১৯৯১ সাল থেকে চালু উদারীকরণ পর্বে পুঁজির প্রবেশ ও নির্গমণ বা চলে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তার অনিবার্য পরিণতিতে কৃষি ও কৃষকদের দেয় রাষ্ট্রীয় সহায়তা কমানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে সারের ক্ষেত্রে পুষ্টিনির্ভর ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করায় বঞ্চিত হচ্ছে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক (প্রান্তিক : সেচ এলাকায় ১.২৫ ও অসেচ এলাকায় ২.৫ একর, ও ক্ষুদ্র : সেচ এলাকায় ২.৫ ও অসেচ এলাকায় ৫ একর) এবং তার পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে বেশি জমির মালিকরা।

পুঁজির প্রবেশ

উদারীকরণ পর্বের আগে থেকেই কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ শুরু হয়েছিল। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকের শুরুতে যখন দেশে খাদ্য স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহার শুরু হয় তখন থেকেই কৃষিতে পুঁজির বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করে। যদিও তখন পর্যন্ত কৃষিব্যবস্থা ছিল শ্রমনিবিড়। এর সাথেই আসে গ্রীষ্মকালীন ধান (বোরো) চাষ। গ্রীষ্মে সেচবিহীন এলাকায় জলের যোগানের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার করে উৎপাদন শুরু হয়। পরে কৃষিক্ষেত্রে যেমন যেমন উন্নত মানের বীজ, সার, কীটনাশক ও যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে তেমন তেমন বেড়েছে পুঁজির বিনিয়োগ। কৃষি ক্রমশ শ্রমনিবিড় থেকে পুঁজিনির্ভর হয়েছে। কিন্তু এটা বিবেচনায় রাখা দরকার যে দেশ বা রাজ্যের সর্বত্র পুঁজির বিনিয়োগের হার এক নয়। এক্ষেত্রেও অসমতা আছে।

উদারীকরণ-পর্বে কৃষি উপকরণগুলির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ কমে যাওয়ায় বেড়েছে মহাজন-নির্ভরতা। এই দুই কারণে উৎপাদনব্যয় বেড়েই চলেছে। এরই সাথে বেড়ে চলেছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম। এই দুই বৃদ্ধির বিচারে বাড়ছে না কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য। ফলে বাড়ছে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা। ফলে বাড়ছে কৃষকের আত্মহত্যা। বর্তমানে এই সংখ্যা তিন লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। গড়ে প্রতিদিন ৫২ জন কৃষক আত্মহত্যা করছেন। বাড়ছে কৃষকের জমি হারানোর প্রক্রিয়া। ২০১১ সালে জনগণনার পর সাংবাদিকদের কাছে সেন্সাস কমিশনার চন্দ্রমৌলি বলেছিলেন গড়ে প্রতিবছর ১০ লক্ষ কৃষক জমি হারাচ্ছেন। গত ৪ মার্চ, ২০১৬ 'ফ্রন্টলাইন' পত্রিকায় রমেশ চক্রপাণি লিখেছেন যে, ১৯৫১ সালে দেশের গ্রামাঞ্চলে মোট জনসংখ্যার ৮২.৭ শতাংশ লোক বাস করতেন, ২০১১ সালে এটা নেমে এসেছে ৬৮.৯ শতাংশে। সে বিচারে এই সময়কালে কর্ষণকারী কৃষকের হার নেমে এসেছে ৭১.৯ শতাংশ থেকে ৪৫.১ শতাংশে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এন.এস.এস) সূত্র অনুসারে ১৯৯২ সালে দেশে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের হার ছিল ৮৫.৩ শতাংশ। ২০১৩ সালে এই হার হয়েছিল ৯২.৮৩ শতাংশ।

জমি হারানোর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাড়ছে ভূমিহীনের সংখ্যা, বাড়ছে খেতমজুরের সংখ্যা। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে (আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িকে একটি জেলা হিসেবে ধরা আছে) প্রধান শ্রমিক খেতমজুর-এর সংখ্যা ৫৮,৬০,৫৯৫ জন। প্রান্তিক শ্রমিক খেতমজুরের সংখ্যা ৪৩,১৫,৮৫৯ জন। এটাই বাস্তব যে, মাঠে কাজের দিন কমায় এই অংশটি খেতমজুরি ছাড়াও বাঁচার স্বার্থে অন্য কাজও করেন। শুধুমাত্র এই দুটি ক্ষেত্র মিলে মোট সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৫৯ জন বা গ্রামীণ জনসংখ্যার ১১.৭৩ শতাংশ।

খেতমজুর সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় ১২ শতাংশ মানুষ যাঁরা খেতমজুরি বা অন্য কায়িক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থেকে, শ্রমশক্তি বিক্রি করেই জীবিকা নির্বাহ করেন, লেনিন যাঁদের 'গ্রামীণ সর্বহারা' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন, তাঁদের সংগঠিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু এই অংশই নয়, এর সাথে ৩-৬ মাস ও ০-৩ মাস প্রান্তিক শ্রমিক, প্রান্তিক শ্রমিক-অন্যান্য হিসেবে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের যুক্ত করা (মোট ৫৬ লক্ষ ৮০ হাজার ৩১১ জন) দরকার। কারণ বছরে ৩ বা ৬ মাস কাজ করে কেউ সংসার প্রতিপালন করতে পারে না। একই ভাবনা তাঁদের নিয়েও যাঁরা প্রান্তিক কৃষক হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন এবং বছরে ৩ মাস বা ৬ মাস জমিতে কাজ করেন। কারণ এঁদেরও ওই সামান্য জমির ওপর নির্ভর করে সংসার প্রতিপালন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে এঁরা অল্পদিনের মধ্যেই জমি হারাতে বাধ্য হবেন। স্বভাবতই এইসব অংশকে আপাতত একই ঝাণ্ডার নিচে, একই কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত করার লক্ষ্যেই খেতমজুর সংগঠন গড়া একান্ত প্রয়োজন।

বর্তমান পর্যায়ে আমাদের লক্ষ্য বুর্জোয়া বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজকে সমাপ্ত করা। এ কাজ করতে গেলে প্রয়োজন শুধুমাত্র পেশা হিসেবে যাঁরা খেতমজুরের কাজ করেন তাঁদের জয় করাই নয়, প্রয়োজন সমগ্র গ্রামীণ শ্রমজীবী অংশকেই জয় করা। গ্রামাঞ্চলের শ্রেণিভারসাম্যকে অনুকূলে নিয়ে আসা। শ্রমিক কৃষকের দৃঢ় মৈত্রী। আর মৈত্রী গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ভূমিহীন কৃষক বা খেতমজুররাই। তাই এই অংশকে সংগঠিত করার কাজটি খুবই জরুরি। গ্রামীণ এলাকায় আশু রণনীতিগত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিপিআই(এম)-কে অগ্রসর হতে হবে।

দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ও তার ভূমিকা

সন্তোষ দেবরায়

৫ আগস্ট ১৯৬৬। দুর্গাপুরের হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের উদ্যোগে তৎকালীন প্রশাসনিক ভবনের সামনে জমায়েত ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের পক্ষ থেকে কিছু দাবি-দাওয়া সম্বলিত মেমোর্যান্ডাম ডিএসপি-র জেনারেল ম্যানেজারকে দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। শুধু অস্বীকারই করেন না, পরিবর্তে অফিস ছেড়ে চলে যাওয়ার পথের জমায়েতকে হঠিয়ে তাঁর গাড়ির রাস্তা করে দিতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা প্রশাসনিক ভবনে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হন নেতৃত্ব সহ অসংখ্য শ্রমিক-কর্মচারী। গুরুতর জখম অবস্থায় জব্বরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবং শেষ রাতে তিনি শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। জব্বরের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন সেক্টরে জমায়েত হয়ে মিছিল সংগঠিত করেন এবং পুলিশ প্রশাসনের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যারিকেড গড়ে তোলেন। ৬ আগস্ট সকাল ৯টা নাগাদ বর্তমান আশীষ মার্কেট সংলগ্ন রাস্তায় পুলিশ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আশীষ দাশগুপ্তকে গুলি করে এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। উভয় ঘটনার প্রতিবাদে ইস্পাতনগরীর সমস্ত অংশের মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং ১৪৪ ধারা ও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি ঘৃণায় ইস্পাতনগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করেন। ইউনিয়নের আহ্বানে লাগাতার ধর্মঘট এবং যে মৌন প্রতিবাদ মিছিল হয় তাতে ইস্পাতনগরী সহ সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এক্ষেত্রে মহিলারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জব্বর এবং আশীষ দাশগুপ্তের মৃত্যুর জন্য ১৯৬৬ সালের ৬ আগস্টের আন্দোলন দুর্গাপুরের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের কাছে আজও লড়াই সংগ্রামের অভিমুখ হয়ে আছে।

□

হিন্দুস্তান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬১ সালে। দেশের স্বাধীনতার পর তৈরি হওয়া দুর্গাপুর ব্যারেজ, জি.টি রোড, রেললাইন ও স্টেশন ইত্যাদির অবস্থান থাকার ফলে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে শিল্পনগরী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বামপন্থীরা এই উদ্যোগকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে। অসংখ্য ছোটোবড় কারখানা। বিগত পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তরতাজা যুবকরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় একের পর এক চাকরিতে যোগদান করেন।

পশ্চিমবাংলার খাদ্য আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ট্রেন ভাড়া বৃদ্ধির আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন এবং পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতাকাতলে থাকা ইত্যাদির প্রভাব দুর্গাপুরে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অকুতোভয় শ্রমিক হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন গড়ে তোলার বিষয়ে সংস্থার তৎকালীন কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসনের শ্যেনদৃষ্টিকে এড়িয়ে এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৯৬১ সালে শত্রুপক্ষের নজর এড়িয়ে অত্যন্ত গোপনে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৬৩ সালে প্রথম সম্মেলনে অজিত মুখার্জী সভাপতি হন। ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে সমস্ত কাজ অত্যন্ত গোপনে করা হত। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে নানাবিধ অপপ্রচার, নৃশংস আক্রমণ ও প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে ইউনিয়ন পরিচালিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে প্রথম ওয়ার্কার্স কমিটি নির্বাচনে ইউনিয়নের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৯ জন জয়ী হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই ইউনিয়নের প্রতি শ্রমিক-কর্মচারীদের আস্থার বহিঃপ্রকাশ। দুর্গাপুরের বিভিন্ন ছোটো, বড়ো, মাঝারি, শিল্প শ্রমিকদের লড়াই-আন্দোলনের মধ্য সমন্বয় সাধন করে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে চলার ক্ষেত্রে গড়ে তোলা হয় দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি। হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, ডিএসপি এবং ইতিমধ্যে গঠিত হওয়া এ.এস.পি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধভাবে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আগস্ট আন্দোলনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে পাথেয় করে শ্রমিক আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সহযোগী শক্তি হিসেবে কৃষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সহ সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া সম্ভব নয়, এই উপলব্ধি থেকে ইস্পাতনগরী সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রথীন রায় সহ ইউনিয়নের কয়েকজন নেতৃস্থানীয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। গড়ে তোলা হয় গণতান্ত্রিক মহিলা সংসদ। ইস্পাতনগরীর বিভিন্ন সেক্টরে গড়ে ওঠে সেক্টর কমিটি। ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই সময়কালেই ডি.এস.পি-র ঠিকাদার

শ্রমিকদের সংগঠিত করার প্রয়োজনে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল এবং গড়ে ওঠে ইউনাইটেড কনট্রাক্টর্স ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। এর অনেক পরে এ.এস.পি-তে এ.এস.পি.সি.ই.ইউ. এবং ইস্পাতনগরীতে টি.সি.ই.ইউ গড়ে ওঠে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য ৩৫টিরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি তিনটি মাধ্যমেই পড়াশোনার জন্য ১৫০০-র বেশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক নিযুক্ত হন। হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ শিক্ষক নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করে ও পরামর্শ দিয়ে একটি শক্তিশালী অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করেন। প্রথম দলমত নির্বিশেষে একটিই সংগঠন থাকলেও পরবর্তীকালে বামবিরোধী মনোভাবাপন্ন কয়েকজন শিক্ষক স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর সাথেই পরামর্শ করে সংগঠন পরিচালনা করতে থাকেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ও ইস্পাত কর্তৃপক্ষের শিক্ষায় বেসরকারীকরণ নীতি গ্রহণের ফলে ইস্পাত কারখানার স্কুলগুলি অবলুপ্তির মুখে, ফলে শিক্ষক সংগঠনটিও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

শ্রমিকদের বসবাসের এলাকাগুলি হকারমুক্ত করে ইস্পাতনগরীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী স্টল নির্মাণ করে হকারদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে।

ইস্পাতনগরী সংলগ্ন এলাকায় যত্রতত্র গরু-মহিষের খাটাল গজিয়ে ওঠায় সামগ্রিকভাবে একটি পরিচ্ছন্ন নগরীর পরিবেশ দূষিত হচ্ছিল। ইউনিয়ন এ-বিষয়েও সজাগ ছিল।

খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড প্রসারেও ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। দুর্গাপুর ইস্পাতের কর্মী ও ইউনিয়নের নেতা দিলীপ মজুমদারকে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী করার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা ক্ষেত্রের মানুষ এক উন্নত চেতনার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সময়ে ইউনিয়নের ভেতরে এবং বাইরে ইউনিয়নকে একই সাথে সংকীর্ণতাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম করে ইউনিয়নকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, কিন্তু উভয় ঝোঁকের বিপদ থেকে ইউনিয়নকে রক্ষা করা গেছে, এ দাবি করা যায় না।

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের রিগড় নির্বাচন ও ২০১১ সালের সন্ত্রাসপূর্ণ নির্বাচন ছাড়া ২০১৬ পর্যন্ত (মৃণাল ব্যানার্জির মৃত্যুর পর একটি উপনির্বাচন সহ) টানা ১২ বার দুর্গাপুরের শ্রমিক-কৃষক, রিক্সা ও ভ্যানচালক, হকার, পরিবহন কর্মী, মহিলা-ছাত্র-যুব, বস্তিবাসী, আধিকারিক সহ বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ সমাজের সমস্ত অংশের জনগণের ভোটে বামপন্থী শক্তি জোটবদ্ধ হয়েছে।

১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক, বীমা ক্ষেত্র, কয়লাশিল্প ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়করণ করার বিষয়টিতে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদর্থক ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে।

প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার প্রতিবাদে রাজ্যব্যাপী যে গণআন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, দুর্গাপুরেও এই আন্দোলনের ব্যাপকতা তৈরি হয়। ১৯৬৮ সালে অটোমেশন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৭০ সালে সি.আই.এস.এফ. বাহিনী বলপূর্বক দুর্গাপুর ইস্পাতে ঢোকানোর প্রতিবাদে লড়াই-আন্দোলন সহ ১১ দিনের ধর্মঘট সংগঠিত হয়। এই ধর্মঘটে বৃহত্তর দুর্গাপুরের ৬০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘটী মনোবলকে ভাঙার জন্য সিআরপিএফ, এসএপি, বিএসএফ, হরিয়ানা পুলিশ সহ আইএনটিইউসি-র ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর অবর্ণনীয় দৈহিক অত্যাচার সত্ত্বেও শ্রমিক-কর্মচারীদের অটুট মনোবলে ফাটল ধরানো যায়নি। এইচ.এস.ই.ইউ সহ দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। লড়াই-আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থাকার ফলে ১৯৬৯ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০-র ২২ আগস্ট ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর শ্রমিক-কর্মচারীরা কাজে যোগদান করতে গেলে তাদের নামে নামে প্রায় ৭৫০০ জনের মতো মেজর চার্জশিট ধরিয়ে ছাঁটাই করার পরিকল্পনা নিয়ে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে মানস মুখার্জীকে কোনো কারণ না দেখিয়ে সরাসরি ছাঁটাই করা হয়। তবে ডিএসপি ও এএসপি-র অন্য কোনো শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করতে কর্তৃপক্ষ সমর্থ হয়নি। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে নকশাল ও কংগ্রেস গুণ্ডাবাহিনী ও পুলিশ-প্রশাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ইস্পাত নগরীর মহিলারা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯৭০ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত নজিরবিহীন ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাকালীন সময়ে দুর্গাপুর সহ রাজ্যব্যাপী অসংখ্য সিপিআই(এম) কর্মী শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। অসংখ্য কর্মী মিসা, পি.ডি অ্যাক্ট ইত্যাদি আইনে বিনা বিচারে জেল খেটেছেন। ঘরছাড়া হয়ে থাকতে হয়েছে অসংখ্য কর্মীকে। ইউনিয়ন অফিস লুঠ হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ৭০০ জন ঠিকা শ্রমিককে বলপূর্বক কারখানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন রাতে দেশে জারি করা হয় অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা। এই ঘোষণার বিষয়টি জানার পর দেশের মানুষ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এইরকম একটা জটিল এবং কঠিন পরিস্থিতিতে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মুখোমুখি হয়েও ইউনিয়ন পরিচালনায় মতাদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখে দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়েছে।

১৯৭৭ সালে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এই নির্বাচনে দুর্গাপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দিলীপ মজুমদার জয়যুক্ত হওয়ার পিছনে দুর্গাপুরের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতি সাধারণ মানুষের স্বীকৃতি দেওয়ারই প্রমাণ মেলে। ১৯৭৮ সালের ভয়ঙ্কর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারকার্যে ইউনিয়নের সাধারণ কর্মী সহ নেতৃত্ব একদিনে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি কারখানার বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্রাংশকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করে স্বেচ্ছায় শ্রমদান সহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শিল্পকে রক্ষা করা শ্রমিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে যেমন পড়ে, তেমনি শিল্পের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের প্রশ্নে 'সিক চাইল্ড অব দুর্গাপুর' নামে পুস্তিকাটি প্রকাশের তাগিদ থেকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে শিল্পায়নের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কারখানার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হয়।

একদিকে কারখানার ম্যানিং-এর প্রশ্ন, বোনাসের দাবি ইত্যাদির আন্দোলন এবং তা আদায়ে অনেকক্ষেত্রে সফলতা এসেছে। অন্যদিকে ওভারটাইমের পরিবর্তে উৎপাদন বোনাস, পোষ্যের চাকরির প্রশ্নে মতাদর্শগত আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থে প্রথমে ক্রেডিট সোসাইটি গড়ে তোলা এবং পরবর্তী সময়ে তা ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করা হয়। মহিলা ব্যাঙ্ক সহ

একাধিক হাউসিং সমবায় গড়ে তোলা এবং তা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলনে ইউনিয়নের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অন্যদিকে বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধেও বস্তিবাসীদের সাথে নিয়ে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করার ফলে একতরফা বস্তি উচ্ছেদের পরিকল্পনা থেকে কর্তৃপক্ষকে বিরত থাকতে বাধ্য করা হয়। বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলতে ডিএসপি-র ঠিকা শ্রমিক সহ ডিএসপি ও এএসপি-র শ্রমিক-কর্মচারীরা ৩ দিনের বেতন ও শ্রমদান করেছেন। দুর্গাপুরের ছাত্রযুব এবং মহিলারা রক্তদান করে এক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯৭৫ সালে আধাফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখে জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাবেশে ঝাণ্ডা সহ অথবা ঝাণ্ডা ছাড়া যোগদান করার প্রশ্নে, ঝাণ্ডা ছাড়া যোগদানের বিষয়টি সমর্থনের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদর্থক ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন সময়ে কর্মরত কোনো ঠিকা শ্রমিককে কারখানা থেকে ছাঁটাই না করে, ১৯৭৪ সালে বলপূর্বক উচ্ছেদ হওয়া ৭০০ জন ঠিকা শ্রমিককে পুনর্বহাল করার ক্ষেত্রে ইউসিডব্লুইউ-র পক্ষ থেকে ইস্পাত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত করা, সেই সাথে এইচএসইইউ-এর নানারকম উদ্যোগ সহ কর্তৃপক্ষের উপর ক্রমাগত চাপ তৈরির ফলে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৫৫০০ জন ঠিকা শ্রমিককে চুক্তি অনুযায়ী ডিএসপি-তে স্থায়ীপদে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৮৪ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যা এবং সারা দেশব্যাপী শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের ওপর অত্যাচার ও হত্যা, উভয় ঘটনার নিন্দাসহ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার কাজ যেমন ইউনিয়ন থেকে করা হয়েছিল, তেমনই শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষকে রক্ষা করতে তাদের বাসস্থানে পাহারা ইত্যাদির ব্যবস্থা করার মধ্য দিয়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সারা দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রশ্নে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা হয়েছিল।

ইস্পাত শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের সমন্বয় ঘটানোর লক্ষ্যে এইচএইইউ-র উদ্যোগে ১৯৮২ সালের ৮ জানুয়ারি দুর্গাপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয় 'স্টিল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া', যা ১৯৭০ সালে ভিলাইতে অনুষ্ঠিত ২৬ জুলাই ভিলাই কনভেনশনে কমিটি গঠন করে কাজ করার অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। কারখানার ভেতরে ও বাইরে ইস্পাতনগরীতে নিরক্ষর শ্রমিক-কর্মচারী সহ অন্যান্যদের নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে সাক্ষরতা সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এইচএসইইফ এবং ইউসিডব্লুইউ এক উজ্জ্বল ভূমিকা পালনে ব্রতী ছিল।

১৯৯১ সালে উদার অর্থনীতির সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে যৌথ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা রূপায়ণে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয় সহ সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে শ্রেণি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার বিষয়েও ইউনিয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল।

২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তীব্র সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী তৃণমূল কংগ্রেস দুষ্কৃতী ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াই-সংগ্রাম করার মাধ্যমে রাজ্যে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই সময়কালের মধ্যে কেবলমাত্র দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা থেকে ৫০০ জন মহিলা সহ ৩৫০০ জন ঠিকা শ্রমিককে রাজনৈতিক কারণে বলপূর্বক উচ্ছেদ করে দুর্গাপুর পৌর নিগম, ক্রেতা সমবায় এবং দুর্গাপুর স্টিল পিপলস্ কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি নির্বাচনকে তৃণমূলের সরকার প্রহসনে পরিণত করে। জম্মু-কাশ্মীর এবং নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহকারীদের ওপর তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের নৃশংস আক্রমণ ইত্যাদি সংগঠিত করা সত্ত্বেও ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা করা, ইউনিয়ন দপ্তরে একাধিকবার আক্রমণ, কারখানার ভিতরে এবং কারখানার বাইরে ইউনিয়ন নেতৃত্ব সহ কর্মীরা বর্বরোচিত আক্রমণের শিকার হয়ে দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি ঠিকাদার শ্রমিক সহ মহিলারাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পান নি। সামগ্রিক এই কঠিন পরিস্থিতিতেও শ্রমিক-কর্মচারীদের স্বার্থ বিরোধী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতিগত আক্রমণের বিরুদ্ধে ডিএসপি এবং এএসপি আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের দাবি এবং পরিষেবা সহ অন্যান্য স্থানীয় ইস্যুতে ইউনিয়নের ধারাবাহিক আন্দোলন এখনও অব্যাহত আছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও গোপন ব্যালটে গত ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচনে দুর্গাপুর ইস্পাতের শ্রমিক-কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নকে সমর্থন করার ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, ইউনিয়ন পরিচালনা সম্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীদের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট আছে।

সিআইটিইউর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বি টি রণদিভে ইউনিয়নের প্রতি সম্মেলনে উপস্থিত থেকে প্রতিনিধিদের আলোচনাকে উৎসাহত করে সম্মেলনকে উজ্জীবত ও সঠিক দিশায় ইউনিয়ন পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। বিটিআর কনফেডারেশনের লক্ষ্যে 'সংগ্রাম- ঐক্য-সংগ্রাম'-এর শ্লোগানকে সামনে রেখে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, ইউনিয়ন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সেই লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে সিআইটিইউ-কেও পরিচালনা করেছিলেন। নীহার মুখার্জী, বিনয় চৌধুরী, রবীন সেন, মনোরঞ্জন রায়, চিত্তব্রত মজুমদার, দিলীপ ব্যানার্জী, নিরুপম সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইউনিয়ন গঠন এবং পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত থেকে সঠিক দিশায় ইউনিয়ন পরিচালনা করতে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

১৯৬৬ সালের ৬ আগস্টের ঘটনার ৫০ বছর পূর্তি আমরা পালন করছি। প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচি ও যথাযথ মর্যাদার সাথে এই দিনটি পালিত হয়। ইতিমধ্যে ১৭ জনের শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। অসংখ্য কর্মী এই ইউনিয়নের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস সহ গর্ব অনুভব করেন। ৫০ বছর পূর্তিতে সমাজতন্ত্র গড়ার লক্ষ্যে মতাদর্শে বলীয়ান হয়ে সময়োপযোগী সংগঠন গড়ে তোলাই হবে আমাদের আগামী দিনের কাজ এবং শহিদদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানোর অঙ্গীকার।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

আমাদের লক্ষ্য—নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত

বাড়িতে একটি শৌচাগার বানান

পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষা করুন

এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর

খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ সিদুলি, জেলা বর্ধমান

রমানাথ দত্ত
উপপ্রধান

তারাবতী মাঝি
প্রধান

Sl. No. 117

গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের নতুন পদ্ধতি এবং প্রতিরোধ

নিশীথ অধিকারী

ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এটি সংবিধান-ঘোষিত। ভারত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গণতন্ত্র। বলা হয় ৭০ বছরে ভারতে গণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে। কিন্তু, এর উল্টোদিকটি হল অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদির নিরিখে ভারতের নাগরিকরা নানাভাবে বিভক্ত এবং বিভাজনের এই দিকগুলিকে বিভিন্ন সময় আমরা গণতন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকটভাবে উপলব্ধি করি। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বাধীন ভারতে সংবিধান প্রণয়নের পর ইংরেজ রাজনীতিবিদরা অনেকে বলেছিলেন গণতন্ত্রের জায়গা একমাত্র ঈশ্বরশাসিত ব্রিটেন, ভারতবর্ষ নয়। কারণ গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে সর্বজনীন শিক্ষা ও সচেতনতার ওপর। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতে সর্বজনীন শিক্ষার হার একেবারেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। এবং এখনও এই হার আশাপ্রদ নয়। কিন্তু যারা শিক্ষায়, অর্থে, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় উচ্চস্থানে বিচরণ করেন তাঁরা কেউই আপামর জনসাধারণকে নিজেদের সমান ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। সুতরাং স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই গণতন্ত্রের ওপর আমাদেরই শাসকশ্রেণি আক্রমণ শুরু করে এবং এই আক্রমণ সংগঠিত হয় প্রথমেই কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করার মাধ্যমে।

বিচারপতি অজয় নাথ রায় তাঁর গ্রন্থ 'Jurisprudencial Thoughts' নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করে বলেছেন যে, নির্বাচনের অধিকারকে কোনোভাবেই সর্বজনীন করা উচিত নয়। তাঁর মতে, নির্বাচকমণ্ডলীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা উচিত। তাঁদের দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতার জন্যই, যাঁরা কর দেন না, তাঁদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকা উচিত নয়। এমনও অভিযোগ করা হয়েছে যে, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিলে, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তা হবে দুটি অসমকে। সমান করার একটি অনৈতিক প্রচেষ্টা। ফলে সমাজে নতুন বৈষম্যের সৃষ্টি হবে।

এই কারণে শ্রেণিবিভক্ত ভারতীয় সমাজে সর্বজনীন ভোটাধিকার (যেটা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি) উচ্চশ্রেণির কাছে প্রায় কোনোদিনই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবু, গণতন্ত্রের পক্ষে ব্যাপক গণসমর্থনের জন্য বিভিন্ন কারণে সুবিধাভোগী শ্রেণি গণতন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ তৈরি করে ৭০ বছর ধরে গণতন্ত্রের শব-সাধনা করে চলেছে। এই রকম ভঙ্গুর গণতন্ত্রের ওপরও শাসকশ্রেণি আস্থা রাখতে না পারার জন্য এর ওপরও আমরা আক্রমণ চলতে দেখেছি গত কয়েক দশক ধরে। স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল থেকে যাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আছেন, তাঁরাও অনেকেই জনপ্রতিনিধিদের ভালোমন্দ নির্বিশেষে চরিত্রহনন এবং কদর্য মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পরোক্ষে তাঁদের কলঙ্কিত চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করে এসেছেন। ফলে সৎ পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং শৃঙ্খলাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও জনমানসে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যেটা গণতন্ত্রের ওপর একটি চতুর ও সুকৌশলী আক্রমণ।

সম্প্রতি বিশ্বায়নের ফলে এবং প্রযুক্তিবিপ্লবের পরে সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ বাণিজ্যিক সংস্থাদের হাতে চলে গেছে, আর সেই সংবাদমাধ্যমগুলি প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের মনন ও চিন্তন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবার জায়গায় এসেছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বার্থে বহুজাতিক সংস্থাগুলি মানুষের মনোজগতকে নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ার বিভিন্ন গণমাধ্যমকে, বিশেষ করে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে এবং তা আপাতদৃষ্টিতে জনস্বার্থের পক্ষে প্রচারিত হলেও আসলে কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থে প্রচারিত হচ্ছে। বাণিজ্যিক স্বার্থের চোখধাঁধানো উজ্জ্বল প্রচারের চাপে মানুষ তার মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্র হারিয়ে ফেলছে, যেটা গণতন্ত্রের পক্ষে এক অশনিসংকেত।

কয়েক দশক আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের কর্তা জানিয়েছিলেন যে, 'We purchased the Centres of Power of economically trapped countries.' এই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলি যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত মানুষেরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তা নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার পক্ষে সুখপ্রদ নয়। এই জন্যই গণতান্ত্রিক সংস্থা অর্থাৎ পার্লামেন্ট বা বিধানসভার বাড়বাড়ন্ত শোষকদের ক্ষেত্রে, যাঁরা সমাজ শোষণ করেন, তাঁদের পছন্দ নয়। এতদিন যে গণমাধ্যমগুলো (যাদের আমরা গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' বলি) দেশের আইনসভাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকত, এখন তাদের অন্যদিকে তাকাবার সময় এসেছে।

১৯৭৫ সালের পর থেকে লক্ষ করা যাবে যে, দেশের বিচারকেরা (বিশেষ করে উচ্চ আদালত), তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেই চলেছেন। বিচারব্যবস্থার অতি সক্রিয়তা সর্বত্র লক্ষিত হচ্ছে। কী ঠিক, কী ভুল—এ স্থির করার চেয়ে কোন পক্ষ ঠিক, কোন পক্ষ ভুল, এটাকে স্থির করাই বিচারকরা তাঁদের কর্তব্য বলে ধরে নিচ্ছেন। এখন মূলত সরকারের কী কর্তব্য, কী কর্তব্য নয় এটাই আদালতের নির্দেশ হিসেবে চালু হয়েছে। এতদিন বিচারব্যবস্থার পদ্ধতি হিসেবে ধরে, বিরোধী পক্ষের অভিযোগকারীরা এখন অনেক ক্ষেত্রেই ঠিক নিজের স্বার্থে নয়, জনসাধারণের স্বার্থেই আদালতকে ব্যবহার করছে এবং আদালত আজকাল বহু ক্ষেত্রেই আইনসভার বিরোধী পক্ষের ভূমিকাটি গ্রহণ করছে। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে লোকসভা এবং রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে বিরোধী সদস্যদের যুক্তিশাণিত সোচ্চার প্রতিবাদ

এখন আর শোনা যায় না। অথচ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে এই সোচ্চার যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদ গণতন্ত্রের ওপর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারত। গণতন্ত্র এখন আহত, রক্তাক্ত।

আমরা জানি ভারত নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত। জনপ্রতিনিধিরাই মন্ত্রিসভা তৈরি করেন, বাজেট করেন এবং টাকা ভাগ করে দেন। এছাড়া যাঁরা আইনসভার সংখ্যালঘিষ্ঠ বিরোধী পক্ষ, সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের সমালোচনা করে তাদের শাসনকালে জনবিরোধী কার্যকলাপ এবং অপশাসনকে উন্মোচন করেন, যা সাধারণ মানুষের কছে পৌঁছে যায় বিভিন্নভাবে, যার ফলে সরকারের বিপক্ষে ব্যাপক গণআন্দোলনের সুযোগ তৈরি হয় এবং মাঠে ময়দানে এই ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমেই অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারের পতন হয়।

কিন্তু এখন আমরা দেখছি যে, বিধানসভার কার্যপদ্ধতির সুযোগ গ্রহণ করে সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীপক্ষের সমালোচনাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভার মূল্যায়ন ঠিক করা, কীভাবে চলবে তার নীতিকে ঠিক করা ইত্যাদির জন্য আইন হচ্ছে সেকসন ১৫ এবং ১৬। যেমন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৫ ধারায় আছে সঠিক কার্য পদ্ধতি আইন। যে বিষয় কোনো আদালতের বিচার্য, তা বিধানসভায় আলোচনা করা যাবে না। এই আইনটিকে সামনে রেখে আমরা লক্ষ করছি যে দিন-কে-দিন আইনসভা, বা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রশ্ন-উত্তর প্রস্তাব, কাটমোশন, নো-কনফিডেন্স মোশন, এগুলি কার্যত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আদালতগুলিতে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলাগুলির ভিড় বেড়েই চলেছে, যেটা খুবই উদ্বেগজনক। মানুষ আদালতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ক্রমশ আন্দোলনবিমুখ হয়ে পড়ছে। সুতরাং, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে বহমান ধারায় আমাদের গণতন্ত্র পুষ্ট হচ্ছিল, বিকশিত হচ্ছিল, সেটা এখন প্রচণ্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এবং নিঃসন্দেহে সকলের অলক্ষ্যে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত এইভাবে তীব্রতর হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে গত শতকের পঞ্চাশের দশকের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন, এক পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির জন্য ১৭টি ট্রাম পুড়েছিল। সেই পশ্চিমবঙ্গেই সারদার মতো এমন ন্যক্কারজনক জালিয়াতির ঘটনায় বিধানসভা নিশ্চুপ। এমনকি নারদা ঘটনাও বিধানসভাতে আলোচনা হয়নি। এই ঘুষকাণ্ডে যাঁরা জড়িত, তাঁরাই তাদের স্ত্রী-পরিজন দিয়ে মামলা করে বসলেন এবং যিনি এই ঘটনাকে জনসমক্ষে নিয়ে এলেন তাঁকেই অভিযুক্ত করা হচ্ছে। বিরোধী পক্ষেরও অনেকে, কষ্টসাধ্য গণআন্দোলনের থেকে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন পছন্দ করছেন এবং এটাকে সামনে তুলে ধরছেন বৈদ্যুতিন মাধ্যম। আদালত যে কোনো অবস্থাতেই বিধানসভা বা বিরোধী পক্ষের বিকল্প নয়, এটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। এই বিষয়গুলি নিয়ে তাবৎ নাগরিকের সচেতন আলোচনা প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণের ওপর এবং মানুষের এই বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভর করে সৎ, পরিচ্ছন্ন, শাণিত বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক নৈতৃত্বের ওপর যাঁরা—বিভিন্ন সভাসমিতি ও গণআন্দোলনের মাধ্যমে জনমত তৈরি করবেন। সেই জনমতই (বর্তমান সংবাদ মাধ্যমগুলির উদ্যোগে Manufactured Public Opinion নয়) গণতন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যেটা গণতন্ত্রের ওপর বর্তমান শাসকশ্রেণির এই নগ্ন আক্রমণকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে পারবে। এই আশা ও বিশ্বাসই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

Hero

Sk. Abdul Goni
A.R.D. Director

SK AUTO

Authorised Representative
Badiyapur (Patilpara More), M : 9851718641
Kalna, Burdwan, PIN : 713122
E-mail : skauto2015@yahoo.com

Sl. No. 20

বর্তমান পরিস্থিতি ও বামপন্থীদের কর্তব্য

সুকান্ত কোঙার

বামপন্থা এখন এক কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে আছে। কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও অনেক সম্ভাবনাময় উপাদান আছে। এই উপাদানগুলি বামপন্থার অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে। তাই এইগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে কাজে লাগিয়ে বামপন্থীদের এগিয়ে যেতে হবে। বামপন্থীদের সামনে এটাই চ্যালেঞ্জ এবং তারা পারবে।

পরিস্থিতি কঠিন এই কারণে যে বিগত নির্বাচনে বামপন্থীদের পরাজয়, তারা হারানো জনসমর্থন ফেরত পায়নি—অথচ তাদের প্রত্যাশা ছিল বিরাট। তার ওপর সিপিআই(এম)-কর্মীদের ওপর আক্রমণের মাত্রা অনেক বেড়েছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলত্যাগের হিড়িক, যেটা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ছিল বিরল। বোঝা যাচ্ছে যে জোড়াতালি দিয়ে এর মোকাবিলা করা যাবে না, পার্টির ভিতরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদর্শকত সংগ্রাম চালিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে।

ধারণা কি সবসময় মেলে? মেলে না—মেলা সম্ভব নয়। ১৯৬২ সালে বামপন্থীদের-কে চিনের দালাল এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের দালাল বলে চিহ্নিত করে জেলে পোরা হয়েছিল। অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এবং বামপন্থীদের ভুল বুঝেছিলেন। তখনকার নেতৃত্ব কি ১৯৬২ সালে ভেবেছিলেন যে ৫ বছরের মধ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের শাসনের অবসান হবে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবে এবং বামপন্থীরা এই রাজ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চলে আসবে। বাস্তবে এটা ঘটেছে এবং তা সম্ভব হয়েছে মানুষের দাবি নিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই করেই। ১৯৭৭ সালে কি কেউ ভাবতে পেরেছিল যে সারা ভারতে তখনকার তথাকথিত ‘এশিয়ার মুক্তিসূর্য’ ইন্দিরা গান্ধীসহ সমগ্র কংগ্রেস দলের ভরাডুবি ঘটবে, সত্তরের দশকের সন্ত্রাসের দিনগুলোর অবসান ঘটবে? কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেছিল। এর অর্থ এই নয় যে ধারণা না মেলার কারণ কমিউনিস্টরা খুঁজবে না। খুঁজতে হবে এবং দুর্বলতাগুলো কাটাতে হবে। নির্বাচন সহ বিভিন্ন সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টি কখনো জিতবে, কখনো হারবে—এটাই স্বাভাবিক। শুধু সাফল্য আসবে এটা হয় নাকি? তাহলে তো লেনিনকে একথা বলতে হত না —“অনেক খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে পরাজয়ের পরে আখেরে জেতে কমিউনিস্টরাই।”

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলকে শুধু আসনসংখ্যার নিরিখে নয়, মানুষের প্রাপ্ত ভোট দিয়ে বিচার করতে হবে। ২০০৬ সালে বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা ছিল ২৩৫। ভোট প্রাপ্তির নিরিখে এই হার ছিল ৫০.১৮ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এটাকে হিসেবের মধ্যে না রাখলে প্রকৃত অবস্থানকে বোঝা যাবে না, সাফল্যকে ফাঁপিয়ে দেখা হবে এবং তা ঘটেছিল। এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসন ২১১, কিন্তু শতকরা ৫৫ ভাগ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। জোটের ভোটের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ভোটের ফারাক বুথপিছু প্রায় ৪০টি। অর্থাৎ বুথপিছু ২০টা ভোট তৃণমূল থেকে চলে এলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। যদিও সকলেই জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের বেশ কিছু জাল।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ নতুন বা অপ্রত্যাশিত নয়। এই আক্রমণের মোকাবিলা করেই কমিউনিস্ট পার্টি টিকে থেকেছে, এগিয়েছে। কঠিন পরিস্থিতি থাকবে, আক্রমণ থাকবে, জয়-পরাজয় থাকবে। তার মধ্য দিয়েই কমিউনিস্ট পার্টিকে এগোতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য বর্তমান পুঁজিবাদী-জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা। কারণ এই সমাজব্যবস্থাই মানুষের সব সমস্যার মূলে। কিন্তু ওদের হাতে রাষ্ট্রযন্ত্র আছে। তার আক্রমণের মোকাবিলা করেই কমিউনিস্টদের এগোতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ তার দুর্বলতার পরিচয় নয়, এটা তার সবলতার পরিচয়। এর জন্য কমিউনিস্টদের গর্ববোধ থাকতে হবে এবং মানুষকে বোঝাতে হবে যে কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণ আসলে মানুষের ওপরেই আক্রমণ।

বর্তমানে সিপিআই(এম) কর্মীদের অধিকাংশই বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে আসা। শাসকশ্রেণির প্রবল আক্রমণের মোকাবিলা করে কীভাবে কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়েছে তা দেখার সুযোগ তাদের হয়নি। এই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে বামফ্রন্ট সরকার কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেনি, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মানুষের—বিশেষত সমাজের দরিদ্র অংশের মানুষের দাবি নিয়ে লড়াই কমিউনিস্ট পার্টিকে জনপ্রিয় করেছে। ভোট বেড়েছে, বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হয়েছে। অনেক কাঁটা বিছানো পথ অতিক্রম করেই কমিউনিস্ট পার্টিকে এগোতে হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি লড়াই করার মানসিকতা নিয়েই কমিউনিস্ট পার্টি করতে হবে। আশু সাফল্য আসবে এমনটা যেমন নয়, আবার চিরকালের জন্য ভবিষ্যৎ অন্ধকার এমনটাও হতে পারে না।

কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের ভালো করে মনে রাখতে হবে যে কমিউনিস্ট পার্টি ভোটের পার্টি নয়। কমিউনিস্ট পার্টির মূল লক্ষ্য হল সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করা। সিপিআই(এম) ভোটে অংশগ্রহণ করে এজন্য নয় যে ভোটের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও প্রশাসনের দায়িত্ব পেলে পার্টির শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানুষের জন্য যে কিছু করা যায় তা বামফ্রন্ট-শাসিত রাজ্যসরকারগুলো দেখিয়েছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের সাহায্য নিয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধী দলগুলি যত কুৎসাই করুক না কেন, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে

ফেলা যাবে না।

নির্বাচনী সংগ্রামকে পার্টি কেমনভাবে দেখবে? এই বিষয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর 'নির্বাচন ও কমিউনিস্ট পার্টি' শীর্ষক রচনায় লিখেছেন, ''নির্বাচনে জয়লাভের কথা সবকিছুর আগে ওঠে, কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কাছ জয়লাভ করা নিশ্চয়ই কাম্য, তবে একমাত্র কাম্য নয়। নির্বাচনের ভেতর দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবধারা প্রচারিত হয় এবং পার্টির প্রভাব প্রসারিত হয়। এই দুটি কথাকে ভুলে গিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এই নির্বাচন হবে বৃথা, নির্বাচনে অধিক সংখ্যায় জিতে গেলেও। আজ যে আমরা নির্বাচনে নামছি তার প্রতি পদক্ষেপে আমাদের ভাবতে হবে এই নির্বাচনের কাজ থেকে দল হিসেবে সিপিআই(এম) কী লাভ করল? সাধারণ মানুষের কতটা রাজনৈতিক চেতনা, কতটা মার্কসীয় চেতনা আমরা বাড়াতে পারলাম? নির্বাচনে আমরা ভোট আহরণ করব। ভোট পেলেই নির্বাচনে জয়লাভ হয়। এই ভোটগুলি যাতে সচেতন ভোট হয় সেই প্রচেষ্টাই আমাদের একান্তভাবে করতে হবে। আসল কথা হচ্ছে, নির্বাচনের লড়াই আমরা কীভাব লড়ব? মার্কসীয় ভাবধারা আমরা জনসাধারণের কাছে কতটা পৌঁছে দিতে পারব।'' অর্থাৎ তিনি সচেতন ভোটের কথা বলেছেন এবং নির্বাচনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট ভাবধারা প্রচারের কথা বলেছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির সম্পদ তার দলীয় কর্মীরা। কিছু বিচ্যুতি থাকলেও এত আদর্শবাদী কর্মী ও নেতা আর কোনো পার্টিতে আছে? পার্টিকর্মীরাই পার্টির অগ্রগতির চাবিকাঠি। তাই পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত প্রচার মাধ্যম তীব্রভাবে প্রচার করছে যে কমিউনিস্টদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। অর্থাৎ কমিউনিস্ট কর্মীদের হতাশ করে তোলো। সিপিআই(এম)-এর যদি ভবিষ্যৎ না থাকে তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণ কেন? মড়াকে কেউ মারে নাকি? সমাজে শোষণ থাকবে, বৈষম্য থাকবে, অধিকাংশ মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে থাকবে আর কমিউনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ থাকবে না—এটা হতে পারে না, যদি না কমিউনিস্টরা আদর্শচ্যুত হয়। তৃণমূল কংগ্রেস ভোটে জিতেছে বলেই তাদের অপরাধগুলো মুছে যাবে না। ওরা রাজ্যটাকে যে সর্বনাশের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে তা অস্বীকার করা যাবে না। ওরা যতই ভাঁওতা দিক জিনিসের দাম বাড়া অব্যাহত, বেকারি বাড়ছে। অরাজকতা, তোলাবাজি, নারী নির্যাতন, সিন্ডিকেটরাজ অব্যাহত। ক্রমশই মানুষ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। এই রাজত্বে মানুষের কথা বলার অধিকারটুকুও নেই। মানুষের চোখ খুলবে, ভয় কাটবে। কমিউনিস্টদের সেই কাজটা করতে হবে। গুণ্ডামি করে, ভিক্ষা দিয়ে মানুষের সমর্থন ওরা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারবে না—এটাই বাস্তব।

টাকা-পয়সা দিয়ে কিনে ওরা স্থানীয় প্রশাসনগুলি দখল করেছে। এগুলির মাধ্যমে কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মানুষকে এটা বোঝাতে হবে যে সামাজিক সুবিধাগুলি কারও দয়ার দান নয়, এটা একটা অধিকার। আর এই অধিকারের জন্য বামপন্থীরাই নিরবচ্ছিন্নভাবে লড়াই করে। ওরা মানুষকে একা বাঁচতে শেখায়। কমিউনিস্টদের বোঝাতে হবে যে একা বাঁচা যায় না, বাঁচতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। একা বাঁচার ভাবনা আত্মঘাতী।

কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। কিন্তু এটা বাস্তব যে শ্রমজীবী মানুষের একটা অংশ তাদের দুর্বল চেতনার কারণে পার্টি ছেড়ে চলে গেছে। পার্টি পারেনি তাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করতে। এই মানুষদের ফিরিয়ে আনতে হবে। আর তার জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করতে হবে এবং সেই সম্পর্ক হবে রাজনৈতিক। শ্রমজীবী অংশ থেকে চেতনাসম্পন্ন কর্মী গড়ে তুলতে হবে। পার্টি পত্রিকা এই কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। তাই পার্টি পত্রিকা বিক্রি বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রগতি সম্ভব শ্রেণি সংগ্রাম ও মানুষের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় দাবিগুলি ছাড়াও স্থানীয় সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে তার ভিত্তিতে মানুষকে যুক্ত করে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আশু দাবি নিয়ে লড়াই করার পাশাপাশি মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান করার জন্য যে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে তা মানুষের চেতনায় আনতে হবে।

একটা প্রচার পার্টি কর্মী, সমর্থক ও দরদির মধ্যে করা হচ্ছে যে অনেক ইস্যু থাকা সত্ত্বেও সিপিআই(এম) নেতৃত্ব তা কাজে লাগাতে পারছে না। তৃণমূল নেত্রী এই ধরনের ইস্যু থাকলে দেখিয়ে দিতেন। পার্টির ঘাটতি থাকলে তা কাটাতে হবে। কিন্তু এই প্রচারের মাধ্যমে একটা বিষয় গোপন করা হচ্ছে যে বামফ্রন্ট বিরোধীদের অবাধ গণতন্ত্র দিয়েছে, আর অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে বিরোধীদের প্রায় সব গণতন্ত্রই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর মোকাবিলা করেই পার্টিকে টিকে থাকতে হবে। পার্টি টিকে থাকবে। পার্টি এগোবে।

এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেই পার্টিকে এগোতে হবে। এলাকার পরিস্থিতি অনুসারে কর্মসূচি নিতে হবে ও মানুষকে রাস্তায় নামাতে হবে। সন্ত্রাসকবলিত এলাকায় আক্রমণ এড়িয়ে কীভাবে এগোনো যায় তার রাস্তা বের করতে হবে। ১৯২০ সালে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যখন সর্বক্ষণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি করার সিদ্ধান্ত নিলেন তখন তিনি বললেন যে আমার অযোগ্যতা সম্পর্কে আমি সচেতন, মার্কসবাদের জ্ঞান ছিল ভাসাভাসা। তবে দুটি জিনিসের প্রতি ভরসা রেখে আমি অকুল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—(১) জনগণের প্রতি আস্থা, (২) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের প্রতি ও মার্কসবাদের প্রতি পার্টিকর্মীদের ভরসা রাখতে হবে এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই যে কমিউনিস্ট পার্টি করতে হবে তা বুঝতে হবে। ১৯৭০-এর দশকে আমাদের রাজ্যে যখন কংগ্রেস আধাফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস নামিয়ে আনে তখন প্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছিলেন, ''এ হচ্ছে শাসক দলের চরম দুর্বলতার লক্ষণ। রক্ত ও অশ্রুতে গড়া পার্টিকে ওরা ভাঙতে পারবে না। ওদের পরাজয় সুনিশ্চিত। আত্মসমর্পণ নয়, আত্মরক্ষা করুন। লাল পতাকা যেন অবনমিত না হয়।''

স্বৈরাচার শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ। ইতিহাসে স্বৈরাচারীর স্থান আস্তাকুড়ে। কমিউনিস্টদের দায়িত্ব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচারীকে তার যথাযথ স্থানে পাঠানো।

ফেসবুকের একটি পোস্ট ও কিছু কথা

পঙ্কজ রায় সরকার

৪ আগস্ট করা একটি পোস্ট

''প্রিয় কমরেড শ্রীকান্ত,

তুই আমাকে অপরাধী করে দিয়ে চলে যাবি ভাবি নি। আজকে সকাল প্রায় ৭.৩০টায় সময় তোর বাড়িতে যখন গেলাম তোর মা মধুনিদি কী বললো জানিস?—''তোমাকে বলতো ওর ঘরের লোক... তোমাকে বলেই নাই ওর কী হয়েছে? বাঁচাতে পারলে না?'' কী জবাব দোবো তোর মাকে বল! মাত্র ২২ বছরে তুই সমাজকে যে শিক্ষা দিয়ে গেলি, জানি না কয়েক হাজার বই-এর পাতা উল্টেও আমরা তোর মতো হতে পারব কি না। তোর বাবা মারা যাওয়ার পর বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে কাজ করে তোর মা তোকে পেলেছিল। আমাদের পরিবারের ছেলেদের যেমন বলি... ভালো চাকরি করতে হবে। তোকে তোর মা কিন্তু তা বলেনি। তোকে বলেছিল পাড়ার সবার ভালো কর, পার্টির কাজ করবি ভালো করে। তোকে যখন যুব সংগঠন তারপর পার্টি সংগঠন-এর কাজে যুক্ত করি তখন বুঝিনি যে তুই এত বড় মহাতারকা হয়ে যাবি। ২০১১-এর পর জেমুয়া গ্রামে চরম সন্ত্রাস রুখে দিয়েছিলি তুই এবং আরও কয়েকজন সাহসী সংগঠকরা। আমার ঢোকা নিষিদ্ধ করেছিল জেমুয়া গ্রামে, রাতের অন্ধকারে যেতাম ঘুর পথে। তোর আর এক মুসলিম যুবকের ঠিকানায়। আমি ঘরে না না ফেরা পর্যন্ত তোরা দু-জনেই ঘুমাতি না, খবর নিতি।

২০১৩ পঞ্চায়েত নির্বাচন। সন্ত্রাসের বেশ কিছু পরীক্ষিত কমরেডের পা টলে গেল। তুই সহ বেশ কিছু সাহসী যুবক-যুবতীকে সামনে আনার ভাবনা আলোচনা করলাম তৎকালীন পার্টির জেলা সম্পাদকের সাথে। এগিয়ে যেতে বললেন উনি। নমিনেশন জমা দিতে গিয়ে মার খেলি। ফোন করলি। আমি ফিরে আসতে বললাম। তোদের সবাইকে নিয়ে আবার গেলাম। নমিনেশন জমা হল। বাড়ি ফেরার পর মনে পড়ে তুই আমাকে রাত্রি ১২টায় ফোন করলি? বললি, ''দাদা, ওরা ১০-১২ জন এসে withdraw করতে বলছে। আমি বলে দিলাম আমাকে খুন করে দে তাও আমি withdraw করব না। withdraw করলে আমার মরা বাপকে কী জবাব দেব?''

বিশ্বাস কর শ্রীকান্ত, সেদিন থেকে তোর প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হল। জিতলি ভোটে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পেয়ে। ভাবতে পারিনি এতো গ্রামের লোক তোকে ভালোবাসে। বিরোধী দলনেতা হলি। কিন্তু তোর কাজটা রাখতে পারলাম না। তৃণমূলের হুমকি বা উন্নয়নের জোয়ারে ভাসার জন্য টাকার হাতছানির কাছে আত্মসমর্পণ করলি না। একটা বেসরকারি হাসপাতালে সাফাই কর্মী ছিলি। তাও রেয়াত করেনি। খাবার জুটছে না দেখে আমি একদিন বললাম, ''যাবি অমুক নেতার কাছে বলে দেবো?'' কী রাগ দেখালি আমাকে। কিন্তু চাল-ডালের ব্যবস্থা করা শুরু হল তোর জন্য।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরে তোর কত বন্ধু উন্নয়নের জোয়ারে ভাসার জন্য টাকা নিয়েছে। তুই নিসনি। দুবার জন্ডিস হল। খাবার পাস না ঠিকমতো, হবেই তো। আমরা বেশি খাবার খেয়ে ক্যালোরি ঝরাতে জিমে যাই। চার অক্ষরের সব নিয়ন্ত্রক... এই রাষ্ট্রকাঠামোর। সেই শরীর নিয়ে সবার দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতিস। প্রতিদিন অপেক্ষা করতাম রাত্রি ১০.৩০ থেকে ১০.৪৫ তুই মিস্‌কল দিবি। আমি ফোন করব। শেষে ফোন করলি ১ তারিখ। ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি নিয়ে বললি।

এবার আর হাসপাতাল থেকে ফেরাতে পারলাম না। আসলে জানিস তো শ্রাকীন্ত, পার্টি বড় বেশি মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছে। শেষ বার কোনো চেষ্টা করতে পারলাম না। মাত্র ২২ বছরের মহাতারকা শ্রীকান্ত বাউড়ি ক্ষমা করে দিস আমায়।

পঙ্কজদা

ফেসবুকে কতই তো পোস্ট হয় প্রতি সেকেন্ডে। অন্য অনেকের মতো আমিও করি। কিন্তু উপরের পোস্টটা যেমন ভাইরাল হয়, ঠিক তেমনি পরিচিত বা অপরিচিতেরাও ফোনে, ইনবক্সে শ্রীকান্ত বাউড়ি সম্পর্কে আরও জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। কেন এত কৌতূহল? পার্টির ওপরের কোনো কমিটি-সদস্য তো ছিল না শ্রীকান্ত বাউড়ি। ২০১৪ সালের শেষের দিকে এ.জি. সদস্য থেকে প্রার্থী সদস্য হয়েছিল। যুব ফেডারেশনের কেবলমাত্র ইউনিট স্তরের সদস্য ছিল শ্রীকান্ত। কোনোদিন সংবাদপত্রের পাতায় ওর নাম অসেনি—কোনোদিন শ্রীকান্তর জন্য কোনো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের অনুগত দৈত্যের মতো এই সার্বভৌম বাজার মাথানত করে বলেনি—''তোমার বেঁচে থাকার অধিকারকে কী করে রক্ষা করতে পারি শ্রীকান্ত বলো।''

আসলে এই সমাজব্যবস্থায় শ্রীকান্ত বাউড়িদের বেঁচে থাকাই ছিল প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে এক সংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে আরো বাধা হয় একটি ফুটফুটে ছেলের শৈশব অবস্থা থেকে বাবা-মার হাত ধরে লাল ঝাণ্ডার মিছিলে পা-এ পা মেলানোর জন্য। রাষ্ট্র নামক শ্রেণি শাসন ও শোষণের যন্ত্রের চোখে সে তখন আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের থেকে আলাদা। ২০১২ সালের প্রথম দিকে শ্রীকান্ত বাউড়ি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) Auxiliary Group-এর সদস্য হিসেবে আবেদনপত্রে সই করেন, তখন গণতন্ত্রের ওপর চলছে দানবীয় আক্রমণ। কিছু পাওয়ার আশায় ফর্ম ফিল-আপ করেনি, শারীরিক আক্রমণ চলছিল একনাগাড়ে, যেমনটা

চলছিল সমগ্র জেলায় এবং রাজ্যে। দুবেলা পেট ভরে গরম ভাত জুটত না। ওদের পরিবারের সবার পেটে খিদে ছিল, কিন্তু মেরুদণ্ডটা ছিল টানটান। তফাৎ তো মেরুদণ্ডতেই। পরবর্তীতে আক্রমণের সাথে যুক্ত হল লোভের হাতছানি। ওর কিছু বন্ধুবান্ধব নিজেরা ফাঁদে পা দিল এবং শ্রীকান্তকেও প্রলুব্ধ করল। টলে নি। নিয়ে যেতে পারেনি আসানসোলে অনুষ্ঠিত ২০১৫ সালের দলবদল অনুষ্ঠানে। ওর বন্ধুরা বলল, চল্, যুবরাজ ভাইপোর হাত থেকে পতাকা নিবি এবং বাদবাকিটা রাত্রে পকেটে দিয়ে দেব। শ্রীকান্ত বাউড়ির জবাব—''এত টাকা কী করে দিচ্ছিস তোরা? চুরি করে? উয়াদের হাত থেকে ফ্ল্যাগ নিবো?"

ভাবুন তো, যার ঘরে দুবেলা খাবার জোটে না, প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন ঘরে থাকা একটা ছোটো টিভি বিক্রি করে দেয়, এমন ছেলে ৫০,০০০ টাকার লোভ এবং একটা চাকরির প্রতিশ্রুতিকে ঠেলে ফেলে এত কঠিন সত্যি কথাটা কী সহজে অবলীলায় বলতে পারে!

প্রাক্তন মন্ত্রী, কিছু বিধায়ক, কোনো জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের সদস্য বা কোনো জেলা পার্টি নেতৃত্ব যে কথা বলতে পারেন নি; সেকথাই বলতে পেরেছিল শ্রীকান্ত। বলবই তো, হাজার বার বলব, শ্রীকান্ত তুঝে সেলাম।

২১১ পেয়েও মাননীয়া আতঙ্কে ভুগছেন। যাদের 'হার্মাদ' বলতেন, তাদের জন্য স্বপ্নের সম্ভার হাজির করছেন। প্রতিদিন পালা করে ক্যামেরায় ফ্ল্যাশের সামনে হাজির করানো হচ্ছে সেই তথাকথিত 'হার্মাদদের'। কেন ভয় পাচ্ছেন মাননীয়া? আসলে উনি জানেন প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ ভোট বাম ও কংগ্রেসের প্রার্থীরা মিলিতভাবে এবারের নির্বাচনে পেয়েছে। মাননীয়ার ঝুলিতে ২ কোটি ৪৫ লাখ। ব্যবধান খুব বেশি নয়। নির্বাচনের দিন কী করেছেন ওনার দলের কর্মীরা তাও উনি জানেন। বিলক্ষণ জানেন। আর আমরা তো জেনেছি, বুঝেছি দুখীরাম ডাল, শেখ ফজলে হক, ওহিদুল ইসলাম, নূর আলম মিস্ত্রীদের জীবনের বিনিময়ে। কিউবায় নাকি ভোটদান কক্ষের পাহারায় থাকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। মার্কিনিরা অন লাইনে ভোট দেন। আর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের এক অঙ্গরাজ্যে এখন ভোট মানে জীবন নিয়ে খেলা। কাকে ভোট দেবেন তার থেকেও কোটি কোটি টাকার প্রশ্ন ভোট দিতে পারবেন কি না? মাননীয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে (প্রথম ইনিংস-এও ছিল। আবার জনগণ তার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করলেই হবে না। তারা যদি তথাকথিত তোলাবাজ এবং সিন্ডিকেট রাজের উন্নয়ন যজ্ঞে সামিল না হন, তবে ভোটের পর নির্বাচিত হয়ে বাইপাসের ধারের ভবনে এসে ''উন্নয়নের পতাকা" হাতে নিতে হবে। অপ্রচলিত এবং প্রচলিত লোভ-লালসার ডালি নিয়ে হাজির আমলা-প্রশাসন- পুলিশের একাংশ।

লোভ-ঘৃণা-পাপের (অনৈতিকতা বোঝাকে গিয়ে 'পাপ' শব্দটি ব্যবহার করলাম—পাপ-পুণ্যে লেখক বিশ্বাস করেন না) দাম চোকাতে হবে। তা সে যে-ই হোক। তাই টিমটিম আলোয় জ্বলে ওঠে শ্রীকান্ত বাউড়ির মুখ, দেখা যায় স্পর্ধার চূড়ায়। শ্রীকান্তর মৃতদেহ যখন লাল পতাকায় ঢাকা হচ্ছিল, নিষ্পাপ মুখটা যেন বলতে চাইল—''সহযাত্রী কমরেড—চোখের জল ফেলো না—আগুন জ্বালো বুকে—আমি খালি দেখতে চাই জীবনের মুখ যেন কলঙ্কিত না হয় কোনোদিন!"

পুঁজির এত আগ্রাসী রূপ রাজ্যের রাজনীতিকে কবে কে দেখেছে বলা মুশকিল। টাকা দিয়ে রাজ্যে সবই পাওয়া যায় এখন। একদিকে দেশ-দুনিয়া জুড়ে ভাবনা কেবলমাত্র নিজের জীবনকে সুন্দর করে তুলতে শেখো। পাশের জনের কথা ভাবার দরকার নেই। মধ্যবিত্তের আঙিনা ছেড়ে এই ধারণা গরিব পাড়াগুলিতেও চোখে পড়ে। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ছেলে-মেয়েদের মতো ভ্যালেন্টাইনস ডে উদ্‌যাপনে KFC-MAC-Burger King-এর দোকানে লাইন দিতে পারে না অনেকে, যেমনটা পারে না অপুষ্টি আর অর্ধাহারে জীর্ণ তৃতীয় বিশ্বের অসংখ্য শ্রীকান্ত বাউড়িরা। কিন্তু বড় বড় শপিং মলের কাঁচের দেওয়ালের স্বচ্ছতা এবং দরজার ফাঁক দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত অভাগা, না-পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট—অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়েদের মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষে। চোখ বড় বড় করে দেখে কাচের দেওয়ালের ওপারের দৃশ্যাবলী। অপু যেভাবে কাশফুলের ফাঁকে ট্রেন দেখে অবাক নয়নে তাকিয়েছিল ঠিক তেমনি এই অভাগা—না-পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট—অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়েগুলো কল্পনা করতে থাকে প্রতিটি আনন্দঘন মুহূর্তের। গোটা পৃথিবীটাকে নতুনভাবে উপভোগ করতে চায়। উথাল-পাথাল হয় মনের ভিতরে। একটা গরিব বাড়ির ছেলে বা মেয়ের জীবনসংগ্রাম থেকে তিল তিল করে গড়ে ওঠা শ্রমজীবী মূল্যবোধ তখন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। ভুলে যায় ঘরের অভাব-যন্ত্রণার কথা। ততক্ষণ সেই অভাগা-না পাওয়ার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট-অর্ধভুক্ত ছেলেমেয়েদের চোখে রঙ লেগে যায়। মনে পড়ছে একটি টিভিতে দেখা দৃশ্যের কথা... এক সুন্দর হরিণী গভীর জঙ্গলে অজগরকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রাথমিক ভয় আস্তে আস্তে কাটার পর অজগরের সৌন্দর্যে সম্মোহিত হরিণী কাছে যায় সুন্দরকে আরও বেশি চোখের ক্যামেরায় আবদ্ধ করে রাখার জন্য। ততক্ষণে অজগর পেশির প্রবল প্যাঁচে জড়িয়ে ধরে সম্মোহিত হরিণীর হাড়গোড়-মজ্জারস ভেঙে গুঁড়িয়ে নিঃশব্দে টেনে নেয় তার নিজস্ব বিপাকীয় প্রতিক্রিয়ায়। ছেঁড়া তোশক আর পিঠের হাটে খোঁচা মারা চৌকিতে শুয়ে চিন্তা করতে থাকে ঠিকাশ্রমিক। ঘরে এসে কাজ হারানোর বাপের ঘুম-না-আসা কাশি আর ভালো লাগে না। মাথায় চিন্তা ঘুরপাক করতে থাকে পাড়ার-মনসাপুজোতে বড়লোক বাড়ির ডি.জে. না হোক, ভালো সাউন্ড সিস্টেম আনতে হবে। 'ঝুম বরাবর ঝুম শরাবি...' মনসাপুজো থেকে ভোটে এই প্রভাব গরিবপাড়ায় পাওয়া যায় সর্বত্র।

শ্রীকান্ত বাউড়ি তাই ব্যতিক্রম।

শ্রীকান্ত বাউড়িরা তাই ব্যতিক্রম।

এইরকম হাজারো শ্রীকান্ত বাউড়িরা প্রতিদিন লড়ছে মাঠে-ঘাটে, কলে-কারখানায়।

ক্রোনি ক্যাপিটালিজ়ম পড়েনি, ফিনান্স ক্যাপিটালও ও বোঝে না। তার মধ্যেই শহিদদের লাশ গুনতে গুনতে চেতনা শাণিত হয়েছে শ্রীকান্ত বাউড়িদের। আক্রমণে পিঠ পেতে মেরুদণ্ডটা টানটান হয়েছে শ্রীকান্ত বাউড়িদের। আক্রমণ, সন্ত্রাসের মুখে কুঁকড়ে না গিয়ে টালির চালে রাত্রিবাস করতে দেয় নেতৃত্বদের। ভোরের আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ে পাড়ায় পাড়ায়।

চার্জশিট

মৃদুল সেন

মঞ্চ দুটো জোনে বিভক্ত করা থাকবে। একদিকে অধ্যাপক সত্যেন সেনের পড়ার ঘর। অন্যদিকে থানার সেকেন্ড অফিসার সাব-ইন্‌সপেক্টর অমিত দত্তের ঘর। ছাত্র ভালো। পরীক্ষা দিয়ে সরাসরি সাব-ইন্‌সপেক্টর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। এখনও বিবেকবোধ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক সেন : বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
আমাকে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।

অমিত : (*গলা বাড়িয়ে*) আসতে পারি স্যার—

অধ্যাপক : আরে, এসো এসো। একেবারে এই বেশে। এই পুলিশের উর্দি পরা অবস্থায় তোমাকে মানায় না। আমি কবি অমিত চন্দ্রকে এ বেশে দেখতে রাজি নই। আজকাল লিখছো টিকছো তো, না—

অমিত : আর লেখা—

অধ্যাপক : আসলে এ ধরনের চাকরি তোমাদের জন্য নয়। তবুও বলব লেখালেখিটা ছেড়ো না। মানবিক মূল্যবোধগুলো অন্তত বজায় থাকবে। তা কী ভেবে হঠাৎ আমার কাছে?

অমিত : একটা কেস ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়েছিলাম। মনটা খুব ভারি হয়ে উঠেছে, তাই আপনার কাছে চলে এলাম একটু হাল্কা হবার জন্য।

অধ্যাপক : কী এমন কেস যাতে তুমি এত মুষড়ে পড়ছ?

অমিত : স্যার, বলতে লজ্জা হয়, রেপ কেস। আজকের সকালের কাগজে দেখেন নি?

অধ্যাপক : হ্যাঁ, বেশ বড় করে খবর করেছে দেখলাম। কিন্তু পড়তে মন চাইল না। এসব তো আজকাল হরবখত ঘটছে। আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো সব যৌবনের কলরব বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল রাজ্যে একটারও বিচার হল না এখনও পর্যন্ত। তোমাদের অক্ষমতা, একটারও চার্জশিট আদালতে পেশ করতে পার না।

অমিত : স্যার, মেয়েটি শুধু ধর্ষিতাই হয়নি, মারাও গেছে। সবচাইতে খারাপ লাগছে সে আমাদের কলেজের ছাত্রী—

অধ্যাপক : আমাদের কলেজের? উঃ। নাম কী?

অমিত : অনন্যা। অনন্যা সেন রায়।

অধ্যাপক : অ—(*ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য নিস্তব্ধ থাকে মঞ্চ*) অমিত, কয়েকদিন আগেও আমার কাছে এসেছিল, এই কাছাকাছি কোথায় যেন—ভালো ছাত্রী, জিজ্ঞসু মন—

অমিত : যতদূর খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি প্রতিবাদী, দৃঢ়চেতা—আর এটাই হয়েছে কাল। যাক, এই পোস্টমর্টেম শেষ হবার পর পরিবারের হাতে বডি তুলে দিয়ে এলাম, ওদের চোখের দিকে তাকানোর মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। ওরা বুঝে নিয়েছে আমরা ক্লীব, পশু—

অধ্যাপক : পরিবারের লোক কোনো এফ.আই.আর করেনি?

অমিত : ঠিক এফ আই আর হিসেবে নয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কয়েকটি বিষয় উঠে এসেছে। এফ.আই.আর. হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে খুব ভীত, সন্ত্রস্ত। মনে হচ্ছে কে বা কারা খুব ভয় দেখাচ্ছে—দেখি।

অধ্যাপক : এটাই তো সমস্যা অমিত। সর্বস্তরে এটা ভয়ের আবহ। মাঝে মাঝে ১৯৩৩-এর বার্লিন শহরের কথা মনে করিয়ে দেয়। এত মিথ্যাচার, এত নগ্নতা, এত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা সত্তরের দশকের পর আর দেখিনি।
'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়—'
বুঝলে, বাঙালির একমাত্র ভরসা সেই রবীন্দ্রনাথ—

অমিত : তা স্যার, আপনাদের এখনও প্রতিবাদ করার যে সাহস আছে, আমাদের এই উর্দিপরা লোকেদের তাও নেই। নিতান্ত অসহায়। নইলে গুটিকয়েক সমাজবিরোধীর ভয়ে আমাদের থানার মধ্যে টেবিলের তলায় মুখ লুকোতে হয়? হায়, একেই বলে দাসত্ব। আমাদের তুলনায় আপনারা অনেক ভালো আছেন। সম্মান আছে, এখনও আপনাদের দেখলে আমরা ভালো মন্দ কুশল নিই।

অধ্যাপক : ভুল। অমিত ভুল। সমাজে একবার পচন ধরলে তা এক জায়গায় থামিয়ে রাখা যায় না—সর্বত্র, সর্বত্রই তা ছড়িয়ে পড়ে।

অমিত : তবুও প্রতিবাদ হয়। আমাদের ক্ষেত্রে—

অধ্যাপক : ভুল। ভুল। যারা সমাজের মাথা, দেশ চালান—তারা শিক্ষাব্যবস্থায় অনর্থক হস্তক্ষেপ করেন। পৌরাণিক কল্পকাহিনিকে ইতিহাস বলে পাঠ্য বইগুলিকে বিকৃত করছেন। এমনকি জাতপাত, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টিতে তারা ফায়দা লুটছেন।

অমিত : যেমন—

অধ্যাপক : কেন, অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের প্রতিবাদ দেখনি? কেমনভাবে শিক্ষায় গৈরিকীকরণ চলছে— আবার আমার কলেজে পড়াতে গিয়ে আমি সেদিন এক অদ্ভুত প্রতিবাদের মুখ পড়লাম। অবশ্য সংখ্যায় তারা নগণ্য।

অমিত : কারা প্রতিবাদ করল, ছাত্ররা?

অধ্যাপক : জানোই তো—আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। সমাজ বিবর্তনের ধারায় সেদিনের টপিক 'সমাজতন্ত্র', 'সায়েন্টিফিক সোস্যালিজম'। যেই শুরু করেছি—অমনি গোটা দুই ছেলে চিৎকার করে উঠল—''স্যার, ওটা 'অবসোলিট', 'বাতিল'—ওটা আর জানাতে হবে না। অদ্ভুত সব ভাবনা।

অমিত : অন্য ছেলেরা—

অধ্যাপক : জানতে ইচ্ছুক। কিন্তু ইচ্ছার অপমৃত্যু। ভয়ে কাঠ। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে— তখন আমি রাগত স্বরে বললাম, ওই 'টপিক' সিলেবাসে আছে—প্রশ্ন আসবে। তা জানতে হবে, বুঝতে হবে। বললাম, কম্পালসারি প্রশ্ন আসবে এখান থেকে। তখন কী করবে? ছেলেদুটি বলল—'স্যার আমাদের সংগঠন থেকে ওই চ্যাপ্টার বাতিলের জন্য মন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেব।' ভাবো একবার, কোথায় নেমেছি। আমি ক্লাস নিতে শুরু করলাম। বললাম, যাদের জানতে ইচ্ছে করছে না তারা চলে যেতে পার। দেখলাম ওই দু-জন বাদে সবাই ক্লাসে রইল।

অমিত : আসলে সাহস করে দাঁড়াতে পারলে রোখা যায়। তবে আপনার মতো ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষ এখন দুর্লভ। দেখলাম তো—(*নিজের মনে*) এতো প্রশ্ন করলাম, মা বাবা, সবাই যেন ভয়ে সিটিয়ে আছে। কিছু আন্দাজ করছে। অথচ বলতে পারছে না। কেন ভয়, কিসের ভয়, কেউ ভয় দেখাচ্ছে কি? নাঃ, এর উত্তর আমায় খুঁজতে হবে।

অধ্যাপক : কিছু ভাবছিলে নাকি অমিত? হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলে।

অমিত : হ্যাঁ, আসলে কেসটা খুব জটিল মনে হচ্ছে।

অধ্যাপক : বিগত কয়েক বছরে আমাদের রাজ্যে কোনো ধর্ষিতার কেসের সমাধান হয়নি। কোথাও না কোথাও এমন চাপ কাজ করেছে যার ফলে অধিকাংশের আদালতে চার্জশিট দাখিল পর্যন্ত হয়নি। এক্ষেত্রে আমার খালি একটা রিকোয়েস্ট তোমার কাছে—

অমিত : রিকোয়েস্ট বলে লজ্জা দেবেন না স্যার, বলুন আদেশ—

অধ্যাপক : হাঁ, যাই বল না কেন—অবশ্যই আমি সুবিচার আশা করি, আমার ছাত্রী—তোমার কলেজের ছাত্রী। তুমি কোনো চাপের কাছে মাথা নত করবে না। এ আশা আমি করতেই পারি—

অমিত : স্যার, একজনের নাম আমি পেয়েছি। লক আপে রেখেছি। গিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করব। তার যা পাস্ট, তাতে বিশ্বাস করতে পারছি না এরকম জঘন্য অপরাধ সে করতে পারে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে বেশ কয়েকজনের দ্বারা মেয়েটি ধর্ষিতা হয়—সর্বাঙ্গে অত্যাচারের বীভৎস চিহ্ন। দেখা যায় না। মৃতার দেহ দেখে মায়ের সে কী বুকফাটা কান্না—উঃ অসহ্য, অসহ্য—ভোলা যায় না। (*এমন সময় মোবাইল বেজে ওঠে*) —হ্যাঁ স্যার বলুন। না, না—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে পাইনি, তবে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে গেছি। হ্যাঁ স্যার—হ্যাঁ, বডি হ্যান্ডওভার করে দিয়েছি। হ্যাঁ স্যার, এই একটু বাদেই থানায় আসছি। হ্যাঁ, বলব—বলব—কেসটি জটিল—হ্যাঁ—(*মোবাইল অফ করে।*)

অধ্যাপক : কে ফোন করেছিল?

অমিত : (*মাথায় টুপিটি পরে*) সেই চাপ স্যার। আসছি। তবে আপনার কথা মনে থাকবে। চলি স্যার—থানা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(*মেজবাবু অমিত দত্তের চেম্বার। ঢুকেই টেবিলে রাখা একগ্লাস জল ঢক ঢক করে খেয়ে হাঁফ ছাড়েন।*)

অমিত : বংশী। এই বংশী—

বংশী : (*স্যালুট করে দাঁড়ায়*) বলুন স্যার—

অমিত : যাও কোথায়? এক কাপ চা খাওয়াতে পার? তুরন্ত—

বংশী : এই যাব আর আসব—

অমিত : (*টেবিলে বেটন ঠুকতে ঠুকতে*) এফ.আই.আর-এ একটি ছেলের নাম। অথচ পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অন্য কথা বলছে—বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করা হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে, তারপরে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলরের রিপোর্টে সন্দেহ একজনকে। অথচ মেয়েটির মায়ের সন্দেহ অন্য। বেশ রহস্যজনক ঘটনা বটে।
(*বংশী চা টেবিলে রাখে। অমিত চায়ে চুমুক দিয়ে সিগারেট বার করে সুখটান দেয়।*)
উঁহু, অঙ্ক মিলছে না। (*উঠে দাঁড়ায়, পায়চারি করতে থাকে*) কলেজ স্টুডেন্ট, আমাদের কলেজের ছাত্র। উভয়েই ক্লাসমেট। ভাব-ভালোবাসা থাকতেই পারে। খুব স্বাভাবিক। তা বলে খুন—আবার গলা টিপে। এত পরিচিত ক্লাসমেটকে—নাঃ, অঙ্ক মিলছে না।
(*এমন সময় থানার বড়বাবু অমিতের চেম্বারে ঢোকেন*)

বড়বাবু : এই যে অমিত—

অমিত : স্যার, আমাকে ডাকলেই পারতেন। আপনি হঠাৎ—

বড়বাবু : আরে বাবা। তোমাদের মতো ইয়ং পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আমাদের মধুর সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। ডাইরেক্ট পরীক্ষা দিয়ে সাব-ইনসপেক্টর। আমাদের মতো লেদ খেতে খেতে শেষ বয়েসে এসে থানার বড়বাবু? দি এন্ড। ভাল কেরিয়ার, ধুপ করে হয়ত ইন্সপেক্টরের অর্ডার এসে পড়বে। আর পলিটিক্যাল লিডারদের মন জোগাতে পারলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে নমিনেটেড আই.পি.এস. হতেই বা

অসুবিধা কি? এ বাজারে প্রশাসনের নেকনজরে অধিকাংশ নমিনেটেড আই.পি.এস-রা। খালি একটু তৈলমর্দন। বুঝলে না হে—

অমিত : ওসব কথা ছাড়ুন স্যার। বডি পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে। মেয়েটির পরিবারের কাছে হ্যান্ডওভার করা হয়েছে।

বড়বাবু : দুয়ে দুয়ে চার হল তো?

অমিত : মানে?

বড়বাবু : মেয়েটির বাবা-মায়ের স্টেটমেন্ট নিলে?

অমিত : হ্যাঁ, নিলাম। ওটাকেই এফ.আই.আর. হিসেবে ট্রিট করব বলে ঠিক করেছি।

বড়বাবু : ভালো। আমি বলছিলাম, আমাদের কমিশনার সাহেবের আশঙ্কা আর ওদের পরিবারের আশঙ্কায় মিল পেলে কিনা। কমিশনার সাহেবের কথামতো ছেলেটিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। লকআপে পোরা হয়েছে।

অমিত : স্যার, এ কেসটির আই.ও. মানে ইনভেস্টিগেশন অফিসার কে?

বড়বাবু : কেন তুমি।

অমিত : তাহলে, কমিশনার সাহেবের প্রসঙ্গ আসছে কেন? প্রপার ইনভেস্টিগেশন না করে যাকে-তাকে ধরলে কেসটা হাল্কা হয়ে যাবে। মগজটা অমরা খাটাব। কারণ ল অ্যান্ড অর্ডার দেখার জন্য সরকার আমাদের বেতন দেয়—

বড়বাবু : আরে বাবা, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাথায় ওরা—কথা শুনতে হবে—

অমিত : দেখুন স্যার, আমি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ছাত্র। প্রশাসনের নিয়মকানুন আমার জানা—কৈফিয়ত কতটা দিতে হবে, কোথায় দিতে হবে জানি।

বড়বাবু : নাঃ আরও কিছুদিন না গেলে এই পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই হবে না—যাকগে— (*এমন সময় ফোন বেজে ওঠে*) হ্যাঁ স্যার। আমি মেজবাবু, আই মিন, অমিতের সঙ্গে ওই ব্যাপারে কথা বলছিলাম। না, না, ছাড়ার কোনো প্রশ্নই নেই। কলেজে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কলেজে উৎপাত করছে—না না বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে অমিত দেখছে। (*অমিতের দিকে ফিরে*) অমিত, এই নাও কমিশনার সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন—

অমিত : হ্যাঁ, বলুন স্যার। না না, সঠিকভাবে তদন্ত এগোচ্ছে। কী বললেন—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট? ও তো কনফিডেনশিয়াল। একেবারে কোর্টে প্লেস করা হবে। আহা চটছেন কেন? এখন আমার হাতেই এসে পৌঁছয়নি—আপনাকে বলব কী করে? দেখা করবে? কতজন? তিনজন? আসুক, আমি থানায় থাকব—

বড়বাবু : (*স্বগতোক্তি*) এবার বোঝ ঠেলা। খোদার ওপর খোদগারি। চাপ কাকে বলে এবার বুঝবে বাছাধন। ঠিকমতো চললে টপাটপ প্রমোশন, ব্রাইট কেরিয়ার। না হলে বাবা ফক্কা। স্রেফ সদর থানা থেকে ঘাড়ধাক্কা—গাঁয়ের আউটপোস্টে, হাওয়া খাওয়া—বড্ড অ্যারোগ্যান্ট— (*অমিতকে*) কী অমিত, কমিশনার সাহেব কী বলছেন?

অমিত : বুঝলাম তিন সমাজবিরোধী পাঠাচ্ছেন। যাদের জেলে পোরার কথা তারা সতী সেজে এ কেসের ক্লু দিতে আসছে। ন্যাস্টি, জঘন্য। এ জন্যই পুলিস সাধারণ মানুষের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠছে।

বড়বাবু : স্টপ দিস ডিসকাশন। দেওয়ালেরও কান আছে। আমাদের এসবের মধ্যে বেশি নাক গলাবার কী আছে? এই আমি যেমন—কমিশনার সাহেব চাইলেন ছেলেটিকে কেসে ইনভল্‌ভ করতে, চোখ-কান বুজে অ্যারেস্ট করে নিলাম। ল্যাঠা চুকে গেল। তুমিও এবার উনি যেমন যেমন চাইবেন, তেমন তেমন চার্জশিট তৈরি করে দেবে। ল্যাঠা চুকে গেল—

অমিত : বুঝতে পারছি, এরকম অনেক ল্যাঠা চুকিয়েছেন— আমি কিন্তু কারও ইনস্ট্রাকশনে চলব না। প্রপার ইনভেস্টিগেশন করে চার্জ গঠন করব। কোথাও নতি স্বীকার করার লোক আমি নই—

বড়বাব : বুঝবে ঠেলা। সিনিয়র লোকের সৎ উপদেশ নিলে না তো! কপালে অনেক দুঃখ আছে। এটা পুলিশের চাকরি বাবা—(*বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান*) (*এমন সময় হুড়মুড় করে তিনটি ছেলে ঢোকে*)

ছেলেগুলি : স্যার, আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন?

অমিত : না তো।

প্রথম ছেলে : তবে যে কমিশনার সাহেব আমাদের দেখা করতে বললেন। বললেন, ওই নারকীয় ঘটনায় সাক্ষী দিতে হবে।

অমিত : এই রেপ কেসে আপনারা জড়িত নন এমন কী করে ভাবলেন—এলাকায় আপনাদের দারুণ সুনাম—

দ্বিতীয় জন : হ্যাঁ স্যার, এই সেদিন ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে প্রায় একশো জনের রক্ত সংগ্রহ করে দিলাম—

তৃতীয় জন : সোশ্যাল সার্ভিস আর কি!

অমিত : ভালো। কী করেন সব?

সবাই : সে আর এমন কিছু না—

অমিত : কিছু তো করেন। বেশ ভালো টাকা পয়সা কামান খবর আছে।

প্রথম জন : প্রমোটারের দালালি করে দু-পয়সা রোজগার করি। কমিশনার সাহেবের ব্যবসায় সহায়তা করি।

অমিত : বাঃ, ভালো— শুনেছি প্রমোটার ফ্ল্যাটবাড়ি তৈরির সময় একটি করে ফ্ল্যাটের দায়িত্ব আপনাদের ছেড়ে দেয়। আর তা বিক্রি করলে ২৫ থেকে ৩০ লাখ টাকা পকেটে আসে। পাড়ার সব ফ্ল্যাটগুলি থেকে প্রায় কয়েক কোটি টাকা আপনাদের হতে এসেছে—কী বলেন?

সবাই একসঙ্গে : না স্যার, ভাগের মা গঙ্গা পায় না। বখরা দিতে দিতে আমাদের ভাগ একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে।

অমিত : যাক, যে জন্য এসেছেন তা বলে ফেলুন—চটপট।

প্রথম জন : আসলে শুনলাম, রেপের আসামি অ্যারেস্ট হয়েছে। ছেলেটিকে আমরা চিনি জানি। থানায় প্রথম রিপোর্ট আমরাই করি—

দ্বিতীয় জন : পাড়ায় বুক ফুলিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যেত। কতবার ডেকে বারণ করেছি—কে কার কথা শোনে।

তৃতীয় জন : ছেলেটি ডেসপারেট ছিল।

প্রথম জন : কিন্তু এমন ঘটনা ঘটবে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা

পার্কে তাস খেলছিলাম, হঠাৎ পাশের ঝোপে তীব্র আওয়াজ, ছুটে গেলাম ধরতে। পারলাম না—তখন সব শেষ। রক্তাক্ত ডেডবডি। অ্যাম্বুলেন্স ডেকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে থানায় ইনফরমেশন দিই।

অমিত : নাঃ, গল্পটা বেশ ভালো—

প্রথম জন : কিছু বলছিলেন স্যার?

অমিত : নাঃ, বলছিলাম কি, পুলিশের খাতায় আর একটি সাহসিকতার প্রমাণ রাখলেন—কিছু না—কমিশনার সাহেবকে বলবেন—উদ্বেগ না করতে, খুব তাড়াতাড়ি আসল খুনি ধরা পড়বে—আপনারা যান—
(*তিনজন বেরিয়ে যায়। হুড়মুড় করে কয়েকজন সাংবাদিক ঢুকে পড়ে*)

প্রথম সাংবাদিক : স্যার, কিছু ক্লু পেলেন?

দ্বিতীয় সাংবাদিক : শুনলাম আসামি ধরা পড়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে কি?

অমিত : এখন পুলিশ কাস্টডিতে। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ এখনও শুরু করিনি—আপনারা এরই মধ্যে—

প্রথম সাংবাদিক : শুনেছি, ছেলেটির ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট। মেয়েটির সহপাঠীও বটে। এমন কাজ করতে পারল—

অমিত : দেখুন, আপনারা অনেক মুখরোচক গল্প বলতে পারেন। আমি পারি না। কোথাও ত্রিকোণ কোথাও চতুষ্কোণ সম্পর্কের ছড়াছড়ি। ওই শিনা নামে মেয়েটিকে নিয়ে তার মা ইন্দ্রানী ও সিদ্ধার্থ দাসকে নিয়ে প্রতিদিন মুখরোচক রসালো গল্প লিখছেন—তাদের সেলিব্রেটি করে তুলছেন। এখানে এসব হবে না। প্লিজ যান, কোর্টে তুলব যখন জানতে পারবেন।

দ্বিতীয় সাংবাদিক : কোনো ক্লু—

অমিত : নো ক্লু। প্লিজ যান।
(*অমিত হাত জোড় করে, সাংবাদিকরা বেরিয়ে যায়।*)
(*হাঁক দেন*) বংশীবদন—

বংশী : জী হুজুর—

অমিত : লক আপ থেকে আসামিকে নিয়ে এসো।
(*অমিত ছেলেটির ফাইল ওলটাতে থাকে।*) অদ্রিজ ঘোষ। বাঃ বেশ আর্টিস্টিক নাম। পড়াশোনায় ভালো। মাধ্যমিকে এইটি টু পারসেন্ট। হায়ার সেকেন্ডারিতে স্টার। অনার্স পার্ট ওয়ানে ফার্স্টক্লাস নম্বর—তারপরে রেপিস্ট। নাঃ আজকাল ভালো ছেলেরা এসব অপকম্মে বেশ হাত পাকাচ্ছে। আবার আমাদের কলেজের ছাত্র। আজ ওর ছাল চামড়া আমি ছিঁড়ে ফেলব। রাস্কেল কোথাকার। রেপিস্ট।
(*রাগে গরগর করতে থাকে অমিত। বংশী আসামিকে নিয়ে ঢোকে, একটি স্টুলে বসিয়ে দেয়।*)

অমিত : কী নাম তোর?

আসামি : অদ্রিজ ঘোষ।

অমিত : নাম তো বেশ বাহারি। দেখে ভদ্রঘরের সন্তান বলে মনে হয়। এতবড় অমানুষ হলি কী করে? অবশ্য আজকাল—

অদ্রিজ : না স্যার। আমি অনন্যাকে রেপ করিনি। খুন করিনি—

অমিত : (*রাগে গরগর করতে করতে চুলের মুঠি ধরে*) ইউ রাস্কেল। নামটা পর্যন্ত সড়গড়। কদ্দিন ধরে তাক করে ছিলি? লজ্জা করে না—নিজের কলেজের ছাত্রী, তোর বোনের মুখটা একবার মনে পড়ল না?

অদ্রিজ : না স্যার, সত্যি বলছি আমি ওকে রেপ করে খুন করিনি। আমাদের দু-জনের সম্পর্ক অন্য ধরনের—বেশ কয়েক বছরের।

অমিত : তাহলে, মেয়েটিকে অ্যাদ্দিন ধরে পটিয়ে পাটিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে তারপর কাজ সেরেছিস। মারব এক ডান্ডার রদ্দা—

অদ্রিজ : স্যার, আপনি আমায় মেরে ফেললেও একটা মিথ্যাকে সত্য বলে চালাতে পারবেন না। মিথ্যা বলে আমার ভলোবাসাকে কলুষিত করতে পারব না।

অমিত : কী ভালোবাসা রে! মেয়েটির বাড়িতেই শুনলাম তোর সঙ্গে ও বেরিয়েছিল। অনেক রাতে খবর হাসপাতালে ডেডবডি। তাহলে কোন জানোয়ার এখানে জুড়ে বসল বলতে পারিস—

অদ্রিজ : হ্যাঁ, আমি বলতে পারি। তবে ক্রিমিনালদের হাত অনেক লম্বা। আপনারা তাদের কিছুই করতে পারবেন না। এই যে চেয়ারে বসে আছেন সেখান থেকে ছিটকে যাবেন—
(*অমিতের আঁতে ঘা লাগে*)

অমিত : কী, এতবড় কথা। (*বেধড়ক ছেলেটিকে পেটাতে থাকে, হাঁপিয়ে যায়*) বংশী, ওকে লকআপে নিয়ে যা—
(*ঢক ঢক করে জল খায়। স্বগতোক্তি—*) প্রপার ইনভেস্টিগেশন হলে আমি চেয়ার থেকে ছিটকে যাব—এতবড় কথা। ও ক্রিমিনাল নয়। ক্রিমিনালের হাত অনেক লম্বা। ভাবা যায় না। অসহ্য।
(*এমন সময় একজন এসে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দিয়ে যায়*)

অমিত : কী? একাধিক লোকের দ্বারা রেপ্‌ড? যৌনাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত? সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন? অত্যাচারের ছাপ? তবে কি—

তৃতীয় দৃশ্য

(*অধ্যাপক সেনের বাড়ি। অধ্যাপক বই পড়ছেন। অমিতের প্রবেশ*)

অমিত : গুড মর্নিং স্যার—

অধ্যাপক : মর্নিং।

অমিত : স্যার, মেয়েটির মা রাজি হয়েছে আসতে? আসলে কী জানেন—স্যার, আপনাকে ছাড়া ভরসা পেলাম না। ওনাকে ফেস করতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছে।

অধ্যাপক : লাগবেই তো। প্রায় তোমার মায়ের বয়েসি। জিজ্ঞেস করতে হবে এমন সব প্রশ্ন যা কোনো মাকে করা অস্বস্তিকর। অদ্রিজ কিন্তু ভালো ছেলে—সে এমন কাজ করতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। এটা আমার কল্পনায় আসে না।

অমিত : ঠিক তাই। আমিও কিছুতেই মেলাতে পারছি না। বার বার কোর্টে ডেট নিচ্ছি। জজ সাহেব তো গতবার বলেই ফেললেন সামনের বার যদি চার্জশিট জমা দিতে না পারি তাহলে অভিযুক্তের বেল হয়ে যাবে—
(*অনন্যার মায়ের প্রবেশ*)

অধ্যাপক : আসুন মা। আসুন, বসুন। আপনাকে এখানে নিয়ে আসতে খুবই কুণ্ঠাবোধ হচ্ছিল। এই পুলিশ অফিসারও আমার ছাত্র। কেসটির ইনভেস্টিগেশনের ভার তার ওপর। আপনার কাছে যাবার কথা। কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। এখনও ঠিক পুলিশ হয়ে উঠতে পারেনি। সেন্টিমেন্ট, মানবিকতা এসব এখনও রয়ে গেছে। তাই নেতা-মন্ত্রীরা যা বলবে তাই বেদবাক্য—একথা না ভেবে অনন্যার বিষয়ে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে ব্রতী—

(অনন্যার মা কান্নায় ভেঙে পড়ে)

(অধ্যাপক হাত জোড় করে) মা, আপনাকে আঘাত দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আসল অপরাধী কে, তার শাস্তি তো আপনিও চান?

অনন্যার মা : *(আঁচলে চোখ মুছে)* হ্যাঁ। আমিও চাই প্রকৃত অপরাধী ধরা পড়ুক। বল বাবা কী জানতে চাও—

অমিত : বলুন। ঘটনার দিন আপনার মেয়ে কোথায় ছিল?

অনন্যার মা : অদ্রিজ নিয়মিত আমার বাড়িতে আসত। দুজনে গল্প করত। আমাকে অনেকটা মায়ের চোখে দেখত। বলত—আমার তো মা নেই, মায়ের আদর আপনার কাছে পেতে আসি—

অমিত : দু-জনের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল, আপনি জানতেন না?

অনন্যার মা : জানব না কেন! আমার মেয়ে আমার কাছে কোনো কথা গোপন করত না। বলত—বিয়ের পরে আমরা দুজনে মিলে তোমায় সব তীর্থ দর্শন করিয়ে আনব—*(বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন)*

অমিত : আপনি বিশ্বাস করেন, অদ্রিজ এ-কাজ করতে পারে?

অনন্যার মা : *(মাথা নেড়ে)* না, কিছুতেই না। যেখানে বাড়িতে তারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেয়েছে, সেখানে এরকম জঘন্য অপরাধ কেউ করতে পারে ভাবা যায়? এ কাজ এক জনের নয়, কয়েকজন দুষ্কৃতীর কাজ। অদ্রিজের সঙ্গে আমার মেয়ের সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত হয়ে তারা এ কাজ করেছে।

অমিত : আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?

অনন্যার মা : সমাজের মধ্যেই সে নরকের কীটগুলি বাস করছে। আপনাদের কাজ তাদের বিনাশ সাধন—তা না করে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখছেন, বাড়তে সাহায্য করছেন—

অমিত : তাই তো আপনাদের সাহায্য চাইছি। গোপন রাখব—

অনন্যার মা : না, গোপন থাকবে না। আমার আর একটি বিবাহযোগ্য কন্যা আছে। তাকে ওই আগুনে ঠেলে দিতে পারব না। যাদের দলদাস হয়ে কাজ করেন, এই নরকের কীটেরা তো তাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। পারবেন খুঁজে নিতে? সাহস আছে? হিম্মত আছে?

(বলেই বেরিয়ে যান)

(অমিত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। অধ্যাপক অমিতের পিঠে হাত রাখেন)

অধ্যাপক : ইটস্ আ চ্যালেঞ্জ, অমিত, ইটস্ আ চ্যালেঞ্জ।

অমিত : ইয়েস, ইটস আ চ্যালেঞ্জ। *(অমিত দ্রুত বেরিয়ে যায়)*

চতুর্থ দৃশ্য

(থানা। অমিতের চেম্বার)

অমিত : বংশী, বংশী—

বংশী : যাই স্যার। *(এক গ্লাস জল হাতে ঢোকে। বড়বাবুর প্রবেশ)*

বড়বাবু : তারপর, কদ্দুর এগুলে? আমার তো মনে হয় আমরাই প্রথম এরকম রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেসে বেশ সময় মতো চার্জশিট দিতে পারছি। অধিকাংশ কেসে বছর পেরিয়েও কোনো হদিস করা যাচ্ছে না

অমিত : আপনার সুনাম—

বড়বাবু : আসলে কী জান, রেপ কেসের মোটিভেশনটা না বুঝলে চট করে সমাধান অসম্ভব। এটা তো ক্লিয়ার কেস। কাল একবার এস.পি. সাহেবের সন্দর্শনে যাই, কী বল। বলে আসি আমাদের অ্যাচিভমেন্টের কথা—আমরাই প্রথম চার্জশিট দাখিল করতে পারছি এরকম এক কমপ্লিকেটেড কেসে—

অমিত : আসুন—

(বড়বাবু বেরিয়ে যান। অমিত ফাইল দেখতে থাকে)

নাঃ কেসটার যত গভীরে ঢুকছি ততই যেন তল পাচ্ছি না। অথচ সামনের বার কোর্টে আসামিকে প্লেস করে যদি চার্জশিট জম দিতে না পারি তাহলে আসামি বেল পেয়ে যাবে— কী চার্জশিট দেব—? এফ.আই.আর. রেপ্‌ড বাই ওয়ান পার্সন। দ্যাট ইজ অদ্রিজ ঘোষ— পোস্টমর্টেম রিপোর্ট গ্যাং-রেপ্‌ড। বেশ কয়েকজন যে জড়িত বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ সেকথা প্রমাণ করে। অথচ কেউ মুখ খুলছে না। ভয়, ভয়—কোথায় যেন একটা নেপথ্য চোখরাঙানি সত্য উদ্‌ঘাটনে বাধা দিচ্ছে।

(এমন সময় অধ্যাপক সেন প্রবেশ করেন)

অধ্যাপক : কী ব্যাপার? তোমাকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে?

অমিত : *(মৃদু হেসে)* চার্জশিট দেবার সময় এগিয়ে আসছে স্যার। অথচ আসামি কে এখনও এ ব্যাপারে আমি কনফিউজড্।

অধ্যাপক : আর যে হোক, তুমি যাকে অ্যারেস্ট করে রেখেছ সে যে নয় এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

অমিত : স্যার, আমিও সত্য উদ্‌ঘাটন করতে চাই।

অধ্যাপক : তাহলে আরও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখ। মরতে হলেও আমি তোমার পাশে থাকব। ইতিমধ্যেই কলকাতার নামজাদা ক্রিমিনাল ল-ইয়ারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। তাঁকে এ কেস দেখার দায়িত্ব দিয়েছি।

অমিত : আপনি কি স্যার আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?

অধ্যাপক : আগে পারতাম—এখন পারি না। দেখছি তো চোখের সামনে—তোমাদের পুলিশের উপরতলার লোকেরা সরকারের আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিণত হচ্ছে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে স্পেডকে স্পেড বলতে আর পারছে না। তোমরা তো কোন ছার—

অমিত : *(অধ্যাপকের হাতদুটি ধরে)* স্যার, আমি আপনার ছাত্র—আপনি আমার শিক্ষাগুরু। কথা দিচ্ছি—কেউই আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। স্পেডকে স্পেড বলার সাহস আমি রাখি। ইভেন অ্যাট দ্য কস্ট

অব মাই সার্ভিস—

অধ্যাপক : ইয়েস মাই বয়। আমি তোমার উপর ভরসা করতে পারি। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তোমাকে একটা স্মার্ট ফোন দিয়ে গেলাম। অদ্রিজের মোবাইল। ওর বাড়িতে পাওয়া গিয়েছে। আশা করব, অনন্যার মৃত্যুর কিনারা পাবে। চলি—

(*অধ্যাপক চলে যাবার পর অমিত স্মার্ট ফোনটি ঘাঁটতে থাকে। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে*)

অমিত : ইউরেকা। ইউরেকা। সূত্র পেয়ে গেছি। আর দেরি নয়। চার্জশিট, হ্যাঁ চার্জশিট এবার সাবমিট করবই—

পঞ্চম দৃশ্য

(*সমগ্র মঞ্চকে বিচারালয়ে পরিণত করতে হবে। একদিকের কাঠগড়ায় আসামি অদ্রিজ ঘোষ দাঁড়িয়ে আছে, অন্যদিকের কাঠগড়ায় অনন্যার মা। সরকারপক্ষের উকিল ও আসামিপক্ষের উকিল সওয়ালের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বেঞ্চে অধ্যাপক ও কমিশনারের তিন প্রিয়পাত্র ন্যাপলা, হ্যাবলা আর গোকুল বসে আছে। আই.ও. অমিত দত্ত ফাইল নিয়ে হাজির। বিচারপতি বসার জায়গার ঠিক নিচে কোর্টের ক্লার্ক ফাইল নিয়ে বসে।*)

বিচারপতি: (*সরকারপক্ষের উকিলকে লক্ষ করে*) আপনার সওয়াল শুরু করুন।

সরকারি উকিল : আপনি তো অনন্যার মা?

মা : হ্যাঁ।

সরকারি উকিল : (*অদ্রিজের দিকে আঙুল তুলে*) আসামিকে আপনি চেনেন? যে আপনার মেয়ের এতবড় সর্বনাশ করেছে—কোল খালি করেছে।

মা : আসামি কি না জানিনা। তবে অদ্রিজ আমার সন্তানতুল্য।

সরকারি উকিল : আপনি ছেলেটিকে মায়ের স্নেহ দিয়েছেন, বিশ্বাস করেছেন, ভালোবেসেছেন, পুত্রের আসনে বসিয়েছেন, দিনের পর দিন আপনার বাড়িতে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ করে দিয়েছেন—অথচ ওই ক্রিমিনালটা—

আসামি পক্ষের উকিল : অবজেকশন ইওর অনার—দোষী সাব্যস্ত হবার আগেই—

বিচারপতি: অবজেকশন সাসটেইন্ড, প্রসিড অন—

সরকারি উকিল : সরি স্যার। —কিন্তু ভাবুন একবার, যে মা ওই ছেলেটিকে সন্তানবৎ স্নেহ দিয়েছে, মেয়ের সহপাঠী হিসেবে অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে—সে মায়ের বিশ্বাসের এতটুকু মর্যাদা ন দিয়ে, মেয়েটিকে ভুলিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে ক্লাব ঘরে ঢুকিয়ে শুধু রেপ নয়, গলা টিপে হত্যা করে—ভাবতে পারেন স্যার। কোন ধরনের নৃশংসতা—

অদ্রিজ : (*চেঁচিয়ে ওঠে*) মিথ্যা। ভুল। ভুল। আমি অনন্যাকে— (*বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে*)

সরকারি উকিল : (*মায়ের দিকে তাকিয়ে*) আপনি কী বলেন মা—?

মা : (*কান্নায় ভেঙে পড়েন*) না-না-না বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না—

সরকারি উকিল : বিশ্বাস না করতে পারলে ভালো হত—কিন্তু উপায় নেই। মানুষের মধ্যেও কোনো কোনো সময় পাশবিক সত্তা কাজ করে। কিন্তু সেই আদিম রিপু দমন করে তার শুভবুদ্ধি দিয়ে। চারিত্রিক দৃঢ়তায়। কিন্তু যদি শয়তান আশ্রয় নেয়—সেক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না। এ ঘটনা একেবারেই পরিকল্পিত। ছেলেটি বাড়ির অভ্যন্তরে তার সেক্সের খিদে মেটাতে পারছে না, মায়ের উপস্থিতিতে। তাই বেছে নেওয়া হল ক্লাবঘর। মেয়েটি বাধা দেয়—তাই ধস্তাধস্তি—জানাজানির ভয়ে এই ভয়াবহ খুন—দ্যাটস অল ইওর অনার—

বিচারপতি: (*আসামি পক্ষের উকিলের প্রতি*)—আপনার কিছু বলার আছে? এরপর আই.ও.-কে রিপোর্ট প্লেস করতে বলব।

আসামি পক্ষের উকিল : অদ্রিজ তোমার মাধ্যমিকে কত নম্বর ছিল?

অদ্রিজ : এইটটি-টু পারসেন্ট—

উকিল : উচ্চমাধ্যমিকে—

অদ্রিজ : স্টার—

উকিল : এত ভালো রেজাল্ট, অথচ ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে না গিয়ে জেনারেল লাইনে কেন গেলে—

সরকারি উকিল : এসব প্রশ্ন অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক—

বিচারপতি: সেটা আমি বুঝব, আপনি বসুন—

অদ্রিজ : আমি অধ্যাপনা করতে ইচ্ছুক। আমার বাবা রিটায়ার্ড অধ্যাপক। পড়াশুনা নিয়ে থাকেন, আমিও থাকতে চাই।

আসামি পক্ষের উকিল : সেই সুবাদে অনন্যার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব?

অদ্রিজ : ঠিক তাই। ও আমার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইত। একসঙ্গে আমরা অনেকক্ষণ লাইব্রেরিতে কাটাতাম। নোট নিতাম। ধীরে ধীরে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলতে পারেন ভালোবাসার সম্পর্ক।

আসামি পক্ষের উকিল : সেদিনের ঘটনা কিছু মনে আছে?

অদ্রিজ : সেদিন। উঃ—সেদিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ে—(কিছুক্ষণ এদিকে ওদিক তাকিয়ে) সবে সন্ধে হয়ে আসছে—আমরা লাইব্রেরিতে থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনন্যাদের বাড়ির দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ ওরা অনন্যাকে জোর করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল—উঃ কী বীভৎস—(*চেঁচিয়ে ওঠে*) আমার মোবাইল কই? আমার মোবাইল? সব ধরা আছে—সব, সব, সব—

আসামি পক্ষের উকিল : স্যার, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট বলছে গ্যাং রেপ্‌ড। কোনো একক ব্যক্তির কাজ নয়। দ্যাট্‌স অল ইওর অনার—

বিচারপতি: এবার পুলিশের তরফ থেকে আই.ও.-কে রিপোর্ট পেশ করতে বলব। মনে রাখবেন—আজ যদি রিপোর্ট পেশ না করেন তবে অভিযুক্ত আসামিকে আমি বেল দিয়ে দেব। আপনি প্রস্তুত?

অমিত : ইয়েস স্যার, আমি প্রস্তুত। শুধু একটা রিকোয়েস্ট আমি রাখতে চাই—আমার রিপোর্ট পেশের সময়ে এই আদালত কক্ষে উপস্থিত কেউ যেন কক্ষ ত্যাগ না করে। (*সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে*)

বিচারপতি: *ঠিক আছে*, দরজায় সেন্ট্রি পোস্ট করা হোক—

অমিত : মাননীয় বিচারপতি, প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই কেসের চার্জশিট জমা দিতে দেরি হওয়ার জন্য। এফ.আই.আর মতো আসামি ধরা পড়েছে ঘটনার একদিনের মধ্যে, ফলে সাদা চোখে দেখতে গেলে অত্যন্ত সহজ একটি খুনের মামলা—প্রায় জটিলতা বিহীন। কিন্তু বাধ সাধল পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ও খুনি সম্পর্কিত কিছু এভিডেন্স যাচাই করতে গিয়ে। প্রথমত, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে মেয়েটি একজনের দ্বারা ধর্ষিতা নন—কয়েক জনের দ্বারা। সারা অঙ্গে যে নির্যাতনের ছাপ রয়েছে তাতে কয়েকজন মিলে জোর করে মেয়েটির ওপর অত্যাচার চালায়। বার বার বাধা দিতে গিয়ে অনেক জায়গা ছিন্নভিন্ন হয়। রক্তাক্ত হয়। এই রিপোর্ট হাতে আসার পর আমি তদন্তের স্বার্থে মাস্টারমশাইয়ের শরণাপন্ন হই—

বিচারপতি: মাস্টারমশাই কে? তাঁর এক্ষেত্রে কী ভূমিকা?

অমিত : স্যার, উনি এই ছেলে-মেয়ে দুটি যে কলেজের ছাত্রছাত্রী সেখানকার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমারও শিক্ষক।

বিচারপতি: আপনিও ওই কলেজের ছাত্র ছিলেন? (*অমিত মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়*) প্রসিড অন।

অমিত : অনন্যার মায়ের সঙ্গে মাস্টারমশাই-এর বাড়িতেই আমি মিলিত হই। কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পরে বুঝতে পারি উনি বিশ্বাসই করেন না অদ্রিজ এ-কাজ করতে পারে। উপরন্তু বললেন, যারা সত্যিকারের শয়তান তাদেরকে নাকি আমরা ধরব না—কারণ তারা রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে। তাদের নাম জানাতে বললে তিনি বললেন, আমার আর একটা বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে তাকেও হারাতে বলছেন? আপনাদের মুরোদ আমার জানা আছে—

বিচারপতি: কথাটি খুব কঠিন। তবে একেবারে অসত্য কি?

অমিত : তা জানিনে স্যার, তবে একজন অনেস্ট পুলিশ অফিসার হিসেবে আজই আমার শেষ দিন—(আদালত কক্ষে গুঞ্জন ওঠে)

বিচারপতি: কী বলছেন মি. দত্ত?

অমিত : হ্যাঁ স্যার। গতকাল এস.পি. সাহেবের কাছে রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনও পর্যন্ত আই.ও. আছি। কারণ এখনও পর্যন্ত পদত্যাগ গৃহীত হবার খবর আসেনি। ফলে আজকের চার্জশিট বৈধই থাকবে।

বিচারপতি: এতো একেবারে চাঞ্চল্যকর খবর—

সরকারি উকিল : সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সামিল—

বিচারপতি: আপনি থামুন, প্রসিড অন—

অমিত : কলেজটি কমিশনারের এলাকায়, যা আমার থানার অন্তর্ভুক্ত। অদ্রিজের বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্থানীয় মানুষজনের কাছ থেকে নানান ইনফরমেশন সংগ্রহ শুরু করলাম। এফ.আই.আর. যারা করেছে সেই তিনজনের নামে নানান অসামাজিক কাজের অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার অব্যবহিত পরে থানায় আমার সঙ্গে ওরা দেখা করে। কিন্তু খুনিরা স্বাভাবিক নিয়মে কোনো-না-কোনো এভিডেন্স রেখে যায়। (*দর্শকাসন থেকে ন্যাপলা ওরফে নেপাল লাফিয়ে ওঠে*) চমকে গেলেন নেপালচন্দ্র তাই না? হ্যাঁ, মোবাইলটা ফেলে গিয়েছিলেন, পরে খুঁজতে আসেন—আমি ডিনাই করি, কেমন? বসুন। বসুন—

সরকারি উকিল : মহামান্য বিচারপতির কাছে জানতে ইচ্ছে করছে এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আই.ও. উপনীত হচ্ছেন? মোবাইলের সঙ্গে খুনের সম্পর্কই বা কী?

অমিত : একটু অপেক্ষা করুন। ক্রমশ প্রকাশ্য। মাননীয় বিচারপতি, এই মোবাইলটি ছিল ন্যাপলা ওরফে নেপালচন্দ্রের, যিনি কমিশনার সাহেবের দক্ষিণহস্ত। ঘটনার দিনের আর একটি মোবাইল আমার হস্তগত হয়। ক্রিমিনালরা মেয়েটির ওপর অত্যাচার করে মেরে ফেলে চম্পট দেয়। এ-সময় অনন্যার ভ্যানিটিব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে যায়। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে সেই মোবাইলও আমার হস্তগত হয়। পরে দুটো মোবাইলের কললিস্ট মেলাতে গিয়ে অনন্যাকে যে বার বার হুমকি ও কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করা হয় তা ধরা পড়ে। এমনকি ঘটনার দিন সকালেও—

সরকারি উকিল : স্যার, এর দ্বারা কিন্তু খুনের অভিযোগ প্রমাণিত হয় না। আর বিশেষত, ফোনটা একই ব্যক্তির অথচ আই.ও.-র কথা অনুযায়ী পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে গণধর্ষিতা।

বিচারপতি: এসব সওয়াল জবাবের সময় অনেক পাওয়া যাবে। আই.ও. কী রিপোর্ট দিচ্ছেন বা কার কার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন সেটাই এই মুহূর্তে বিচার্য বিষয়। বলুন—

অমিত : অদ্রিজ যে এই ঘটনায় কোনোভাবে যুক্ত নয়, সে সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হলাম অদ্রিজের বাবার সঙ্গে সাক্ষাতে। সেখানেও মোবাইল কাজ করল—পাওয়ারফুল স্মার্ট ফোন—যাতে পরিষ্কার ছবি তোলা যায়। পরিষ্কার ভেসে ওঠে ওই সামনে বসে থাকা তিনজনের ছবি—যারা দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত। ন্যাপলা ওরফে নেপালচন্দ্র, ভ্যাবলা আর গোপলার মুখগুলি। (*ওরা পালাতে চায়*) উঁহু পালাবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে বিপদ আরও বাড়বে—

বিচারপতি: বুঝলেন কী করে?

অমিত : ছবিতে মুখ অনেকটা স্পষ্ট। তবু আরও কনফারমেশনের প্রয়োজন ছিল। অদ্রিজের উপরেও তো অত্যাচার হয়েছে, নয়তো ভয় দেখিয়ে স্পট থেকে সরিয়ে দিয়েছে—তাহলে? আরও এনকোয়ারি করলাম। ক্লাবের বেশ কিছু দূরে এক ঘুঘনিওয়ালা প্রতিদিন ঘুঘনি বিক্রি করতে আসে। ঘটনার পর আর সে আসে না। অনেক খুঁজে তাকে পাকড়াও করলাম। জানাল, অদ্রিজের হাত দুটি বাঁধা ও মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগানো অবস্থায় ঘুঘনিওয়ালা দেখতে পায় এবং হাতের বাঁধন খুঁলে দেয়। পরে অদ্রিজকে জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে জানতে পারি সে আবার ক্লাব ঘরের দিকে ছুটে যায়—অনন্যাকে বিবস্ত্র করে ওরা অত্যাচার করে, অদ্রিজ ছবিও তোলে।

বিচারপতি: মোবাইলটা পেলেন কী করে?

অমিত : এ কৃতিত্ব আমার মাস্টারমশাইয়ের। তিনি অদ্রিজের বাড়ি যান, অদ্রিজের বাবা তাঁকে অদ্রিজের

মোবাইলটা দেন। মাস্টারমশাই তদন্তের স্বার্থে আমাকে ওটি দেন। ফলে সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমার চার্জশিট থেকে অদ্রিজের নাম আমি তুলে নিচ্ছি এবং অনন্যার শ্লীলতাহানি, পাশবিক অত্যাচার ও খুনের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৫, ৩৭৬ ও ৩৪ আই.পি.সি. ধারায় ন্যাপলা ওরফে নেপালচন্দ্র, গোপলা ওরফে গোপালচন্দ্র ও ভ্যাবলার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে মহামান্য আদালতে পেশ করছি। সাথে সাথে তিনটি মোবাইলও কোর্টে পেশ করলাম। আর একটি বিষয় জানিয়ে রাখা ভালো। এখনও আমার পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার কোনো চিঠি আমি পাইনি। ফলে এ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার চার্জশিট ভ্যালিড—বৈধ।

বিচারপতি: এক ঘণ্টা পরে রায় ঘোষিত হবে। সে পর্যন্ত আদালত স্থগিত রইল।
(*মঞ্চের আলো নিভে গেল এবং কয়েক সেকেন্ড পরে আবার জ্বলে উঠল*)

বিচারপতি: মোবাইলের ছবি ও অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আমি শ্রীঅদ্রিজ রায়কে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলাম এবং আই.ও.-র পেশ করা চার্জশিটে উল্লিখিত তিন আসামিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিলাম। দ্য কোর্ট ইজ অ্যাডজর্নড। পরবর্তী শুনানির দিন পরে জানানো হবে।
(*আদালত কক্ষ খালি হতে শুরু করল বিচারপতির কক্ষত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে। আসামিদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল। ইন্সপেক্টর অমিত দত্ত ফাইল গুটিয়ে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন—অধ্যাপক এগিয়ে এলেন।*)

অধ্যাপক : কংগ্র্যাচুলেশন মাই বয়। নাঃ, এতকালের আমার শিক্ষকতা বিফলে যায়নি। তোমাদের স্পেডকে স্পেড বলতে শিখিয়েছিলাম। আজ তার যথার্থ প্রমাণ মিলেছে।

অমিত : এতকাল ভাবতাম পুলিশের চাকরি সম্মানের চাকরি। সমাজসেবকের চাকরি। স্বপ্ন দেখতাম আই.পি.এস. অফিসার হব। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। হয়ত পাশও করে যেতাম। কিন্তু যা দেখলাম—এ কোন রাজত্বে আমরা আছি। আমরা যারা প্রশাসনে আছি তারা কাদের সেবা করছি! আই অ্যাম কমপ্লিটলি কনফিউজড্, ফ্রাস্ট্রেটেড।

অধ্যাপক : পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাও—দেখবে একদিন সব কেটে যাবে। হিটলারের আমলের জার্মানি তার অকাট্য প্রমাণ। শ্বাসরোধকারী বার্লিন শহর, কলুষিত কুৎসিত সমাজজীবন, মিথ্যা আর সাজানো মামলায় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কণ্ঠরোধ, খুন, নারীধর্ষণ, নাৎসি বাহিনীর অবাধ বিচরণ। কিন্তু সবই সাময়িক—
(*এমন সময় থানার বড়বাবুর প্রবেশ*)

বড়বাবু : এই যে মিস্টার দত্ত। আপনাকে নিয়ে যেতে এলাম।

অমিত : স্যার, আপনাকে একেবারে অচেনা লাগছে। হঠাৎ এমনভাবে? কোথায় যেতে হবে?

বড়বাবু : থানায়—

অমিত : থানায় তো এমনই যাব—কেসটি নতুন করে সাজাতে হবে—

বড়বাবু : আর কিছু করতে হবে না। ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

অমিত : মানে?

বড়বাবু : এস.পি. সাহেব স্বয়ং ওয়ারেন্টে সই করেছেন—সরকারি কাজে গাফিলতি, সরকারি তদন্তকে বিপথে চালনা, সর্বোপরি একটি নিরীহ ছেলেকে বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন জেলে রাখা, এমনকি অত্যাচারে তার স্মৃতিভ্রংশ ঘটানো—এসব অভিযোগের ভিত্তিতে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। (*স্বগতোক্তি*) কোথায় আই.পি.এস. অফিসার দেখব, নাঃ শালা, এখন নিজে জেলের ঘানি টান।

অমিত : তাহলে বড়বাবু, সত্যমেব জয়তে—কী বলেন?
(*উচ্চগ্রামে শ্লেষাত্মক হাসি*)
(*মূল মঞ্চ আলো আঁধারি হয়ে যায়। শুধু একটি আলো বিচারপতি বসার পেছনের যে জায়গায় গান্ধীজির ছবি আছে সেখানে ঠিকরে পড়ে। সারা মঞ্চ ও দর্শকাসনে খালি একটি ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়—সত্যমেব জয়তে, সত্যমেব জয়তে। মঞ্চের চরিত্রগুলি ফ্রিজ হয়ে যায়।*)

With Best Compliments of

A Well Wisher

Dhatrigram, Burdwan

Sl. No. 26

সোশ্যাল মিডিয়া ও সন্ত্রাসবাদ

মইনুল হাসান

সন্ত্রাসবাদী হামলায় সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছে। ঢাকা থেকে বাগদাদ, কাবুল থেকে প্যারিস—সর্বত্র রক্তপাত। সাধারণ মানুষ, নারী শিশু নির্বিচারে খুন হচ্ছে। যারা পৃথিবীতে শান্তিতে বাস করতে চেয়েছিল অকারণে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। সর্বত্র এই কাজ হচ্ছে ধর্মের নামে। সব ধর্ম শান্তির কথা বলে। এরা মানুষ খুন করার কাজে সেই ধর্মকেই ব্যবহার করছে। মুসলিম মৌলবাদী শক্তি নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য কোরান বা হাদিস তুলে নেয়নি। হাতে তুলে নিয়েছে বন্দুক। হিন্দু মৌলবাদী শক্তি এই ধর্মের উদারতা, বহুত্ববাদকে দূরে সরিয়ে হিংস্রতা প্রসারে মন দিয়েছে। একটা দেশের সীমানার মধ্যে বিষয়গুলি আবদ্ধ নেই। ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। পৃথিবীর যেখানেই হামলা হোক না কেন, আই এস আই এস-এর লোক আছে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তারাও প্রায় আধঘণ্টার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দায় স্বীকার করছে। বাংলাদেশ ও কাবুলের ঘটনা তাই প্রমাণ করছে। ঢাকা হোলি আর্টিজান কাফেতে হামলা সম্পর্কে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে এটা বিদেশিদের নয়, দেশীয় সন্ত্রাসবাদীদের কাজ। প্রধান দায়ী জামাতুল মুজাহিদিন-বাংলাদেশ। কিন্তু এই কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের ছবি আই এস নিজস্ব সাইটে প্রকাশ করে দায় স্বীকার করে নিয়েছে। তবে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে জে এম বি-র সঙ্গে আই এস-এর যোগাযোগ খুবই নিবিড়। কাবুলে শিয়া সম্প্রদায়ের একটি মিছিল ও জমায়েত ছিল। সেখানে আত্মঘাতী বোমায় ৮০ জনের বেশি শহিদ হয় এবং অসংখ্য আহত হয়। আফগান সরকার ঠাওর করতেই পারেনি যে কাজটা কারা করেছে। একদিন পর আই এস বলেছে এটা তাদের কাজ। কারণ হিসেবে বলে—শিয়াদের তারা শেষ করবে। কারণ তারা নাকি মানুষই নয়। বাস্তিল দিবসে যা হয়েছে তা ইদানীং ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীগুলির মধ্যে অভিনব নয়। প্রতি বছর বাস্তিল দুর্গের পতনের দিনটি গণতন্ত্রের বিজয় দিবস হিসেবে ফ্রান্সে পালিত হয়। সারা পৃথিবীতেই এই দিনটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। উৎসব করেই ফ্রান্সে এটি পালিত হয়। প্রচুর মানুষের জমায়েত। তার মধ্যে একটা ৯০ টন ওজনের ভারি লারিকে চালিয়ে দেওয়া হয়। নিরাপত্তা রক্ষীরা বলে যে লরিটি থেকে গুলি বর্ষণও করা হয়। হামলার ধরন থেকে এটা আইসিস-এর কাজ কি না অনেকের সন্দেহ হয়। কিন্তু একদিন আইসিস নিজেই তাদের সাইটে ঘোষণা করে এ-কাজ তারাই করেছে।

২.

আমাদের এই লেখার প্রধান বিবেচ্য বিষয় যারা সন্ত্রাসবাদী তারা কারা? তারা কোন বাড়ির সন্তান? বয়স কত? কোন দেশ থেকে আসছে? কী ভাব পোষণ করছে? হঠাৎ বন্দুক তুলে নিচ্ছে কেন? কোন আকর্ষণে তারা এমন কাজে রত হল—এই সবগুলো। কিছুদিন থেকে একটা ধারণা অনেকের মনে চালু আছে যে, যারা সন্ত্রাসবাদী তারা খুবই গরিব ঘরের সন্তান। বেশিরভাগই মাদ্রাসায় পড়া। তাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মগজ ধোলাই করে মৌলবাদী সংগঠনগুলি। টাকা-পয়সার বিনিময়ে তাদের প্রায় কিনে নেয়। ধর্মের নামে উত্তেজিত করে এবং ইসলামের নামে ভয় প্রদর্শন করে। বলে তুমি

জেহাদ করতে যাচ্ছো। মারা গেলে—অনন্ত স্বর্গবাস।

মুম্বই হামলায় একমাত্র জীবিত ধৃত জঙ্গি আজমল কাসভ-এর জীবনপঞ্জি দেখে সেটাই মনে হয়েছিল। খুবই দরিদ্র ঘরের সন্তান এবং সামান্য কয়েক লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই কাজে সে হাত দিয়েছিল। তার উপর সমস্যা ছিল—পুরো টাকা তার পরিবার পায়নি। এক্ষেত্রে আরও একটা বড় বিষয় ছিল যে, তার পরিবারের লোকজন জানত যে সে জঙ্গিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কোথায় যাচ্ছে তা জানত না। আবার খাগড়াগড়ের ঘটনার পর সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে যেভাবে মাদ্রাসাগুলোর ওপর নজরদারি শুরু হল তাতে মনে হল যে সব মাদ্রাসাতে জঙ্গিরা লুকিয়ে আছে। কিন্তু এখন যে-সব সংবাদ আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে—জঙ্গিরা মাদ্রাসা থেকে শুধু আসছে না, পৃথিবীর অত্যাধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি থেকেও আসছে। সম্প্রতি ঢাকা এবং কিশোরগঞ্জের পর পর সন্ত্রাসের যে ঘটনা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাও জঙ্গিদের খাতাতে নাম লেখাতে পারে, পবিত্র রমজান মাস বা ইদের দিনেও হামলা করতে পারে। ধর্মের নামে জেহাদ করলেও কোনোরকম অনুশাসন (ধর্মীয়) তারা মানে না। সাবেকি ধর্মশিক্ষা নয়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণরা জঙ্গি দলে যোগ দিয়েছে পশ্চিমের দেশগুলিতে। কিন্তু ঢাকা-র ঘটনায় প্রমাণ হয়ে গেল এই উপমহাদেশ তার ছোঁয়া পেয়ে গেছে।

কয়েক মাস আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল হয়ে ওঠে। একটি হলুদ গাড়ির সামনে এক যুবক ডান হাতে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাম হাত দিয়ে আগলে রেখেছে তার সদ্যোজাত শিশুকে। যে অ্যাকাউন্ট থেকে ছবিটি ট্যুইটারে পোস্ট করা হয়েছিল সেটি আবু রুমায়শাহ-র। ৩১ বছরের এই যুবক আবার সারা দুনিয়ায় আলোকচিত্র হয়ে উঠল যখন আইসিস ১০ মিনিটের ভিডিও পোস্ট করল। তাকে ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরাজি বলতে শোনা গেল। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা। তার সামনে ৫ ব্রিটিশ নাগরিক নতজানু হয়ে বসে। তাদের পরনে কমলা রঙের পোশাক। সেই বন্দি ৫ জন ব্রিটিশকে 'চর' বলে ঘোষণা করা হল। তাদের দিয়ে তা কবুল করিয়ে নেওয়াও হল। তারপর 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি। সেই যুবকটি সহ অন্যরা কাছাকাছি রেঞ্জ থেকে গুলি করে তাদের মেরে ফেলল। এই যুবকটি ক্যামেরনকে যথেষ্ট গালাগাল দেয় এবং বলে, 'আমরা জেহাদেই বিশ্বাস করি। ব্রিটেন আমরা দখল করব। তারপর শরিয়ত মেনে শাসন করবো।' একটি শিশুকে দিয়েই ভিডিওটি শেষ হয়েছে। ভালো চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল, মাথায় কালো ফেট্টি বাঁধা। তাতে একটি নিয়মমত গোলাকার চাকতিতে আই এস-এর লোগো। আঙুল উঁচিয়ে ব্রিটিশ উচ্চারণে ইংরাজিতে বলছে 'ওখানে আমরা কাফেরদের হত্যা করেছি।' আবু রুমায়শাহ নামক এই যুবকটির আগের নাম ছিল সিদ্ধার্থ ধর। বাবা কাশ্মীরি পণ্ডিত। মা বাঙালি। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের 'ধর' পদবি হয়। হিন্দু পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নাম আবু রুমায় শাহ। মার্কিন-আরব-ইজরায়েল বিরোধী নানা সমাবেশে তাকে দেখা যায়। লন্ডনে মৌলবাদী সংগঠনে সে খুবই পরিচিত মুখ। তাকে বন্ধুরা সিড বলে ডাকতো। এই সিড কবে আইএস-এর জঙ্গিতে পরিণত হয়ে গেল। আয়েশা নামে একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে। তারপরই তার মতিগতি পাল্টে যায়। মুসলমান হয়ে সে নাম নেয় সইফুল ইসলাম (ইসলামের তরবারি)।

২০১৪ সালে ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন পর ছাড়া পায়। পাসপোর্ট জমা রাখতে হয়। কিন্তু গোপনে সে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী ও শিশুপুত্র নিয়ে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশন থেকে প্যারিসের ট্রেন ধরে, সেখান থেকে সোজা সিরিয়া। পুলিশ তাকে ধরতেই পারেনি। খবর পায়নি। বরং সে-ই একদিন তার ছবি ও সিরিয়া বাসের কথা ট্যুইট করে জানায়। সে ট্যুইট-এর কথা আগেই বলেছি। তারপর তার বহু মৌলবাদী বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেছে। গৌতম বুদ্ধর ছেলেবেলার নাম সিদ্ধার্থ। দয়া মায়া শান্তি এই নামের মধ্যে লুকিয়ে আছে। এখন সেসব শুনে সিড অট্টহাসি হাসে। তার কাছে শান্তির ব্রত একটাই—রক্ত আর খুন। যে সিদ্ধার্থ একদিন সুন্দর হাসিকে জীবনের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিল, এখন সে নিরপরাধ মানুষকে খুন করেই হেসে ওঠে।

ঢাকার ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন 'বাড়িতে নিজের ছেলে আছে কিনা দেখুন, আর না থাকলে কতদিন নেই দেখুন।' হোলি আর্টিজান বেকারিতে অন্যতম হামলাকারী রোহান ৩০ ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ। তার বাবা ইমতিয়াজ বাবুল বিশিষ্ট আওয়ামী লিগ নেতা ও বাংলাদেশের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক। তিনি ছেলের ফেসবুকে কাতর আবেদন জানিয়েছেন—'ফিরে আয় বাবা'। মাত্র তিনটি শব্দ সারা বাংলাদেশ কাঁপিয়ে দিয়েছে। কয়েক মাস ধরে রোহনের মতো অনেকেই বাড়ি ফেরেনি। তাদের কারও বাবা বিচারপতি, কারো বাবা সেনা অফিসার, কারো বাবা বড় আমলা, কারো বাবা বেসরকারি সংস্থার কর্তা। লোক জানাজানির ভয়ে পুলিশের কাছে কোনো রিপোর্ট পর্যন্ত করেননি তাঁরা।

ইসলামিক স্টেটস-এর এপ্রিল সংখ্যাতে আবু জান্দাল আল বেঙ্গলি নামে এক জঙ্গির মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, কীভাবে এই সেনা অফিসারের ছেলে একটি কলেজের ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে সিরিয়ায় পালিয়ে এসেছিল। সেখানে অস্ত্রশিক্ষা নিয়েছে। তারপর এক যুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে মারা যায়। গুলশনে হামলার পর প্রকাশিত আই এস-এর ভিডিওতে বাংলাদেশে আরও বড় জঙ্গি হানার হুমকি দিতে শোনা গেছে তিন জন তরুণকে। তাদের মধ্যে একজনের বাবা দেশে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ পুলিশ অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছে খন্দকান রোকনউদ্দিন নামে এক ডাক্তার সপরিবারে নিখোঁজ। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক জামাইকে নিয়ে তিনি মালয়েশিয়া যান। সেখান থেকে তারা সিরিয়া চলে গেছেন। তিনি নিজেই ট্যুইট করে আত্মীয়দের জানিয়েছেন 'আই এস শাসনে এসে তাদের মন ভরে গেছে।'

বাংলাদেশ পুলিশের আরও অনুসন্ধান হচ্ছে যে, এই নিখোঁজ তরুণরা প্রায় সবাই বিত্তশালী পরিবারের সন্তান। বাড়ি থেকে কেবলমাত্র পাসপোর্টটিই তারা নিয়ে গেছে। তালিকায় কয়েকজন মধ্যবয়স্ক মহিলাও আছেন। আছেন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় শিক্ষক ও কয়েকজন ডাক্তার। এরা প্রথমে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া বা ভারতে কয়েকদিন কাটিয়ে সুযোগমতো পাড়ি দেন সিরিয়ায়। পুলিশের ধারণা বাংলাদেশে অতি আধুনিক শিক্ষাযুক্ত একটি চক্র সমগ্র ব্যবস্থাপনার গোড়াতে আছে। তারা গরিব মাদ্রাসা পড়ুয়াদের দিকে নজর দেয় না। উচ্চবিত্ত বাড়ির ছেলেদের দিকে নজর দেয়। তার একটি বড় কারণ পাসপোর্ট, মাদ্রাসার ছাত্র ও গরিব বাড়ির লোকদের যেটি থাকার সম্ভাবনা কম।

কমবয়সীরা কীভাবে এবং কেন এমনভাবে সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লেখাচ্ছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে সারা দুনিয়া জুড়ে। বিষয়টিকে কেবল ধর্মের প্রতি টান বলে মনে করা হচ্ছে না। তারা এমন একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় যা তার পরিবারের লোকজনই বুঝতে পারে না। আপাতভাবে তারা নিরীহ। অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করে না। ঘটনা ঘটার পর অনেকের সম্বন্ধে এলাকার মানুষকে বলতে শোনা যায় পাড়ার সবচাইতে শান্ত স্বভাবের ছেলেটি 'এমন' তা তারা বিশ্বাস করতেই পারছেন না। তবে এমন ঘটনা

বহুকাল ধরে চলছে। সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিতে ছেলেরা আগেও বাড়ি ছেড়েছে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে আরও বড় সমস্যা হচ্ছে তারা হাতে ল্যাপটপ বা অ্যাপস্ মেবাইল নিয়ে সারাদিন খুটখুট করে যে কী করছে তার কোনো হিসাব বা খবর কেউ রাখে না। অনেক বাড়ির মানুষজন এসব খুব বেশি বোঝেন না। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবাধে সারা পৃথিবী জুড়ে যোগাযোগ এবং কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে। কমবয়সীদের 'মগজধোলাই' এভাবেই চলে। এই সময়ে মগজধোলাই-এর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল নেটওয়ার্কিং।

বিলেতে এই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে—কেন দলে দলে মৌলবাদী বা সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠছে যুবরা, কেন তারা রওনা দিচ্ছে সিরিয়ার দিকে। আমি নিজে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম এম আই টি-র একটি মেয়ে তার শিক্ষকের সঙ্গে যে কথা বলছে তা শুনে। ইউটিউবে সে নিজেই দিয়েছে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য সিরিয়া গিয়ে আইসিসের মহিলা বাহিনীতে যোগ দেবে। খেলাফতের হয়ে কাজ করবে। আইসিস জঙ্গিদের মহিলাদের সম্পর্কে মনোভাবের কথা জানালে এসব কিছু সে পাত্তা দিতে চায়নি।

তরুণ মনের পরিবর্তনের কয়েকটি সাধারণ সামাজিক প্রবণতা যেভাবে রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে তা হল—(১) বয়ঃসন্ধিকালের একাকিত্ব, (২) সেই নবকুমারের জিজ্ঞাসা—'এ জীবন লইয়া কী করিব?' অর্থাৎ জীবনের অর্থ কী তা নিয়েই চিন্তা, (৩) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাওয়া ও সমাধানের চেষ্টা করা, (৪) নিজেকে সব সময় অবহেলিত বলে মনে করা এবং সেখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা, (৫) মনোজগতে এসব চিন্তার সূত্র ধরেই কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া, (৬) সামাজিক বা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী মনোভাবের হয়ে যাওয়া।

ধর্মীয় শিক্ষা বা দারিদ্র্য কোনোটাই জঙ্গিপনার উৎস নয় তা ক্রমে ক্রমে আমাদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে। সবচাইতে বড় জঙ্গি হানা হয়েছে ৯/১১-র জোড়াবাড়িতে। আমেরিকার এই জোড়াবাড়ি ভেঙে পড়েছে। বিমান ছিল—তাই নিয়ে যারা নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, হোয়াইট হাউস এবং পেন্টাগন ধ্বংস করতে হানা দিয়েছিল তারা কেউই মাদ্রাসার ছাত্র ছিল না। আত্মঘাতী ওই সন্ত্রাবাদীরা অধিকাংশই ছিল উচ্চশিক্ষিত—ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। বিমানচালকও ছিল কেউ কেউ। নইলে এমন কাণ্ড ঘটানো সম্ভব ছিল না।

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সন্ত্রাসবাদী হয়ে যাবার প্রক্রিয়া চলছে বহুদিন ধরেই। স্যোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর দক্ষতা ও পারদর্শিতা সমগ্র বিষয়টিতে নতুন গতি এনে দিয়েছে। ইন্টারনেট, ফেসবুক, ট্র্যাকার, ই-মেল, ইনস্ট্রাগ্রাম, স্কাইপ সহ আরও বহুরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা এ-যুগে জঙ্গিপনার বিশ্বায়ন ঘটিয়েছে।

সদ্য পশ্চিমবাংলায় একজন সন্দেহভাজন জঙ্গি ধরা পড়েছে। মহম্মদ মুসাউদ্দিন ওরফে 'মুসা'রও দেশবিদেশের তাবড় জঙ্গির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল এসব সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে। গোয়েন্দারা বলছেন, ল্যাপটপে অন্তত ১০-১২ রকম সাইট ব্যবহারে মুসার উচ্চমানের দক্ষতা আছে। এগুলোর মধ্যে এমন সাইট আছে যেখানে বার্তাবিনিময় করলে কোনো সার্ভার রেকর্ডই থাকে না। এরকমই গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা সেখানে আছে। সর্বাধুনিক এসব যোগাযোগ-ব্যবস্থাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে জঙ্গি মনোভাবের প্রসার ঘটাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে মাদ্রাসা সহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক পিছনে পড়ে আছে।

সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে ধর্মের চাইতে হাজারগুণ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট এবং তার হরেকরকম অঙ্গ। শুধু ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের ক্ষেত্রে এটা সত্য নয়। হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যেও ইন্টারনেটের ব্যবহার ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষ এই মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে দ্রুত হারে। গঙ্গাসাগর বড় তীর্থক্ষেত্র। লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে মিলিত হন। মিলিত হন অগণিত সাধুবাবা। এই দৃশ্য আমাদের কাছে অদেখা নয় যে, ছাইভস্ম মেখে সাধুবাবা স্মার্ট ফোন, আইপ্যাড, ল্যাপটপ ব্যবহার করছেন। মনিটরে ফুটে উঠছে নানা রকম তথ্য ও ঘটনাবলী। মক্কা মসজিদে ও সমঝোতা এক্সপ্রেসে সন্ত্রাসবাদী হামলার আগে জঙ্গিদের মধ্যে যে বার্তা বিনিময় হয়েছিল ওয়েবপেজের মাধ্যমেই তার প্রমাণ মিলেছে।

'র‍্যাডিক্যালাইজেশন অব ইসলাম' কথাটা পশ্চিমদেশে চালু হয়েছে অনেকদিন। বিষয়টি হচ্ছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিবর্তনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন মানুষ সামাজিকভাবে এক অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে অন্য অবস্থায় পৌঁছে যায়। এই প্রক্রিয়া বেশ সময়সাপেক্ষ। হঠাৎ একদিনে এই পরিবর্তন হতে পারে না। যে ধাপগুলি পেরিয়ে আসতে হয় তার একটা সাধারণ বিবরণ দিয়েছেন তাবড় তাবড় সমাজতাত্ত্বিকরা। প্রথমত, একটি বিশেষ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া। দ্বিতীয়ত, সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা বা প্রয়োগ করার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়ার চিন্তা শুরু করা। তৃতীয়ত, সেই চিন্তাকে ইচ্ছায় পরিণত করা। চতুর্থত, সেই ইচ্ছাকে কার্যকর করার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা। এই প্রক্রিয়া ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দুই-ই হতে পারে। আল-কায়েদা বা জেএমবি বা আইসিস বা বজরঙ্গ দল হতে পারে, আবার মাওবাদী দলও হতে পারে। জন্মেই কেউ জঙ্গি হয় না। এই প্রক্রিয়া তাকে জঙ্গি হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।

৩.

সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলো কীভাবে ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছে সে ব্যাপারে হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক গাব্রিয়েল ওয়েমান বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখিয়েছেন প্রত্যেকটা এই ধরনের সংগঠনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ৯০ ভাগ হয়ে থাকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে। তাঁর মতে সন্ত্রাসবাদীরা ট্যুইটার, ফেসবুক, ইউটিউব এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অত্যন্ত দ্রুত বার্তা পাঠানো, কর্মীসংগ্রহ ও তথ্য সংগ্রহ করার কাজ করে থাকে। জঙ্গি সংগঠনগুলি কীভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে তার বড় উদাহরণ হচ্ছে ওসামা বিন লাদেনের অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং মূল স্রোতের আরবি টেলিভিশনগুলিতে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া। আল জাজিরা টেলিভিশন তার মধ্যে অন্যতম।

আলকায়দা এমন একটি জঙ্গি সংগঠন যারা সোশ্যাল মিডিয়াকে সব চাইতে বেশি ব্যবহার করেছে। রান্ড কর্পোরেশন-এর বরিষ্ঠ ব্রেন জেনকিন্স এ-ব্যাপারে বলেছেন—

> While almost all terrorist organisations have websites, al-Qaeda is the first to fully exploit the internet. This reflects al-Qaeda's unique characteristics. It regards itself as a global movement and therefore depends on a global communications network... Its leaders view communications as 90 per cent of the struggle. Despite the risks imposed by intense manhunts, its leaders communicate regularly with video and audio messages, which are posted on its websites and

disseminated on the internet. The number of webwites deveoted to the al-Qaeda-inspired movement has grown from a handful to reportedly thousands, although many of these are ephemeral.

এই প্রসঙ্গে পুরোনো কথাটা আবার মনে করিয়ে দিতে চাইছি যে, ৯/১১-র পূর্বাহ্নে ওসামা বিন লাদেন কাবুল ত্যাগ করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্বের এক উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন—সেটি পূর্ব আফগানিস্তানে। অনেকগুলো গাড়ির কনভয় গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। তার মধ্যে একটি ছিল 'মিডিয়া ট্রাক', যেটি তাঁর নির্দেশে মাত্র ২/১ মাস আগে তৈরি করা হয়েছিল। একজন কম্পিউটার শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত যুবক মিনি ভ্যানটির দায়িত্বে ছিল। সেখানে বসানো ছিল স্যাটেলাইট টিভি এবং রেডিও অ্যান্টেনা। বিন লাদেনের ইচ্ছা ছিল ঘটনা ঘটার পর আমেরিকা এবং সারা বিশ্বে কেমন প্রতিক্রিয়া হয় এবং তিনি তাঁর অনুগামীদের প্রয়োজনীয় বার্তা সহজে দিতে পারেন। সেটাতে তিনি সফল হয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহারে নিজেদের দক্ষতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে ইসলামিক স্টেট। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গোপন চ্যাটিং-এর অ্যাপও তৈরি করে ফেলেছে। একথা জানিয়েছে 'ঘোস্ট সিকিউরিটি গ্রুপ' নামের একটি সংস্থা। 'আলরাউ' এবং 'আমাক' নামে দুটি অ্যাপের সন্ধান পাওয়া গেছে। দুটি অ্যাপই অ্যানড্রয়েড সিস্টেম-এর জন্য তৈরি। কিন্তু এই অ্যাপদুটিকে গুগল প্লে স্টোরে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে জেহাদকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য আই এস হ্যাকারদের দলে টানার ব্যবস্থা করেছে। 'ঘোস্ট সিকিউরিটি গ্রুপ' জানিয়েছে, 'আলরাউ' অ্যাপটি প্রধানত গোপন এনক্রিপ্টেড বার্তা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে 'আমাক' অ্যাপটি আই এস-এর হয়ে প্রচার চালাতে বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদানের কাজে লাগে। অ্যানড্রয়েডের যে কোনো অ্যাপ প্রধানত গুগল প্লে স্টোরের মাধ্যমে ডাউনলোড করা যায়। সেক্ষেত্রে সহজে নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই দুটি অ্যাপ সেখানে নেই। আই এস-এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা মোবাইল বা ট্যাবে অ্যাপ কোডটি ডাউনলোড করে ইনস্টল করলেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। প্রযুক্তি বিষয়ে বেশ কিছু মানুষ আই এস-এ নাম লিখিয়েছে। ফলে এই ধরনের অ্যাপ তৈরি করা কঠিন কিছু নয় বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

আই এস-এর বিস্তারেও সোশ্যাল মিডিয়া বড় ভূমিকা নিয়েছে। আই এস প্রযুক্তির এই সূক্ষ্ম দিকগুলি ব্যবহারে অত্যন্ত পটুতার প্রমাণ ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। আই এস-এর পরের পর হত্যালীলার একের পর এক ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও হামলা করার পর ইন্টারনেটেই তার দায় স্বীকার করে আই এস। আইএস-এর হয়ে লড়তে, খেলাফতের হয়ে কাজ করতে দলে দলে বিদেশিরা সিরিয়ায় যে মিলিত হচ্ছে তারও অন্যতম কারণ সোশ্যাল মিডিয়া। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার সমস্যাও আছে। আই এস-এর কর্মকাণ্ডের ওপর নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সহজে নজর রাখতে পারে এবং রাখছে। তাই এটাকে গোপনপন্থা বলে মনে করছে না বিশেষজ্ঞরা। আই এস-এর ইন্টারনেট কর্মকাণ্ডের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নজর রাখছে 'ঘোস্ট সিকিউরিটি গ্রুপ'। এদেরই দাবি, ২০১৫-তে ইন্টারনেটে আই এস-এর সঙ্গে জড়িত ৫৭ হাজার অ্যাকাউন্টকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

এর আগে গোপনে খবর আদান-প্রদানের জন্য আই এস 'টেলিগ্রাম' অ্যাপটি ব্যবহার করত। 'টেলিগ্রাম' অ্যাপটিতেও এনক্রিপ্টেড বার্তা বিনিময় করা যেত। নানা মহল থেকে আপত্তি করার ফলে 'টেলিগ্রাম' শেষ পর্যন্ত আইএস-এর সঙ্গে জড়িত অ্যাকাউন্টগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যদিও এখনও আইএস-এর সঙ্গে জড়িত বেশ কিছু 'টেলিগ্রাম'-এর অ্যাকাউন্ট চালু আছে বলে অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সাইফুল হক-এর নাম করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলায় নিহত। তার এক নাম সুজন। একজন ব্রিটিশ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। জুনাইদ হুসেন নামে এক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ ২০১৪-তে এক ড্রোন হালায় নিহত হলে সাইফুল সেইখানে নিযুক্ত হয়। জুনাইদ ছিল ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ইরাক ও সিরিয়ায় আই এস-এর যোদ্ধাদের আকৃষ্ট করার কর্মসূচির উদ্যোক্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগনের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০১৫-র ডিসেম্বর মাসে সিরিয়ায় আই এস-এর তথাকথিত রাজধানী রাকা প্রদেশের কাছে বিমান হামলায় সাইফুল মারা যায়। আইসিসের হয়ে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগকারী, হ্যাকিং কর্মকাণ্ড নজরদারি প্রতিরোধ প্রযুক্তি ও অস্ত্র উন্নয়নের কাজে নিয়োজিত ছিল। সাইফুল হক সিরিয়ায় আবু খালিদ আল-বাঙালি নামে পরিচিত হয়। সেখানে ব্রিটিশ নাগরিক ও আইসিসের হ্যাকিং কর্মকাণ্ডের নেতা জুনাইদ হোসেন-এর অধীনে কাজ শুরু করে। ২০০৩ সালে লেখাপড়ার জন্য লন্ডনে যায় এবং গ্ল্যামারগান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে। কম্পিউটার প্রকৌশলী হয়ে ওলেক্সের কার্ডিফে গিয়ে 'আইব্যাক' নামে তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে।

৪.

সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেন হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গাব্রিয়েল ওয়েমান। তিনি বলছেন, ১০-১২ বছর আগে মাত্র ১৬টি ওয়েবসাইট, যা সন্ত্রাসবাদীরা চালাতো তা নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করতাম বা তার দিকে নজর রাখতাম। কিন্তু এখন এই সংখ্যাটি ৭ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

সন্ত্রাসবাদীদের একটা শিক্ষাশিবিরের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। তাতে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তার বর্ণনা আছে। প্রথম বিষয় হচ্ছে নেতা নির্বাচন, সদস্য সংগ্রহ, কাকে কাকে খুন করা হবে তার কলাকৌশল শেখানো। শেষে প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার করা হবে। সংবাদ আদান-প্রদানে সোশ্যাল মিডিয়া কীভাবে সাহায্য করতে পারে তারই গভীর বিশ্লেষণ। ওয়েমন-এর মতে শিক্ষার মান ও পেপার যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল নয়, তার চাইতে বেশি। সহজেই বোঝা যায় সারা পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসবাদীরা কীভাবে তৈরি হয়েছে।

অধ্যাপক ওয়েমন-এর মতে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে একটা সাধারণ নির্দেশ থাকে। তুমি একটা ইন্টারনেট কাফেতে যাও, চ্যাট রুম বা ওয়েবসাইট-এ প্রবেশ কর, কীভাবে কাজ করতে হবে এবং অন্যান্য যে নির্দেশ নির্দিষ্ট করা আছে সেটা প্রিন্ট করে নাও। তোমাকে কেউ দেখতে পাবে না। কম্পিউটার টারমিনাল থেকে যখন অন্যরা এটার হদিশ পাবে তখন তুমি সে জায়গা ছেড়ে অনেক দূর চলে গেছ। সংগঠনগুলি আরও জানে যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বার্তা পাঠানো যায়। আপাত গোপনীয়। অতি সস্তা। সুতরাং গোলাবারুদের চাইতে এটা শক্তিশালী অস্ত্র। সেই কারণেই বার্জার ও মর্গান দেখাচ্ছেন ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে আইসিস প্রায় ৪৬ হাজার ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে। অতি দ্রুত তারা অ্যাকাউন্ট পাল্টে ফেলে। দেখা যায় ২/১ মাস অন্তর ২০-৩০ শতাংশ মানুষ ট্যুইটার অ্যাকাউন্টে যুক্ত হচ্ছে।

মহম্মদ মেরাহ্ নামে একটি ছেলে। মাত্র ২৩ বছর বয়স। একজন

খুনি মাত্র। তার জীবনের শেষ ৩৬ ঘণ্টা সে সঙ্গের ল্যাপটপ নিয়ে কাটিয়েছে। ফ্রান্স-এর তোলুস এলাকায় একটা ছোট ঘরে সে থাকত। সে তার বাড়ির বাইরে পুলিশ এবং সাংবাদিকরা জড়ো হয়েছে। কিন্তু নিশ্চিন্তে তার ঘরে খাবার গরম করে খেয়েছে এবং তার অস্ত্রগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। কোনো বিকার নেই। সে নিজেই বলেছে ৭ জনকে সে খুন করেছে। তার মধ্যে স্কুলগামী শিশুও আছে। প্রত্যেকটা খুনের আগে তার শরীরে গোপ্রো ক্যামেরা লাগানো থাকত। এর ফলে প্রত্যেকটা সেকেন্ডের ফুটেজ তাতে ধরা ছিল। তার খুন করা ৭ জনের মধ্যে প্রথম তিন জন সৈনিক। তার মধ্যে ২ জন মুসলমান এবং ১ জন ক্যাথলিক। তাদের তখন বিশ্রামের সময়। অন্যগুলো শিশু। একটি ৮ বছরের শিশুকে ধরে ফেলে। বেশিরভাগ পালিয়ে যায়। সেই বাচ্চাটি তার স্কুলব্যাগটি নেবে কি নেবে না এটা ভাবতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাকে ধরে অস্ত্র পাল্টায় এবং শেষ পর্যন্ত গুলি করে মারে। কতখানি হিংস্র হলে সন্ত্রাসবাদীরা এই কাজ করতে পারে! তারপর ঘরে বসে সে তার হত্যালীলার ২৪ মিনিটের ভিডিও ক্লিপ তৈরি করেছে অতি মনোযোগ সহকারে। এর মধ্যে কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়। সে বাড়ি থেকে বের হয় এবং কাছের পোস্টবক্সে ভিডিও ক্লিপটি আলজাজিরা টিভিতে পাঠাবার জন্য ফেলে আবার ঘরে ফিরে আসে। তারপর পুলিশের সঙ্গে লড়াইতে মারা যায়। এতক্ষণ কথাগুলো বললাম এই কারণে যে, এই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী আর এই হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যবহার।

সারা পৃথিবীতে যে জঙ্গিহানা আইসিস চালাচ্ছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্য যে-কোনো সন্ত্রাসবাদীদের থেকে তারা আলাদা। অন্য সন্ত্রাসবাদীদের থেকে একেবারে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলেছে। আইসিসের নিজস্ব এলাকা আছে। সিরিয়া এবং ইরাকের একটা অংশ নিয়ে খেলাফত তৈরি হয়েছে। সারা বিশ্বে তারা খেলাফতের জন্য লড়াই করছে। খেলাফতের কোনো সীমানা নেই। যে মানচিত্র তারা প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে স্পেন এবং পূর্বে চিন পর্যন্ত তা বিস্তৃত হবে। তার মধ্যে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ থাকবে। এই কাল্পনিক খেলাফতের জন্য সৈন্য সংগ্রহ এবং অর্থ সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি। সোশ্যাল মিডিয়াতে আইসিস ধারাবাহিকভাবে তাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ফলও ফলছে। ফেসবুক, ট্যুইটার, স্কাইপে প্রচার করা হচ্ছে এটা কোনো ব্যক্তিগত লড়াই নয়। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ। এখানে মৃত্যু মানে অন্তহীন স্বর্গ। আর কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ-বিক্ষোভের জায়গাও এখানে নেই। সে কারণে বিদেশ থেকে যোদ্ধা সংগ্রহ করা তাদের কাছে জরুরি। সোশ্যাল মিডিয়ার চূড়ান্ত ব্যবহার করে কাজটা সহজ হয়ে গেছে।

মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করাতে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের ভিডিও ক্লিপ সরাসরি আপলোড করা হচ্ছে। শার্লে এরাদো দপ্তরে হানা দিয়ে সাংবাদিকদের যেভাবে মারা হয়েছিল, সিরিয়ার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকের মাথা যেভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলা হয়, তাও ভিডিও ক্লিপের মাধ্যমে হাজার হাজার অ্যাকাউন্টে ছড়িয়ে পড়ে।

মিডিয়া প্রচার ও আইসিস সম্পর্কে বড় আলোচনা করেছেন মাজিদ নওয়াজ। তাঁর বইটির নাম 'র‍্যাডিক্যাল : মাই জার্নি আউট অব ইসলামিক এক্সট্রিমিজ়ম'। তিনি বলেন, ''আমরা অনেক পিছনে। তারা নতুন মিডিয়া প্রযুক্তি, সামাজিক মাধ্যমের দিক থেকে অনেক এগিয়ে, অনেক আধুনিক।'' অনেক ভিডিও ক্লিপ্সে দেখা যাচ্ছে তারা মার্কিনি পাসপোর্ট পুড়িয়ে ফেলছে। তার অর্থ পশ্চিমি দুনিয়ায় তারা আর ফিরতে চায় না। তারা তাদের সমসাময়িক জঙ্গিদলগুলির চাইতে অনেক বেশি সুসংগঠিত ও অনেক বেশি অর্থপুষ্ট। তারা অনেক বেশি প্রত্যয়ী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের আওতাধীন এলাকার সীমা অনেক বেশি হওয়ায় বিদেশি যোদ্ধাদের আকৃষ্ট করতে অনেক বেশি সফল হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে আইএস কেবলমাত্র সিরিয়া ও ইরাক সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে রত আছে তাই নয়। অন্যান্য জেহাদি গোষ্ঠীর সঙ্গেও তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আল-কায়েদার সঙ্গে তাদের বিরোধ তো আছেই, সেই সঙ্গে আল-নুসরা নামে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ এখন চরম পর্যায়ে উঠেছে। আল-নুসরাকে আবার সিরিয়া সরকারকে বিব্রত করার স্বার্থে ফ্রান্স মদত দিচ্ছে। আর একটি ছোট সংগঠন সিরিয়ার জাতীয় কাউন্সিলকেও ধ্বংস করতে চায় আইএস। এইসব কাজের জন্য সারা পৃথিবী থেকে জঙ্গি বা জেহাদি দরকার পড়ছে তাদের। অন্তর্জাল বা সোস্যাল মিডিয়া থেকে একটা বড় সুযোগ পেয়ে গেছে এই জঙ্গি সংগঠনটি।

আইএস প্রমাণ করতে চায় তারা কতখানি নৃশংস। সেটা প্রচার করতে চায়। এই বর্বরতার রেকর্ড নিজেরাই ভেঙে পৈশাচিক আনন্দ পায়। এদের আর একটা অভ্যাস হচ্ছে, সব সময় বিশ্ব গণমাধ্যমের শিরোনামে থাকতে চায়। প্রতিনিয়ত আরও অনেক কিছু করতে হবে, এই চিন্তায় তারা তাড়িত হচ্ছে। আই এস কেবল ইরাক-সিরিয়ার দখল করা ভূখণ্ডে ত্রাসের রাজত্বই কায়েম করছে না, তারা বিশ্বগণমাধ্যমের 'কলাম ইঞ্চি' ও 'টি আর পি'রও দখল নিচ্ছে। তাদের গতিবিধি, রণকৌশল নিয়ে পৃথিবীর 'ফরেন পলিসি' নির্ধারকরা থিসিস লিখছেন। সেমিনারে তর্ক হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে কোনো কোনো সময় বড় করে প্রচারও করা হয়। তারও প্রভাব কম নয়। এই প্রচারেই আইএস কার্যত দানবীয় আকার নিয়েছে। ২০১৪ সালে সিআইএ-র দেওয়া তথ্যানুযায়ী আইএস-এর মোট যোদ্ধা ছিল মোটামুটি ৩০ হাজার। যদি এটা ৫০ হাজারও হয় তাহলেও মধ্যপ্রাচ্যের যে-কোনো ছোটো দেশেরও সমান নয়। অথচ এই সত্য কথাটা উচ্চারণ করা হচ্ছে না। সারা পৃথিবীর গণমাধ্যম আইএস-এর এক একটা কর্মকাণ্ডকে প্রায় বীরের সম্মান দিচ্ছে। তাদের রণকৌশলের প্রচুর সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে এই প্রচারের দায়িত্বও প্রায় একা নিয়ে নিয়েছে সিএনএন। আই-এস-এর একের পর এক হাড় হিম করা কাণ্ড প্রচার করে যাচ্ছে তারা। ফলে একটা প্রেক্ষিত পেয়ে যাচ্ছে আইএস।

মনে পড়ে যায় বিন লাদেনের এক-একটি ভিডিও টেপকে ঘিরে কীভাবে দুনিয়া জুড়ে ভয়ের সংস্কৃতির বাণিজ্যিক বিস্তার ঘটেছিল। ২০০৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগের দিন বিন লাদেনের আরও একটা টেপের সম্প্রচার এবং মার্কিন ভোটারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া ভয় বুশকে দ্বিতীয় মেয়াদে হোয়াইট হাউসে বসিয়েছিল। ভয়ের সেই বাণিজ্যিকীকরণ থেকেই আইএস-এর উৎপত্তি হয়েছে। এই ফাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ১৬ শতাংশ বেড়ে গেছে।

আল-কায়দা থেকে আর একটা পার্থক্য আছে আইসিস-এর। আল-কায়দা সদস্যদের প্রতি কঠোর নির্দেশ ছিল, মহিলা-শিশু, সে যদি শত্রুপক্ষেরও হয়, তাহলেও তাদের ওপর সরাসরি কোনো আক্রমণ নয়। আইসিস একেবারে উল্টো অবস্থান নিয়েছে। মেয়েদের কীভাবে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা বলা তো দূরের কথা লেখা পর্যন্ত যায় না—এত কুৎসিত। শিশুহত্যা করে তার মাংস রান্না করে বন্দিদের খাওয়ানো হয়েছে এমন ভিডিও ক্লিপও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছে। কতখানি হিংস্র এবং বিকৃতমনস্ক হলে এটা করা যায় তা সহজেই অনুমেয়।

আইসিস-এর প্রচারপত্র বা পত্রিকা 'দাবিক'। সিরিয়ার একটি ছোট্ট শহরের নাম দাবিক। ২০১৪ সালে অক্টোবর মাসে বেশ ঘটা

করে দাবিক শহরটি দখল করে আই এস। মাত্র সাড়ে তিন হাজার মানুষের বাস। এই দাবিক নামেই তাদের পত্রিকা। প্রধান উদ্দেশ্য জঙ্গি সংগ্রহ। রিক্রুটমেন্ট। পিডিএফ ফরম্যাটে ইন্টারনেটে পাওয়া যায় পত্রিকাটি। যে-কোনো ছাপানো ম্যাগাজিনের চাইতে অনেক সমৃদ্ধ পত্রিকা। বিষয় বিন্যাস, পরিবেশনা, ছবির কারুকাজ, পাদটীকা এবং ভাষার ব্যবহার দেখই বোঝা যায় পাকা হাতের কাজ। রাশিয়া-ভিত্তিক একটি সংবাদমাধ্যমের 'দাবিক' পত্রিকা সম্বন্ধে বক্তব্য—এত চাকচিক্যের কারণে সহজে যে জিনিসটা মাথায় আসে না সেটা হল—এই পত্রিকা মিথ্যায় ভরপুর এবং এর বেশিরভাগই বাগাড়ম্বর। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের দিকে লোক টানার কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত যুদ্ধ শুরু হয়েছিল দাবিক থেকে। হয়ত নিজেদের পত্রিকার নাম সে কারণেই 'দাবিক' রাখা হয়েছে।

দাবিক ওয়েবপেজে যা প্রকাশিত হয় তাই অনেকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু তা মোটেই ঠিক না। সম্পূর্ণ বাগাড়ম্বর। বাগদাদি-র খেলাফতে মানুষ কত সুখে আছে সেটা সবাইকে জানানো এবং প্রমাণ করা হচ্ছে 'দাবিক'-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। একটি সংখ্যায় সিরিয়ার হোমস ও রাকা নগরীর কর্মব্যস্ত জীবনের হালচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ কত স্বর্গসুখে আছে সেটাই দেখানো হচ্ছে। ঝলমলে রাত, সারি সারি গাড়ি—এক আধুনিক জীবনের স্বাদ। এগুলো যে চরম মিথ্যাচার এবং ফটোশপের কারসাজি তা অচিরেই ধরা পড়ে যায়। হোমসের একটা ছবি দিয়ে বলা হচ্ছে ন্যাটো জোটের বিমান হামলায় রাস্তাঘাট স্তব্ধ, ধ্বংসস্তূপ, সব দিকে মরুভূমির মতো অবস্থা। আর একটা সংখ্যায় দেখানো হচ্ছে রাকায় একটি ভরা ফলের খেতে বাসিন্দারা ঘোরাফেরা করছে। সুখী দম্পতিদের দেখা যাচ্ছে। এগুলোও যে ফটোশপের কারসাজি তা বুঝতে বেশি সময় লাগে নি। সেসব জায়গায় আইএস-এর অত্যাচারে বহু আগেই মানুষ বিতাড়িত হয়েছে। কোনো খেত বা বাগিচা নেই। আই এস জঙ্গিদের মিডিয়াকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করার কৌশল। মূলত ডিজিটাল কারসাজি করে বানানো ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিগুলো এত বাস্তবসম্মতভাবে বানানো হয়েছে যে সাদা চোখে বোঝা খুবই মুশকিল।

৫.

সব দেশই এখন এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সম্পর্কে দারুণভাবে ওয়াকিবহাল। সন্ত্রাসবাদীরা একটা কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হচ্ছে তা নয়। কিন্তু সব দেশের সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য এক। দেশ বা রাষ্ট্র দখল করতে হবে। তার একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তঝরানো। খুন। তার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করতে পিছপা হচ্ছে না। কার্যত এখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলছে ধর্মের নামে। যদিও ধর্ম উল্টো কথাই বলে।

আমাদের সকলের বোঝা প্রয়োজন যে, মূল লড়াইটা আসলে মস্তিষ্কের, মানুষের মনোজগতের। এ লড়াই জিততে গেলে পুলিশ-মিলিটারি, সাঁজোয়া গাড়ি ছাড়াও আরও অনেক কিছু দরকার। অনেক বিষয় নিয়েই লড়াই শুরু করা দরকার। ধর্মের সমস্যা নয়, মৌলবাদী সমস্যাকেও দেখতে হবে সামাজিক সমস্যা হিসেবে। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিকতাকেও মোকাবিলা করতে হবে। সমাজকে বাদ দিয়ে বা তাকে সরিয়ে রেখে এই সমস্যার সমাধান কোনো দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে এই অভিজ্ঞতা না থাকার কথা নয় যে, সমাজ থেকে ও সামাজিক কারণে যার উপস্থিতি, সমাজকে দিয়েই তার শেষ ঘটাতে হবে। সেটাই হবে মৌলিক কাজ। ধর্মকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা প্রমাণিত। সুতরাং যে সমাজে বা পরিবারে এমন আবহ আছে সেখানে প্রকৃত ব্যাখ্যা চালু করতে হবে। প্রকৃত সত্য জানলে অন্তত ফেসবুকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা দেবে না।

বহু বহু মানুষ এখনও ধর্ম পালন করে, বিশ্বাস করে। বেশিরভাগ মানুষই ধর্মহীন নয়। এটাই বাস্তব। এই বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে কতকগুলো সাধারণ বিষয়ে একমত হওয়ার লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া হবে না, অন্যের ধর্মে আঘাত করা যাবে না, কারও ধর্মবিশ্বাস যাই হোক তার জন্য কোনোভাবে সে বঞ্চিত হবে না, রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না। ধর্ম পালন করা, নিজধর্মকে ভালোবাসা সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণ নয়। এভাবে চললে সমাজে একটা স্থির পরিবেশ আসতে পারে। এর পরেই ঠিক করতে হবে—ধর্মই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। ব্যক্তি বিশেষের পেটের ক্ষুধার তারতম্যই তার আসল পরিচয়। এই অবস্থান থেকে সামাজিক ক্লেদ সরানোর লড়াই শুরু করতে হবে।

প্রকৃত শিক্ষা সামাজিক। সমাজ দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাসের আধার। এই সংগ্রামে রত ছিল এবং আছে মানুষ। এই সংগ্রামই ইতিহাসকে ইতিবাচক দিকে নিয়ে গেছে। আজকের বিপদ থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে সেই অভিজ্ঞতাই কাজে লাগবে এবং লাগাতে হবে। মনোজগতের সংগ্রামকে রাস্তার লড়াইতেও পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শারদ উৎসব সহ সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্তির শেষ কথা

ফ্রেন্ডস ক্যাটারার

(আমাদের কোনো শাখা নেই)

ধাত্রীগ্রাম, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 28

বিভেদেরে মানো যদি

সুকৃতি ঘোষাল

আজকের যুগে যখন হিংসার বিষাক্ত নিঃশ্বাস শিশুদেরও রেয়াত করছে না, ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির নেশায় সমষ্টিকল্যাণ যখন ভূলুণ্ঠিত, প্রাচুর্যের অতিরিক্ত কেন্দ্রীভবনের ফলে বঞ্চনার হাহাকার যখন আর্তনাদে পরিণত হয়েছে, তখন সভ্যতা নিয়ে গর্বিত হওয়া বোধ হয় সমীচীন নয়। কিন্তু এমনটা তো হবার কথা নয়। প্রবৃত্তির ওপর বোধি, সংস্কারের ওপর যুক্তি, ভোগের ওপর ত্যাগের আদর্শকে স্থাপন করে মানুষ নিজের ভেতরের শয়তানটাকে যখন থেকে শাসন করতে শুরু করেছে, তখন থেকে সভ্যতা বিকশিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত। ইংরাজি civilize শব্দের আদি অর্থ civil অর্থাৎ নাগরিক হয়ে ওঠা, অর্থাৎ জঙ্গলের নিয়মহীনতাকে নগরের উৎকৃষ্ট নিয়মকানুন দিয়ে প্রতিস্থাপন। এটা একটা অন্তহীন, ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমাজ যেহেতু বিবর্তিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত, শুভাশুভের সংজ্ঞা বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই কাল যেটা সভ্য মানুষের আচরণ বলে চিহ্নিত হত আজ সেটা সভ্যতার মাপকাঠি নাও হতে পারে। একটা সময় ছিল যখন ক্রীতদাস নিয়োগ নিয়ে সভ্য মানুষের মনেও কোনো লজ্জাবোধ হত না; আজ এই প্রথা বর্বরতা বলেই বিবেচিত হয়। তাই সভ্য-অসভ্যের পার্থক্য যদি আচরণের ভিত্তিতে করতে হয় তাহলে প্রথমেই চিহ্নিত করা দরকার, বর্তমান সময়ে কোন আচরণ 'সভ্য' আচরণ বলে গ্রহণযোগ্য। চিহ্নিত করার পরের ধাপ অনুশীলন, যার মাধ্যমেই সম্ভব আদিমতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বিরোধ মীমাংসার কথা। বহু মানুষ নিয়ে গঠিত সমাজ। বহু সমাজ নিয়ে রাষ্ট্র, বহু দেশ নিয়ে বিশ্ব। এই বহুত্বের উপস্থিতির জন্যই সমাজ, দেশ বা বিশ্বে প্রতি বিষয়েই মতভিন্নতা থাকবেই। ব্যক্তিকে নিয়েই গঠিত সমষ্টি, আর শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্ম-রাজনীতি-শিক্ষাগত অবস্থানের পার্থক্যের কারণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সুরভিন্নতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমরা যখন কিছু নিয়ে ভাবি, মতামত দিই, প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি, সেটা আমাদের নিজস্ব চেতনার আলোকেই করি। যেহেতু নানা কারণে আমার চেতনাটি স্বতন্ত্র, আমার ভাবনা অন্যের থেকে আলাদা হতেই পারে। এই আলাদা আলাদা ভাবনাগুলো যখন ব্যক্ত হয়, প্রকাশ্যে আসে তখন তাদের অবস্থান বহুত্বের পরিসরে। এই কথাটাই সরল করে বোঝাতে আমরা বলি 'নানা মুনির নানা মত'। কিন্তু যখন সেই নানা মতের মধ্যে একটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তখনই শুরু হয় সমস্যা। মতে মতে লাগে বিরোধ, বিরোধ থেকে সংঘাত, সংঘাত থেকে সংঘর্ষ। শেষে পেশি (বা বর্তমানকালে অর্থ/যন্ত্র) শক্তিতে যে বলবান, বিপক্ষকে সে পরাজিত করে এবং এর মধ্য দিয়ে একটা মত প্রতিষ্ঠা পায়। এতাবৎকাল এটাই হয়ে এসেছে। কিন্তু সভ্যতা যত অগ্রসর হয়েছে আমরা তত বুঝতে পেরেছি যে রক্তপাতের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা সভ্যবিধিসম্মত নয়। সভ্যতার বিবর্তনকে পেশি থেকে যন্ত্র, যন্ত্র থেকে মগজশক্তির (Muscle > Machine > Merit) পরিসরবৃদ্ধি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাই যদি হয় তাহলে বিরোধ মীমাংসার বৌদ্ধিক পথটাকে চিহ্নিত করা দরকার।

বিরোধের মূলে যেহেতু মতের সংঘাত তাই মত বিষয়টা ভালোভাবে বোঝা দরকার। মত হল এক মানসিক অবস্থান, যার যৌক্তিক ভিত্তি থাকতে পারে আবার যা নিছক অভিজ্ঞতালব্ধ বা পূর্ব সূত্রপ্রাপ্ত হতে পারে। যখন আমরা বলি পূর্বজন্মের পাপ নয়, বিকাশের অভাব ও শোষণ হল দারিদ্র্যের কারণ, তখন তার একটা যৌক্তিক ভিত্তি আছে। কিন্তু কেউ যখন বলে 'এর থেকে ব্রিটিশ শাসন ভাল ছিল' তখন সেই মত ঘটনাসূত্রে লব্ধ এক ধারণামাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধারণাটাই প্রবল হয়ে এক অনড় মতান্ধতার জন্ম দেয়। তথ্য যেহেতু ধারণাকে বদলাতে সাহায্য করে, তথ্যের সঙ্গে মতের ভাব নেই। আর্নল্ড গ্লাসো এই কথাটাই সুন্দর করে বলেছেন : 'The fewer the facts, the sronger the opinion.' এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। মত পাল্টাতে হলে তথ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে।

কিন্তু মত পাল্টানোর আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি? আমার মত যদি হয় হিটলার ভালো লোক, সেটা আমার নিজস্ব ধারণা, সেটা পাল্টাতে হবে কেন? সম্প্রতি অরুন্ধতী রায় আম্বেদকারের 'The Annihilation of Caste'-এর তামিল অনুবাদের প্রকাশ অনুষ্ঠানে মন্তব্য করলেন যে, দলিতদের কাছে 'হিন্দুত্ব এক গ্যাসচেম্বার'। এটা তাঁর ব্যক্তিগত মত, তাতে সমষ্টির কী আসে যায়? কী যায় আসে থেকে বড় কথা হল এর থেকে আমরা কিছুটা বুঝতে পারি যে মত অনেকটাই ব্যক্তিগত তাই আপেক্ষিক। অনেক ব্যক্তি নিয়ে যেহেতু একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, তাই সম্প্রদায়ভিত্তিক কোনো মত থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব ধারণা থেকে সেই মতের জন্ম, তাই সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও আপেক্ষিক। মার্কাস অরেলিউস যথার্থই বলেছেন— 'Everything we hear is opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.' অর্থাৎ মতামত হল একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয়কে দেখা। দৃষ্টিকোণ বদলালে বিষয় এক থাকলেও মত পাল্টে যায়, কখনো কখনো যেতে বাধ্য। যেমন ইংরাজি 'ছয়' (6)-কে উল্টো দিক থেকে দেখলে 'নয়' (9) দেখি আমরা।

এই যে মতামতের আপেক্ষিকতা এটাই মতভিন্নতার কারণ, আর এ থেকেই দ্বন্দ্ব। আমি ভাবছি আমি তো স্পষ্ট 'ছয়' দেখছি, যে 'নয়' বলছে, সে ভুল। সেই একই ধারণা তার, যে উল্টোদিক থেকে 'ছয়'কে 'নয়' দেখছে। নিজেদের চোখকে সে কেন অবিশ্বাস করবে? আমরা এটা ভুলে যাই যে মত যেহেতু একটা দৃষ্টিকোণ, দুজনে একই

সঙ্গে সমানভাবে সত্যি হতে পারে। এই বোঝাটা জরুরি কারণ তাতে আমরা পরমতসহিষ্ণু হয়ে মতবিরোধ এড়াতে পারব। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটাই ঘটে। আমরা দৃষ্টিকোণের ভিন্নতার বিষয়টা ভুলে গিয়ে নিজের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের অভ্রান্ততা নিয়ে এতটাই নিঃসন্দেহ থাকি যে আমার মতের বিপক্ষে কেউ কথা বললে তাকে যুক্তি দিয়ে থামাতে না পারলে আমরা বলপ্রয়োগ করে নিজমত প্রতিষ্ঠায় তৎপর হই। গত কয়েক দশক ধরে শান্তি বজায় রাখার নামে কাশ্মীরে এই কাজটাই করে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। যে মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা হিংসার আশ্রয় নিই, বলপ্রয়োগ করি, তা সত্যিই আমার মত কি না, ভেবে দেখা দরকার। দৃষ্টিকোণ বদলালে 'ছয়' যেমন 'নয়' হয়ে যায়, যে মতের ধ্বজা তুলে ধরতে আমি রক্তপাত করতে পিছপা হই না সে মত আমার নিজস্ব মত না সুকৌশলে নির্মিত ধারণা, সে বিষয়ে সজাগ থাকা খুবই জরুরি। হয়ত এজন্যই Hazlitt বলেছেন 'Our opinions are not our own.' অর্থাৎ আমি যে মত অভ্রান্ত বলে দাবি করছি তা সুকৌশলে নির্মিত এক ধারণা, আমি সেই প্রচারের শিকারমাত্র।

মত যে নির্মাণ করা সম্ভব, শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যমের যে এক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা আছে, তা বহুচর্চিত। শুধু কী করে এই সর্বব্যাপী ফাঁদে পা না-দিয়ে বাঁচা যায়, তা উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রথমত, মতামত গঠনের ক্ষেত্রে অন্যমতের গুরুত্ব কতটা, তা খেয়াল করা দরকার। যেহেতু কোনো মানুষের পক্ষেই নিজে সব জানা-বোঝা সম্ভব নয়, তাই অন্যের মতকে জানতে হবে, বিচার করতে হবে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসী না হলে আমরা নীতিকাহিনির সেই লোকটার মতো ঠকে যাব যে লোকের কথা শুনে কাঁধের ছাগলকে কুকুর ভেবে পথে নামিয়ে রেখে স্নান করে ঘরে ঢুকেছিল। দ্বিতীয়ত, মত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির কারসাজির বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। সম্প্রতি ঈদের সময় কোরবানি নিয়ে ঢাকার রাস্তায় রক্তস্রোতের ছবি সোস্যাল মিডিয়ায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল। উৎসব পালন নিয়ে এত রক্তপাত! যে কোনো মানুষ শিউরে উঠবে। পরে জানা গেল, বর্ষার রাস্তায় জলস্রোতের ছবির ওপর কম্পিউটারে লাল রঙ লেপে সম্প্রদায়বিদ্বেষী জনমত নির্মাণের মতলবে এই ছবি বাজারে ছাড়া হয়েছে। আপনি চোখে দেখে বিশ্বাস করছেন, ধারণা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু আপনি তাই দেখছেন যা আপনাকে দেখানো হচ্ছে। তৃতীয়ত, ভুয়ো প্রচারের উল্টো দিকে আছে তথ্য চেপে যাওয়া বা সেন্সরশিপ। উপযুক্ত পরিমাণে সঠিক তথ্য পেলে আপনি হয়তো নিজেই আপনার মতটি পুনর্বিবেচনা করতেন। কিন্তু যা কিছু প্রতিষ্ঠানবিরোধী, সে তথ্য সংগ্রহ দুঃসাধ্য। গণতন্ত্রে এই কাজটা কিছুটা করে সংবাদমাধ্যম। তবে সংবাদমাধ্যমও ধোয়া তুলসিপাতা নয়, তার নিরপেক্ষতা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়।

মত যেহেতু দৃষ্টিকোণ-নির্ভর, দৃষ্টিকোণ যেহেতু ব্যক্তিক, মত যেহেতু নির্মাণযোগ্য, তাই যে-কোনো বিষয়ে মত পোষণ করা ভালো, কিন্তু মতকে অভ্রান্ত ভাবা বা তা যৌক্তিক বিচারে অভ্রান্ত হলেও তাকে আঁকড়ে ধরে থাকা সুবুদ্ধির লক্ষণ নয়। কিন্তু আমরা মতামত বিষয়ে এতটাই রক্ষণশীল যে মতামত বর্জন দূরস্থান, তার পুনর্গঠনেও আমরা আগ্রহী নই। ফলে মতে মতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। ক্ষমতা যার হাতে সে এই পরিস্থিতিতে তার মতটাই সবার মত বলে চালাতে চায়। কিন্তু সবকিছুকে নিজের দিক থেকে দেখতে চাওয়া এক বিপজ্জনক নেশা। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বর্তমানে বিরোধীশূন্য করার যে যজ্ঞ চলছে তার পরিণাম ভয়ঙ্কর। কেননা শাসকদলের অবস্থা অচিরেই একচক্ষুমৃগবৎ হতে বাধ্য।

মতভেদ থেকে যেহেতু দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব থেকে বিরোধ, বিরোধ থেকে সংঘাত ও হিংসাশ্রয়ী বলপ্রয়োগ, বিরোধমীমাংসার গঠনমূলক প্রক্রিয়াসমূহ চর্চার প্রয়োজন তাই সর্বাধিক। এ বিষয়ে প্রথম হল মতের চূড়ান্ততা বিষয়ে সংশয়। আমি যা জানি তা হয়ত ঠিক, কিন্তু অন্যরকম হওয়া সম্ভব, এই সংশয়বোধ না থাকলে আমরা মতের সত্যতা যাচাই করার পথ রুদ্ধ করে দেব। সেক্ষেত্রে মত অন্ধবিশ্বাস বা ডগ্‌মাতে পরিণত হয়ে যাবে। মার্কসবাদকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ বলা হয় সম্ভবত এই কারণে যে এই মতবাদ সমাজবিকাশের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের (Dialectics) কথা স্বীকার করে, চূড়ান্ততা স্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত, মতের ক্ষেত্রে বহুত্বকে মান্যতা দেওয়া দরকার। একই 'ছয়' যেহেতু উল্টোদিকে 'নয়', মত এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। মতাদ্বৈতবাদ আধিপত্যের সঙ্গে যুক্ত হলে তা ফ্যাসিবাদ। ফ্যাসিবাদ অন্যমতসহিষ্ণু নয়, সে বিরোধিতাকে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। মতবহুত্ব চর্চার একটা সহজ উপায় হল মতকে নির্বাচনযোগ্য করা। বাজার অর্থনীতি আমাদের শিখিয়েছে প্রতিযোগিতা থাকলে গুণমান সুনিশ্চিত করা যায় ও দাম সহজে বেসামাল হতে পারে না। মতের ক্ষেত্রেও যদি আমরা একাধিক বিকল্প পাই তখন যেটি ভালো মনে হবে সেটি বেছে নিতে পারব। বেছে নেওয়া একদিকে যেমন বিচার করে গ্রহণ, তেমনি এটা পরোক্ষভাবে অন্য মতের উপস্থিতিকে মান্যতা দেওয়া। তৃতীয়ত, সবাই এক সুরে গাইলে সুরমাধুর্য নষ্ট হয়। ভিন্নমত গ্রহণে অনীহা না দেখিয়ে এমনকি দুর্বলতম কণ্ঠটির স্বরক্ষেপের একটু সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। মার্টিন লুথার কিং কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। তাঁর কথায়—'Riot is the language of the unheard.' অর্থাৎ আমি ক্ষীণকণ্ঠ বলে আমার আওয়াজ যদি ক্ষমতাগর্বীর কর্ণকুহরে প্রবেশ না করে, ক্ষোভ-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে একদিন বিস্ফোরিত হবেই। সেই ধ্বংসলীলা যদি কাঙ্ক্ষিত না হয়, যারা ভিন্ন মতাবলম্বী তাদের কথা একটু ধৈর্য ধরে শোনা দরকার। দুঃখ এই, চোর ধর্মকথা শোনে না; আর এদেশে কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার—সবজান্তা। অন্য মতের কোনো পরিসর থাকা তাদের পছন্দ নয়। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যের দুর্যোধনের মতো তারা সমালোচনার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চায়, ভুলে যায় ধৃতরাষ্ট্রের কথা : 'নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন/নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে/গভীর জটিল মূল সুদূরে প্রসারে/নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।'

শেষ কথা এই, যে-কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে 'জিত-জিত' (Win-Win) সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যতক্ষণ তা না মিলছে ততক্ষণ মীমাংসার পথ খুলে রাখতে হবে। পরাজয়ের গ্লানি কেউ বহন করতে চায় না, দু-জনেরই পরাজয়ে কারুর লাভ নেই। তাই 'হারজিত', 'হার-হার' থেকে 'জিত-জিত' সমাধানের মাধ্যমেই বিরোধ মীমাংসা করা উচিত। সন্ধ্যায় বাইরে খাওয়া হবে না ছবি দেখা হবে এই নিয়ে দু-বন্ধুর তর্কাতর্কি থেকে মনোমালিন্য। এক্ষেত্রে বাইরে থেকে খাবার কিনে এনে ঘরে বসে মুভি দেখার আয়োজন করলে, দুজনের কথাই রইল, কেউ হারল না। এটাই ম্যানেজমেন্টের ভাষায় Win-Win সমাধান। বাস্তব জীবনে সমাধানসূত্র বার করা অবশ্য এত সহজ নয়। তবু বিরোধমীমাংসা তো করতেই হবে। কারণ পেশি শক্তি বেশি ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে যায়। প্রতাপশালীদের তাই ভাবতে হবে কীভাবে স্টিয়ারিং নিজের হাতে রেখে বিরোধী কণ্ঠকে চাঙ্গা রাখা যায়। ভিন্নমত প্রকাশপথ পেলে একচক্ষু হরিণ আর একচক্ষু থাকে না, নতুন দৃষ্টি পায়। নিখাদ Win-Win।

শিক্ষার চালচিত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা

সেখ সাইদুল হক

এটা আমরা সকলেই কমবেশি জানি ও মানি যে জাতি গঠন ও জাতির অগ্রগতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিক্ষা। শিক্ষাই শুধু ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ গুণাবলীকেই প্রকাশ করে না, তা সমগ্র সমাজের ও সমগ্র দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে সাধিত করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫ নং অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছিল যে ১৯৬০ সালের মধ্যে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সকল শিশুর অবৈতনিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। ইতিমধ্যে কেটে গেছে ৬৮ বছর, কিন্তু আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণ করতে পারিনি। আজও আমরা বিশ্বের দরবারে পরিচিত সর্বাধিক নিরক্ষর মানুষের দেশ হিসেবে। অথচ স্বাধীনতার পর শিক্ষা নিয়ে অনেক কমিটি হয়েছে, অনেক কমিশন হয়েছে। ড. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়রের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২-৫৩), কোঠারির নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬), কে সি পন্থের নেতৃত্বে শিক্ষার নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিশন (১৯৮৪) ইত্যাদি। ১৯৬৮ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে পুনরায় জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে, যার সংশোধন ও সংযোজন হয়েছে ১৯৯২ সালে। আবার ২০১৬ সালে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি আনতে চলেছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

ইতিমধ্যে ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী ঘটিয়ে শিক্ষাকে যুগ্মতালিকায় আনা হয়েছে, যাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উভয়েই শিক্ষার ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। ২০০2 সালে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন ঘটিয়ে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা পাবার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে সংবিধানের ২১নং ধারার সাথে '২১-এ' ধারা যুক্ত করা হয়েছে। তারই সাথে সঙ্গতি রেখে ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে আমরা কি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি?

শিক্ষার চালচিত্র

ইউনেসকো ২০১৪ সালে বিশ্বের ১৪২টি দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক ক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে নারী-পুরুষের ব্যবধানের উপরে ভিত্তি করে একটি সূচক তৈরি করে—যার নাম 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট-২০১৪'। এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ভারতের স্থান ১২৬তম, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১১৭তম, মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১২৬তম এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ১১১তম স্থানে।

সাক্ষরতা : ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের সাক্ষরতার গড় হার ২০০১ সালের ৬৪.৮৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৪.০৪ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার ৮২.২ শতাংশ। ২০০১ সালে এই হার ছিল ৭৫.০২ শতাংশ। নারী সাক্ষরতার হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৫.৫ শতাংশ। ২০১১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী সারা দেশের প্রায় ১২২ কোটি জনগণের মধ্যে ৭ বছর বয়সী বা তার উর্দ্ধের ২৭ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ নিরক্ষর। এর মধ্যে পুরুষ ৯ কোটি ৭০ লক্ষ এবং নারী ১৭ কোটি ৬০ লক্ষ। এই নিরক্ষরদের বড় অংশই হল তপশিলি জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং এদের বড় অংশ বাস করে গ্রামাঞ্চলে। আমাদের রাজ্যে ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৬৮.৮ শতাংশ (পুরুষ ৭৭.৬, মহিলা ৬০ শতাংশ)। ২০১১-তে এই হার হয়েছে ৭৭.১ (পুরুষ ৮২.৬ ও মহিলা ৭১.২ শতাংশ)। কেরালায় সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি—প্রায় ৯৪ শতাংশ। বিহারে সবচেয়ে কম ৬৩.৬ শতাংশ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটেছে ত্রিপুরায়—৯০ শতাংশের কাছাকাছি।

এই পটভূমিতে যখন সাক্ষরতা প্রসারে সরকারের আরও প্রচেষ্টা গ্রহণ করা ও সেইমতো ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো উচিত ছিল তখন সরকার তা না করে ২০০৯ সালে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন তুলে দিয়ে সাক্ষর ভারত মিশন চালু করল এবং সেই জেলাগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করল যাদের নারী-সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশ বা তার নিচে। সাক্ষরতার কাজে সরকার নিজের দায়িত্বকে ঝেড়ে ফেলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাল। এটা ঠিক, কোনো একটি দেশে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচি চালানো কাম্য হতে পারে না। তবু চালাতে হবে, নিরক্ষর আছে বলে। যদি ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী সব ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে আনতে ও ধরে রাখতে পারা যেত তাহলে সাক্ষরতা কর্মসূচি দীর্ঘস্থায়ীভাবে চালাতে হত না। আমাদের রাজ্যেও বর্তমান সরকারের সাক্ষরতার বিষয়ে না আছে কোনো আগ্রহ, না আছে কোনো কর্মসূচি। গোটা দেশেই বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে স্কুলে ভর্তি করা ও ধরে রাখার (Universal Enrolment and Retention) কর্মসূচির ওপর।

বিদ্যালয়-শিক্ষার ক্ষেত্র : ভারতে বিদ্যালয়-শিক্ষার ক্ষেত্রটি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্ববৃহৎ। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থী ১৮.৩ শতাংশ এবং ওই স্তরের

মোট শিক্ষকের ১২.১৮ শতাংশ আছে ভারতে। মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২০ এবং ১০ শতাংশ। দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬৮৩টি জেলার ৭৩০০টি ব্লকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ১৫ লক্ষ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে কমবেশি ২৬ কোটি ছেলেমেয়ে পড়াশুনো করে। এগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। ১৯৬৮ এবং ১৯৮৬ সালের শিক্ষানীতিতে ঘোষণা করা হয়েছিল বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি। বলা হয়েছিল জাতীয় আয়ের অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। কিন্তু তা কখনোই করা হয়নি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মিলিত ব্যয় কখনও ৪.৩ শতাংশ অতিক্রম করেনি। বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৫ শতাংশে।

২০১৪-১৫ বর্ষের DISE রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সারা দেশের ১৪ লক্ষ বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে। সেখানে প্রায় ২০ কোটি ছেলেমেয়ে পড়াশোনো করে। এই ১৪ লক্ষ বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ হল সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। বাকি তিন লক্ষ ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয় যেখানে প্রায় ৬ কোটি ছেলেমেয়ে পড়াশানা করে। ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি) পর্যন্ত বিদ্যালয়-ছুটের হার ১৭ শতাংশের কাছাকাছি। আবার অষ্টম মান পর্যন্ত ধরলে এই হার দাঁড়ায় ৩৩ শতাংশ। অর্থাৎ এটা বলা যায় যে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া প্রতি দশজন ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রায় চার জন ছেলেমেয়ে অষ্টম মান শেষ করার আগেই বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এদের বেশিরভাগই হল সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের।

এখন যদি উচ্চবিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার কথা ধরি (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) তাহলে দেখব এই স্তরের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ২০১১-১২ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান চালু করেছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়েছিল ২০১৭ সালের মধ্যে নবম ও দশম শ্রেণিতে ভর্তির হারকে ১০০ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সকলকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে হবে। গত ৫ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে সেই লক্ষ্য পূরণের ধারেকাছেও আমরা পৌঁছতে পারিনি। লক্ষ্য পূরণের জন্য যে সদিচ্ছা দেখানোর প্রয়োজন ছিল বা যে ধরনের পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের প্রয়োজন ছিল তা আমরা ঠিকমতো করিনি। NUEPA (National University of Educational Planning & Administration)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী এই স্তরের বিদ্যালয়-ছুটের হার ৪০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত এবং এর বেশিরভাগই বালিকা।

লক্ষণীয় যে এই স্তরের ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলিতে স্কুলছুটের হার তুলনামূলক ভাবে কম। কেননা তাদের পরিকাঠামো, শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার ও পঠন-পাঠনের মান সরকারি ব্যবস্থাপনার চেয়ে উন্নত। এ-কারণে বর্তমানে এই স্তরেও ব্যক্তি-মালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। ফলে ওই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এতদিন প্রাথমিক স্তরেই এই প্রবণতা ছিল। এখন তা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই মাধ্যমিক স্তরেও পৌঁছেছে।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র : ভারতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিও বেশ প্রশস্ত। উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীর ১৮.৬ শতাংশ আছে ভারতে এবং ওই স্তরে অধ্যাপনায় রত মোট শিক্ষকের ৬.১২ শতাংশ ভারতে আছে। উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারতে বাস করে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি করিগরি শিক্ষাকেও ধরা হয়েছে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এক্ষেত্রে ব্যক্তি-মালিকানাধীন বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সারা দেশেই কারিগরি শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষার অঙ্গন হিসেবেই পরিগণিত করা হচ্ছে।

১৯৫০-৫১ সালে আমাদের দেশে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি মিলিয়ে এই সংখ্যা ৭১১টি। এর মধ্যে ৪৬টি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০-৫১ সালে সারা দেশে কলেজ ছিল ৫৭৮টি। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৪০,৭৬০টি। এছাড়া ১১,৯২২টি স্বনির্ভর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি মূলত হল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উচ্চশিক্ষায় ১৯৫০-৫১ সালে পড়াশোনা করত ২ লক্ষ ছেলেমেয়ে। এখন এই সংখ্যা ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ। এর মধ্যে কমবেশি ১ কোটি ৭৯ ছেলে এবং ১ কোটি ৫৪ লক্ষ মেয়ে। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল উচ্চশিক্ষার জন্য যতগুলি কলেজ ও স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে প্রায় ৬৩.৫ শতাংশ হল ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। কারিগরি শিক্ষা সহ উচ্চশিক্ষা অঙ্গনে যত ছেলেমেয়ে পড়ে তার মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ে ৫৮.৭ শতাংশ। রাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ে ৩৮.৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানে পড়ে ২.৭ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি সত্ত্বেও এটা দেখা যাচ্ছে আঞ্চলিক বৈষম্য ভালো পরিমাণে বিদ্যমান এবং ভর্তির হারেও এই বৈষম্য প্রতিফলিত হচ্ছে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বহু ছেলেমেয়ে পাশ করে বেরিয়ে আসছে অথচ শ্রম-বাজারে উপযুক্ত দক্ষ মানবসম্পদের অভাব থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে ধরনের দক্ষতা শিক্ষার্থীরা অর্জন করছে আর যে ধরনের দক্ষতা শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি দাবি করছে তার মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিকাঠামো ও ফ্যাকাল্টি উন্নয়নের শর্তগুলি পূরণ না করেই অনুমোদন পেয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আর যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নানা ধরনের পারদর্শিতাকে মাপকাঠি করে একটি বিশ্বমানের তালিকা তৈরি করা হয়। এর নাম Global Ranking of Universities। এই তালিকায় বিশ্বের ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। ভারতের যে-সব প্রতিষ্ঠানগুলি খুবই উচ্চ মানের বলে পরিগণিত হয়, বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-এ তাদেরও স্থান ২০০-র নিচে।

যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি

শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যে যে ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি সেগুলি হল—(১) অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ, (২) গুণমানের চ্যালেঞ্জ, (৩) পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের চ্যালেঞ্জ এবং (৪) দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ।

(১) *অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ* :শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। যে-কোনো নাগরিক সে অধিকার চাইতে পারেন। রাষ্ট্রও তাই একে ২০০২ সালে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে একে সর্বজনীন করতে চেয়েছে। রাষ্ট্রীয় খরচে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে ১৯৯১ সালে নয়া-উদারবাদী নীতি গ্রহণ করার পর থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে ব্যক্তি-পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেড়ে উঠেছে তাতে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব রক্ষা একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। বিশ্বায়নের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই এই ধরনের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। ফলে বহু সরকারি বা সরকার-পোষিত বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে হয় উঠে যাচ্ছে (closing) কিংবা তাদের সংযুক্তিকরণ (marging) ঘটাতে হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'প্রথম' (PROTHAM) শিক্ষার অধিকার আইন চালু হওয়ার দু-বছর পর ২০১২ সালে কী ধরনের উন্নতি হল সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গত দু-বছরে গড়ে প্রায় ৬ শতাংশ হারে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রভর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০ সালে ২৯ শতাংশ ছেলেমেয়ে পড়ত। ২০১২-তে হয়েছে ৩৫.৫ শতাংশ। ওই সমীক্ষা মতে এভাবে চললে ২০২০ সালে প্রারম্ভিক স্তরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ৫০ শতাংশের বেশি পড়বে বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবং ছাত্র না পাওয়ার কারণে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়কে তুলে দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-সব রাজ্যগুলির সাফল্য-কাহিনি প্রায়ই চর্চিত হত সেসব রাজ্যগুলিতে, বিশেষত, কেরালা, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান ও গুজরাতে, বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির প্রবণতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্য অনেক রাজ্যেও এই প্রবণতা বিদ্যমান। এই প্রবণতার একটি বড় কারণ হিসেবে ব্যক্ত করা হয় যে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলিতে পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষক, শিক্ষিকার অভাব, শিক্ষণ পরিবেশের অভাব এবং এর ফলে গুণমানের অভাব। এই কারণগুলিকে অস্বীকার করা যাবে না। তথাপি এগুলিকেই একমাত্র কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া সবক্ষেত্রে ঠিক হবে না। নব্বই-এর দশকের পর থেকে মননের জগতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাকেও হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। এটা নয় যে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে ওঠা সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো, পরিবেশ ও গুণমান ভালো। তথাপি বিশ্ববাজারে বিশ্বায়নের আধিপত্য ইংরাজি মাধ্যমগুলির প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বাড়িয়েছে। সেই পটভূমিতে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনও ঠিকমতো করা যায়নি। কিংবা বলা যায় পুনর্গঠন করতে সচেষ্ট হয়নি। ফলে বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি ঝোঁক বেড়েছে।

গুণমানের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়েও একথা বলা যায় যে মনস্তাত্ত্বিক গঠনের এই পরিবর্তনের মোহে কেতাদুরস্ত বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে আমরা অনেকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে দেখেছি। সাধারণ বিদ্যালয়-ব্যবস্থাকে গরিবের জন্য চিহ্নিত করেছি। এমনকি সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাকতা করেন তাঁদের অনেকের মধ্যেও এই ধারণা সংক্রমিত হয়েছে। চাকরির বাজারে ইংরাজি বিনা গতি নেই—এই বোধ প্রলুব্ধ করেছে। ১৯৯১ সালে উদারীকরণ নীতি চালু এবং ১৯৯২ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি পরিমার্জনের প্রায় ১০ বছর পর ২০০১ সালে নীপা (NUEPA) একটি সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে (Study of Prof. Yash Agarwal)। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক স্তরে বেসরকারি বিদ্যালয় গত দশ বছরে যেখানে বেড়েছে প্রায় ৭.৫ শতাংশ হারে, সেখানে সরকার-পোষিত বিদ্যালয় বেড়েছে মাত্র ১.৫ শতাংশ হারে।

২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হওয়ার পর সরকারি ব্যবস্থাপনায় বেশ কিছু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তথাপি ২০০৫-০৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যায় প্রারম্ভিক স্তরে বেসরকারি বিদ্যালয় বাড়ছে ৬ গুণ হারে এবং সরকারি বিদ্যালয়ের বৃদ্ধি হয়েছে ৩ গুণ হারে। ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ২০১০ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত 'Human Development in India: Challenges for a Society in Transition' গ্রন্থে (পৃ. ৮৫) দেখা যাচ্ছে ২০১০ সালে প্রাথমিক স্তরে ভারতে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির জাতীয় গড় দাঁড়িয়েছে ২৮.৫ শতাংশ। কতকগুলি রাজ্যে এই গড় জাতীয় গড়ের অনেক উঁচুতে। যেমন পাঞ্জাবে ৫০ শতাংশের ওপর, হরিয়ানায় ও জম্মুকাশ্মীরে ৪৭ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৪৩ শতাংশ, রাজস্থানে ৩২ শতাংশ, দিল্লিতে ৩৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে এই হার অনেকটাই কম, ১২ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে।

আমাদের রাজ্যে যেটা উদ্বেগের তা হল বিগত বামফ্রন্ট সরকার দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করলেও শিক্ষাখাতে শিক্ষার্থীর ব্যয় বেড়েছে অধিকতম। ওই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর বার্ষিক গড় ব্যয় যেখানে জাতীয় ক্ষেত্রে ৬৮৮ টাকা, আমাদের রাজ্যে তা ১১৩৬ টাকা। এর বড় অংশ বিদ্যালয়গুলি উন্নয়নের নামে বিভিন্ন খাতে এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে যে ফি আদায় করে তার জন্য দিতে হয়। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-পিছু ব্যয় ভারতে যেখানে ২৯২০ টাকা, আমাদের রাজ্যে তা ৫০৪৫ টাকা। এছাড়াও এ-রাজ্যের অভিভাবকদের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয় প্রাইভেট টুইশন খাতে। প্রাইভেট টুইশন-এর ব্যাধি কমবেশি সব রাজ্যেই জাল বিছিয়েছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি। সম্প্রতি ভারত সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে সারা ভারতের আর সব রাজ্যগুলির মধ্যে ট্যুইশন পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি পশ্চিমবঙ্গে। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরের প্রতি ১০০০ জন বালক পড়ুয়ার মধ্যে প্রাইভেট ট্যুইশন পড়ার জাতীয় গড় ৩৭৮ জন। পশ্চিমবঙ্গে এটা ৮৯০ জন। ওই স্তরে প্রতি ১০০০ জন মেয়ের ক্ষেত্রে জাতীয় গড় ৩৪৭ জন। পশ্চিমবঙ্গে তা ৯২০ জন। এমনকি কলেজ স্তরের পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সারা ভারতে গড়ে যেখানে ২০৩ জন ট্যুইশন পড়ে, পশ্চিমবঙ্গে পড়ে ৭৮৬ জন। স্নাতকোত্তর ক্ষেত্রেও প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১০৩ জন হল সর্বভারতীয় হার। আমাদের রাজ্যে তা হল ৫৪৯ জন। আরও দেখা গেছে বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ টুইশনের সঙ্গে যুক্ত। এরাজ্যে একটা ধারণাই গড়ে উঠেছে যে প্রাইভেট ট্যুইশন না পড়লে পড়াশুনা হবে না। এই প্রবণতার ক্ষতিকর দিক হল আমাদের রাজ্যে গরিব, নিম্নবিত্ত অংশ মনে করছে প্রাইভেট ট্যুইশনিতে যখন এত খরচ করতেই হচ্ছে তখন ক'টাকা মাইনে বাঁচিয়ে কী লাভ? তাই সরকারি স্কুলে না পড়িয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে পড়ানোই ভালো। আর না পারলে পড়িয়ে লাভ নেই। কেননা সরকারি বিদ্যালয়ে তো পড়াশুনা হয় না। ফলে একটা অংশ শিক্ষার বাইরে চলে যাচ্ছে। এ প্রবণতা বাড়ছে। ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষক উদ্বৃত্ত হবে। নতুন শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ কমে যাবে। ছাত্রছাত্রী কমে গেলে বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। আর এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে বেশি আসবে তা হল সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলিতে গুণমান বৃদ্ধির প্রশ্ন।

(২) ***গুণমানের চ্যালেঞ্জ*** : সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে কেবল গুণমান নেই প্রচার করলেই হবে না। কেন নেই তার বাস্তব কারণগুলিকে উপলব্ধি করতে হবে—বিশেষ করে, আমাদের রাজ্যে। বহু শিক্ষকের পদ ফাঁকা এবং তা পূরণের উদ্যোগ নেই। বহু বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের বা কলেজে অধ্যক্ষের পদ ফাঁকা।

উপযুক্ত পরিকাঠামো কিংবা পরিবেশের অভাব। বহিরাগতদের ভিড় কিংবা পরিচালকমণ্ডলীর খবরদারি দৈনন্দিন বাড়ছে। নানা ধরনের সরকারি নির্দেশিকা বিভিন্ন মাত্রার বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। বিদ্যালয়স্তরে সরকারি পাঠ্যপুস্তক ঠিকমতো সরবরাহ করা হয় না। শিক্ষক, বিশেষ করে, প্রধানশিক্ষকদের উপর মিড-ডে-মিল কর্মসূচি রূপায়ণের চাপ থাকছে। আবার মাঝে-মধ্যে ভোটার লিস্ট সংশোধন, জনগণনা সমীক্ষার কাজে শিক্ষকদের লাগানোয় পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে। কলেজগুলির ক্ষেত্রে ছাত্র সংসদের কিংবা রাজনৈতিক স্তরের চাপ থাকছে। ঠিকমতো ফলপ্রকাশ হচ্ছে না। কলেজ ও বিদ্যালয় উভয় ক্ষেত্রেই পরিদর্শন-ব্যবস্থা ঠিকমতো কার্যকর হচ্ছে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে প্রাক্-প্রাথমিক ব্যবস্থা চালু না থাকার ফলে পশ্চাৎপদ পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে। তারা উচ্চবিদ্যালয়গুলিতেও ভিড় বাড়াচ্ছে। তাই গুণমানের শিক্ষা দাবি করার সাথে সাথে এই বিষয়গুলির মীমাংসাও জরুরি।

কিন্তু এই কথাগুলি বলে শিক্ষকমণ্ডলীর নিজেদের দায়কে এড়ানো যাবে না। এই প্রশ্ন এখন দেখা দিয়েছে যে যেটুকু সুযোগ আছে তাকেই কি ঠিকমতো ব্যবহার করে গুণমানের শিক্ষা দেবার ক্ষেত্রে শিক্ষকরা আন্তরিকতা দেখাতে পারছেন? যে শিক্ষকমণ্ডলী আছেন তাঁদের মাঝে-মধ্যেই অনুপস্থিতি বা নানা কারণ দেখিয়ে বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাওয়া কিংবা ঠিকমতো ক্লাস না নেওয়ার ঘটনা ঘটছে। নানা সমীক্ষাতে ফুটে উঠেছে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি গুণগত মান অর্জনে বেশ কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করছে। পশ্চাৎপদ পরিবারের যেসব ছেলেমেয়েরা সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে আসছে তাদের প্রতি ঠিকমতো দরদ ও ভালোবাসার অভাব রয়েছে।

বিদ্যালয়-শিক্ষার গুণমান নিয়ে সারা দেশব্যাপী দুটি সংস্থা সমীক্ষা করে। একটি সরকারি। সেটি হল NCERT। অপরটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Protham যার কথা আগে বলেছি। NCERT প্রতি বছর তৃতীয়, পঞ্চম ও অষ্টমশ্রেণিতে National Achievement Survey (NAS) করে। 'প্রথম' প্রতি বছর প্রারম্ভিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সমীক্ষা করে ASER (Annual Status of Education Report) রিপোর্ট বের করে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত ওই দুটি রিপোর্টে বহু বিষয়েই মিল আছে। ASER রিপোর্ট বলছে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে গড়ে অষ্টম শ্রেণির ২১ ভাগ, পঞ্চম শ্রেণির ৫০ ভাগ এবং তৃতীয় শ্রেণির প্রায় ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ঠিকমতো পড়তে পারছে না এবং ওই স্তরের অঙ্ক ঠিকমতো করতে পারছে না। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রীর কেবল ২৪.৫ শতাংশ মুখস্ত বলতে পারে, চিনতে পারে ও লিখতে পারে। বাকি ৭৫ শতাংশ পারছে না। পঞ্চম শ্রেণির ৭৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী সাধারণ মানের যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করতে পারে না। এটা ঠিকই, বেসরকারি স্তরের বহু বিদ্যালয়েও সম মানের যোগ্যতা অর্জন করতে পারছে না। কেবল পয়সা রোজগারের জন্য বেশ কিছু স্কুল খুলে দেওয়া হয়েছে। তথাপি ASER ও NAS রিপোর্ট বলছে গুণমানের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ব্যবধান বাড়ছে। বহু উচ্চ মানের সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় যেমন আছে, তেমনি পরিকাঠামো আছে, শিক্ষকও আছেন এমন অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী কাম্য মানের শিক্ষা (minimum level of learning) অর্জন করতে পারছে না। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী বলে কিংবা বাড়িতে অনুশীলন করে না বলে আমরা নিজেদের দায়কে এড়িয়ে যেতে পারি না।

এটা ঠিকই বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নেই। সরকার তুলে দিয়েছে। ২০০৯-এর শিক্ষা আইনেও নেই। ফলে পশ্চাৎপদতা নিয়েই এসব ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে আসছে। ফলে এরা পিছিয়ে পড়ছে। পাশ-ফেল না থাকায় অষ্টম শ্রেণিতে পৌঁছেও যাচ্ছে। আর এখানেই তো চ্যালেঞ্জ। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে না পারলে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় গুরুত্ব হারাবে। প্রয়োজনমতো 'রেমেডিয়াল টিচিং' না হলে এই ছাত্রছাত্রীরা হীনমন্যতায় ভুগে বিদ্যালয়-ছুট হবে।

(গ) ***পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের চ্যালেঞ্জ*** : শিক্ষকমণ্ডলীর পাশাপাশি যারা শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের স্তরে আছেন তাঁরাও তাঁদের চ্যালেঞ্জকে অস্বীকার করতে পারবেন না। সরকারের শিক্ষা দপ্তর, সরকারি, পরিদর্শকমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত ও পৌরসভার মতো স্বশাসিত সংস্থা এবং বিদ্যালয় ও কলেজ-ভিত্তিক পরিচালকমণ্ডলীকে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কিন্তু তারা কি তা ঠিক মতো করছেন? নাকি শিক্ষকদের উপর দায় চাপিয়ে নিজেদের হালকা করতে চাইছেন? শিক্ষা-পরিকল্পনার অগ্রাধিকার, নির্বাচন, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, পঠনপাঠনে নিয়মিত নজরদারি, অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ, মাতব্বরির মানসিকতা থেকে নয়, সহমর্মিতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং পরিকাঠামো ও পরিবেশ রচনায় সহযোগিতা—এই সমস্ত কাজে সকল অংশীদারকেই সচেষ্ট ও সক্রিয় হতে হবে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংগঠন (NSSO) ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত যে ৭১তম সমীক্ষা করেছে সেখানে শিক্ষা-বিষয়ের উপরও সমীক্ষা করেছে। সেই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থীরা যায় তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত ৫ শতাংশ পরিবারের শিক্ষার্থীদের Net Attendance Ratio হল ৮৯ শতাংশ। নিম্নবিত্ত গরিব ৫ শতাংশ পরিবারের শিক্ষার্থীদের হল ৭৮ শতাংশ। আবার যদি মাধ্যমিক স্তর ধরি তাহলে এই হার হল উচ্চবিত্ত পাঁচ শতাংশের ৬৬ শতাংশ, (শহরাঞ্চলে) এবং ৫৩ শতাংশ (গ্রামাঞ্চলে)। অপরদিকে দরিদ্র পাঁচ শতাংশের ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলে ২৩ শতাংশ এবং গ্রামে ১৮ শতাংশ। আবার যদি দলিত, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু ধরি তাহলে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ৫ শতাংশ পরিবারের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাত্র ৬ শতাংশ।

এর একমাত্র কারণ না হলেও একটা বড় কারণ হল দারিদ্র্য। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের নানা পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করতে হয়। তাই পরিকল্পনাকারীদের এটা ভাঙতে ওইসব পরিবারের শিশুদের শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে দারিদ্র্য মোচন কর্মসূচিগুলিকে ঠিকমতো রূপায়িত করা দরকার। কোনোরকম বরাদ্দ হ্রাস চলবে না। রূপায়ণে নানা ধরনের মধস্বত্বভোগীদের হঠাতে হবে। তা সে ১০০ দিনের কাজের কর্মসূচিই হোক কিংবা অসংগঠিত শিল্পশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বা বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচিই হোক। মিড ডে-মিলকে ঠিকমতো রূপায়িত করতে হবে। শিক্ষকদের ওপর চাপ না বাড়িয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীদের কাজে লাগাতে হবে।

পাশাপাশি শিক্ষার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে দ্বৈতব্যবস্থা—অর্থবানদের জন্য একরকম আর গরিবদের জন্য অন্যরকম—জাতীয় সংহতির বিপদ ডেকে আনবে। দুই ধরনের বিদ্যালয়ে দুই শ্রেণি পড়ার ফলে আমরা পরস্পরকে চিনব না, মানব না। ধনী ও দরিদ্র দূরত্ব বাড়বে। কোঠারি কমিশন জাতীয় সংহতির স্বার্থে Common School System-এর কথা বলেছিল। এই ধরনের বিদ্যালয়ের এক-একটি শ্রেণি মিনি-ভারতে পরিণত হয়। কিন্তু বর্তমানে পরিকল্পনাকারীরা যে পথে হেঁটেছেন তাতে

বিপদ বাড়বে। তাই এই চ্যালেঞ্জকেও মোকাবিলা করতে হবে।

(৪) ***দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ*** : সর্বজনীন শিক্ষা রূপায়ণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাবটির পাশাপাশি আর যে ক্ষেত্রকে সে প্রভাবিত করে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা হল মানুষের চেতনার ক্ষেত্র। এই বোধ গড়ে ওঠে যে সবাইকে টপকে উপরে উঠতে হবে। নিজ ছেলেমেয়েদের সেইভাবে মানুষ করতে হবে। এক অশুভ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ে।

এই কারণেই আমলাতন্ত্রের ও শিক্ষকমণ্ডলীর সর্ববৃহৎ অংশ নামিদামি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। তারা সরকারি ব্যবস্থায় চাকরি করেন, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় বেতন গ্রহণ করেন, কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে পাঠান না। সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করব কেননা এ-কাজে নির্দিষ্ট বেতক্রম আছে, চাকরির নিরাপত্তা আছে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের পড়াব না, কেননা গুণমান নেই। তাহলে অন্যরা পড়বে কেন? সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষও মনে করবে শিক্ষক যখন নিজেই তাঁর স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন না, তাহলে আমার সন্তানদের পড়িয়েও লাভ নেই। এই ভাবেই কি বেসরকারীকরণের গণভিত্তি তৈরি হচ্ছে না? আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য বেসরকারীকরণের বিরোধিতা কি দ্বিচারিতা নয়?

এ বিষয়ে গত ২০১৫ সালের ৮ আগস্ট এলাহাবাদ উচ্চ আদালত একটি যুগান্তকারী রায় দিয়ে বলেছে, নিজেদের ছেলেমেয়েদের অভিজাত স্কুলে পাঠানোর ফলে সাধারণের বিদ্যালয়ের উন্নয়নের প্রতি, তার মানোন্নয়নের প্রতি সরকারি চাকরিজীবীদের (অফিসার, কর্মচারী সহ) ও অনেক শিক্ষকমণ্ডলীর নজর কম পড়ে। উচ্চ আদালত তার রায়ে তাই নির্দেশ দিয়েছে সমস্ত সরকারি অফিসার, কর্মচারী, শিক্ষকমণ্ডলী যারা সরকার থেকে বেতন গ্রহণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে সরকারি ব্যবস্থার বিদ্যালয়েই পড়াতে হবে। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই রায় কার্যকর করার কথা নির্দেশে বললেও সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রেই এটা হওয়া উচিত। আমলাতন্ত্র হয়তো কার্যকর করতে চাইবে না। কিন্তু সরকারকেই সদিচ্ছা দেখাতে হবে। কেননা তারা আমআদমির ভোটে নির্বাচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতি

এই পটভূমিতেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রে এন.ডি.এ. সরকার গঠিত হবার পর পরই শিক্ষাক্ষেত্রে গেরুয়াকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। লক্ষ্য ধর্মনিরপেক্ষ ধারণাকে ভেঙে ফেলা, হিন্দুত্বের ধারণাকে প্রচার করা, মানুষের জনপ্রিয় ইতিহাসচেতনা, যা মূলত ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের, তাকে বিকৃত করা, সংঘ আদর্শে নতুন ইতিহাস রচনা করা। এন.সি.ই.আর.টি. এবং ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পরিষদে সংঘ-ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বসানো হল। অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও পৌরাণিক ভাবনাগুলিকে বেদ-উপনিষদের শিক্ষার নামে শিশুদের মধ্যে প্রোথিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হল। পাশাপাশি কর্পোরেটের স্বার্থে শিক্ষাকে বাণিজ্যীকরণের রাস্তায় ঠেলে দিতে লাগল। শিক্ষার খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ কমানো হল। এই পটভূমিতেই ২০১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি তৎকালীন মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ঘোষণা করলেন নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হবে। এই নিয়ে ৩৩টি ভাবনাকে আপলোড করে জনগণের পরামর্শ ও মতামতের জন্য 'mygov' ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হল, কোনো খসড়া প্রকাশ করা হল না। ইতিমধ্যে সেই পরামর্শ ও মতামতগুলিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি তৈরির জন্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব টি.এস.আর. সুব্রমানিয়ান-এর নেতৃত্বে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠিত হল এবং অন্য সদস্যরা হলেন দিল্লি সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব শৈলজা চন্দ্র, গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যসচিব সুধীর মাকড়, দিল্লির প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব শিয়ারাম শর্মা এবং এন.সি.ই.আর.টি.-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান জে.এম. রাজপুত। লক্ষণীয়, কমিটিতে বিশিষ্ট কোনো শিক্ষাবিদকে রাখা হল না। রাজপুতের পরিচয় যত না শিক্ষাবিদ হিসেবে তার চেয়েও সংঘ ভাবনার প্রচারক হিসেবে। বাকিরা সব আমলা।

যাই হোক, ওই কমিটি ইতিমধ্যে রিপোর্ট দাখিল করেছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক তা এখনও প্রকাশ্যে আনে নি। রাজ্যগুলির মতামত গ্রহণের নামে গোপন রেখেছে। তথাপি ওই রিপোর্টের সুপারিশগুলো গণমাধ্যমে গত মাসে ফাঁস হয়েছে। সেই সূত্রে দেখা যাচ্ছে যে-সব নীতি কার্যকর করতে চাওয়া হচ্ছে তাতে একদিকে শিক্ষার বাণিজ্যীকরণ বাড়বে, অপরদিকে শিক্ষায় গৈরিকীকরণের মাত্রাকে বাড়ানো হবে। দ্বৈত ব্যবস্থা যা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে তা আরও গতি লাভ করবে। প্রস্তাবিত খসড়া সুপারিশের কিছু বিষয় নীচে উল্লেখ করছি :

(১) চরিত্রগঠনে নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে, (২) ভারতীয়ত্ব বোধের বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কৃত শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে, (৩) শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান রাজনীতির ক্ষেত্র করা চলবে না, (৪) কলেজে ধর্ম বা জাতপাত ভিত্তিক সংগঠন থাকবে না, (৫) অল ইন্ডিয়া এডুকেশন সার্ভিস গঠন করা হবে। (৬) সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষা অধিকার আইনের আওতায় আনা হবে, (৭) বৃত্তিশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে, (৮) দশম শ্রেণির বোর্ড-চালিত পরীক্ষাগুলিকে সর্বজনীন করা হবে এবং ওই পরীক্ষাকে দুটি পর্বে ভাগ করা হবে, (৯) দশম ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দেশ জুড়ে সমমানের জাতীয় কর্মসূচি ও পরীক্ষা হবে, (১০) জি.ডি.পি-র অন্তত ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচের বিষয়ে সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা হবে, (১১) আগামী ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় ১০০ উৎকর্ষকেন্দ্র খোলা হবে, (১২) পঞ্চম শ্রেণির পর থেকে ফিরবে পাশ-ফেল প্রথা, (১৩) ইউ.জি.সি-র পরিধিকে কমানো হবে, (১৪) তথ্যপ্রযুক্তিকে শিক্ষার আবশ্যিক অংশ করা হবে, (১৫) প্রাক্-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার অধিকার আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়া আরও আছে যা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। মোটকথা, এই শিক্ষানীতি বাণিজ্যিকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণকে আরও বাড়াবে।

আমাদের রাজ্য

এখন আমরা আমাদের রাজ্যের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার দিকে নজর দিতে চাই। রাজ্য সরকার প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে নীপা সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের 'শিক্ষা রিপোর্ট ২০১৪-১৫' প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, এস.এস.কে., এম.এস.কে সহ সমস্ত ধরনের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয় মিলিয়ে রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৫,৫৭২টি। এর মধ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ৮২,৪৪৮টি। বেসরকারি বিদ্যালয় ৯,৭২৫টি। মাদ্রাসা সহ অনুমোদনহীন বিদ্যালয় ৩,৪০৩টি। কেবল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয় এমন সরকারি এবং সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয় ১০,০২৭টি—গ্রামাঞ্চলে ৭২৭৭, শহরাঞ্চলে

২৭৫০টি।

সমস্ত ধরনের বিদ্যালয় মিলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বত্র প্রারম্ভিক শিক্ষায় মোট শিক্ষার্থী ১ কোটি ৩০ লক্ষ ১৫ হাজার। এরমধ্যে ছাত্রী প্রায় ৫০ শতাংশ। ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে পড়ে ১ কোটি ১৫ লক্ষের মতো, বেসরকারি বিদ্যালয়ে ১০ লক্ষ এবং মাদ্রাসা সহ অনুমোদনহীন বিদ্যালয়ে ৫ লক্ষের ওপর। যদি প্রাথমিক স্তর ধরি (প্রথম থেকে পঞ্চম) তাহলে ছাত্রছাত্রী ৮১ লক্ষ ৬৩ হাজার এবং উচ্চপ্রাথমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) ৪৮ লক্ষ ৫২ হাজার। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে (নবম থেকে দ্বাদশ) ছাত্রছাত্রী আছে ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার। সরকারি হিসেবে চতুর্থ শ্রেণিতে বিদ্যালয়-ছুটের হার ৮.২৪ শতাংশ এবং অষ্টম শ্রেণিতে এই হার ৬.৪৬ শতাংশ। আবার সংখ্যাগত দিক বিচার করলে দেখা যায় প্রাথমিক পড়ে ৮১ লক্ষ ৬০ হাজার, উচ্চ প্রাথমিকে তা কমে ৪৮ লক্ষ ৫২ হজার, মাধ্যমিক স্তরে আরও কমে হয় ৪২ লক্ষ ২৭ হাজার। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিত গড় ভর্তি হার দেখানো হয়েছে ৯৮ শতাংশ। যার মধ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চপ্রাথমিকে স্থানান্তরের হার ৯৬ শতাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা অভিযান চালু হবার পর তৎকালীন রাজ্য সরকার রাজ্যে পরিকল্পিত আকারে বহু বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক) গড়ে তুলেছে। এম.এস.কে. ও এম.এস.কে-গুলিকে সর্বশিক্ষা প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির গড় হার বেড়েছে। গ্রাম শিক্ষা কমিটি/ওয়ার্ড শিক্ষা কমিটি গড়ে তোলার ফলে জনগণের অংশগ্রহণ বেড়েছে। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলিতে বড় সমস্যা হল ৪০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক পদ খালি আছে। গত পাঁচ বছরে কেবল ১ বার প্রাথমিক টেট হয়েছে ও ১ বার এস.এস.সি. হয়েছে। অল্প কিছু শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক সহ মাধ্যমিক আছে এমন বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৫০ অতিক্রম করেছে। প্রাথমিকে এই অনুপাত ২৩ দেখানো হলেও তা মূলত শহর ও শহর লাগোয়া বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, সেখানে শিক্ষার্থী কম কিন্তু শিক্ষক বেশি। বাস্তবে গ্রামাঞ্চলে ও প্রত্যন্ত এলাকায় এই হার অনেক বেশি। সরকারি রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে এক-শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন প্রায় ৪ শতাংশ। এক-কক্ষ বিশিষ্ট বিদ্যালয় প্রায় ৭ শতাংশ। সরকারি রিপোর্টে অনেক সময় জল মেশানো থাকে। বাস্তব চিত্র কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। গত ২ জানুয়ারি ২০১৬ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রথম পাতায় বড় খবর হয়েছে কীভাবে শূন্য স্কুলছুটের তকমা পেতে ভাবের ঘরে সিঁধ কাটা হচ্ছে। সেই মতো রিপোর্ট বানানো হচ্ছে।

আমাদের রাজ্যে গত পাঁচ বছর ধরে শিক্ষাঙ্গন আক্রান্ত। শিক্ষাক্ষেত্রে নেমে এসেছে এক অদ্ভুত আঁধার। তৈরি হয়েছে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান আক্রমণকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) দৈহিক আক্রমণ, (২) পেশাগত আক্রমণ (৩) চেতনাগত আক্রমণ।

দৈহিক আক্রমণের ক্ষেত্রটি হল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী নানা ধরনের আক্রমণ, হেনস্থা, জুলুম ও জরিমানার শিকার হচ্ছেন। গণ টোকাটুকি আবার ফিরে আসছে। তা আটকাতে গেলে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। ন্যায্য দাবিতে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করলে বাড়ি থেকে তুলে আনা হচ্ছে কিংবা বিদ্যালয়ে ঢুকতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বহিরাগতরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাতব্বরি করছে। শিক্ষকমণ্ডলীকে নানা ধরনের নির্দেশ মানতে বাধ্য করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এককথায় দলতন্ত্র কিংবা বলা যায় 'দিদিতন্ত্র' গ্রাস করেছে। সরকারের বিরোধিতা না করার ফতোয়া জারি হয়েছে।

পেশাগত ক্ষেত্রে আক্রমণের দিকটি বড় আকারে সূচিত হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হবার পর থেকে। বহু শিক্ষকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাজ্য সরকারের পরস্পরবিরোধী নানা ধরনের নির্দেশিকা যা শিক্ষকমণ্ডলীকে আরও বিভ্রান্ত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্ট্যাটুট পরিবর্তনের নামে এমন সব বিষয় ঢোকানো হচ্ছে যা পেশাগত ক্ষেত্রটিকে আক্রান্ত করছে। বিদ্যালয়শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকার প্রবর্তিত পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্বাচন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে জলাঞ্জলি দিয়ে নানা ধরনের টেস্ট পদ্ধতি প্রচলন, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক সহ অন্যান্য পেশাগত দাবিগুলিকে উপেক্ষা করা, সময়মতো সরকারি পাঠ্যপুস্তক প্রদানে বিলম্ব করা, 'শ্রী' কর্মসূচি রূপায়ণে প্রধানত সহশিক্ষককে করণিকে পরিণত করা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে পেশাগত ক্ষেত্রটি আক্রান্ত। কলেজগুলির ক্ষেত্রে ছাত্রসংসদের নামে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওপর খবরদারি, ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেন ও নানা ধরনের দুষ্কর্মকে মেনে নিতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে পেশার মর্যাদাকে আক্রান্ত করা হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। দলীয় ব্যক্তিদের পরিচালকমণ্ডলীতে মনোনীত করা হচ্ছে যাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল-এর নির্বাচন না করিয়ে দলীয় আনুগত্য আছে তেমন ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদগুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচনা করে শর্তাবলী পূরণ না করলেও তাদেরকে তা চালাতে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অধ্যক্ষের পদ দীর্ঘদিন ফাঁকা থাকছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পদ পূরণ করা হচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে মিড-ডে-মিল পরিচালনায় শিক্ষকদের যুক্ত করে পঠন-পাঠনকে ব্যাহত করা হচ্ছে। এই ধরনের নানা কার্যক্রম শিক্ষকমণ্ডলীর পেশাগত দিকটিকে আক্রান্ত করে সরকারি ব্যবস্থাপনার শিক্ষাকে ধ্বংস করতে চাইছে যাতে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের মাত্রাকে আরও বাড়ানো যায়। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিধি বলবৎ করতে চাইছে তাতে পেশাগত ক্ষেত্রটি আরও আক্রান্ত হবে।

চেতনাগত আক্রমণের ক্ষেত্রটি হল যে শিক্ষকমণ্ডলী যে-কোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে সামিল হতেন, তাঁদের সেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামী চেতনাকে ভোঁতা করে দেওয়া। বিশ্বায়নের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল মানুষকে কূপমণ্ডুক করা। ক্ষুদ্র 'আমি'তে বেঁধে ফেলা। আমাদের রাজ্যের শিক্ষককুলের একটা অংশ চেতনাগত এই আক্রমণের শিকার। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে পথে নামার ক্ষেত্রে এই অংশটি যত কমই হোক না কেন, এড়িয়ে চলেন। আক্রমণগুলিকে গা-সওয়া করে নেন। ভাবেন এগুলি থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকলে ভালো থাকব। শিক্ষকদের আন্দোলনের ফসল স্কুল সার্ভিস কমিশন। এখান থেকে নির্বাচিত বহু শিক্ষক ভাবেন যেহেতু মেধার দ্বারা উত্তীর্ণ তাই ওইসব আন্দোলনে তাঁর দায় নেই। অথচ আজ সেই টেট, এস.এস.সি. আক্রান্ত, দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তাহলে তাঁর পরিবারের অন্যদের কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী হবে? আগেই বলেছি আমাদের রাজ্যে প্রাইভেট ট্যুইশন ব্যাধি প্রবল। এক্ষেত্রে আমরা কী ভূমিকা পালন করব? সরকারি ব্যবস্থাপনার কি মৃত্যুঘণ্টা বাজাবো? রাজ্যে গণতন্ত্রের

ওপর আক্রমণ হলে আমায় নয় বলে হাতগুটিয়ে বসে থাকব? চেতনাগত আক্রমণের ক্ষেত্রে এসব বিষয় সহ অন্যান্য আরও বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে।

উপসংহার

তাই বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি তাকে মোকাবিলা করতে হবে। একদিকে যেমন নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে তেমনি নিজেদের দ্বিধা, ভয়, ভীতিকে ঝেড়ে ফেলে অন্যান্য গণসংগঠনগুলির সাথে যৌথ সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' নিবন্ধে লিখেছিলেন, ''শিক্ষার অভিসেচেন ক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোন সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয়নি।" রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মর্মার্থকে উপলব্ধি করে আমাদেরও শপথ নিতে হবে শিক্ষার ওপর নানাবিধ আক্রমণকে আমরা মেনে নেবে না। ১৯৬৬ সালেই কোঠারি কমিশন সতর্ক করেছিল এই বলে যে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভালো মানের শিক্ষা কিনবে, অপরদিকে সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে, এটা চলতে দেওয়া উচিত হবে না।

অথচ বর্তমানে এই প্রবণতা আরও বেড়েছে। শিক্ষার এই দ্বৈত ব্যবস্থা সাধারণের মধ্যে বঞ্চনার বোধ তৈরি করছে। সেই বঞ্চনা যাতে বিক্ষোভে পরিণত না হয় তার জন্য শাসকশ্রেণি নানা ছল চাতুরি করবে, নানা প্রলোভনের ডালি সাজাবে। শিক্ষকমণ্ডলী মধ্যবিত্ত সমাজেরই অংশ। মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে নানা দোদুল্যমানতা কাজ করতে পারে। এটা যেমন দেখা যায় তেমনি এটাও দেখা গেছে মধ্যবিত্ত সমাজে জন্ম এমন অনেকে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অতীতে দেখা গেছে এবং বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে যে এই শিক্ষকমণ্ডলীর উল্লেখযোগ্য অংশ মহান সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এত আক্রমণ সত্ত্বেও সংগ্রামের ময়দান অনেকে ত্যাগ করে চলে যান নি। আমাদের রাজ্যে ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে সংগ্রাম জারি আছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গণসংগঠনের সহযোগিতায় সর্বভারতীয় স্তরে ও রাজ্যে National Platform in Defence of Education গড়ে উঠেছে।

আমি তাই শেষ করব ১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার শেষ অংশ উল্লেখ করে—

দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধন
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানব মর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোক
মুক্তির বাতাসে।

With best compliments of

A

Well Wisher

from

Asansol, Burdwan

Sl. No. 104

With best compliments of

A

Well Wisher

from

Ningah-Asansol

Sl. No. 15

লোকবৃত্ত ও লোকশিক্ষার সম্মিলন

ভব রায়

'শিক্ষা'র সংজ্ঞা, ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে এ-তাবৎ যেসব বিশেষজ্ঞ-অভিমত প্রচলিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য দৃষ্টান্ত হলেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বহুবিধ বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপাতত আমরা মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করব—সেগুলি —'স্ত্রীশিক্ষা', 'আশ্রমের শিক্ষা', 'বিদ্যাসমাচার', 'কলাবিদ্যা' ইত্যাদি রচনা। আবার, এই প্রসঙ্গে তাঁর 'লোকসাহিত্য' তথা লোকসংস্কৃতি মূলক রচনাদির কথাও উল্লেখের দাবি রাখে। যাই হোক, শিক্ষা সম্পর্কে সমূহ রবীন্দ্র অভিমতের কেন্দ্রবিন্দু হল নিছক প্রথাগত স্কুল-কলেজীয় শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষার সম্যক উদ্দেশ্য নিহিত নেই। বরং, দেশের বিভিন্ন স্তরের বহুমুখী সামাজিক পরিমণ্ডলের মানুষের মধ্যে, যাকে এক কথায় বলা হয় বৃহত্তর লোকবৃত্ত, সেখানে শিক্ষার বহুত্ববাদকে (Pluralism) বিকশিত ও সম্প্রসারিত হতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর সেই প্রসঙ্গেই বলতে হয়, 'লোকশিক্ষা' হল শিক্ষার বৈচিত্র্য ও বহুত্ববাদেরই এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বা শরিক। দুঃখের বিষয়, এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ আলোচনা সচরাচর চোখে পড়ে না।

এখন প্রশ্ন হল—'লোকশিক্ষা' বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? 'প্রথাগত শিক্ষা'র সঙ্গে তার মিল বা অমিলই ঠিক কোথায়? 'গণতন্ত্র'র বহুল-ব্যবহৃত সংজ্ঞাটি যেন অনেকটাই লোকশিক্ষার সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা ও তৎপর্যের সঙ্গে মিলে যায়। 'লোকশিক্ষা' অর্থাৎ বৃহত্তর লোকবৃত্ত বা 'লোক'-এর সম্পর্কে শিক্ষা, আবার 'লোক'-এর জন্যই সেই শিক্ষা এবং সর্বোপরি এর স্রষ্টাও সেই একই 'লোক' বা বৃহত্তর লোকসমাজ। তাই, 'লোকশিক্ষা'র জন্মভূমি নয় কোনো প্রাচীন 'গুরুগৃহ' বা আশ্রম। আবার আধুনিক শিক্ষাদানের যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, সেখানেও পাওয়া যাবে না লোকশিক্ষার ঠিকানা। বরং লোকশিক্ষার স্বরূপ চিনতে হলে যেতে হবে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র, বিস্তৃত ভুবনে, যেখানে মূলত গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন বা মরসুমি লোক-অভ্যাস-বিনোদন-ধর্ম-উৎসব-লোককথা লোকশিল্প ইত্যাকার অজস্র অনুষঙ্গ সৃষ্টি, পালিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে।

'লোকশিক্ষা' অর্থাৎ বৃহত্তর লোকবৃত্ত বা 'লোক'-এর সম্পর্কে শিক্ষা, আবার 'লোক'-এর জন্যই সেই শিক্ষা এবং সর্বোপরি এর স্রষ্টাও সেই একই 'লোক' বা বৃহত্তর লোকসমাজ। তাই, 'লোকশিক্ষা'র জন্মভূমি নয় কোনো প্রাচীন 'গুরুগৃহ' বা আশ্রম। আবার আধুনিক শিক্ষাদানের যে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন, সেখানেও পাওয়া যাবে না লোকশিক্ষার ঠিকানা। বরং লোকশিক্ষার স্বরূপ চিনতে হলে যেতে হবে লোকসংস্কৃতির বিচিত্র, বিস্তৃত ভুবনে, যেখানে মূলত গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন বা মরসুমি লোক-অভ্যাস-বিনোদন-ধর্ম-উৎসব-লোককথা লোকশিল্প ইত্যাকার অজস্র অনুষঙ্গ সৃষ্টি, পালিত ও বিকশিত হয়ে চলেছে।

এখন দেখা যাক, লোকশিক্ষার বিভিন্ন মণিমুক্তো কীভাবে মিশে রয়েছে লোকসংস্কৃতির সামগ্রিক অবয়বে। আমরা জানি, গ্রামীণ সমাজের নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত গরিব কৃষিজীবী তথা শ্রমজীবী মানুষেরা তাঁদের কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদেরই তৈরি কথায় সুরে মেতে ওঠেন নাচে-গানে, মুখে মুখে তৈরি করেন প্রবাদ-ধাঁধা-ছড়া, জমিয়ে তোলেন বাউল-ফকিরি-কৃষ্ণযাত্রা-আলকাপের আসর। যুগ যুগ ধরে লোকসংস্কৃতি তথা লোকঐতিহ্যের পথ ধরেই লোকশিক্ষার উৎসারণ ও বিকাশ ঘটে চলেছে। লোকশিক্ষার যেসব উপাদান লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে বাহিত হয়ে এসেছে, সেগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—পাপ-পুণ্যবোধ, সততা-অসততা ইত্যাদি, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলি—যেমন স্নেহ-ভালোবাসা-বাৎসল্য-প্রেম-মাতৃভক্তি-পিতৃভক্তি-গুরুভক্তি। আবার কখনও কখনও 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' জাতীয় নীতিবোধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে।

লোকসংস্কৃতি থেকে লোকশিক্ষা—বাংলার লোকবৃত্তে যে বিশেষ অঙ্গ-উপাঙ্গের মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার বহতা-ধারার সন্ধান মেলে, তার মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্র হল : (১) প্রবাদ-প্রবচন, (২) ব্রতকথা, (৩) লোককথা (নীতিকথা), (৪) কথকতা, (৫) লোকসংগীত, (৬) লোকনাট্য (কৃষ্ণযাত্রা, স্বদেশি যাত্রা, রামযাত্রা ইত্যাদি)। বলা বাহুল্য, এর বাইরেও হয়ত রয়ে গিয়েছে লোকসংস্কৃতির আরও কিছু ক্ষেত্র, যেখানে ঘটে থাকে লোকশিক্ষার সামাজিক অভিঘাত ও প্রতিফলন।

প্রবাদ প্রবচন : প্রবাদ-প্রবচন হল এক ধরনের 'জীবন-অভিজ্ঞতা', যার আধারে আবার এখানে-ওখানে লোকশিক্ষার নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবেই। এখন, এ-রকম কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্তকে আমরা যাচাই করে দেখতে পারি।

আমরা জানি, বাংলা প্রবাদে এক বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে 'মা'-এর প্রসঙ্গ। সন্তানের প্রতি মায়ের যে স্নেহ, তা যেমন

সহজাত, তেমনই তা চিরন্তন। নিঃসন্দেহে, দেশ-কাল-নির্বিশেষে এটি একটি সর্বজনীন লোকশিক্ষা। দু-একটি বেশ পুরোনো প্রবাদে বলা হয়েছে, 'মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়/তারে বলি ডাইন', 'চিড়ে বলো মুড়ি বলো/ভাতের বাড়া নাই,/পিসি বলো, মাসি বলো/মায়ের বাড়া নাই।' মায়ের সন্তান-বাৎসল্যের অকৃত্রিম স্বরূপ বোঝানোর উপযোগী লোকশিক্ষা এর বড় আর কী হতে পারে?

এই ধরনের প্রবাদের সঙ্গেই তুলনীয় 'মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি!' আবার মা-কে নিয়ে অন্য ধরনের নীতিমূলক প্রবাদও রয়েছে—'কু-পুত্র যদি বা হয়/কু-মাতা কখনো নয়।' পারিবারিক প্রসঙ্গের বাইরেও বাংলার লোকসমাজে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রবাদ, যেখানে খুব সহজভাবে লোকশিক্ষাকে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। এ-রকম দু-একটি দৃষ্টান্ত : 'অতি বাড় বেড়ো না/ঝড়ে পড়ে যাবে। অতি ছোটো হয়ো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।', 'ভালোবাসা ভালো বটে, ভালো নয় অতিশয়/অধিক বাসিলে ভালো বেশিদিন নাহি রয়।' এইভাবে, বাংলার প্রবাদমালায় কত যে 'অমৃতকথা' মিশে রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হদিশ মেলা হয়তো বা অসম্ভব।

ব্রতকথা : ব্রতকথার মধ্য দিয়ে লোকশিক্ষার প্রকাশ ও স্ফুরণের বিষয়টি একেবারে সরাসরি ও প্রত্যক্ষ। ব্রতকথা দুই প্রকার : শাস্ত্রীয় ও মেয়েলি। মেয়েলি ব্রতকথাই লোকসমাজে বেশি প্রচলিত। আর এইসব ব্রতকথার মাধ্যমে নিজেদের প্রিয় দেব-দেবীকে মূলত নিজের ও পরিবারের শুভকামনা, সুস্থ ও সুখী জীবনের প্রার্থনা জানানো হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রতকথার উৎস ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বলেছেন, ''দুই থাকে বিভক্ত এই মেয়েলি ব্রত যার অনুষ্ঠানগুলি খুঁটিয়ে দেখলে পুরাণেরও পূর্বেকার বলে বোধহয় এবং যার মধ্যে হিন্দু-পূর্ব এবং হিন্দু এই দুই ধর্মের একটা আদান-প্রদানের ইতিহাস পড়তে পারি।'' তাই, বলা নিষ্প্রয়োজন—ব্রতকথার উৎস ও তাৎপর্য সবটাই লোকশিক্ষামূলক। পুণ্যিপুকুর ব্রত, মঙ্গলচণ্ডী-সন্তোষী মা, নাটাই-চণ্ডী ব্রত—এইসব ব্রতের মাধ্যমে পারিবারিক তথা সামাজিক মঙ্গল এবং সর্বজনীন শান্তি-কামনা করা হয়ে থাকে। সর্বজনীন সুখ ও শান্তির স্বপক্ষে ব্রতকথার এই যে প্রাসঙ্গিকতা, তা চূড়ান্ত অর্থে ভিন্নতর লোকশিক্ষারই আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ।

লোককথা (নীতিকথা) : লোককথার সুবিস্তৃত আধারে কম-বেশি জায়গা করে নিয়েছে রূপকথা, উপকথা, নীতিকথা। রেভারেন্ড লালবিহারী দে-র 'Folktales of Bengal' ইংরাজিতে লেখা হলেও বাংলার লোককথার অন্যতম স্থায়ী সম্পদ। রূপকথার মূল বিষয়বস্তুতে সর্বদা লোকশিক্ষার উপাদান হয়ত থাকে না, কিন্তু বিভিন্ন রূপকথা ও উপকথার মাধ্যমে প্রধানত রূপকের আড়ালে, আর নীতিকথায় তা প্রায় সরাসরি বহুবিধ মানবিক মূল্যবোধের পরিপূরক লোকশিক্ষার ইতস্তত সম্প্রচার দেখা যায়। এইসব লোক-আখ্যানে বিভিন্ন ধরনের চিরায়ত লোকশিক্ষার সংশ্লেষ থাকে, যেমন—ন্যায়ের সমর্থন, ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, দুর্বলের প্রতি সহমর্মিতা, মিলনান্তক প্রেম বা বিবাহ, সুখী দাম্পত্য ইত্যাদি।

আবার, এইসব লোককথা তথা নীতিকথার একটি প্রধান উৎস হল রামায়ণ ও মহাভারত। এ দুটি মহাকাব্য ছাড়াও প্রাসঙ্গিক অন্যতম উৎসে প্রায়শই বেশ উল্লেখযোগ্য জায়গা নিয়ে রয়েছে 'জাতকের কাহিনি', 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য, হিতোপদেশ-সংকলক লোককথা ও লোকশিক্ষার সম্পর্কটিকে নিজেই স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন এই ভাষায় : 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।'

কথকতা : ব্রতকথা মূলত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আচার, কিন্তু কথকতায় পরিবেশন হয়ে থাকে লোকবৃত্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে, তাই কথকতার বৈশিষ্ট্য ও আবেদন মূলত সমষ্টিগত। কথকঠাকুর সুর করে শোনান রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ ইত্যাকার বিভিন্ন ধর্মকাহিনি এবং আগ্রহী গ্রামীণ মানুষেরা তা-ই মন দিয়ে শোনেন। তাঁর সময়কালে কথকতার সাময়িক ক্ষয়িষ্ণুতার প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, ''গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, বেদীপিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া সুগন্ধ মল্লিকমালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া নাদুসনুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জুনের বীরধর্ম, লক্ষ্মণের সত্যব্রত, ভীষ্মের ইন্দ্রিয় জয়... আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙল চষে, যে তুলা পেঁজে.. সেও শিখিত যে ধর্ম নিত্য, ধর্ম দৈব... যে লোকহিত পরম কার্য... সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়?'' লোকবৃত্তের সঙ্গে লোকশিক্ষার মহত্তম সার্থক এই দৃষ্টান্ত এক কথায় কী চমৎকার!

তবে, বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও কথকতার সজীব ধারাবাহিকতা বহু বছর অক্ষুণ্ণ ছিল—কী গ্রামীণ, কী নাগরিক বাংলায়। বিশেষ করে, মানিকপীর-সত্যপীর-সত্যনারায়ণের পাঁচালিও তো এক ধরনের লোকশিক্ষামূলক কথকতাই, যা দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক ধরনের সর্বজনীন সম্প্রীতির বাতাবরণ বিকশিত করেছিল।

লোকসংগীত : বাংলার লোকসংস্কৃতি তথা লোকবৃত্তে সবচেয়ে বড় জায়গা দখল করে রয়েছে লোকসংগীত। আবার, এই লোকসংগীতের রয়েছে বিভিন্ন বিভাজন—ব্যবহারিক, কর্মসংগীত, আঞ্চলিক প্রেম বা ধর্মসংগীত। তবে, সব লোকসংগীতেই যে লোকশিক্ষার উপাদান রয়েছে, তা নয়—তবে কিছু পার্বণ সংগীতে এবং বিশেষত নির্দিষ্ট ভাবনির্ভর আধ্যাত্মিক সংগীতে রূপ ও প্রতীকের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা প্রসারের ব্যাপক দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে। এইসব গানের মধ্যে লোকশিক্ষাও সমাজশিক্ষার যেসব দিকগুলি সচরাচর ফুটে ওঠে, সেগুলি হল—(১) জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ-রূপ 'ঈশ্বর' বা 'সত্য'-এর সন্ধান, (২) 'ভক্তি'-দর্শন-প্রভাবিত বিভিন্ন মানবিক গুণের প্রচার, (৩) স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য আবেগের আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ, (৪) সম্প্রদায় ও জাতপাতের উর্ধ্বে সম্প্রীতি-ভাবনার প্রসার।

এ-প্রসঙ্গে বাউলগানের অনিঃশেষে ভাণ্ডার থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরা হচ্ছে—

কৃষ্ণ-নামের রঙ্গের চকমকি
একবার ঠুকে দ্যাখ্ দিকি—
দেখবি—ঠুকতে পারলে জ্বলবে আগুন,
তাহলে আমাদের তামাক-খাবার
ভাবন কী?
কৃষ্ণনামের রঙ্গের চকমকি!

রূপকের আড়ালে যে অসাধারণ চিরন্তন বার্তাটি এই গানে লুকিয়ে রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। আবার অন্য একটি বহুল-প্রচলিত বাউল-গানে জাতপাতের বেড়া ভেঙে প্রকৃত প্রেমের কিংবদন্তি স্বীকৃতি পেয়েছে এই ভাষায়—

এক ব্রাহ্মণের ছেলে
বদখতে বিটকেলে
ধোপার মেয়ের সে
পা ধুয়ে দিলে।
পীরিতে জেতের বিচার
করলে পরে
মিলবে না চাঁদের কণা...

আর, সবার ওপরে রয়েছেন লোকশিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক লালন ফকির, যিনি আজও গানের মাধ্যমে বিস্তীর্ণ লোকবৃত্তে সহজিয়া মানবিক দর্শনের মণিমুক্তো ছড়িয়ে চলেছেন।

বাউল বা ফকিরি গান ছাড়াও লোকসংগীতের আরও একটি

শাখায় সীমিতভাবে হলেও মাঝেমাঝে লোকশিক্ষার ঝিলিক চমকে দেয়। এরকম একটি কবিগানের নমুনা—

খৃস্টে আর কৃষ্টে কিছু তফাত
নাইরে ভাই,
নামের ভেদে মানুষ ফেরে
একথা তো শুনি নাই
আমার খোদা যে হিঁদুর হরি সে
ওই দ্যাখো শিব দাঁড়িয়ে আছে...

লোকনাট্য : রামকৃষ্ণ অভিনেত্রী বিনোদিনীকে বলেছিলেন—'থিয়েটারে লোকশিক্ষা হয়।' লোকনাট্যের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে রয়েছে—কৃষ্ণযাত্রা-রামযাত্রা-স্বদেশি যাত্রা-আলকাপ-লেটো-চোরচূর্ণি, আরও কত না নাম-না-জানা অনুষঙ্গ। একথা সত্য, লোকনাট্যের সব কিছুতেই লোকশিক্ষার উপকরণ নেই। বরং এই পরিবৃত্তের একটি বড় অংশ জুড়েই রয়েছে সরল ও আদিরসাত্মক ব্যঙ্গবিদ্রুপ, ফার্স জাতীয় মোটা দাগের কৌতুক ও চটুল বিনোদন। তবে, কৃষ্ণযাত্রা-বোলান-রামযাত্রা ইত্যাকার শাখায় 'ধর্ম'কে সামনে রেখে গান ও সংলাপের মাধ্যমে নীতিকথা বা লোকশিক্ষা পরিবেশনের বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর এসবের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনিবার্যভাবেই থাকে একজন 'বিবেক', যিনি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গানের সুরে বারে বারে হুঁশিয়ারি দেন অধর্ম-পাপ-দুরাত্মার বিরুদ্ধে এবং ধর্ম ও 'সত্যমেব জয়'-এর স্বপক্ষে।

লোকসংস্কৃতি-লোকশিক্ষা-লোকবৃত্ত সঞ্চরণ-প্রক্রিয়া

লোকসংস্কৃতিমাত্রই কিন্তু লোকশিক্ষা নয়। লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে যেমন লোকশিক্ষা, আবার অন্য অংশ জুড়ে রয়েছে স্থূল বা বিকৃত রুচি এবং নানাবিধ কুসংস্কার ও অলৌকিতার গোঁজামিল বা হেঁয়ালি। এরই মধ্যে থেকে লোকশিক্ষামূলক উপকরণটি কীভাবে গ্রহণ করেন গ্রামীণ মানুষ তথা বৃহত্তর লোকবৃত্ত?

এ প্রসঙ্গে একটি প্রাচীন প্রবচনের সঙ্গে যেন কাকতালীয়ভাবে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের ঐকমত্য লক্ষ করা যায়—পড়ার চেয়ে শোনা ভালো, শোনার চেয়ে দেখা ভালো। এখানে 'ভালো' অর্থে অধিকতর কার্যকর। লোকসংস্কৃতি ও লোকশিক্ষায় 'পড়া' প্রসঙ্গটি এক অর্থে অবান্তর ও অবাস্তব কেননা এই সংস্কৃতি মূলত 'মৌখিক সাহিত্য'র ঐতিহ্যবাহিত, আর এই সংস্কৃতির সাধারণ গ্রাহক ও উপভোক্তাদের সিংহভাগই পঠন-অক্ষম। তাই, তাদের রসাস্বাদন বা বিনোদনের বিষয়টি মূলত সীমাবদ্ধ থাকে 'শ্রাব্য' (audio) ও 'দৃশ্য' (visual) ফর্মের চৌহদ্দিতে। তাই লোককথা বা কথকতার মতো শ্রাব্য বিষয়ই হোক অথবা লোকনাট্য বা লোকসংগীতের মতো 'শ্রাব্য-দৃশ্য' (Audio-Visual) হোক, বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ শ্রোতা-দর্শকদের সঙ্গে শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ, সহজতম সংযোগ-সঞ্চরণের গুণেই এইসব লোক-প্রযোজনা তাৎক্ষণিকভাবেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আর এইসব খণ্ড-বিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে গ্রামীণ মানুষদের মনে সবার অলক্ষ্যে ঘটে চলে শিক্ষার সঞ্চার।

এইভাবেই, চূড়ান্ত অর্থে সার্থক হয়ে ওঠে লোকবৃত্ত ও লোকশিক্ষার 'সম্মিলন'।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আমাদের কথা

সততা আর স্বচ্ছতা যদি থাকে
আয়নার মতো হিসেবটা যদি রাখে
পঞ্চায়েতটা পঞ্চহিতের হবে
সব সদস্য মানুষের পাশে রবে।
পথ-ঘাট আর পানীয় জলের পাশে
স্বাস্থ্য-শিক্ষা-আলো তমশ নাশে
আমরা আছি থাকব যে চিরকাল
আঁধারকে ছিঁড়ে আনব নতুন সকাল।

আমড়াসোতা গ্রাম পঞ্চায়েত

মহঃ আকবর আনসারি
উপপ্রধান

সীমা বাউরী
প্রধান

Sl. No. 158

With best compliments of

SUPER SMELTERS LTD.

Ikrah, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 47

স্থাবর

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

আকাশপানে উড়ান দিতে চেয়েছিল চিত্ত
দশবর্ষ ধরে।
পরিবেশ প্রতিকূল, রচে দিলে বৃত্ত
দশবর্ষ পরে।
স্থবিরতা শাপমুক্তি হল না কারামুক্তি
কেচেগণ্ডুষ করে।

পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা
হরির লুটের বাতাসা
ধরে মুঠি ভরে,
বেঁচে থাকা স্থাবর হয়ে,
স্বপ্ন উড়ান খোওয়া গিয়ে,
এক দশক পরে।

মানুষেরই জয়

গণেশ চৌধুরী

বাংলার ভাগাড়ে পড়ছে নিয়ত গণতন্ত্রের লাশ
মুক্ত আকাশ ছেয়ে গেছে তীক্ষ্ণ নখের শকুনের ভিড়ে
চারিদিকে ধেয়ে আসে ক্ষুধার্ত কুকুরের উল্লাস
ঘোষিত নিদান ওদের কিছুটা দূরে শ্মশানে বা কবরে।
ভিন্নমত নিষিদ্ধ এখানে, বিরোধিতার জায়গা নেই
এখানে সব মতই কেনা যায় টাকায় বা ডলারে।
নীতি বা নৈতিকতা শব্দগুলো মুখ ঢেকেছে অন্ধকারে
অদ্ভুত তাই দমবন্ধ বিবেকের নীরবতা এখানে।
শাসকের পছন্দ নয় জনতার কল্লোল কলরব,
এখানে পছন্দ ওদের নৈশব্দের গোঙানি বা আর্তনাদ
মাতৃক্রোড়ে শিশুর নির্মল হাসি এখানে দুর্লভ
ডুকরে ওঠে মায়েদের-মেয়েদের বুকচাপা ক্রন্দন।
অধিকারের আকাল এখানে। একান্তই অমিল,
কুকুর আর ভিখারির ভিড় এখানে, তাদেরই কাড়াকাড়ি
মহাভোজের এঁটো পাতা খেয়ে এদের দিন কাটে
তৃণভোজী বুদ্ধিবৃত্তির খোয়াব তাতেই সাবাস দেয়।
ক্ষুধার রাজ্যে পুরস্কৃত হয় তারা ক্ষমতার পদতলে,
হারে হৃদয়-মন, বিচারবুদ্ধি সবই আপাত শরশয্যায়
হাতে হাতে যবে তাই শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো
বারুদ ভিজতে দিও না, মেঘ কেটে যাবে, মুক্ত হবে আকাশ।
দেওয়ালের লিখন পড়তে পারে না শাসকেরা,
তাই ইতিহাসের নিয়তিও ওরা জানে না।
লাঙলে-কাস্তেয়-হাতুড়িতে যুগের কাব্য লেখা হয়
অন্ধকার শেষ কথা নয়, পুবের আকাশে সূর্য উঠবেই আবার
অন্ধকারের উপাসকরা ভোরের আলো ফুটলেই পালাবে সবাই
ফুলেরা হাসবে বাগান জুড়ে, পাখিরা আসবে আবার,
শত্রুর চোখে চোখ রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে ভোরের অপেক্ষায়
শেষ কথা ওরা নয়, বলবে মানুষই, হবে মানুষেরই জয়।

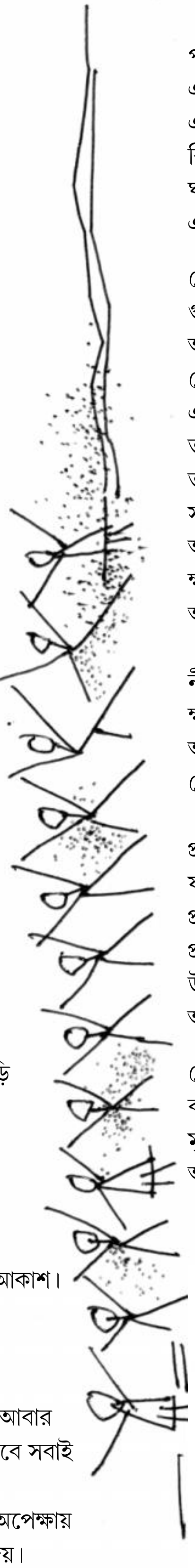

হোক-কলরব হোক-কলরব মৃত্যুর তোয়াক্কাহীন

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

পাখি-সব করে রব রাতি পোহাইলে
এবং তখন কাননে কুসুম কলি ফুটতেই থাকবে, থাকবেই—
এই-তো বিশ্বাস ছিল প্রত্যাশা ছিল স্বপ্নের আদিগন্ত ঝিলে।
কিন্তু যাদবপুর ক্যাম্পাসে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৪-র রাতে
ঘটানো হল ক্ষমতার তাণ্ডব বীভৎসা :
এরপর কী করে রাখব বলুন তো লালিত স্বপ্নের প্রত্যাশা?

কেন না আধুনিক সভ্যতার নিষ্প্রদীপ অন্ধকার মধ্যরাতে
গুন্ডা-আর-পুলিসের হিংস্র নৃত্যের প্রত্যুত্তরে
আহত-রক্তাক্ত ক্যাম্পাস গান গাইছে মৃত্যুঞ্জয়ী সুরে—
হোক-কলরব হোক-কলরব হোক-কলরব যাদবপুরে
এই বাংলার দৃপ্ত যৌবনের অহংকার থাকবেই
তাণ্ডবকে ফুৎকারে উপেক্ষা করে মাথা উঁচু করে বাঁচবেই
তবে মেধাহীন নয় প্রেমহীন নয়
সুন্দর নম্রতায়
অন্যায়-অত্যাচার যতই আচার্য-রূপের মহিমা দেখাক
ক্ষমতার দম্ভ যতই ঢাকুক তার হিংস্রতার বীভৎস দেমাক
অত্যাধুনিক ব্যান্ড-বাদ্যের সপ্তসুরের ঝঙ্কার-উল্লম্ফন
যতই উচ্চকিত করুক
নীরবে-নিভৃতে অশ্রু-রক্ত যতই ঝরুক
ক্ষমতা-দম্ভের উচ্চ মদোন্মত্ত জগঝম্প যতই বাজতে থাকুক—
আনুষ্ঠানিক সমাবর্তনে প্রহসনের সুর বেখাপ্পা বেজে উঠবেই—
কেননা গীতশ্রীদের বিনম্র প্রত্যাখ্যানে অন্য সুর
তেজোদ্দীপ্ত হবেই
প্রাক্তনী অহনারাও স্বর্ণপদক ফেরাবেই
যাদবপুরের রৌদ্রোজ্জ্বল ক্যাম্পাস
প্রাণ-বিপন্ন করেও যাদবপুরের বিদগ্ধ যৌবন
প্রতাশার অগ্নি-কুসুম ফোটাবেই
উদ্‌ভ্রান্ত ক্ষমতার দম্ভিত মাথা নোয়াবেই
অমোঘ অবিনশ্বর সত্যম্-সুন্দরম্-সংকাশ!!

হোক-কলরব হোক-কলরব হোক-কলরব যাদবপুরে
বাংলা-ভারত-জগৎ জুড়ে
মৃত্যুর তোয়াক্কাহীন দৃপ্ত পাখিরা সব সঙ্ঘবদ্ধ করছে কলরব
অন্ধকার রাত্রি অবশ্যই পোহাইবে ক্ষমতার অন্ধ-অন্তঃপুরে!!!

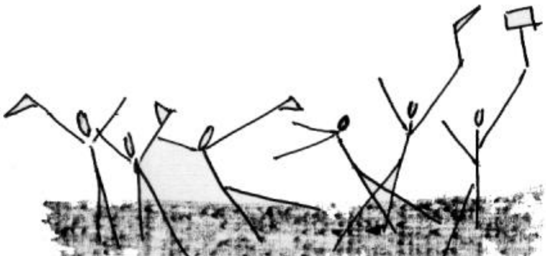

রূপরাম

শেখ জয়নাল আবেদিন

পড়েছে বাঘের মুখে যেন এক রূপরাম কবি
ফেলে যত পুঁথিপত্র দেয় ছুট যদি প্রাণে বাঁচে
ঘরে ফিরে দাদার চোখেও দেখে দাউ দাউ রবি
সোনা হীরা বোন দুটি অন্তরালে মাকে ধরে কাঁদে।।

মৃত্যুর ভেতর বন্ধ ছিল জানালা

বিদ্যুৎ ভৌমিক

কোনো সহজ ইচ্ছাতে আমি জানলা খুলি না
অথচ পাথরের ঢাকনা খুলে হামেশাই সূর্যোদয় দেখি!
এই দোষে দুষ্ট ভেতরের অমৃত্য প্রাণ,
বয়স মেনে চোখ হাসে গোপন সূত্রে
এখানেই রোজ রোজ বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে সমস্ত আকাশ ধয়ে মুছে গেছে
অথচ এভাবেই চলছে দু-বেলা!

কোনো প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনে জানলা কিন্তু খুলিনা একবারও
বুকের মধ্যে কতকাল আমি নিঃশব্দে আছি...
পাপ, ক্লেদ, বিষাদ কিছু হৃদয় খারাপের অন্যসব ভাসমান দুঃখ;
এসব যেন নিমেষেই দর্পণে দেখি,—ছবিময়।
এই ঘরে আমি ইচ্ছে করেই একা হয়ে থাকি বারোমাস
জানলা এবং খুলে রাখা মন, সবটাই যখন বিপরীতে হাসে
সেই সময় আমি যেন অন্য পুরুষের চেহারা নিয়ে বেঁচে থাকার
নাটক করি!

সবাই যেভাবে চলে, কথা বলে, গান গায়—আমি একেবারেই
মৃত্যুর মতো নীরব নিঃশব্দে পড়ে থাকি!
এখানে স্তব্ধ, কিছু কথা হলে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে ইচ্ছে হয় না
জটিল দৃষ্টিগুলো ছায়া ছায়া চেহারায় এক একটা ভিনগ্রহের যেন,
তবুও তো আমি নিজেই আমার একটা দীর্ঘ দাঁড়ি টানি—

এই ঘরের মধ্যে প্রবেশদ্বার যতটা শক্ত
বেরিয়ে যাবার ম্যাজিক রিয়ালিটি ততটাই সহজলভ্য...
ফুল-চন্দনে এবং সুগন্ধি ধূপে এই ঘর অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ;
তবুও কোথাকার কোন এক আকাশ যেন নামহীন পৃথিবীর গল্প
বলেছে সারারাত ধরে!
জীবন থেকে ঘুরে এসেছে আর একটা জন্মদিন
ভালোবাসা এবং খেদ শ্মশানে পুড়ে-পুড়ে ক্রমাগত ছাই হয়ে
গেলে ভেতরের খবর নিতে চলে আসে অন্য কোনো জীবন...
অথচ এইভাবে কেউ কেউ বাতিল হয়ে যায় ঘর-সংসারে!

যে-কোনো কারণেই হোক আমি কিন্তু পুষে রাখি নিজের আমিকে
কথাহীন যত কিছু নির্বাক ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে—
এই ঘরের জানালা কবে থেকে বন্ধ আছে, সেটা নিয়ে কেউ প্রশ্ন
তোলেনি একবারও।
তবুও তো রোজ রোজ আমি চিতার ভেতর থেকে উঠে আসি
স্বপ্নহীন-ঘুমহীন—একই প্রবহমানতায়!!

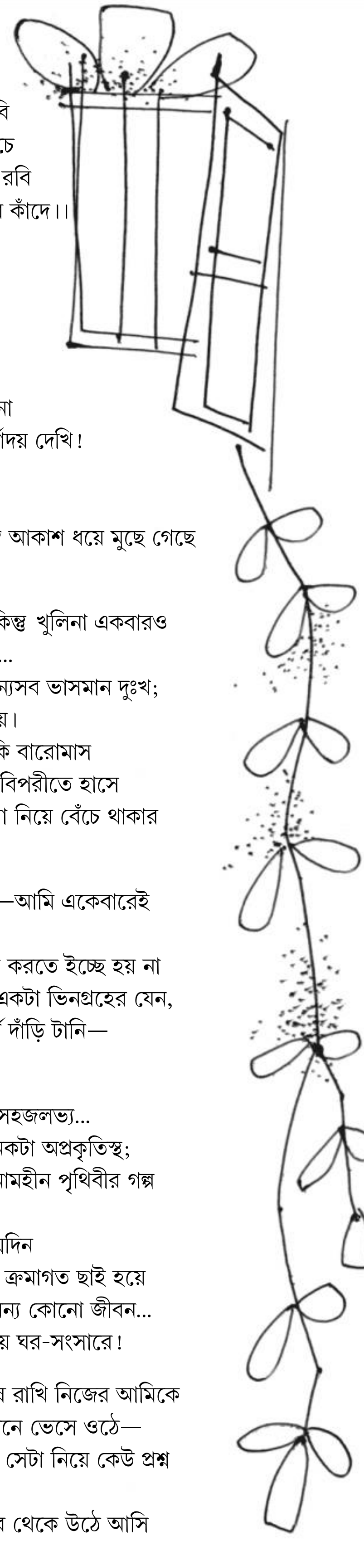

ঝাউপাতা

আমির উল হক

জেগে থাকা আধো ঘুমে
জেগে আছে—
বেঁচে আছে,
অনাবিল সেই স্মৃতিভারে—
বাসন্তীর মধুমাখা স্মৃতি।
জানালার পাশে
খ্রিস্টীয় কবর থেকে—
ছানি দিয়ে ডাকে,
লাশের ওপর থেকে ভেসে ওঠে—
শতাব্দীর শেষ সংলাপ।
জানালা বন্ধ করে
চলো আজ ফিরে যাই—
কোনো এক মরকত বনে।

হে আমার অসীম অতীত,
নির্ভয়ে ক্ষমা করো—
পাশে থেকো আজীবন।
দেখা যদি হয় কোনোদিন,
মনে করে বলে দিও তারে—
ঝাউপাতা রেখে গিয়েছিনু ভুলে,
বইয়ের হারানো পাতাগুলি—
খুঁজে ফিরি—
আজও খুঁজে ফিরি।

আগামী ভোরের জন্য

বিকাশ বিশ্বাস

গাঢ় অমানিশার অন্ধকারে চারপাশ প্লাবিত
অশান্তির আবহ সঙ্গীতে বিনিদ্র জাগরণ
বেপরোয়া অটল সংকল্পে রচি তাই
ধারাপাত—জীবনের স্বরলিপিতে।

মেপে চলা আর বলার তালিম দিতে দিতে
স্বাধীনতার স্বাদ যাই ভুলে
একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ
পাশে এসে দাঁড়াবার কেউ নেই।

তবু জীবনকে বাজি রেখে
যারা লড়ছে অবিরাম
গেয়ে চলে নিত্য জীবনের জয়গান
ভয়কে জয় করে এসো
তাদের সাথী করি
আগামী ভোরের জন্য শুরু হোক
দীর্ঘ অভিযান।

বর্ধমানের ইতিহাস

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি হারিয়ে যাই, মহাবীরের নামাঙ্কিত এই
গ্রামশহরের ইতিহাসের পাতায়, চোখ বুজলে দেখতে
পাই শের আফগানের উদ্যত কৃপাণ পত্নীরক্ষার অসম
লড়াই যা আজও প্রবহমান কালের স্রোতে...জাহাঙ্গীরের
দুধভাই কুতুবুদ্দিন-এর আত্মত্যাগ...
হারিয়ে যাই কমলাকান্তের সাধনাধন্য
কালীবাড়িতে, কঙ্কালীর ভীষণা মূর্তির আশেপাশে,
আজিমউসসানের মসজিদে কিংবা নবাব বাড়িতে...

কোথায় বিজয়চাঁদের কাব্যপ্রীতি, আর কোথায়
ব্রিটিশ শাসকের পদলেহন... এও বুঝি একই বৃন্তে দুটি ফুল
কখনও হারিয়ে যাই বাহাত্তরের দিনগুলিতে, শহিদের
শোনিতে শোনিতে, আবার চোখ আটকে যায় ক্ষেতি
বামনীর গলিতে, চরণের মাংসের চাট, আজও গন্ধবিধুর
করে তোলে ইসতাঁবুলের রক্তাক্ত তরোয়ালের কোণায় কোণায়,
বিদ্যাসাগর থেকে সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ থেকে
সুনীল সবাই আছেন, এসেছেন, এসেছেন গান্ধীজিও

পাঞ্জাবিঘরানার রাজা রাজড়াও সেই বণিকের মানদণ্ড
হাতে নিয়ে এখানে এসে রাজদণ্ড তুলে নিয়েছেন
কিন্তু আজ তাঁরা কোথায়? রাজভক্ত বর্ধমান আজও
রাজভক্তিতে ভরপুর

কেউ কি শুনছেন কোনো একজন উকিল ব্রিটিশ শাসনের
লৌহকবাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোটা বর্ধমান স্টেশনটাই
ক্রোক করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই প্রখ্যাত ডি এন মিত্র
অথবা পৃথিবীখ্যাত রাসবিহারী ঘোষ... বুঝিয়ে
দিয়েছিলেন তামাম দুনিয়াকে, ওকালতি কাকে বলে

আজ অর্থলোলুপ কিছু ক্লিন্ন ব্যক্তিত্ব গোটা শহরটাকে
নার্সিংহোমের কসাইখানায় পরিবর্তিত করেছেন স্রেফ
টাকার জোরে আর কোনো এক শ্রেণিসহায়তায়... হারিয়ে
গেছে আড্ডা কালস্রোতে,

ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছিলেন 'অর্থমনর্থম্' আজ
বর্ধমান প্রমাণ করে চলেছে... ঠিক্ ঠিক্, এখানে
ধানের ধুলোর জোরে, হাতের তেলোয় পুরো শহরটাকে
ঘোরানো যায়—এমনকি সাংস্কৃতিক জগতকেও

তবে শকহূনদল পাঠান মোঘল যদি লীন হয়ে থাকে
ভারতের কোথাও... তা এই বর্ধমানেই

একথ সত্য এবং চিরন্তন, কিছু কর্মীর প্রচেষ্টায়
মহারাজের ভাঙা নাক জোড়া লাগলেও
বর্ধমানের ভাঙা নাক জোড়া দেয়... এ সাধ্য কার?

অতএব চলছে... চলবে, এটাই শেষ শ্লোগান।।

পশুশ্রী পেতে

নলিনীরঞ্জন সরকার

হতে হলে পশুশ্রী
ভাবনাটাই বা খুব কী
সোজা পথে এগিয়ে যাও
খেতাবটা নিজে নিয়ে নাও।

খেতাবটাই তো আসল
তাকে ছাড়ে কোন পাগল
তেমন তুমি হয়ো না
এমন খেতাব নাও না।

সভার মাঝে কর হুপহাপ
অন্য সময় থাক চুপচাপ
কী বলছে নেতা শোনার দরকার নাই
ঘন ঘন হাততালিটা দেওয়া চাই।

পদযাত্রায় পা চালাও ঘোড়ার ঢঙে
মাঝে মাঝে হাসো কিন্তু নেতার সঙে
শ্লোগান ভুল দিলেও তালে তাল মেলাও
বুঝদার লোককে মজা পাবার সুখ দাও।

পার্থেনিয়াম

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

মিতুর মা না এলে এঁটো বাসন পড়ে থাকে
অন্য কারোর আসা না আসায় তখন আর যায় আসে না
আমি খেয়াদহের স্বপ্ন দেখি, ভ্রমরবিলের খোঁজ করি
ক্যামেরায় আমার দুঃখের ছবি ওঠে, মোবাইল রিচার্জ হয় না
কাল সময় করে সমুদ্রগড় যাব, কঙ্কনার বাঁওড়ের কাছে যাব
দ্যাখো এক-একটা লক্ষ্মীসায়র হাতছানি দিচ্ছে
আউশখেতের গায়ে নৌকোর স্তব্ধ পতাকা

যদিও এখানে প্রবল হয়ে আছে খুঁটি

যেভাবে সমুদ্রও শেষ হয়ে যায় সেভাবেই আমার ছেলেমেয়েরা
মরচের মতো বেঁচে আছে, যদিও জাফরি জীবন, তার পাপ-পুণ্য
ফিরি করছে মুশকিল আসান কোনো ফকিরের কাঁধের দুপাশে
আর আমরা হারিয়ে ফেলছি উঠোনের শ্যামলী পিঁড়িটিকে

এঁটো বাসন, পিঁপড়ে... এটুকুই বোধ, এটুকুই টিকে থাকা
মনে পড়ল এসব গতকালের কথা

ওদের বারমাস্যা
বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

ওরা নেয় বাসমতী ধানের
প্রথম নরম ঘ্রাণ, ওরা অন্যের
টিভিতে দেখে বাসমতী চালের
লিফ্‌ট চেপে বহুতলে ওঠা,
ওদের সৃষ্টি অন্যের ঘরে ফোটা।

সারারাদ বৃষ্টিভেজা, শীতে কাঁপা ওরা,
সারাদিন নেয় বহুতলের ঘনিষ্ঠ ঘ্রাণ,
তারপর ওদের রক্তঘামে তৈরি বহুতল
অন্যের মুঠোয়, ওরা তখন দর্শক।
ফিকে মুখে পথ থেকে ওরা দেখে
প্রাক্তন স্বপ্নে মাখা শক্ত সিঁড়িগুলো।

বাসমতী চাল, একতলা বাড়ি
ওদের স্বপ্ন। ওদের সাধ
শুধু শক্ত খুঁটি, তার ওপরে ভালো টালি,
অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে দুবেলা
খইয়ের মতো নরম ভাতের
নির্মল নীরব নাচ।

রূপান্তর ভূমি
গিরীন্দ্রনাথ চাকী

ছিনতাই হওয়া মেঘ হাত ধরেছে মিছিলের
বর্ষার নম্র ভাষা ভুলে
সে শ্লোগান দিচ্ছে আগুনের
এদিকে যে ধান্যটুকরির মাঠ
হা-পিত্যেশে চেয়ে আছে আকাশের দিকে
সেদিকে খেয়াল নেই

ঘন পাটের জমিতে খরিশের আনাগোনা—
ডুরে শাড়িপরা দ্বিতীয় পক্ষের বৌ
শাকপাতা তুলতে ধীরে ধীরে
ঢুকে যাচ্ছে ঘন পাটের জঙ্গলে

এখন বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়ছে উত্তরের মাঠে
যখন গোটা মাঠটাই হবে জলে একাকার
তারপর তথ্যচিত্র তুলে
বিদেশি পর্যটক টানা হবে।

গৌড়বঙ্গ নাম মুছে লেখা হবে
রূপান্তর ভূমি।

শিল্পীর আসন
[ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনে রেখে]

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

রাজাদের যাত্রাপথে আগে পিছে উজ্জ্বল কনভয়
স্তব্ধ জনকলরব হুটারের কর্কশ ধ্বনিতে
সচকিত লোকজন রাস্তা ছাড়ে বিরক্ত-সম্ভ্রমে,
প্রজাদের করের কড়ি শুয়ে থাকে পিচে, সরণিতে।

শিল্পীও হাঁটেন পথে। শিল্পীর পিছনে কনভয়
কখনোই ভাবা যায় না, বরং পিছনে লাগে কেউ।
আদৌ মসৃণ নয়, উচ্চাবচ শিল্পীদের পথ
কাঁটায় পাথরে আঁটা, কুসুম বিস্তীর্ণ পাননি কেউ।

রাজাদের মৃত্যু হলে দেশে অর্ধনমিত পতাকা
জাতীয় শোকের মেঘ মানচিত্রে ঘনীভূত হয়।...
শিল্পী প্রয়াত হলে ম্যাড়মেড়ে নীরব প্রস্থান
দেখন-শোকের বন্যা শিল্পীর নদীর জন্য নয়।

এক রাজার মৃত্যু হলে অন্য রাজা পায় সিংহাসন—
শিল্পীর প্রয়াণে কিন্তু শূন্য সেই শিল্পীর আসন।।

লড়াই
গণেশ ভট্টাচার্য

তোমাকে পাবার জন্য বহু দূর চলে যেতে পারি
যতদূর মানুষ গিয়েছে
        গিয়েছে অবাধ রোদ্দুর...

একটি কুটির আছে জঙ্গলের পাশে
        তুমি বসে আছো ঘাসে
        পাখি উড়ে আসে
        উড়ে আসে ক্ষুধা
        তবুও তোমার চোখে নরম নিবিড় এক ছায়া।

একটু দূরে
        দরিদ্রের মতো আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি
        তোমাকে দেখেছি
        অথচ আমার কাছে খাদ্য নেই...

তোমার ক্ষুধার্ত দেহ খাবে বলে
        গাছের ফাঁকে
        ওঁত পেতে থাকে চিতাবাঘ
        আমি দেখি
        চিতাবাঘ আমাকেও দ্যাখে—

তারপর দুজনেই হেসে উঠি
        তোমাকে পাবার জন্য
        দুজনেই অপেক্ষায় থাকি।

মধ্যবিত্ত

সুস্মেলী দত্ত

মৃত্যুসংবাদ পেয়েও
গুছিয়েগাছিয়ে আলুসেদ্ধ, মুড়িভাজা
ধনেপাতাগুলো রোদ্দুরে
এইমাত্র আঁশবঁটিতে ঠেকানো
টুকরো মাছের ঝোল বা কালিয়া—
যা হোক কিছু

শুকনো জামাকাপড়গুলো এখনো টানটান ছাদে
ইতস্তত কাগজের স্তূপ, সস্তা ডাস্টবিন
সদ্যস্নাত মার্বেল পাথরের অ্যাসট্রেটা... ইত্যাদি ইত্যাদি

চাপ চাপ রক্ত তখনও ঠোঁটের কোণ ঘেঁষে
লালা... ওসব মুছতে
সাময়িক বিশ্রাম

কিন্তু চোখ দুটো কোথায়... কৃষ্ণগহ্বরে?
সুগৃহিণীর মতো সে-দুটোকেও
দেরাজে পুরতে হবে

এই শেষবার
একমাথা সিঁদুর পরে বিদিশা
প্রতিবিম্বের সামনে দাঁড়াল।

বোধি

সুকান্ত দে

কারা এলো?
ওম পেয়ে ফুলে উঠল ডানার পালক!

চুরাশি লক্ষ যোনী তারও পরে অমৃতময় কোষ
সাধনা অসম্পূর্ণ রেখে
চলে যাওয়া বিষাদ বালক—

ফিরে আসে নদীটির কাছে
গাছটি চিনে নেয় স্নেহগন্ধ তন্ত্রীর সুর,

ঝুরিটি নামিয়ে দেয়, মাটি থেকে জল তুলে দুধ,
সেই তো ফিরিয়ে দেয় পুষ্টির রস
নদী দেয় স্মৃতির মাথুর।

বিস্মৃতির শুকনো কাঠ যত জ্বলে
অনুভবি আঁচ তত বেড়ে ওঠে রোজ,

জেনে যায়, নাম ও নির্বাসন সমান তরল
শরীরী রাজত্বের রাত ফেলে রেখে,
অবশেষে, বালক নিখোঁজ।

সংশয়

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়

হাজার বছর ধরে মিলেছিল সত্তায়। জিজ্ঞাসা ছিল না।
অযুত বর্ষ ধরে অপার শ্রদ্ধা ছিল
প্রাচীন বিশ্বাসে।
মানুষের কথা ভেবে, মানুষের মঙ্গলের কথা।

চেতনায় মিশে যাওয়া সেইসব মূক বোধগুলি
ইদানীং ক্রমশ মুখর,
সংশয় ভাসায় বাতাসে।
দিন আসে দিন যায়, সন্ধ্যা এসে দাঁড়ায় আঁধারে
যা কিছু হওয়ার নয়, যা হওয়া উচিত নয়
সেইসব অনায়াসে ঘটে যায়
তিনভাগ জল নিয়ে এক ভাগ মাটির পৃথিবী
পুণ্যস্নান সেরে নিতে পারেনি এখনও।

আমার পালিত প্রিয় অভ্যাসের দায়ভার থেকে
শর্তহীন মুক্তি চাই আজ।
সংযমের গণ্ডি মেনে
পথ কেটে কেটে মানুষ হাঁটবে বলে
জন্ম যার—
কথা ছিল ক্রমবিকশিত হবে আলো
পরিচিত পুরোনো জীবন, জীবনের ন্যায় অন্যায়—
সব কিছু নিজেরাই ভেঙে দিলে কেন
কেন এনে দিলে এমন সংশয়?

কথা ছিল গড়ে দেবে মেঘ ছোঁয়া কত ইমারত।
পুরাতন অনুশাসনেরা
নিজেরাই সেইসব ভেঙে দেয় যদি
কী হবে তাহলে।

চাঁদ

রীতা বসু (ধর)

চাঁদ ডাক দিল
দুধে আমসত্ত্ব দিয়ে
ভাত বেড়ে দিল
চাঁদ গিন্নি ছুঁড়ে
ফেলল সব
তাই-তাই বলে
মা বলে না চল।
ভাগনা-ভাগনি
সাদা ভাত তুলতে
ব্যস্ত, জুঁই ফুলের মতো ভাত।

জুঁই ফুলের পাপড়ি
প্রকাশ দাস

সমস্ত আকাশ জুড়ে ওড়াওড়ি
করছে যুদ্ধবিমানগুলি।
হাওয়া—এলোমেলো হাওয়ায়, আকাশের নীচে
উড়ে যাচ্ছে কয়েকটি
জুঁই ফুলের পাপড়ি।
সন্ত্রস্ত আমি,
লাফিয়ে উঠে দেখি বিমানের ওড়াউড়ির পাশে
একাকী পাগল ওই
খেলা করছে ধূলিমুঠি নিয়ে।
মৃত্যুর ভিতরে, যুদ্ধবিমানের ছায়াযুদ্ধের পাশে
এভাবেই প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে জীবন,
পাগলের হাসি। তার চারপাশে উড়ে উড়ে যাচ্ছে
কয়েকটি জুঁই ফুলের পাপড়ি।

কুকুরটা লেজ নাড়ছে...
নিমাই মান্না

যাজক,
পাদ্রী,
উলেমা
সবাই-ই রক্তচক্ষু দেখিয়ে
ফতোয়া জারি করছে...

ঘাতক খড়্গ উঁচিয়ে
লাফিয়েই চলেছে...
জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে বলে
কেউ বা জ্বলন্ত মশাল হাতে
দাঁত কিড়মিড়িয়ে
মারণ-নৃত্য শুরু করেছে...

কুকুরটা কিন্তু লেজ নেড়েই চলেছে...
পৃথিবীটা এখনও তবু চলমান।।

(গ্যালিলিওকে যখন জোর করে বলানো হচ্ছিল যে, সূর্যই ঘুরছে পৃথিবীর চারিদিকে—তখন কুকুরটা লেজ নেড়েই চলেছিল...)

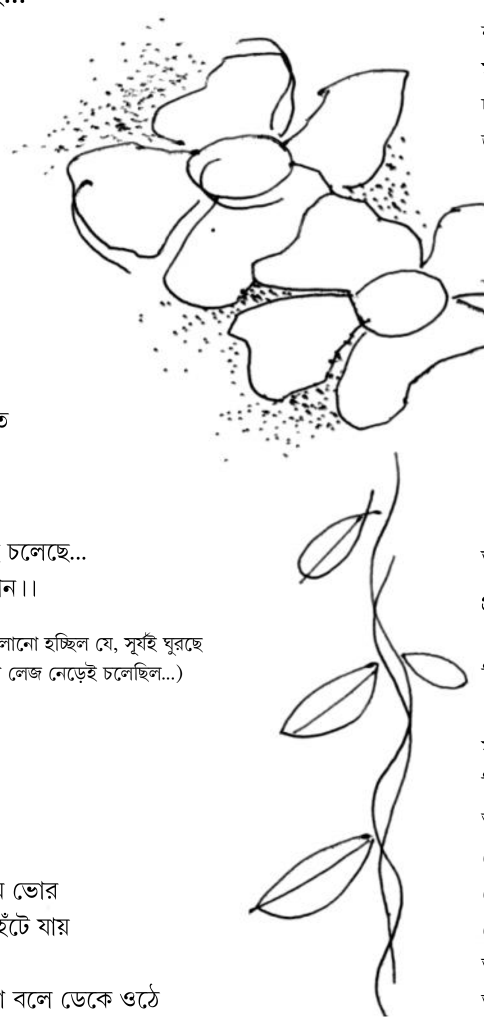

স্বপ্নমৃত্যুর আখ্যান
অনন্য ভট্টাচার্য

মৃত্যুস্বপ্নে জেগে ওঠে প্রথম ভোর
ধ্বস্ত জমির কিনারা ধরে হেঁটে যায়
দ্রুতগামী অশ্বের দল
তাদের অস্ফুট হ্রেষাধ্বনি মা বলে ডেকে ওঠে
পক্ষাঘাতে নিথর হৃদয় প্রাণ পায়

জীবন কাবার
পান্নালাল মল্লিক

প্রতিদিন দুঃখের পাশাপাশি বাস করেও
মুখে রা নেই... মনে দুঃখবোধ নেই...
কাগজের পাতায় প্রণাম এবং শুভেচ্ছা বিনিময়,
প্রতিবেশী পিঠে হাত রেখে বল দেন—
দেখা হলেই বলেন : ভরসা রাখো,
পথ না পেলে বিপথে যেও না।
নোনা জলের এই দেশে
পেটের সঙ্গে লড়াই করে
বাদার অভিশাপ ভুলে যায় মানুষ,
বয়েস হলেই বাড়ন্ত বিস্ময়
মুঠি ভরে শূন্যে উড়িয়ে দেয়
একমুঠো ছাই।
বাসি শালপাতা চেটে দশ বছরের বালক
চায়ের বাসন মাজতে মাজতে শিশুবর্ষের
বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখে—
বুড়ো বাপের মতো শ্বাসকষ্টে ভোগে।
শ্মশানে ধূপের গন্ধে বিভোর—
মনে মনে খই ওড়ে, পড়ন্তবেলায়
দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ফুলের বাস নিতেই
জীবন কাবার হয়ে যায়।

তথ্যচিত্র
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

নির্জনতম বিষণ্ণতাগুলো হেঁটে বেড়ায়
কফি হাউসের চিৎকারে
যদিও এই জীবনের কোনো দায় ছিল না
নির্জনতাগুলি ঝরে পড়ছিল বিষণ্ণ নিঃশ্বাসে
অমরত্বের জন্য আক্ষেপ করিনি কোনো দিন
যেভাবে শুরু হয়েছিল আমার জীবন
ছেঁড়া চাদরে ঢাকা সেইসব অমলিন ভোর
নোংরা-জমা জ্যোৎস্নায় আমার গন্তব্যহীন চলাফেরা
তথ্যচিত্রের মতো সাজানো গোলাপ বারান্দা
ভালোবাসা আর ব্যভিচার আলাদা করতে চেয়ে
শেষ পর্যন্ত তোমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই ছিল।

পুরাতন ক্যানভাস
দিশা চট্টোপাধ্যায়

ভবিষ্যতের ডাকঘরে কোনোদিন
কোনো চিঠি পৌঁছায়নি আজও...
যদি মনে পড়ে
সেই দুঃস্বপ্নের রাত
যদি মনে পড়ে
সেই মৃত্যুর পাতাল যাত্রার কথা
প্রাচীন গ্রন্থি থেকে জন্মানো সবুজেরা
ভিজে আছে শিশিরে
সময়ের আয়নায় অচ্ছ্যুৎ রোদ্দুর দেখে
পিছুটান না রেখে
হেঁটে গেছ একা—
সরীসৃপেরা হলুদ পাতায় আশ্রয় খোঁজে
বিশ্বাস কর
আমার ভুলে যাওয়া ছাড়া
আর কোনো উপায় নেই
তুমি চলে যাওয়ার পর
পুরাতন ক্যানভাস অপেক্ষায় ছিল বহুদিন
চেতনার সাতরঙ আজ অদৃশ্য
চূড়ান্ত অস্বীকার করা ছাড়া
তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

পথ
সুভাষচন্দ্র ঘোষ

এ পথ কেমন যা আমাদের বিভাজিত করে
এটা কোন পথ যে পথ ধরে আমি
চিন্তার হাত বাড়াই
প্রতিটি আঙুলের ডগায় একটি করে ফুল
আঁকা হয়
পথের শেষ প্রান্তে এসে সেই ফুল
যে আমার পাশে হেঁটে ফেরে!

ডুব
বিতস্তা ঘোষাল

পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ
বন্ধ সব দরজা জানালা
শুধুই তমসাচ্ছন্ন এক মেঘ—
তার মাঝেই উঁকি মারে তোমার চোখ;
গভীর সমুদ্রের মতো
অনন্ত প্রসার—
নীল খালি নীল
চৈতন্য হতে
আমি ডুবি, কেবলি ডুবে যাই।

মুসাফির
সোমনাথ বেনিয়া

এই আসমুদ্র হিমাচলে ভিন্ন জ্যামিতিক অবয়বে
প্রাণবন্ত হয়ে আছে প্রকৃতি
কখনো সজল... সবুজে
শুষ্ক... ধূসরে
কিংবা কঠিন শীতল বরফে, যে দুর্নিবার আহ্বান রাখে,
তার কাছে ভ্রমণপিপাসু মন,
উচ্ছল ঝরনার মতো অবাধ পতনে দিশেহারা
উদাসী সন্ন্যাসীর মতো স্রোতস্বিনী...
তখন দিকচক্রবালে নৈসর্গিক চিত্রপট
অপার মুগ্ধতায় ধ্যানমগ্ন সারস,
যার মুখমণ্ডলে আনন্দলোকের গাঢ় হাতছানিতে
কোনো ভবঘুরের আলেখ্য,
ছায়াপথের বিস্তার নিয়ে সতত সজাগ...
এই আলেখ্যর বর্ণপরিচয় একটি যাত্রাপথের কথা বলে
যেখানে যতিচিহ্নের মতো পড়ে থাকে আমাদের—
চোখের দৃশ্য
আন্তরিক কথোপকথন
হাতধরার গল্প
উৎসবের মেজাজ
এখন এই সব অনুষঙ্গের ক্রোড়পত্র মুখস্থ করে,
কেউ যদি চৌকাঠ পেরিয়ে যায়, কারণে-অকারণে
তাকে দোষ দিও না
আসলে আমরা প্রত্যেকেই মুসাফির,
প্রকৃতির সহজাত সমীকরণে...

এই হাতে এই করপুটে
কালিদাস ভদ্র

এই হাতে এই করপুটে
ঝলমল যে কলম
আলো দেয় কালো টুটে
আবার বল্লম
যে হৃদয় ফুঁড়ে
হৃদয় দেখায়।

করপুটে কলম রয়েছে যার
নীলকণ্ঠ জ্বালা তার
সমস্ত শরীর জুড়ে
ব্যথা, বাতাস নাচায়।

এই হাতে এই করপুটে
কলম ছড়ায় ভোর ফুটফুটে।

ভুলে থাকতে হয়

জমর সাহানী

কিছু সত্য নিত্য
জীবনের প্রয়োজনেই ভুলে থাকতে হয়

যেমন—
ভালোবাসার অনেক জ্বালা
জ্বালা-যন্ত্রণার কথা শুধু
মনে রাখলেই
কাউ-কে ভালোবাসা-টাই দায়

কালের নিয়মে সকলেই অথর্ব হবে একদিন
অথর্ব হওয়া-র কথা শুধু
মনে রাখলেই
দুরন্ত বেগে ছুটোছুটি লাফালাফি
করা-টাই দায়

'জন্মিলে মরিতে হবে'
শুধু মৃত্যু-যন্ত্রণার কথা
মনে রাখলেই
বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে
বঞ্চিত হতে হয়। তাই

জীবনের প্রয়োজনেই
কিছু সত্য ভুলে থাকতে হয়।

কানন কাঞ্চন

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

দেখেছ বাগানের সরল তরুলতা
গেঁথেছ প্রশাখার প্রসূতি ফুল—
তোমার দুটি হাতে অমল সাজিটিতে
কেমনে তুলে আনো ঝরা বকুল

রিক্ত বেদনার করুণ জপমালা
ফুঁপিয়ে যেন ওঠে রাতদুপুরই
বাগানে, জঙ্গলে, কাননে কাঞ্চনে
আপাত যাই ভাবো উপর্যুপরি

নিবিড় ফুটে থাকা মহতী কোল জুড়ে
বহতা, মুগ্ধতা যা কিছু থাক
এমন নীরবতা কথার আবডালে
কুসুম সন্ততির প্রাণ জুড়াক

আত্মীয় অনাত্মীয় ওইসব হাজার মাইল

তাপস রায়

এই যে সূর্য এসে গাছ ও মাটিতে ডুবে যাচ্ছে
রাত্রি রাত্রি সঙ্গীতের আগে ফিরছে না
তোমার চিন্তা হবে না! ভেতরে উসখুস জমে উঠবে না ভাবো

ধরো তোমার পিঠ থেকে কলজের ভেতর
ঢুকে আসতে চাইছে বালি মাফিয়াদের রচিত একমাত্র দানাটি
ইঁদারায় দড়ি নেমে যাচ্ছে, জল উঠছে না
তোমার বান্ধবী দৈবের বশে আনবাড়ি থেকে সেলফি পাঠাচ্ছে
—তোমার তো অনাত্মীয় নয় এইসব ভঙ্গি, দেখো বিভ্রান্ত হতেও পারছো না

শুধু শেকল ছাড়াতে ছাড়াতে ওই মগ্ন হেঁটে যাওয়ায়
দেখতে চাইছ না তোমার পায়ের কাছ থেকে পথও ফিরে যাচ্ছে রোজ
একদিন ভোরবেলা এসে তোমাকে গন্তব্যহীন করে দেবে

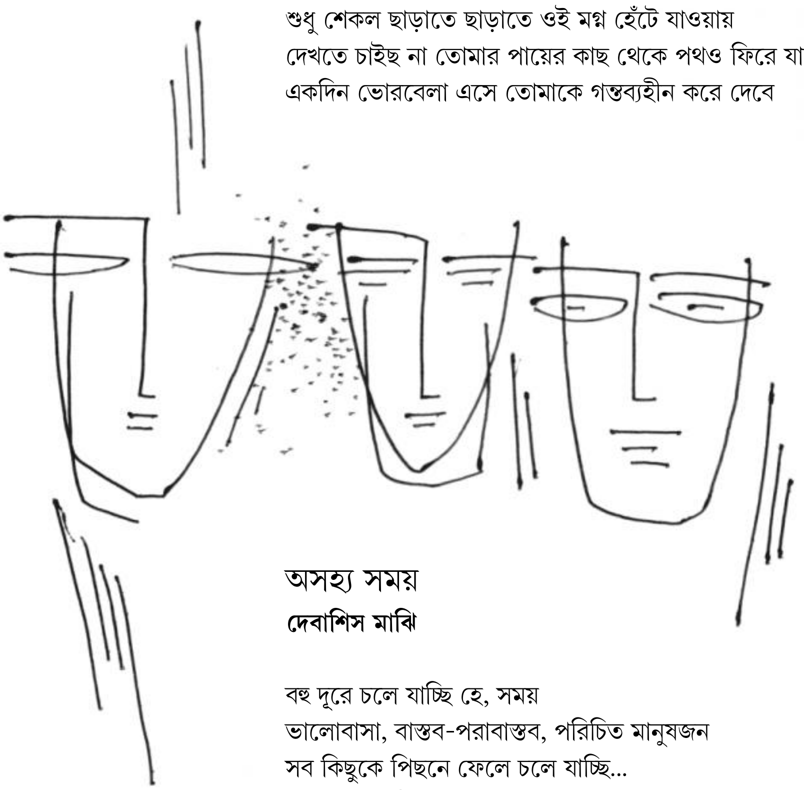

অসহ্য সময়

দেবাশিস মাঝি

বহু দূরে চলে যাচ্ছি হে, সময়
ভালোবাসা, বাস্তব-পরাবাস্তব, পরিচিত মানুষজন
সব কিছুকে পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছি...
          এতদিনের ঋজুটান, খান্ খান্ করে

জাতপাত, মাথার দিব্যি দিয়ে
মাথা ঘামায়, মোড়ে মোড়ে কু-প্রস্তাব বিছিয়ে রাখে
কলকাঠি নাড়াতে সাংঘাতিক ব্যস্ত
পটুত্বের অধিকারী কেউ কেউ
মেরুদণ্ডের গায়ে কলঙ্ক ছিটিয়ে আসাড়ভাব, বিনিময়ে ব্যস্ত
এ সবের মধ্যেও আমরা অভ্যাসের দাস...

কাঁটায় বিক্ষত রক্ত ঝরিয়ে গন্তব্যে এগিয়ে যাই
বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাথায় ঠোক্কর মেরে
ফালাকাটা রাত্রি শেষে, ভোর উঁকি মারে
পাখপাখালিরা জাগে   তবু অবিবেচক মানুষ জাগে না!

যাপন সবুজ
প্রণবকুমার পাল

চোখের ভেতর স্রোত ঝড় জল রোদ্দুর
প্রেম নির্ভীক নিবিড় উচ্চারণে
মায়া ও মমতা গোপন থাকে না
দুটি মুখ প্রজাপতি ফুল

অনুভব সম্মোহন প্রিয় জন্মদিনে
সুখী চোখ রঙিন বাসর
সময় সোনালি স্বপ্ন ও স্মৃতি
ডানা মেলে প্রতিদিন বিশ্বাসে স্বচ্ছ

অধিকার স্পর্শ করে গানের এসরাজ
মঙ্গল শরীরে শরীরে আলপনা আঁকে
কোনো লুকোচুরি নেই সহজ কথায়
সবুজ পাতায় ভরা যাপন উৎসব

হৃদয় গভীরে খেলা করে আকুলি সৃষ্টি
নিজস্ব বোধে উজ্জ্বল চলাচল ছন্দ
প্রশ্ন নির্লিপ্ত পাশ ফিরে চুপ
পরম নির্ভয়ে হেসে ওঠে জীবন আমার।

আজও বাঁজি
মৌসুমী মুখার্জী

থমকে গেলেও আমরা আছি
বুকের মধ্যে আজও ফোটে
রক্তগুলো, তেমনি বাঁচি।

আজও তেমন স্বপ্নগুলো
দানা বাঁধে কালবোশেখী
উঠবে কি ঝড় এলোমেলো?

উড়িয়ে দেবে মিথ্যাভাষণ,
স্তাবকতার গা জ্বলুনি
বুদ্ধি বেচে শোষণ শাসন?

আজও হাঁটে পথিক যত
দিন বদলের স্বপ্ন নিয়ে,
আমিও যে তাদের মতো!

সবার জন্য দু-বেলা ভাত
নিশ্চিত হোক গেরস্থালি
প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত।

এই পৃথিবীর ধুলো-মাটি
সবার জন্য সমানভাবে—
এটাই হল কথা খাঁটি।

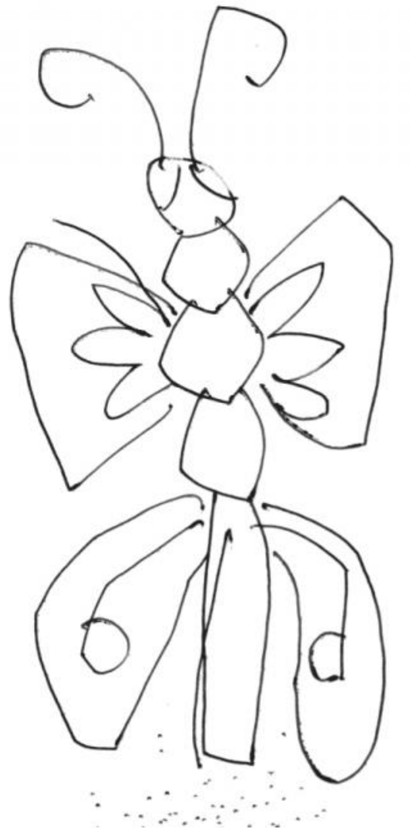

রেখাচিত্র
বিমলেন্দু দাস

সাদা কাগজে কলমের আঁচড়ে
বর্ণমালার রেখাচিত্র এঁকে
মনের কথা সবাইকে
জানানোর অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

জানি কলমে চাই মেঘমালার গতি
চলাচলের সুদূর বিস্তার।
বাস্তব বড়ই কঠোর
শুধু ছেঁড়া ফাটা ভাবের বিকার
মাকড়সার জাল অস্পষ্ট আঁকিবুঁকি।

এক ফোঁটা কালি নেই কলমে
রেখাচিত্র এলোমেলো
কালের দংশনে।

নৈশভোজ
রীণা কুণ্ডু

চেটে চেটে খেয়ে ঢেকুর তোলে
হুইস্কি, বিয়ার, রাম, ভদকা
চাট ডেন্ট-রাইড নয়
জীবন্ত একটা শরীর।
আটজন মানুষের পাতে
পরিতৃপ্ত ভোজের পর
গোড়ালি দিয়ে থেতলে যায়।
পথচারী বিপদ বুঝে পালায়
পরদিন টাটকা খবর।
ট্রাম লাইনে বেওয়ারিশ লাশ।
ভবঘুরে এক বৃদ্ধ চিৎকার করে বলে
লাইন পেরিয়ে মেয়েটা রোজ যেত
কাল রাতে চেটে চেটে খেয়েছে
চাইটা খাউরির দল।
হঠাৎ বুড়োর চোয়ালে পড়ে ঘুষি
দাঁত চেপে বলল কেউ
বুড়ো ভিমরতি হয়েছে, তোর পালা।

কালপুরুষ
শম্ভু ঘোষ

কালপুরুষ প্রত্যক্ষ হয়
অন্ধকার রাত্রে মধ্য আকাশে,
মহাপুরুষ দেখি আট ঘটিকায়
সংবাদ চ্যানেলের প্রকাশে।
আবছা আলোয় ভেসে ওঠে
দেবদূতের এক মূর্তি
বিস্ময়ে অবাক হই দুচোখে
অন্তরে জেগে ওঠে স্ফূর্তি।
ভাষণ, বিশ্লেষণের বিশ্লেষণ
বর্ষিত হয় আশ্বাস বাণী
দোদুল্যমান আশা দুরাশা
প্রত্যক্ষ করি আমরা অবোধ প্রাণী।
কখনও তিরস্কৃত রাষ্ট্রনেতা
রাজনীতিক নেতা-নেত্রীগণ,
কখনও অভিনেতা অভিনেত্রী
সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী অভাজন।
ব্যঞ্জনা, বাম-ডান জোট হবে
সন্ত্রাস মুক্ত হবে বঙ্গ।
নির্বাচনী রঙ্গ মঞ্চ হতে
যুযুধান রণে দিল ভঙ্গ।

আগামীর স্বপ্নে
মৃণালকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবণ ধারা ঢুকলো অবাধে—
ছাউনির ফুটো দিয়ে, ভাঙল মাটির কুঁড়ে।
তারপর—
হা-পিত্যেশ অপেক্ষা খাবারের প্রত্যাশায়।
লক্ষ-কোটি মানুষেরা আশা আর নিরাশায়
জীবন-মৃত্যুর মাঝে দোলায়িত—
প্রতিটি বছর বয়ে চলে—এভাবেই।
সারদা-নারদা-দানে মহৎ আনন্দে মত্ত
নিশ্চিন্ত যে প্রাণ
শ্রাবণ ধারার মাঝে আনন্দের কলতানে মজে!
ওদের না আছে কোনো দায়, না দায়িত্ব!
একই এ মাটির যত সংখ্যাহীন প্রাণে
বৈপরীত্য ক্রমে বেড়ে চলে,—প্রতিটি মুহূর্তে!
ক্ষুধার্তের দুটি চোখে স্বপ্নভরা ছবি—
বুকভরা আশা—
একদিন এ শ্রাবণ সর্বগ্রাসী বন্যার ধারায়
সব একাকার করে চেতনার নবজন্ম দেবে
মানবতা-মনুষ্যত্বের নতুন গৌরবে!

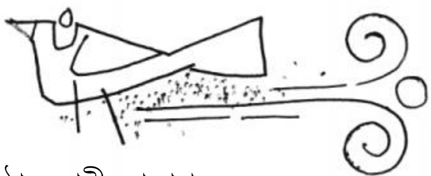

একমুঠো কুমারী আকাশ
নির্মল নিয়োগী

মুঠি আশ্রিত কঠিন বাতাস আমার
যেদিন হবে বিদ্রোহী
গর্জিত হবে প্রলয়ের বাণী—
ছিন্ন করে প্রেমের অনুশাসন
ধ্বংস হবে বিশ্বভুবন
কঠিনতর বজ্র হানি

সৃষ্টির আরাধানা সৃজন করেছে
পূজাবেদী করেছে বরণ
নারীর শিরোপা নারীত্বের সাজে
জীবন শিয়রে জীবের সম্মোহন

আমার একমুঠো কুমারী আকাশ
পৃথিবী ধারণ করেছে সাবলীল জঠরে
... নয় সে মানব করুণা সিক্ত
আপন সঞ্জাত রুধির বেষ্টিত
এক মহান আত্মা—সে পরমাত্মা
গর্ববাহী নারীত্ব আমার হবে না রিক্ত।

দেওয়াল লিখন
অমল কর

গুণ্ডার উৎসবে ভোটের প্রহসনে সন্ত্রাস উড়িয়ে
বিজয় রথের চাকায় দিয়েছ মনুষ্যত্ব গুঁড়িয়ে
বসে আছো জাঁকিয়ে মদগর্বে সদর্পে রাজ্যশিরে
কর্মহীন সর্বহীন গরিব-গুর্বোরা রয়েছে যে-তিমিরে সে তিমিরে
চারিদিকে হইহই বেমক্কা চিটফান্ড ফেটে গেলে
শিরা ফুলিয়ে তোলাবাজ-লুটেরা-লাফাঙ্গারা হাঁটে মিছিলে
ত্রিফলা আর নীল-সাদা আলোর বিভীষিকায় গ্রাম জুড়ে
দুর্নীতির দুর্গন্ধে জোনাকিরা ভুতুড়ে আর্তনাদে ওড়ে
ছলেবলে ভয়ের জঙ্গলে বকধর্মে শকুনের চোখরাঙানি
এখন ক্রমশ অসহায় ধর্ষিতার কাতরানি-গোঙানি
কেঁদে ওটা হাওয়ায় মামলায় হামলায় গণতন্ত্র বন্দি কারাগারে
শিক্ষাকে অস্থির স্থবির করে চারপাশে দেওয়াল দিয়েছ ঘিরে
সুলভে ইজ্জত মজ্জা মগজ মেধা মনন বিকিকিনি
গরম লাভার ওপর হাঁটা—বঙ্গসংস্কৃতি আগে দেখেনি
ঘৃণ্য রাজ-অন্নে পালিত বন্ধ্যা-কবিকে পথকুকুরেও হেই দেয়
প্ররোচনার ভিন্নতর দর্পণে তোমার ভৈরববাহিনী মুক্তচিন্তা কেড়ে নেয়

ইতিহাসে হেঁটে দেওয়াল লিখন পড়ো ফের একবার—
কত কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে গেছে বারবার
কত দর্প কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হয়েছে ধূলায়
কত লোক-বিশ্রুত যশ-খ্যাতি ফুৎকারে উড়েছে হেলায়
কুবেরের কত রত্নভাণ্ডার ভাস্কর্যের কত গথিক-খিলান ভগ্নস্তূপের বিভীষিকায়
কালের অমোঘ নিয়মে অকালেই বিলুপ্ত বিনষ্ট হয়ে যায়

অতি দর্পে হত লঙ্কা শঙ্কার ডঙ্কা বেজে বেজে যাচ্ছে বাতাসে
তোমার মিথ্যের টংকার-ঝংকার শুনে, চেয়ে দ্যাখো, ঘোড়াও হাসে।

বিষাদ দুপুর
মিনতি গোস্বামী

কী অপার বৈধতায়
মাঠঘাট পুড়ছে রোদে
বুকের গভীরে জমছে ব্যথা
চোখ তবু জ্বলেনি ক্রোধে।

জমা ব্যথারা জানি না
কোন মুগ্ধতায় কবিতা হয়
বিদ্রোহের পথে হাঁটেনা তারা
শুধুই কি শাসকের ভয়?

মেঘের জন্য অগাধ প্রেম
ঠোঁটে তো তার টইটুম্বুর
শঙ্খচিল মেপে যায়
ছায়াহীন বিষাদ দুপুর।

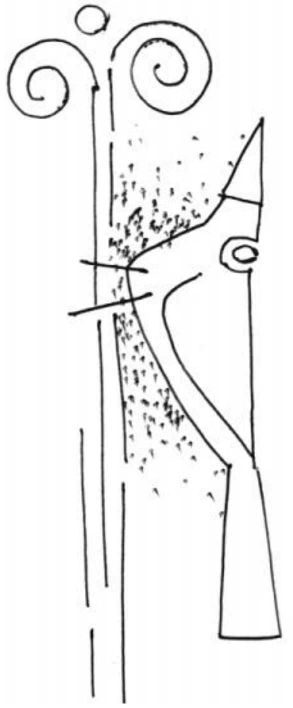

রঙ

মণি মুখোপাধ্যায়

ভয়ানক এক সমস্যায় পড়ে গেছেন শিল্পী বিনোদ সামন্ত। কী করে তিনি এরকম ছবি আঁকবেন! তিনি যে একজন বহুখ্যাত শিল্পী তা নয়। তবে এখনকার তরুণ শিল্পীদের মধ্যে তিনি বেশ সমাদৃত। তার কাজ ক্রমান্বয়ে আদৃত হচ্ছে শিল্পী মহলে। শিল্প সমালোচনাতেও তিনি জায়গা করে নিচ্ছেন সম্মানজনক ভাবেই।

কাজের বরাত দিয়েছেন সরকারি দলের প্রধান। তিনি নিজেও শিল্পী। ইচ্ছে করলে নিজেই আঁকতে পারতেন। কিন্তু সময়ের অভাব। বঙ্গ থেকে কঙ্গো সর্বত্রই তাঁকে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে।

ছবির বিষয়বস্তু তিনি নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। দীর্ঘ পঁচিশ ফুট বাই আট ফুটের ক্যানভাস জুড়ে নীল আকাশের পটভূমিকায় সূর্য উঠছে। একপাশে তার উত্তোলিত বাহু আর হাস্যময় মুখের পোর্ট্রেট। স্থায়ীত্বের কথা মাথায় রেখে তেলরঙে আঁকতে হবে ছবিটা। পারিশ্রমিক আশাতীত রকমের ভালো। ছবি এঁকে যে এত টাকা পাওয়া যায় তা ভাবতেও পারেননি তিনি। পৃথিবীখ্যাত শিল্পীদের কথা আলাদা। তাদের ছবি কোটি কোটি টাকাতেও বিক্রি হয়। আর তিনি তো এখনও বঙ্গখ্যাতই হতে পারেননি। তার কাছে টাকার অঙ্কটা বিশালই বটে।

কিন্তু তার কাছে সমস্যাটা ভয়ানক জটিল। নীল আর সাদা রঙ ছাড়া অন্য কোনো রঙ ব্যবহার করা যাবে না। লাল রঙ তো নৈব নৈব চ। ওই রঙটা তার অসহ্য মনে হয়।

এইখানেই বিনোদ সামন্তর সমস্যার ভয়ানক সূত্রপাত। কোনো শিল্পীর কাছে কোনো রঙই অচ্ছুত নয়। বিষয়বস্তু, প্রেক্ষিত, মুড এবং কল্পনার মিশ্রণ ঘটিয়ে শিল্পী রঙ নির্বাচন করেন। তাছাড়া সদ্য উদিত সূর্যকে তিনি লালরঙ ব্যতিরেকে ধরবেন কী করে!

বিপত্তিটা ভয়ানক। তাদের বংশে কেউ কখনো ছবি এঁকেছে বলে তিনি শোনেননি। তাদের পরিবার বংশানুক্রমিক ভাবে চাষি। তারা ধান ফলায়, নানাবিধ সবজির ফলন হয়। যদিও বিনোদ মনে করে, চাষি মাত্রই শিল্পী। এমন জীবন্ত সৃজন মহৎ শিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু কোথা থেকে যে চিত্রকরের এই ভূতটি তার ঘাড়ে চেপে বসেছে, তা কে জানে।

সেও তো পারত পটল-মুলো-ঝিঙে-কুমড়োর মতো জীবন্ত শিল্প সৃষ্টি করতে। তা হলে আজকের এই বিপদে পড়তে হত না তাকে। অনেক ভেবেছে কিন্তু কিনারা করতে পারেনি।

বন্ধুদের আড্ডায় জিজ্ঞেস করেছে, তোরা বলতে পারিস্, ভোরের সূর্য উঠছে এই দৃশ্যটা লাল রঙ ছাড়া কীভাবে আঁকা যায়?

বন্ধুরা জানে, বিনোদ হালকা রসিকতা করার ছেলে নয়। সে ধীর স্থির এবং স্বল্পবাক।

বন্ধুরা পরস্পরের দিকে তাকায়। একটু ফাজিল প্রকৃতির বিজন হেসে বলে, যাবে না কেন? তুই ক্যানভাসের অর্ধেকটা কালো রঙে ঢেকে দে। তলায় লিখে দিবি মেঘে ঢাকা সূর্যোদয়। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢেকে তারা' দেখিসনি? সেই রকম আর কি!

বন্ধুরা রসিকতা করতে পারে। কিন্তু বিনোদের অবস্থা শোচনীয়। রঙের এইরকম শর্ত সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। তাকে সেরকম করে বলাও হয়নি। কয়েকদিন পর জেলা পরিষদের সভাপতির কাছ থেকে বিশদে জানতে পেরেছেন। অনেক ভেবে চিন্তে কোনো কূল না পেয়ে, জেলা সভাপতির সঙ্গে দেখা করলেন বিনোদ সামন্ত। বিনীতভাবে বললেন, একটা দরকারি কথা ছিল, স্যার।

—বলুন।

—লাল রঙ্ বাদ দিয়ে ভোরের সূর্য আঁকব কী করে?

—সেটা আপনাদের শিল্পীদের ব্যাপার।

—দয়া করে আপনি একটু ওনাকে বুঝিয়ে বলুন না, সেটা হয় না। লাল রঙ্টা চাই-ই।

আঁত্কে উঠলেন সভাপতি।—আপনি ক্ষেপেছেন, এসব কথা আমি বলতে যাব ওনাকে! আপনিই যা হোক করে দাঁড় করান।

কিন্তু যা দাঁড়াবার নয়, তাকে কীভাবে দাঁড় করাবেন বিনোদ সামন্ত। কাগজে অনেক রকম মকশো করলেন বিনোদ। মেঘের ধূসর টাচ্ দিয়ে লালটা অনেক ফিকে করলেন। কিন্তু উদিত সূর্যের পশ্চাৎপটে তো লাল আভা থাকতেই হবে। সাত ভোরে উঠে মাঠে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখলেন।

না, কোনোভাবেই লাল রঙটা বাদ দেওয়া যাচ্ছে না।

একটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ফর্ম বিনোদ সামন্ত দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নয়। বড় বড় সভায় এই ব্যানারটা ব্যবহৃত হবে মঞ্চের পশ্চাৎপট হিসেবে। ব্যাপারটা এক নজরে বুঝে ফেলার মতো করেই করতে হবে।

বিনোদ সামন্ত ভালো করেই জানেন, সরকারি প্রধানের মতামতের ওপর কেউ কোনো কথা বলতে পারেন না। যে-কোনো বিষয়ে পারদর্শিতার আত্মবিশ্বাস তাঁর প্রখরতম।

বিনোদের বাক্যহীন চিন্তিত মুখ দেখে তার মা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করেন, সারা দিন অত কী ভাবিস্, বল তো?

—ছবি আঁকা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। সংক্ষিপ্ত জবাব বিনোদের।

সহজ সরল মায়ের সটান বক্তব্য, যা মনে আসে তাই আঁকবি। অত ভাবার কী আছে!

একটু ম্লান হেসে চুপ করে গেল বিনোদ। মা তো আর জানে না, সংকটের কী বিষম প্যাঁচে সে পড়েছে।

তখনই হঠাৎ মনে পড়ল শঙ্খশুভ্র রায়ের কথা। তিনি বিনোদের শিল্পগুরু, শিল্প চৈতন্যের গুরু। জীবনে কখনো কেনো আপস করেননি। করলে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন কাটাতে পারতেন। হুগলির এক প্রত্যন্ত গ্রামে প্রায় আশ্রমিকের জীবন যাপন করেন। গ্রামাঞ্চল থেকে খুঁজে আনেন সদ্য আঁকতে শেখা ছেলেমেয়ে। তিনি মনে করেন, প্রকৃত ভারতীয় ঘরানার কোনো স্ফুলিং গড়ে উঠল না। যামিনী রায় ছাড়া আর কাউকে বড় একটা রেয়াৎ করেন না। এমনকি রবি ঠাকুরকেও নয়।

শঙ্খশুভ্র স্যারের আশ্রম যেমন জীর্ণ হয়েছে, স্যারের নিজেরও তাই। দেখে খুব কষ্ট হল বিনোদের।

অপরাধীর মতো মুখ করে বিনোদ সামন্ত বলেন, আজকাল তো বিশেষ আসতে পারি না, নানা ঝামেলায়।

—তবু তো তুমি আসো। বাদবাকিরা তো পুরোনো ছেঁড়া মলাটের মতো আমাকে ত্যাগ করেছে।

অনেকগুলি ছেলেমেয়ে এদিক ওদিক নানা কাজে ব্যস্ত। মৃদু গলায় বিনোদ জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন স্যার?

—ভালো—খুব ভালো।

ম্লান হাসলেন বিনোদ, কী রকম ভালো আছেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—দ্যাখো বিনোদ, অন্য আর পাঁচটা বিষয়ের মতো ভালো থাকাটাও রিলেটিভ। কেউ নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে ভালো থাকে, কেউ হয় তো কষ্টের মধ্যেও সেটা আঁকড়ে ভালো থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বিনোদ তার আসার কারণটা সবিস্তারে জানান। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন শঙ্খশুভ্র স্যার। শান্ত গলায় বললেন, দ্যাখো বিনোদ, তুমি যদি তেলরঙে ছবি আঁকতে চাও, তবে অনেক খরচ। রঙের দাম বেড়েছে হু হু করে। আর তেলরঙে না আঁকলে তোমার ছবি কেউ কিনবেও না। যে টাকাটা পাবে, কিছু ভালো কাজ করার সুযোগ তো আসবে।

—কিন্তু রঙের ব্যাপারটা?

—ওটা ন্যাচারালিস্টিকই রাখো। লাল রঙ ছাড়া সূর্যোদয় ধরা যায় না। এটা যদি না বোঝে কিছু করার নেই।

—স্যার, জটিলতার জায়গাটা তো অন্যত্র।

—আমি জানি। —বাঁকা হাসলেন শঙ্খশুভ্র রায়। দৃঢ় গলায় কেটে কেটে বললেন, দ্যাখো বিনোদ, সমাজ এবং মানুষকে মন্থন করেই একজন শিল্পীকে তার কাজ করতে হয়। বিষ অমৃত দুটোই উঠে আসে। বিষটুকু নিজের জন্য রেখে প্রকৃত শিল্পী মানুষকে অমৃতই দেয়। পৃথিবীর মাস্টারপিস্ শিল্পীদের দিকে তাকিয়ে দেখ না। দু-একজনকে বাদ দিলে সকলেই তো দধীচি।

সেদিন স্যারের পর্ণকুটিরে অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসেছিলেন বিনোদ সামন্ত।

সাতদিন অবিরাম পরিশ্রম করে বিশ ফুট বাই আট ফুটের ব্যানারটাতে সূর্যোদয় ঘটিয়ে ফেললেন। শিল্পকল্পনার কোনো ছোঁয়া নেই। সৃজনের কোনো নতুন মাত্রা নেই। দেখা দৃশ্যের প্রতিরূপ। প্রতিকৃতিও আঁকলেন হুবহু। উদ্যত বাহু তেজস্বিতায় উজ্জ্বল।

সযত্ন প্যাকিং করে জেলা সভাপতির হাতে পৌঁছে দিলেন বিনোদ সামন্ত। সভাপতি গাম্ভীর্য বজায় রেখে বললেন, সব ঠিক আছে তো?

—একদম। যেমনটি আপনারা চেয়েছেন।

—আপনার অ্যাকাউন্টের নম্বরটা দিয়ে যান। ঠিক সময়ে জমা পড়ে যাবে।

কয়েক দিনের ক্লান্তির পর দুপুরে খেয়ে দেয়ে একটা লম্বা ঘুম দিলেন বিনোদ সামন্ত।

ঘুম ভাঙতেই আতঙ্কিত দ্বিধায় তিনি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তার মন বলছে ফলাফল ভালো হবে না। অন্যমনস্ক হবার জন্য কয়েকটা পেনসিল স্কেচ আঁকার চেষ্টা করলেন। কিছুই দাঁড়ালো না।

দুশ্চিন্তার কালো মেঘে তার মন ছেয়ে আছে। কাজটা না নিলেই ভালো করতেন। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে আনন্দময় যন্ত্রণা আছে। কিন্তু এ তো শুধুই যন্ত্রণা। কিছুই ভালো লাগছে না বিনোদের।

দিনে দিনে দেশটা কী রকম যেন অমানবিক হয়ে উঠছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে চৈতন্য। আলো অন্ধকারের ফারাকটা মুছে

গিয়ে ক্রমাগত যেন অন্ধকারই গ্রাস করছে সব কিছু। শঙ্খশুভ্র স্যার তার মধ্যে নীতিবোধের যে বীজ বপন করে দিয়েছেন, তা আজ তার রক্তে রক্তে রণিত। নিজের কাছ থেকে নিজের পলায়ন তো সম্ভব নয়।

মনকে দৃঢ় করার চেষ্টা করলেন বিনোদ সামন্ত। তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা। তার শিরদাঁড়া তো টানটান থাকতেই হবে। তিনি সত্যের কাছে, মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। তার সৃষ্টির রাজ্যে তিনিই ঈশ্বর।

চার দিনের মাথায় জেলা পরিষদ থেকে পিওন এসে জানালো, পিসিডেন ডেকেছেন। আজই যেতে হবে।

বাড়ির সবাইকে চিন্তাগ্রস্ত রেখে বিকেলে জেলা পরিষদের অফিসে গেলেন বিনোদ সামন্ত। তাকে দেখে সভাপতি গভীরতর গম্ভীর হবার চেষ্টা করলেন। তারপর বেশ থমথমে গলায় বললেন, আপনার ছবিটা বাতিল হয়েছে, মশাই। আপনার শিল্পীরা যে কী করেন! এক বললে আর এক করেন।

কোনো কথা বলল না বিনোদ। জানে, সেটা বৃথা হবে। সভাপতি আবার বললেন, বাতিল হলেও ওটা অফিসেই রাখা হয়েছে। পাঁচ জনের একটা কমিটি ঠিক করা হয়েছে। তারাই সিদ্ধান্ত নেবে।

একটা ব্যানার নিয়েও কমিটি। কাগজপত্র পড়ে এরকম গণনাতীত কমিটি তৈরির খবর জেনেছে বিনোদ। কিন্তু সে-সব বুদ্বুদের মতো চকিত দৃশ্যমান হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেছে, কেউ তা জানে না।

কোনো কথা না বলে বিনোদ ফিরে এল। উৎকণ্ঠিত গলায় বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কী হল রে বিনোদ?

—যা হবার তাই হয়েছে।

বিনোদের মুখের চেহারা দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না বাবা। নিজের ঘরে এসে হাসবেন না কাঁদবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না বিনোদ। আপাতত স্তব্ধতাই তার একমাত্র সান্ত্বনা।

গত দু-দিন ভালো বর্ষণ হয়েছে। এমনিতে বর্ষা এবার দেরি করে এলো। চিন্তিত ছিলেন বিনোদের বাবা। কিন্তু মাটি এখন কর্ষণযোগ্য হয়েছে। জনমজুরদের খবর দিতে হবে। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। অনেক বেলায় ফিরে এলেন শুকনো মুখে।

দাওয়ায় বসে কপাল চাপড়ে হাহাকার করে উঠলেন বিনোদের বাবা, সব্বোনাশ হয়ে গেল—সব্বোনাশ!

বাড়ির সবাই যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। প্রায় সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছেটা কী?

—এবার চাষআবাদ শিকেয় উঠল!

—কেন?

—জনমজুররা বলছে, এবার তোমার জমিনে কাজ করবো নি।

—কেন? আমি কি তোদের পাওনাগণ্ডা ফাঁকি দিয়েছি?

—সে কথা হচ্ছে না, মালিক। কথা হল যে—

থেমে যেতেই বিনোদের বাবা জানতে চাইল, থামলি কেন, বল্ কী কথা?

—তোমার জমিনে চাষে মানা আছে।

—কে মানা করেছে?

—পার্টির থে।

—কোন পার্টি?

—বলতে মানা আছে।

—অন্যায় মানা তোরা শুনবি কেন?

—বউ বাচ্চা নিয়ে সোমসার মালিক। এ বচ্ছর মোদের ডেকোনি।

শুনে বাড়িশুদ্ধ সবাই স্তব্ধ। তখনই ঘর থেকে উঠোনে নেমে এল বিনোদ। গলা উচিয়ে বলল, কাল থেকে আমাদের জমিতে লাঙল নামবে।

বিস্মিত বিনোদের বাবা জিজ্ঞেস করল, কে চষবে মাঠ?

—আমরা তিন ভাই আছি। তুমি আছো, কাকা আছে। আমাদের জমি এবার আমরাই চাষ করব।

বিস্মিত বাবা বললেন, তুই শিল্পী মানুষ। তুই চাষ করবি?

বিনোদ জবাব দিল, বাবা, চাষির চাইতে বড় শিল্পী কে আছে! ধানের ওরকম বর্ণ, বেগুন, টমেটোর রঙবাহার আঁকতে পারবে কোন শিল্পী? বাবা, জীবনযুদ্ধে নামতে গেলে তাকে তো পরিশ্রম আর ঘাম দিয়েই বুঝতে হবে।

তারপর একটু থেমে বলল, যেই যত বলুক, ভোরের সূর্য লাল থাকবে। চিরকাল।

একে একে সবাই নেমে এল উঠোনে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পূর্বস্থলী এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

সমিতি থেকে কৃষকদের কে.সি.সি. ঋণ, সার, কীটনাশক, ধানঝাড়া মেসিন সুলভে দেওয়া হয় এবং কে.ভি.পি., এন.এস.সি. ঋণ দেওয়া হয়।

অজিতকুমার গুহ *সভাপতি* | দুর্গাদাস গুহ *ম্যানেজার* | প্রশান্ত কুণ্ডু *সম্পাদক*

Sl. No. 14

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ পানাগড় বাজার, জেলা : বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩১৪৮
দূরভাষ : (০৩৪৩) ২৫২৪৩০৭

জনগণকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামোন্নয়নে, ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে চলেছে। জনগণের পরামর্শ এবং গঠনমূলক সমালোচনা পঞ্চায়েতের প্রাণশক্তি। পরিচ্ছন্নতা, সুস্বাস্থ্যের প্রাথমিক শর্ত। নিজ গৃহ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার রাখুন। নির্মল বাংলা গঠনে সহায়তা করুন।

মহঃ মুরশিদ আলি
উপপ্রধান

কাজল বাউরী
প্রধান

Sl. No. 23

এক ধাপ অনুন্নয়ন

তপোময় ঘোষ

ঘড়ির কাঁটায় এখন রাত্রি সাড়ে দশটা। আধঘণ্টা আগে রাত্রি দশটায় ঘণ্টা বেজেছে এই ঘড়িতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ-পরেশ-গৌতমরা চলে গেছে। আছে শুধু তিনজন। তিনজনের মধ্যে দু-জন তো বাইরে। এই বিশাল পার্টি অফিসের ঘরটায় একা ওই দু-জনের ফিরে আসার অপেক্ষায় বসে আছে সনাতন সরকার। তার এখানে এভাবে বসে থাকার দায়বদ্ধতা অন্যদের চেয়ে বেশি, কারণ সে-ই কানাই আর বকুকে ওই শত্রুঘরে পাঠিয়েছে।

শত্রুই তো! এখনও পর্যন্ত ভবা হালদার এদের শত্রুই। এই মাস দেড়েক আগের ভোটেও ওর গোটা ঝাড়-বংশ দারুণ বেগ দিয়েছে সোনা সরকারকে। তারপর এই ব্যাপক জয় ওকে একটু থমকেছে যেন। আর সময় নষ্ট না করে সনাতনরা ওর ডালপালা ধরে নাড়া দিয়ে দেখেছে, একটু টলে কি না! প্রথমে ওর ভাইপো রতনের সঙ্গে কথা বলেছিল বকু। বকুল চক্রবর্তী। এখন এ গাঁয়ের যুব সভাপতি।

কানাইকে সঙ্গে নিয়ে সে-ই আজ, সে-ই ভর সন্ধ্যায়, তখন আন্দাজ রাত্রি সাড়ে সাতটা হবে, গেছে ওই শত্রুঘর, ভবতোষ হালদারের বাড়ি। তিন ঘণ্টার ওপর হল, এখনও না ফেরায় চিন্তা হবে বৈ কি! হেরে গেলেও ওদের জোটারপোটার তো কম নাই! দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ আসে সোনা সরকারের। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায় আর দু-খানা ফ্যান বনবন্ করে ঘোরা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে ঘামে।

পরক্ষণে মনে সাহস সঞ্চয় করে ভাবে : নিজেদের রাজত্বে আবার ভয় কিসের? কী ক্ষমতা আছে ভবা হালদারের তার ছেলেদের ক্ষতি করে? ভারি হিম্মত ব্যাটাদের! এই তো ভোটে দেখা গেল! কিছু শক্তি হয়ত আছে ব্যাটার। কিন্তু সে সব প্রয়োগ করার সাহস এ সময়ে সে দেখাবে না।

আরো পনের মিনিট কাটলো। কানাইরা ফিরে এল না। কবি বোধহয় এ-জন্যই লিখেছেন—"...জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না...।" কিন্তু ওসব কি সোনা পড়েছে ছাই! না পড়েই এত উদ্বেগ। বেশি পড়াশোনা থাকলে কী হত! আরও বেশি সেনসেটিভ হলেই মুশকিল হত। এতেও কি কম হচ্ছে?

যত রাত বাড়ছে, এবার সত্যিই বুকটা তার দুরু দুরু করছে। যতই হোক পরের ছেলেকে পাঠিয়েছে একদম শত্রুর দুর্গে, বিরোধী নেতার বাড়িতে। আশঙ্কা তো থাকবেই। শত্রুকে বিশ্বাস আছে নাকি?

বিশ্বাসই যদি থাকবে, তাহলে সে শত্রু কেন! না, কোনো সন্দেহ সংশয় নেই যে, ভবা হালদার তার এক নম্বর শত্রু। ঘোষিত, অঘোষিত সব ধরনের শত্রু।

অ্যাই যাঃ, আপন মনে এসব কী ভাবছেন শাসকদলের অতবড় এলাকার নেতাটি? আর এক দু-দিন পরেই তো ওই শত্রুটি তার মিত্রতে পরিণত হবেন। সব ঠিকঠাক থাকল চলতি সপ্তাহেই তিনি যোগ দেবেন সোনা সরকারের দলে। সেসব কথা পাকা করতেই তো বকু আর কানাইকে ওই দুর্গে পাঠানো!

তবে কি রতন বকুলের সঙ্গে মজা করেছিল! বেইমানি? কথা খেলাপ? এ যুগে এই বাংলায় এখন এত সাহস? স্বর্ধা কম নয় তো ওই রতন ছোঁড়াটার! তেমন কিছু ঘটলে দেখাচ্ছি মজা! মজা মারার আর জায়গা পাও নি?

শত্রুর শেকড়-বাকড় কল্পনা করেন সোনাবাবু। ঝাড়-বংশ বড় বটে ভবতোষ হালদারের। তার জন্য মাটি কোপাতেও হয়েছে সোনাদেরকে। শেকড় আলগা করতে, ডানা ছাঁটতে হয়েছে বিস্তর। অনেক বিস্তৃত প্রেক্ষিতে বিছাতে হয়েছে জাল। প্রথমে লাগাতার ভয় দেখানো, পরে প্রলোভন।

বিজয়মিছিলের দিনেই বস্তাখানেক আবীর ওর দরজাতেই। অর্ধেক পটকাও আশপাশে। আর বাজনা যেন যুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া। শ্লোগানও তেমনি গলা ছেড়ে। ক-জন অত্যুৎসাহী তো তাকে গালাগালির পর্যায়ে নামিয়েছিল। না, কেউ সশরীরে আক্রমণ করেনি। বাড়ির দরজা ডিঙোয়নি। বরঞ্চ পরদিন এই সোনা সরকারের ছেলে মোহিত স্পেশাল খবর নিয়ে এসেছে। বলেছে, ছেলেরা কিছু করেনি তো? বাবা খবর নিতে পাঠালো। বুঝতেই তো পারছেন, আজকালকার ছেলে ছোকরা সব...

ওই সৌজন্য প্রদর্শন তো স্রেফ রাজনৈতিক ছিল। কিন্তু তাতেই ভবার দু-একজন বৌমা গলে জল। পরে খবর পেয়েছে, এই সৌজন্যের রাজনীতিতে নাকি বড় বেটার বৌটি অভিভূত! তবে কোনো এক পাকাটে নাতি যেন আজেবাজে বলেছে। মোহিত-এর নাম বিকৃত করে বলেছিল : 'বাঃ, মেয়ে-হিত, আমাদের বাড়িতে!!' তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কথাটার মানে সোনা জানে। তবুও...

কিন্তু... তবুও... যদি...

এসব চিন্তায় অধৈর্য সনাতন আবার ঘড়ি দেখলেন। গ্রীষ্মকাল হলেও রাত্রি এগারোটা, এই গ্রামাঞ্চলে একটু বেশিই বটে। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ক্রমশ আলো নিভছে। পার্টি অফিসের একা সোনা সরকারের প্রতি কারো ভ্রুক্ষেপ নেই। সবাই যে যার নিজের নিয়ে ব্যস্ত।

আর তাছাড়া এ পাড়াটা আদৌ সনাতনের পছন্দের নয়। এখানে পার্টি অফিস কোনোদিন বানাতে চায়নি ওর দল। কিন্তু অফিসটা তো সনাতনদের বানানো নয়। এখন সোনা সরকাররা দখল করেছে। পাড়ার লোকগুলো এই জবরদখল মেনে নিতে পারেনি। ভবাদের আমলে অফিসটা ছিল যেন পাড়ার লোকদের একটা নিজস্ব ঠেক। পাড়ার গরিবরা এখানে টিভি পর্যন্ত দেখতে আসত। এখন ওরা কেউ এমুখো হয় না।

আর সোনা সরকারের দলের ছেলেরা? তারা আসে যেদিন নেতা-মন্ত্রী-এম.এল.এ সাহেব আসেন, সেদিন ভিড়ে ভিড়াক্কার হয়ে যায় এই অফিস প্রাঙ্গণ। এমনিতে বিকালে আর সন্ধ্যায় একটু ভিড় অবশ্য প্রতিদিনই হয়। আজও হয়েছিল। তখনই তো কানাই আর বকুলকে ওখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকারমশাই।

কিন্তু কী কারণে কানাইদের এত দেরি হতে পারে? সমস্ত শর্ত তো আলোচনা হয়েই ছিল। আজ শুধু ফাইনাল কথা বলে আসা। সব ঠিক হলে একটা দিন ঠিক করে এম.এল.এ এবং জেলা সভাপতিকে এনে ওকে টুক করে পতাকা ধরিয়ে দেওয়া। এবং...

কিন্তু এত রাত পর্যন্ত কী এত আলোচনা চলছে? কী এত শর্ত চাপাচ্ছে হালদাররা? একটা ফোন যে করবে তার উপায় নেই। সোনা সরকারের মোবাইলটা বাড়িতে চার্জে বসানো আছে। বাড়ির লোকে চিন্তা করবে। এখুনি হয়ত মোহিত বা তার ছেলে রূপম খোঁজ করতে চলে আসবে।

বাড়ির লোকের তো খুব ভয়। হবে না-ই বা কেন! ওর তো এখানে কম শত্রু নেই। দলেই আছে। ওই হৃদয় মোড়ল। স্পষ্টাস্পষ্টি ওর বিরুদ্ধে। মোড়ল চায় না, আর কেউ নতুন করে দলে আসুক। সোনা চায়। সোনাকে এম.এল.এ সাহেব দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, আশপাশের পাঁচখানা গাঁয়ের জবরদস্ত কমরেডদের বিষদাঁত ভেঙে ঝাঁপিতে ঢোকাতে হবে। তার জন্য যা করতে হয় করুন। একেবারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে গেছেন এম.এল.এ. সাহেব।

শুরুটা করেছিলও ভালো। প্রথমেই বকুলের নেতৃত্বে দশজনের একটা বাইক বাহিনী ভবা হালদারের ইলেভেন পড়া নাতনিটার চারপাশে দিন তিনেক পাক দিয়েছে। কিন্তু মেয়েটা তো বটেই হালদারবাড়ির কেউ ভয় পায়নি। সোনারা জেনেছিল, ওরা বলেছে রাজনীতি করতে গেলে এমন ঝুঁকি নিতে হয়। মেয়ের ওপর অত্যাচার হলে তখন দেখা যাবে। পরদিন থেকে ওদের বাড়ির, বংশের এগারোটা বাইকে নামিয়েছিল নাতিপুতিদের। হ্যাঁ। ওই ভবা সরকারের বাড়ির বা বংশের বাইক সব। তার মানে ওরও অনেক শেকড় বাকড় আছে। জানে, সোনা। মানেও...

রাজনীতির বাইরে সবার একটা সামাজিক অবস্থানও তো আছে। স্বীকার করতে হবে ভবতোষ সরকারের সেই অবস্থানটি এই সোনা সরকারের চাইতে একটু কেন, অনেকটা উঁচুতে। এ গাঁয়ে কটা নিজস্ব লাঠি আছে সোনার? হাতে গোনা। সেরেফ এখন হাতে পুলিশ, পায়ে পার্টির নেতারা আছে বলে সোনার এত চোরফুট্টি! নইলে সে কী এমন মরদ! ভবতোষের নখের যুগ্যি নয়।

সর্বশেষ প্রলোভনে বেশ কাজ হয়েছে। রতন যেটুকু বলেছে, তাতে বাড়ির বউগুলোর চাকরি পাওয়ার ব্যাপারটায় সবাই বেশ প্রলুব্ধ। সোনা জানত ওই বাড়ির চারটে বউ মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-বি.এ. পাশ। তারা নাকি চাকরি পাওয়ার যোগ্য। বরগুলোকেও বোঝাতে পেরেছে বকুলরা...। আর তাতেই কাজ হয়েছে। টোপ গিলেছে বাড়ির মেজ প্রজন্ম। বঁড়শি এখন তাদের গলার নিচে, একদম পাকস্থলিতে। এখন ডোর ছেড়ে খেলিয়ে তোলার পালা। সেই পালার একটা অংশ আজকের কানাইদের গমন।

তবে সোনার কাছে যা খবর আছে, তাতে পরের প্রজন্ম, অর্থাৎ ভবার নাতিপুতিরা সোনাদের ওপর বেজায় চটা। তারা সরাসরি রাজনীতি না করলেও সোনাদেরকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। কয়েকজন তো ইস্কুল-কলেজে পড়ে। এত সুযোগ-সুবিধা পেয়েও শালারা...

এই দ্যাখো, মুখে গাল এনে ফেলে সোনা সরকার। উঁহু উঁহু, তার মতো নেতার মুখে এসব মানায় না। ওইসব পাকাটে ছেলেগুলো কিছু করছে না তো? বিশ্বাস নেই। যা দিনকাল। সব সম্ভব। তবে একটা বিষয় মনে পড়ছে সোনার। তিন বছর আগে পঞ্চায়েত ভোটের আগে ভবাদের পাড়ার, বংশের কয়েকজনকে ভালোই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে

একশ দিনের কাজে কিছু অবৈধ সুবিধা ছাড়া আর কিছুই দেওয়া হয়নি। সুবিধা মানে কাজে না গেলেও হাজিরা লিখে দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কিছু টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া। তাও আবার কয়েকজন পাকাটে পার্টির ছেলে, সুপারভাইজারদের প্রশ্ন করেছে : এ অ-ন্যায্য কাজ তোমরা করলে কেন? যেন শালারা খুব সৎ আর কি!

তা সেই সৎ যুবকেরা দলবদ্ধভাবে কিছু করছে না তো? দুশ্চিন্তায় তন্দ্রাভাবও কেটে যায়। তবে কি তারা বাড়ি চলে গেছে? কানাই আর বকুল তো তেমন ছেলে নয়। বকুলকে যুব সভাপতি করেছে সোনাই। তার আঠা এখন অনেক বেশি। সোনাজ্যেঠুর প্রতি আনুগত্যও। সে পালাবে না। আগে এখানে রিপোর্ট করে, তারপরে বাড়ি যাবে। তারা নিশ্চয় কাজ হাসিল করেই আসছে...। আর একটু ধৈর্য ধরে সোনা।

এমন সময় হাঁসফাঁস করতে করতে সত্যিই ওরা দু-জন ফিরে এল। ঘরে না ঢুকে দরজা থেকেই বলে গেল : জ্যেঠা, ওসব হবে না, পালিয়ে এসো।

—কেন রে, কী হল?

—সেসব পরে শুনবা। বলে কিনা, তোরা আমাদের দলে আয়...

—শালাদের দলটা আর কোথা আছে কোথা? সোনা বলে।

বকুল বলে চলে, সেসব যা বলেছে শুনলে কোমার ইয়ে শুদ্ধ জ্বলে যাবে। এখন বাড়ি এসো। পরে শুনবা।

—তোরা ভয় দেখালি না?

—বাব্বা! ভয় পাওয়ার পাত্র ওরা? ওদের বংশের কত লোক গো...। প্রথমে সবার মতামত নেওয়ার নাম করে সবাইকে ডাকলো। সবাই জুটে গেল। কী রোখ গো... ভবার নাতিপুতিগুলোর আবার বেশি। ওদের মধ্যে দু-জন নাকি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। বলে কিনা— খেদাবা? তা আমরা তো গুরগাঁ, নয়তো নয়ডাই যাব। আর বোনদুটো? সে দুটোকেও সেদিকে বিয়ে দেব। আর দাদু মরার ভয় করে না। মা-কাকীমাকে চাকরি দেওয়ার টোপ দিয়েছিলে? তাদের আগে তোমাদের বউদের দাও গো...

—হুঁঃ এসব কথা!! আচ্ছা, দেখছি।

কানাই বলে, কী দেখাবা দাদা? আজ যা দেখলাম! সে কত ছেলেপুলে গো...! সবাই যদি লাঠি ধরে, কম নয়। আরমেয়েরা বঁটি ধরলে তো কথাই নেই...

সব শুনে সোনা সরকার বলে,—চ, চ, পালিয়ে চ...। যা হবে পরে হবে।

এই বলে তিন জনে তিন দিকে বাড়ির পথ ধরল। আকাশের তারাগুলো ঠিকঠাক তাকিয়েছিল। তাদের মুচকি হাসি এত দূর থেকে বোঝা সম্ভব হচ্ছিল না।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সালানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

সামাজিক উন্নয়নে সবাইকে সামিল হবার আহ্বান জানাই।
মানবাধিকার রক্ষায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানাই।

রূপেশ বাউরি
উপপ্রধান

মমতা বাউরি
প্রধান

Sl. No. 70

With best compliments of

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Dist. Burdwan

Sl. No. 42

অজানা দেবতা

স্বপন ঘোষচৌধুরী

কষ্ট করে কেষ্ট পেয়েছিল তাই আদর করে ছেলের নাম রেখেছিল বংশীবদন।

শুনে পলাশের মা বলেছিল—বংশীবদন কেন রে? চাঁদবদন রাখতে পারলি না?—বলেই প্রৌঢ়া ঘংঘং করে কেশেছিল।

পলাশ বলেছিল, —রেখে যখন ফেলেছি তখন ও আর পাল্টাপাল্টি হবে না। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি চাঁদবদন বলে ডেকো।

সত্তরোর্ধ বৃদ্ধার কাছে চাঁদবদন, পলাশ সহ আর সকলের কাছে বংশীবদন। ইস্কুলের খাতাতেও তাই। তবে কিনা বংশীবদন স্কুলের গণ্ডিটাও ঠিকমতো টপকাতে পারেনি। ক্লাস নাইনেই দু-বার গাড্ডু খেয়ে সেই যে বাড়ি ফিরে এল আর স্কুলমুখো হয়নি। রাস্তায় স্কুলের কোনো মাস্টারমশাইকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এমনই বিতৃষ্ণা এই স্কুল এবং লেখাপড়ার ওপর।

বংশীবদনের স্বভাব কিছুটা মনিটর মনিটর গোছের। সবেতেই এগিয়ে মাতব্বরি করতে চায়।

পলাশ বুঝতে পারল ছেলে এবার বারোটা বাজার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনই রাশ না টানলে পরে বিপদ হতে পারে। হতে পারে মানে হবেই হবে। তাই কীভাবে ছেলেকে ভালো ছেলেতে রূপান্তরিত করা যায় তার জন্য বুদ্ধি খাটাতে লাগল। নানা জনের কাছ থেকে পরামর্শও নিতে লাগল।

পরামর্শ দেবার তো লোকের অভাব নেই। যদি বলা হয় মাঝে মধ্যে কাশি হচ্ছে, মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে—ব্যাস ওমনি হাজার গণ্ডা পরামর্শ চলে আসবে, সবাই ডাক্তার। দশ বিশটা ওষুধের নাম বলে দেবে। যদি বলা হয় জমিতে এবার ধান তেমন ভালো হল না, ওমনি মতামত শোনা যাবে—বড্ড দেরিতে ধানটা রুয়েছিলে পলাশ, এট্টু আগে রুইতে পারতে। আর ওই তোমার সারও ঠিকমত পড়েনি।

এতসব জেনে বুঝেও পলাশ দু-চারজনের সঙ্গে ছেলের বিষয়ে আলোচনা করছিল। একুশ বছর বয়স হয়ে গেল। কুড়ের বাদশা। এখন আবার মোটর বাইকের বায়না ধরেছে। কতকগুলো এলোমেলো বন্ধু জুটেছে। দিনরাত শুধু আড্ডা আর আড্ডা। জমি দেখতে যেতে পারবে না, ধান বিক্রির টাকা নেবার জন্য হাত পেতে আছে। সিগারেট খেতে ধরেছে,

তবে অন্য কোনো নেশা ধরেছে বলে মনে হয় না। মুখে তেমন কোনো গন্ধটন্ধ পায়নি। তাছাড়া যত দোষই থাকুক, সারাদিন যতই বাইরে আড্ডা মারুক, সন্ধে নামা মাত্রা বাড়ি ঢুকে পড়ে। কেউ ডাকতে এলেও বেরোয় না। একটা নেশা অবশ্য আছে, গল্পর বই পড়া। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম, শরৎ, নজরুল, সুকান্ত, ডি এল রায়, অতুলপ্রসাদ নিয়ে দস্তুর মতো আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। এমন দু-চারজন শিক্ষক এবং লেখাপড়া জানা মানুষের সঙ্গে আলাপ-সালাপও আছে।

পলাশের কাছে এটা কোনো গুণই নয়। আরে যে ছেলে জোয়ান হয়ে জমিতে খাটতে যায় না, দুটো পয়সা রোজগারের জন্য পরিশ্রম করতে পারে না, সে কিনা আবার মোটর বাইক চাইছে। পয়সা যেন খেলামকুচি, যেমন খুশি নাও আর খরচ কর।

কিন্তু এখন বায়না ধরেছে, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ওর মায়ের গলা। ছেলে চেয়েছে সুতরাং কেন দেবে না? সবেধন নীলমণি। সাধ করে নাম রেখেছো বংশীবদন—তা আজ অব্দি ছেলেকে তো একটা বাঁশি পর্যন্ত কিনে দাওনি যে বাজাবে, মুখে ধরে বংশীবদন নাম সার্থক করবে। যে হোক করে যোগাড় কর টাকা। ছেলে চাইছে বই তো নয়! এ কেমন বাবা জানিনে।

অবশ্যি বংশীবদন খুব একটা ছটফটে নয়, বরং বেশ ধীরস্থির। ও যে সমস্ত কথাবার্তা বলে, পাঁচজন বেশ ভালোভাবে তা বুঝতে পারে এবং মেনে নেয়, কথার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু ওই রোগ, শরীর খাটাবে না। বসে বসে পয়সা পাওয়া যায় এমন কোনো কাজের চেষ্টায় আছে।

বংশীবদনের এমন কাজকর্মে অনীহা দেখে পলাশ বংশীর এক বন্ধুকে বংশীর মতিগতি ফেরাবার জন্য গিয়ে এ গল্প সে গল্প ফেঁদে আসল কথাটা পাড়ল—বংশীকে বাঁচতে গেলে পয়সা চাই। বাপ-ঠাকুরদার পয়সায় বাবুগিরি করলে তা করা যায় ঠিকই, কিন্তু লোকে নানা কথা বলবে।

বংশী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, আমার সম্পর্কে কে কী বলে তা পরে শুনব, তোর নিজের কথা ভাব। বিয়ে করলি, এক বছরে বৌয়ের পেটে সন্তান আসার বদলে পাথর এসে গেল। লোকে কী বলবে বলতো?

শুনে সে পালাতে পথ পায় না। মাসখানেক আর বংশীর মুখোমুখি হয়নি।

কী সব চিন্তা করতে করতে এক সময় বংশীর মনে হল, সব চণ্ডীর পুজো টুজো হয়ে থাকে কিন্তু কথায় কথায় যে চণ্ডীর কথা আমরা বলি সেই উড়নচণ্ডীর পুজো ইতিপূর্বে কোথাও কখনও হয়েছে বলে শোনা যায়নি। এই চণ্ডীর পুজো যদি করা যায় তবে তা ইতিহাস হয়ে যাবে। ভূভারতে প্রথম উড়নচণ্ডীর পুজো করার জন্য সবাই তাকে ধন্য ধন্য করবে। ইতিহাসে নাম লেখা হয়ে যাবে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ওর অনুগামী গোটাকতক ছেলে ছিল তারা কেউ তেমন চ্যাংড়া নয় বরং মোটামুটি ভদ্র ঘরের। সকলে তো বংশীর প্রস্তাব লুফে নিল। কী আশ্চর্য, এমন একটা দেবতা যে আছে এবং শতবার শত জায়গায় এই নাম উচ্চারিত হলেও তার পুজো হয়নি এটা অবাক ব্যাপার তো বটেই!

তোড়জোড় শুরু হল। পাড়ার বয়স্ক এবং বিজ্ঞজনদের এক সন্ধেয় ডেকে বসল বংশী সদলবলে।

বংশী ডেকেছে, বিশেষ এক আলোচনা এবং সকলের মতামত ও পরামর্শ নেবার জন্য, এ আর কে তুচ্ছজ্ঞান করবে। আর পরামর্শ দেবার ইচ্ছে তো কমবেশি অনেকের মধ্যেই থাকে। ডেকেছিল কুড়িজন মতো বয়স্ক মানুষকে, এসেছেন আঠারো জন। অনুপস্থিত দু-জনের একজন গেছেন মেয়ের কাছে আর অন্যজন গেছেন শ্বশুরবাড়ি—শালার বিয়েতে।

আলোচনার শুরুতেই সকলের হাতে গরম চায়ের ভাঁড় দেখা গেল। যথারীতি সমস্ত সভাঘরে সুড়ুৎ সুড়ুৎ, আঃ ওঃ শব্দ শোনা গেল এবং চা শেষ হতেই বংশী গলা ঝেড়ে নিতাইবাবুর নাম সভা পরিচালক রূপে ঘোষণা করে দিল। কে একজন সঙ্গে সঙ্গে তা সমর্থন করতেই চটাপট হাততালি।

নিতাইবাবু গলা ঝেড়ে গম্ভীর হয়ে হাঁটু মুড়ে বাবু হয়ে বসলেন। টাক মাথার দু-পাশে অবশিষ্ট ক-গাছি চুলে হাত বোলালেন এবং বলে উঠলেন—সভার সকলের অনুরোধক্রমে আমি সভা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। তবে কিনা চোখের ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে খাতার সব লেখা পড়তে সক্ষম হই না বলে আজকের সভার আহ্বায়ক শ্রীমান বংশীবদন করকে সভার বিষয়বস্তু সকলকে অবগত করার জন্য অনুরোধ করছি।

বংশীবদন গদগদ হয়ে বলল, —মাননীয় শ্রীনিতাই সরকার মহাশয় আমাকে যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন, আমি তা যথাসাধ্য পালন করার চেষ্টা করব।—বলে একটু কেশে বলতে শুরু করল—আপনারা সকলেই জানেন, হিন্দু দেবদেবীর মধ্যে চণ্ডীর একটি বিশেষ স্থান আছে। নানা রূপে, নানা নামে তিনি পূজিতা হন যথা—ওলাইচণ্ডী, বসন্তচণ্ডী, সহ আরও কত নামে মানুষ তাঁর পূজা করে। কিন্তু এ ছাড়াও চণ্ডীর আরও কয়েকটি নাম থাকলেও সে নামে কোনো পূজা হয় না। যেমন উড়নচণ্ডী, উগ্রচণ্ডী, রণচণ্ডী ইত্যাদি। তাই আমরা কয়েকজন মিলে মনস্থ করেছি প্রথমে উড়নচণ্ডীর পূজা করব এবং এই পূজা সফল হলে পর্যায়ক্রমে উগ্রচণ্ডী এবং রণচণ্ডীর পূজা করব। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত চাইছি।

আলোচনার বিষয়বস্তু আগেই উপস্থিত সকলকে জানানো হয়েছিল। অনেকে এ ব্যাপারে তাঁদের বক্তব্য কী হবে তা ঠিক করে রেখেছিলেন। নিশিকান্ত মল্লিক মোটামুটি ষাটোর্ধ্ব। তিনি সব সময় মুখে পান রাখেন কিন্তু পিক ফেলেন না। হামা হাম গাম্ভীর্যে বলেন, প্রস্তাবটা মন্দ নয়, আমরাও একটা নতুন পুজো দেখতে পাব। কিন্তু—কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা আমার মনে উদয় হয়েছে। তা হল উড়নচণ্ডীর পুজোর পদ্ধতি কী? এখানে আমাদের সকলের নমস্য, পাড়ার জ্ঞানী পুরোহিত শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয় উপস্থিত হয়েছেন। তিনিই এ-ব্যাপারে আলোকপাত করবেন। আমরা এখন তাঁর কাছ থেকে এই পুজো সম্পর্কে বিশদ শুনব।

পাঁচুগোপাল বাখারির মতো লটপটে, ছিপছিপে এবং খড়খড়ে। বেশ ধীরে ধীরে বললেন, আমার এই পঞ্চাশ বছরের যজমানি জীবনে আমি অনেক অনেক দেবতার পূজা করেছি, আপনারা চাইলে আমি সব দেবতার নামও নিতে পারি, কিন্তু আমার জীবদ্দশায় উড়নচণ্ডীর নাম শুনলেও এই চণ্ডীর পূজা কখনও করিনি। এই চণ্ডী কী রূপ অর্থাৎ কিনা তাঁর রূপ কেমন, তাঁর পূজার উপাচার কী কী, এই দেবতার কী মন্ত্র, হোম করতে হয় কি না, বলিদানের বিধান আছে কিনা কিছুই আমি জানি না। এক্ষেত্রে আপনারা যদি এই চণ্ডীর পূজা করতে চান তাহলে অন্য স্থান থেকে পুরোহিত নিয়ে আসুন, আমি তাঁর সঙ্গে থেকে সহযোগিতা করব।

কালো চক্কোত্তি গলা বাড়িয়ে মিহি সুরে বলে উঠল—শুধু উড়নচণ্ডী নয়, উগ্রচণ্ডী, রণচণ্ডীর পূজাপদ্ধতি, রূপ বর্ণনা আমাদের জানতে হবে। এই যে এক নতুন দেবতার আরাধনা আমরা করতে মনস্থ করেছি তা সার্থক করে তুলতে আমাদের

সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নবনব দেবতার আবিষ্কারও মানুষকে নতুন পথ দেখাবে এই বিশ্বাস। এই সভায় দাঁড়িয়ে, মাফ করবেন—বসে আমি বড় আশায় রইলাম কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি অবশ্যই এই দেবতাদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়ে আমাদের স্বপ্ন পূরণ করবেন।

কালো চক্কোত্তির বক্তব্য শেষ হতে সভার অনেকেই বেশ জোরে হাততালি দিলেন। চটাপট শব্দে সভাস্থল ভরে উঠল।

কিন্তু তারপরই সভা চুপচাপ। সবাই যেন বোবা। বংশীবদন বলল, আমি আমাদের বন্ধুবর শ্রীঅশোক রায়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি।

অশোক বংশীর চেয়ে তিন-চার বছরের বড়। তবে আড্ডার সুবাদে তুই তোকারি চলে। বংশীর মতো অশোকও প্রতি ক্লাসে একবার করে ডিগবাজি খেয়ে শেষে ক্লাস নাইনে দুবার গাড্ডু মেরে ব্রেকডাউন হয়ে থেমে গেছে। কিশোর বয়সেই অকালপক্ক, জ্যাঠা, ইঁচড়েপাকা ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়েছিল। এখন কালের নিয়মে বয়সের ধর্মে পুরোপুরি পেকে গেছে। বাবা নেই। পৈতৃক সাড়ে দশ বিঘে জমি চাষ করে মা এবং ছেলের সংসার চলছে। ভালোই চলছে। এই অশোক চোখ পিটপিট করে সভায় উপস্থিত সকলকে ভালো করে দেখল। ঝুলের গায়ে ঝাঁটা বোলানোর মতো করে চোখ বুলিয়ে নিল। পাঁচজনের মাঝখানে গুছিয়ে কিছু বলার অভ্যাসও নেই। কিন্তু বংশী বলে দিয়েছিল উড়নচণ্ডী পুজোর স্বপক্ষে তুই যতটা পারবি বক্তব্য রাখবি। সেই মত সারা দিন ধরে বক্তব্যের একটা খসড়া মনে মনে তৈরি করেছিল। কিন্তু চারপাশে একগাদা কালো কালো মাথা, বিশেষ করে, গুরুজনদের উপস্থিতি দেখে সব গুলিয়ে ফেলল। বলে উঠল, বাপের অকর্মণ্য বখাটে ছেলেদের লোকে উড়নচণ্ডী বলে। কেন বলে জানিনে, তবে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো দেবতা-টেবতা থেকে থাকবেন নইলে উড়নচণ্ডী শব্দটাই বা আসে কী করে! আমি চাই সত্য জানতে। এর জন্য সারা দেশজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। আর সেই আন্দোলন শুরু হবে আমাদের এই শহরের এই পাড়া থেকে এবং সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবেন আজকের এই সভায় উপস্থিত সদস্যগণ।

সাধু সাধু রব উঠল। উৎসাহ পেয়ে অশোকের চোরফুট্টি বেড়ে গেল। গলা তুলে হাত নেড়ে বলতে লাগল—নাম মনে পড়ছে না কে যেন বলেছিলেন, বাংলা আজ যা ভাবে অবশিষ্ট ভারত কাল তা ভাবে। কথাটা যে কতবড় সত্য তা বার বার প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আবার আমরা তার প্রমাণ দেব। দেশের জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা দেশের জন্য প্রাণ দেব না—প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব। দেবী উড়নচণ্ডীর পুজো প্রচলন করে আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের ক্ষমতা। অবশ্যি এজন্য কিছু খরচ করতে হবে। কত টাকা খরচ হবে তা আমরা কেউই জানিনা। রাজ্যে রাজ্যে পুরোহিত পাঠাতে বেশ ভালোই খরচ হবে। আর তার জন্য একটা কমিটি তৈরি করতে হবে। সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক এবং অন্যান্য সদস্যরা কমিটিতে থাকবেন। আমি সভাপতি রূপে আজকের সভার সভাপতি নিতাই সরকারের নাম প্রস্তাব করছি। সম্পাদক হিসেবে আমাদের পছন্দ শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়। সহ-সম্পাদক-দ্বয়ের নাম যথাক্রমে অমিয় প্রধান এবং লালমোহন দত্তর নাম প্রস্তাব করছি। এছাড়া এখানে উপস্থিত সকলের প্রিয় এবং বিশ্বস্ত শ্রীবংশীবদন করের নাম কোষাধ্যক্ষ রূপে প্রস্তাব করছি।—বলে হাতের কাগজটা সভাপতির হাতে ধরিয়ে দিল। সভাপতি মশাই চশমার ফাঁক দিয়ে নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে বললেন, এই কমিটিতে আপনাদের কারও কোনো আপত্তি আছে?

নাঃ! কারও মুখে কথা নেই। সভাপতি চারপাশে চোখ বুলিয়ে বললেন, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি অশোক কুমারের প্রস্তাবিত কমিটিতে আপনাদের সম্মতি আছে।

সবাই ঘাড় নাড়ল।

এবার বংশী বলল, তাহলে এই কমিটির নাম হোক দেবী উড়নচণ্ডী ট্রাস্ট কমিটি—যাকে বলে ট্রাস্টি বোর্ড।

কে যেন বলল, কোথায় দেবতা, কোথায় মন্দির, কিছুই জানি না, ওমনি ট্রাস্টি বোর্ড হয়ে গেল!

—না হবার কী আছে?—বলে উঠলেন নিতাই সরকার। জীবনে প্রথম কোনো কমিটির সভাপতির পদ পেয়েছেন। এ তল্লাটের শতকরা নব্বুইজন লোক নিতাই সরকারকে পাত্তা দেয় না, সেই অবস্থা থেকে একেবারে সভাপতি এবং শুধু তাই নয়, একেবারে ট্রাস্ট কমিটির সর্বোচ্চ পদের অধিকারী। এ জিনিস হাতছাড়া করা চলে না।

পাঁচুগোপাল সমর্থন করল—ঠিকই তো। ট্রাস্টি বোর্ড ছাড়া কোনো মহৎ কাজ হয় নাকি?

—মহৎ কাজের জন্য পয়সারও দরকার!—বলে উঠল বংশী। আর তার জন্যই দরকার টাকা কালেকশনের। আসল কথা টাকা। টাকা ছাড়া আর সব ফাঁকা—এ তো আপনারা সবাই জানেন। আর টাকা তো একজন দু-জন দিয়ে কুলোতে পারবে না তাই বিল ছাপিয়ে চাঁদা তুলতে হবে। এই শহর কেন, এই মহকুমার, এই জেলার মানুষের যার যেমন ক্ষমতা, উড়নচণ্ডীর প্রকৃত রূপ ও রহস্য জানতে অর্থ সাহায্য করবেন।

—করা তো উচিত।—বলে ফেলল অশোক।

নিতাই সরকার বললেন, তাহলে আজকের সভা শেষ করার আগে আমি কিছু কাজের কথা বলে নিই। চাঁদার বিল শ্রীমান বংশীবদন ছাপার ব্যবস্থা করবে। প্রতিদিন কত কত চাঁদা উঠছে সভাপতিকে তার হিসেব দেবে। সম্পাদকও হিসাব দেখবেন। এরপর মোটামুটি একটা ফান্ড হলে তখন পরবর্তী সভা ডেকে উড়নচণ্ডী সম্পর্কে খোঁজখবর নেবার জন্য বিশেষ ব্যক্তি নিয়োগ করা হবে। তার জন্যে সম্পাদক এবং তাঁর দু-জন সহকারী এখন থেকেই এ-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। তাহলে আজকের সভা আমি এখানেই শেষ করছি।

সভা শেষ, জায়গা ফাঁকা। শুধু বংশী, অশোক আর দুজন সাগরেদ ধীর পায়ে স্থান ত্যাগ করছিল।

অশোক বলল, মোটামুটি কেমন কালেকশন হবে?

—মোটামুটি মানে? তিন মাসে অনুরোধ করে, দরকার হলে জোর জবরদস্তি করে অন্তত তিরিশ হাজার চাই, না হলে মজুরি পোষাবে না।

—পুজোর খরচা?—বলল এক সাগরেদ।

—পুজো? উড়নচণ্ডীর! কে খুঁজে পাবে ওই অদৃশ্য দেবীকে! অবশ্যি আমি ওই দেবতার ঠিকানা জানি!

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ, বংশী ঘাড় দোলাল। একটু ভালো করে ভেবে দ্যাখ, উড়নচণ্ডী আমরা চার জনই। কিন্তু খবরদার, কেউ যেন আমাদের স্বরূপ জানতে না পারে। আমরা সবাই ভালো ছেলে, শান্ত এবং বিশ্বস্ত। আমাদের তুল্য যুবক হয় না। এই সত্যটা চিরকাল প্রচার করে যাবি। এরা অনন্তকাল ধরে উড়নচণ্ডী খুঁজে বেড়াক!

With best compliments of

NC-F1

SRB REFRACTORIES ENTERPRISE LTD.

61, Kankulia Road, Flat No. 202B, 2nd Floor, Kolkata-700 029, WB
Mob. 9832195056, 9647901550, E-mail : sgupta.srbc@gmail.com

Specialist in

MAKING ALL TYPES OF BAKING, RE-BAKING FURNACES, TUNNEL, GRAPHITISATION UNIT, CIVIL, ANNUAL MAINTAINANCE OF ANY TYPES OF FURNACES, CASTING REFRACTORY SPECIALIST.

Sl. No. 41

কল্পতরু

মানিকলাল অধিকারী

‘আসব?’

‘আসুন।’

এই একজোড়া শব্দই শুধু তখন তরঙ্গায়িত সমস্ত ঘরময়। তারপর, অটুট নৈঃশব্দ। একেবারে অটুট নীরবতা ছিল তাও ঠিক নয়। কীবোর্ডের সঙ্গে আঙুলের আলাপে যেটুকু শব্দের সঞ্চরণ এবং সিপিইউ-এর একটানা চলমান গোঙানি।

প্রবহমান সময় চলছিল এইভাবেই। কতক্ষণ? সে খেয়াল সত্যিই আমার ছিল না। সামনের দু-তিন মাসের মধ্যেই আমার থিসিস সাবমিশন। কয়েকটা পেপার পাঠাতে হবে জার্নালে। সেমিনারের জন্য রয়েছে আমন্ত্রণ। সব মিলিয়ে বেশ ব্যস্ত এবং আত্মমগ্ন আমি। লসাগু সেদিন হঠাৎই বলছিলেন, ‘রত্নদ্বীপ, তুমি কিন্তু বেশ রোগা হয়ে গেছ।’

‘হতেও পারে। খাওয়াদাওয়া, ঘুম সব যে নিরুদ্দেশ।’

না তাকিয়েই জবাব দিয়েছিলাম, ‘সঠিক উত্তরটা অবশ্য মেনকারই জানা আছে।’

‘কারণ?’

‘কারণ, সেটা মেনকার গরজ।’

‘আমার তেমন কোনো গরজ নেই। স্যর বলছিলেন...।’

অসমাপ্ত কথা। রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে দেখলাম কৃষ্ণকলি। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কাকে চাইছেন?’

‘স্যর, মানে এ.এস.জি.।’

‘ও লক্ষ্মীসাধন গুছাইত? মানে লসাগু? তিনি তো বেরিয়েছেন।’

‘কোথায়?’

‘তা তো জানি না। তবে কার সঙ্গে সেটা জানি।’

‘কার সঙ্গে?’

‘গসাগু।’

‘মানে?’

‘মানেটা খুব সহজ। এক ভদ্রলোক এলেন দেখা করতে। স্যর তখন ক্লাসে। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন লক্ষ্মী আছে? চারদিকে দেখে আমি মজা করে বললাম, এখানে আর লক্ষ্মী কোথায় পাবেন স্যর? জানেন তো, বেশ চাপ হয়ে গেল। আমার রসিকতায় ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে গেলেন। ততোধিক গম্ভীর গলায় বললেন, ‘লক্ষ্মী ইকোনমিক্সের প্রফেসর। আমার ভাই।’

সঙ্গে সঙ্গে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় সজাগ হল। স্যর বলেছিলেন ওনার দাদা আসবেন। কেউ খোঁজ করলে যেন ক্লাস থেকে ডেকে নিই। গুরুর আদেশ পালন করেছি। স্যর বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় বললেন, ‘আমি গৌরীদার সঙ্গে চলে যাচ্ছি একটা জরুরি কাজে। ল্যাবের চাবি তোমার কাছেই রেখে দিও।’

অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে কথা

বলেছিলাম। কৃষ্ণকলি দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে বসতে বলিনি ইচ্ছে করেই। কাটিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু, আমার অদৃষ্টপুরুষ হয়ত অন্যরকম কিছু নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কৃষ্ণকলি দাঁড়িয়েই রইল। ওকে বসতে না বললে ও বসবে না। সেটা জানতাম। বললাম, 'বসুন।'

কৃষ্ণকলি বসল। আমি ফিরে গেলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে। কৃষ্ণকলি আমার বাঁদিকে, চেয়ারে। পেছনে। না দেখেও বেশ বুঝতে পারছি। ওর চোখ এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে কম্পিউটার মনিটরে।

দেওয়াল ঘড়িতে পাঁচটার ঘণ্টা। কৃষ্ণকলি ডে-স্কলার। এতক্ষণ ওর থাকার কথা নয়। অন্যদিন ওরা চারটের পর আর ডিপার্টমেন্টে থাকে না। একমাত্র রিসার্চ স্কলাররা তাদের গাইডের ল্যাবে বসে কাজ করে। সন্ধ্যার পর তাদের ফেরা। আমার আর একটু দেরি হয়। নাগচম্পার দুর্বার আগর্ষণ কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না।

'শুনুন!'

নাঃ। আজ কাজের দফারফা। তবু, বিরক্তি প্রকাশ করা চলবে না। কৃষ্ণকলি যে লসাগুর বেশ স্নেহভাজন। 'বলুন।'

'স্যরের দাদার কী নাম বললেন?'

'গসাগু।'

'কেন?'

'স্যর গৌরদা বলে ডাকছিলেন। আর, সাধন যোগে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে সারনেমটাও গুছাইত। অর্থাৎ গৌরসাধন গুছাইত। সুতরাং গসাগু।'

কৃষ্ণকলির দু-চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস। আমি বললাম, 'কী অপূর্ব বলুন তো। লসাগু আর গসাগু সহোদর।'

কৃষ্ণকলি নিরুত্তর। শুধু ওর ঠোঁটের কোণে এই বিকেলের পড়ন্ত বেলায় এক চিলতে হাসি। বলল, 'আপনি যে যথেষ্ট অ্যানালিটিক, বুঝতে পারছি। কিন্তু, স্যর বলেছিলেন ওনার মাসতুতো ভাই আসবেন।'

'এই রে! এতসব ইনফরমেশন্ তো আমার কাছে ছিল না।'

'শুনুন। আজ আমি হস্টেলে থাকব।'

'থাকুন না। কে আপত্তি করছে?'

'আপত্তির প্রশ্ন নয়। আমি স্যরের কাছেই আসছিলাম। উনি বললেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

একটু অবাক হলাম। 'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। একটু দরকার ছিল।'

আমি স্ক্রিন থেকে সরে এসে বসলাম। মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে গেছি। আজ আর আমার কাজ হবে না। স্যর যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে বলেছেন, তার মানে ব্যাপারটা আমাকে ওবলাইজ্ করতেই হবে। বললাম, 'বলুন, আপনার কোন কাজে আমি লাগতে পারি?'

'এভাবে নাটকের ডায়ালগ দিলে আমি আর কী বলব আপনাকে?'

'বেশ। নাটকের রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে এলাম। বলুন, আপনার জরুরি দরকারটা কী?'

'উইডোজ্ ক্রুইজটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। স্যরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আপনাকে রেফার করেছেন।'

কৃষ্ণকলির মধ্যে কোনো জড়তা ছিল না। নিজের প্রয়োজন বেশ স্বচ্ছন্দেই পেশ করল।

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। সেটা ওর নজর এড়াল না। কৃষ্ণকলি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি কারো জন্য অপেক্ষা করছেন? কিংবা কেউ কি আপনার জন্য?'

'হ্যাঁ। আমার গার্লফ্রেন্ড। প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে আমারই জন্য সে পথ চেয়ে থকে।'

'ও সরি।' কৃষ্ণকলি ভীষণভাবেই অপ্রস্তুত। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'আমি স্যরের সঙ্গে কথা বলে নেব। আপনি যান।'

কৃষ্ণকলির দু-চোখে আমি কি তখন বিষণ্ণতার মেঘ দেখেছিলাম? কিংবা অন্য কিছু? কিছুটা ধন্দে পড়লাম। বেশ কয়েক পা দরজার দিকে এগিয়ে গেল কৃষ্ণকলি। ব্যাপারটা আর বেশি দূর এগোতে দেওয়া ঠিক হবে না। বললাম, 'শুনুন...।'

কৃষ্ণকলি থামল।

'উইডোজ্ ক্রুইজ্টা কী আজকেই বুঝতে হবে? যদি কাল সন্ধেবেলায়...।'

'কিন্তু কাল সন্ধেবেলায়ও তো আপনার গার্লফ্রেন্ড পথ চেয়ে বসে থাকবে।'

'বসে না। দাঁড়িয়ে থাকবে।'

আমার উত্তরে কৃষ্ণকলি কি ব্যাপারটা আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিল? আমিও হয়ত কিছুটা বুঝতে পারছিলাম ওর ভেতরের দ্বিধা দ্বন্দ্বের আলোড়ন। একটা ঝড়কে আড়াল করতে চাইছে ও। আর আমি আপাত গম্ভীর মুখের আড়ালে গোপন করেছিলাম আমার অট্টহাসি।

কেউই আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। থাকেও নি। মা হয়ত আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। কিন্তু, তাকে আমি দেখিনি। মনে আছে স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরের কথা। প্রথম দিন। স্কুলে যাওয়ার সময় সুতপা মাসি দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবির সামনে নিয়ে এল। বলল, প্রণাম কর। আমার অভিমান তখন দু-চোখে ঘন বর্ষার বাদল ধারা। এখনও মনে হয়। বাবার কথা কেউ কখনো বলে না। মা কিংবা বাবা অন্তত কেউ একজন কি আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারত না?

স্কুলে টিফিন পিরিয়ডে ছেলেরা আইস্‌ক্রিম কিনে খেত। চকোলেট, চাট, গুড়বাদাম—আরও কত কী! আমি দূর থেকে সবই দেখতাম। তবে, দূর থেকেই। কখনো কেউ টের পায়নি আমার হ্যাংলামি। তখন বাবার কথা মনে হত। মাসি আমাকে চোখে হারাত। সেই মাসির কাছে একদিন আইস্‌ক্রিমের জন্য বায়না করেছিলাম। মাসি কিনে দেয়নি। তারপর যখন ভুলেই গেছি, মাসি রাস্তা থেকে ফেরিওয়ালা ডেকে আইস্‌ক্রিম কিনে দিয়েছিল। আমি উল্লসিত। আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মাসি বলল, 'জানি, সেদিন তোকে আইস্‌ক্রিম কিনে দিইনি বলে রাগ করেছিস।'

'না মাসি। রাগ আমি করিনি।'

'কষ্ট তো পেয়েছিস। ইচ্ছে তো করে তোর কাছে কল্পতরু হয়ে যাই।'

'কল্পতরু' কী আমি তখন জানতাম না। অনেকদিন পর মাসি সেই কল্পতরুর গল্প বলেছিল। ইন্দ্রলোকের সর্বকামনা পূরণকারী দেবতরুর কথা। নিজের অভীষ্ট লাভে এই কল্পদ্রুমের অসীম অনন্ত ক্ষমতা আর ঔদার্যের কথা। সমুদ্রমন্থনে উত্থিত এই কল্পবৃক্ষের কল্পান্তে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জনের কাহিনি। কতবার সুতপা মাসি বলেছে আর আমি রোমাঞ্চিত হয়েছি।

স্কুলে হাফ্ ইয়ার্লি পরীক্ষায় লিখতে দিয়েছিল এইম্ ইন্ লাইফ্। আমিও এমন বোকা গর্দভ ছিলাম যে লিখেছিলাম বড় হয়ে আমি কল্পতরু হব। লিখে বেশ আত্মপ্রসাদও লাভ করেছিলাম। বন্ধুরা কত কী লিখেছিল। কেউ চেয়েছিল ডাক্তার হতে, কেউ শিক্ষক, কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু অমলকান্তির মতো কেউ 'রোদ্দুর' হতে চায় নি। আর আমি বোকা গাধাটা কিনা হতে চেয়েছিলাম 'কল্পতরু'।

পরীক্ষার খাতা দেখিয়েছিল মাস খানেক পর। সবাই কত কত নম্বর পেয়েছিল। আমি পেয়েছিলাম জিরো। এ ভেরি বিগ জিরো। মাস্টারমশাই এক ক্লাস ছেলেদের মধ্যে আমাকে ডাকলেন। 'হতভাগা! কী হবি বড় হলে?'

'কল্পতরু, স্যর।'

সমস্ত ক্লাসরুমে দমকা হাসির ঝড় আর আমার কানের পাশ সপাটে এসে

পড়ল চড়টা। খুব কষ্ট হয়েছিল। না। কাঁদিনি। মাস্টারমশাই সজোরে আঁকড়ে ধরলেন দুই হাতে আমার দুই কান। 'হতভাগা! লেখাপড়ার নাম নেই। যতসব আবোল তাবোল উদ্ভট কথা।' তারপর ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের দিকে তাকিয়ে আদেশ করলেন, 'যা তো অফিস থেকে কয়েকটা বেত নিয়ে আয়।'

বেত এল। আমার এক কান হাতে ধরে রেখে মাস্টারমশাই আর এক হাতে তুলে নিলেন বেত। একটি বেতের সদ্ব্যবহার হতে থাকল আমার পিঠে। হয়ত বেতেরই দুর্বলতা কিংবা আমারই পিঠের অবাধ্যতা। এমনও হতে পারে যে বেতটাই তখন আমার কল্পতরু হয়ে গিয়েছিল। বেতটা অল্প সময়েই ভেঙে গেল। মাস্টার মশাই তুলে নিলেন আর একটি বেত। সেটাও বেশিক্ষণ টিকল না। আমার প্রতিবাদহীন পিঠ যন্ত্রণায় নীল। আমর দু-চোখ তখন ধূসর মরুভূমি। বেতের ভাণ্ডার তখনও ফুরোয়নি। স্যরের হাতে উঠে এল আর একটি বেত। কিন্তু, আশ্চর্যজনক ভাবেই মাস্টার মশাইয়ের উদ্যত বেত আমার পিঠে আছড়ে না পড়ে আটকে রইল শূন্যে।

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হেডস্যর। মাস্টারমশাইয়ের উদ্যত বেত হাতে ধরেছেন তিনিই। মাস্টারমশাই পেছন ফিরে বুঝি বা একটু অপ্রস্তুত। হেডমাস্টার মশাই বললেন, 'গোপীনাথবাবু! থাক এবারের মতো। ওর খাতাটা আমায় দিন।'

হেডমাস্টারমশাই খাতাটা নিয়ে চলে গেলেন। আমিও আমার বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। লাস্ট পিরিয়ড। গেমস্ পিরিয়ড। ছেলেরা তখন মাঠে। অফিস থেকে পিওন এসে একটা চিরকুট দিয়েছিল গেমস্ টিচারের হাতে। চিরকুটটা দেখে নিয়ে স্যর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করেছিস?'

আমি নিরুত্তর। স্যর বললেন, 'আজ আর তোর খেলার দরকার নেই। যা। হেডস্যর ডাকছেন।'

একবুক শঙ্কা নিয়ে পিয়নের সঙ্গে চললাম হেড্ মাস্টারমশাইয়ের ঘরে। ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে বসল দুয়ারের কাছে একটা টুল নিয়ে। তার দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাকে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম। হেডস্যর কাজে নিমগ্ন। এক মনে দেখে চলেছেন একরাশ কাগজ। আমার ভেতরে দুর্নিবার টাইফুন। এক একটা পল অনুপল মনে হল এক দীর্ঘ অনতিক্রম্য সময়ের পারাবার। অথচ, হেডস্যরের সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

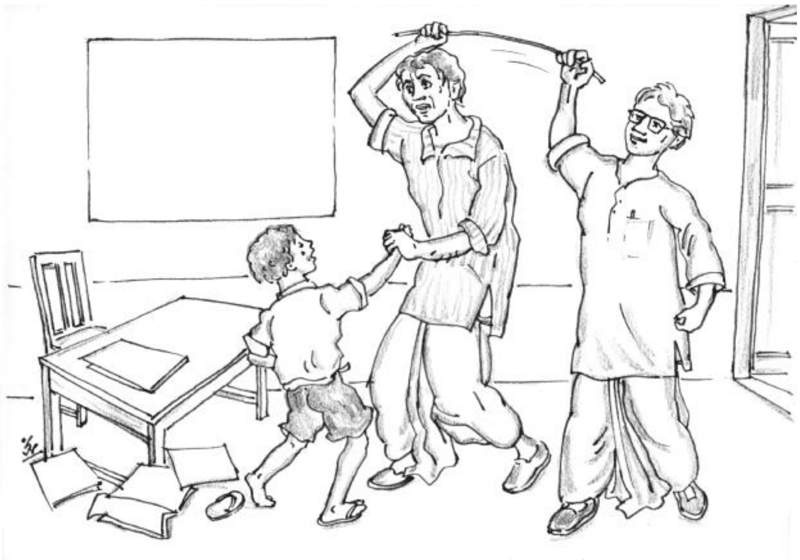

শুধু কয়েকবার চোখ তুলে আমাকে দেখে নিলেন। আমার মনে হয়েছিল নিরীহ হরিণশিশুকে গ্রাসের দূরত্বে রেখে নিশ্চিন্তে কালক্ষেপ করছে এক মহা অজগর।

ছুটির ঘণ্টা বাজল। সব ছেলেরা হইহই করে স্কুল ছেড়ে চলে গেল। স্টাফ রুম থেকে সব স্যরেরা চলে গেলেন একে একে। চলে যাবার আগে হয়ত কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন আমার ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে। হেডস্যর টুলের ওপর বসে থাকা পিওনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই আর অপেক্ষা করিস না।' পিওনটিও চলে গেল।

স্কুলবাড়ি এখন শুনশান। নির্জন পুরী। এই কিছুক্ষণ আগেও এখানে ছিল প্রাণের প্রস্রবণ। আমার ভেতরে ভীষণ এক অস্থিরতার ছোঁয়া। সুতপা মাসি দেরি দেখে খুঁজতে বেরোবে পথে। হঠাৎ গমগম করে উঠল হেডস্যরের কণ্ঠস্বর—'এদিকে আয়।'

আমি মাথা নীচু করে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেলাম। উনি বললেন, 'মাথা সোজা করে দাঁড়া।'

আমি মাথা সোজা করে প্রতীক্ষা করছিলাম আমার প্রাপ্য শাস্তির। হেডস্যর ড্রয়ার খুললেন। এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে সদ্য ভেঙে আনা এক জোড়া লকলকে বেত। আমি বেশ একটু নিরাপদ দূরত্বেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্যর বললেন, 'কাছে আয়।'

কাছে গেলাম। তিনি আমার গালে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ইস...। আঙুলের দাগ বসে গেছে।'

আমার ভেতরে জমে থাকা বরফ আছড়ে পড়ল সমুদ্রের ঢেউ হয়ে। ড্রয়ারের ভেতর হাতটা চালান করে স্যর খুঁজে আনলেন এক অনাঘ্রাত বোরোলিন। টিউব থেকে ক্রিমটা নিয়ে আমার গালে বসে যাওয়া দাগে লাগিয়ে দিলেন। বললেন, 'খুব ভালো লিখেছিস রে। তাই হ। দুহাত উজাড় করে দিয়ে যা। পরিণামে বিষক্রিয়ায় হলিই না হয় নীলকণ্ঠ। তবে, কল্পতরু কে হয়েছিলেন জানিস?'

আমার মৌনতার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ।'

আইসক্রিম না পেয়ে কষ্ট পেয়েছিলাম ঠিকই। তবে রাগ করিনি। সুতপা মাসি বলেছিল, 'সত্যি বলতে কি যখন যা চাইবি, তাই যদি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাস দেখবি সেই পাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ থাকে না। তখন সেই পাওয়াটাই মনে হয় অধিকার। না পেলেই মনের কোণে জমে মেঘ। বিদ্রোহ। মনে হয় বঞ্চিত।'

হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছি আজীবন। সেদিন সুতপা মাসি আমাকে জীবনের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত এক অভূতপূর্ব সম্পদ দান করেছিল। আমার উত্তরণ হয়েছিল এক অনাস্বাদিত উপলব্ধির জগতে যা ওই বুড়োর কাছেই শেখা। 'আমি বহু সাধনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।'

কৃষ্ণকলি দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। ইচ্ছে করলে আজই ওকে 'উইডোজ্ ক্রুইজ'টা বুঝিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু, দিই নি। আমি দেখতে চেয়েছিলাম ও সত্যিই কতটা সিরিয়াস। বললাম, 'কাল বিকেলে। আমি যাব না আমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে।'

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

নয়া ইতিহাস
লিখছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা
প্রচ্ছদপট

—সুকান্ত

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

Sl. No. 57

মদিনার খেজুর আর তারাপীঠের প্রসাদ

কৌশিক লাহিড়ী

বয়স্কা, দুর্বল এবং বেশ নড়বড়ে।

মহিলা এসএলই রোগাক্রান্ত। তাঁর বৃদ্ধ স্বামী প্রতিবারই তাঁকে নিয়ে আসেন আমার চেম্বারে। মানুষটির সাদা গোঁফদাড়ির আড়ালে একটি স্মিত হাসি আর দুটি শান্ত চোখ আমার নজর এড়ায় না।

দম্পতিটিকে চিনি বছর দুয়েক। মোটেই নিয়মিত চিকিৎসা করান না। শেষবার একটু ভাল দেখেছিলাম বটে, কিন্তু সেটাও বছর খানেক আগের কথা।

এবার দেখলাম বেশ কাহিল দশা।

ফ্যাকাশে, ফোলা চেহারা। গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তারের পরামর্শে এলোপাথাড়ি স্টেরয়েড খেয়ে চলেছেন বেশ কয়েক মাস।

চেষ্টা করছিলাম শান্ত থাকতে, রাগ করা অর্থহীন। ওঁরা এই অসুখের গুরুত্ব বুঝবেনও না।

অভিজ্ঞ একজন মেডিসিনের ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠাতে হবে। দরকার হলে হাসপাতালে ভর্তিও করতে হবে। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতেই বুঝতে পারছিলাম, মহিলা কিছু বলার চেষ্টা করছেন। অস্ফুট, গোঙানির মতো দুর্বোধ্য উচ্চারণে।

প্রথমে ভাবলাম, হয়ত, কোনো শারীরিক সমস্যার কথা বলতে চাইছেন।

কিন্তু না।

অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় যে কয়েকটি কথার মর্মোদ্ধার করা গেল, তার থেকে বুঝতে পারলাম হজ করতে যাবার অনুমতি চাইছেন!

হজ!

হজ করতে যাবেন, এই অশক্ত, অসুস্থ বৃদ্ধা! প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ, কখনো কলকাতা শহরেই হয়ত যাননি, তিনি যাবেন সুদূর সেই সৌদি আরবে? তাও আবার এই শরীর নিয়ে!

আমি হতভম্ব হয়ে মহিলার স্বামীর দিকে তাকালাম। সেই শ্বেতশুভ্র গোঁফদাড়ির আড়ালে স্মিত হাসি, আর দুটি শান্ত চোখ।

আমি কোনো রকমে বিড় বিড় করে বললাম—কিন্তু ওনার অবস্থা ভালো নয়, শরীরে রক্ত নেই। ভর্তি করতে হবে।

—দেড় মাস পরে করা যায় না,

ডাক্তারবাবু? যাওয়া আসা মিলিয়ে দেড়মাসও লাগবে না! করুণ মিনতি, সনির্বন্ধ।

আমি এবার কণ্ঠস্বরে একটু পেশাদারি কাঠিন্য আনার চেষ্টা করি।

—দেখুন, এই অবস্থায় যাওয়া মানে আত্মহত্যার সামিল। যদি কিছু হয়ে যায়, তার দায়িত্ব কিন্তু...

—হজে গিয়ে যদি মরেও যাই, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য ডাক্তারবাবু, অত পুণ্য কি করেছি? আল্লাহর রহমতে যদি... আমাকে অনুমতি দ্যান ডাক্তারবাবু... আমি যাই...

ক্ষীণ, দুর্বল কণ্ঠস্বরে, আশা আর বিশ্বাসে ভর করে কতগুলো অসংলগ্ন কথা।

বুঝলাম আমার সম্মতি-অসম্মতিতে কিস্যু যায় আসে না, ওঁরা যাবেনই।

—ঠিক আছে, যান। সাবধানে থাকবেন। কিছু হবে না। ওখানে তো ডাক্তার থাকবেন। দরকার হলে না হয়...। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলি।

আমার দুহাত জড়িয়ে ধরে, আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। আমি জানি চিকিৎসাশাস্ত্র মতে আমি একেবারেই সঠিক উপদেশ দিলাম না। কিন্তু, এই গ্রহে কখনো সখনো ঠিকটাই ভুল আর ভুলটাই ঠিক হয়ে যায়।

মাস দুই পর, ওরা আবার এলেন আমার চেম্বারে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, মহিলাকে এবার বেশ খানিকটা সুস্থ লাগছে।

—আপনার রুগি হারিয়ে গেস্‌ল ডাক্তারবাবু। পাক্কা তিন দিন। কত মানুষ ধাক্কাধাক্কি হল, কত মানুষ মরল। পেপারে পড়েছেন? টিভিতেও তো দেখিয়েছে বলল। তা, ও গেল হারিয়ে। ভাষা বোঝে না। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম বাবু। কিন্তু আল্লার রহমতে ফিরে পেলাম।

—না ডাক্তারবাবু, আমার সে ভাগ্য কই যে মক্কায় মরব? তোমার জন্য আমার মরা হল না ডাক্তার!

আপনি থেকে তুমিতে অবতরণ! নাকি উত্তরণ!

—আমার জন্য!

—নয়ত কী? সেই যে সেই শেষবার বললে না, কিছু হবে না, চলে যান। তো, সে জন্যই তো আল্লা নিল না। আমি বড় পাপী গো, হজে গেলাম, তাও মরা হল না।

—এইগুলো রাখেন।

খবরের কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট।

—খেজুর। মদিনা থেকে নিলাম। দুনিয়ার সেরা খেজুর। আপনার জন্য আপনার রুগি এনেছে।

মানুষটির স্মিত হাসিতে একটু হয়ত কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া। অথবা আমার নিছক কল্পনা।

□

পরের রোগীবাহিনীকে নাটকীয় বললে কমই বলা হয়! অতিনাটকীয় বা যাত্রা-পালা-গোত্রীয়ও বলা চলে! চরিত্রগুলির পরিচয় বলে দিতে হয় না।

নববিবাহিত এক দম্পতি, সঙ্গে সদ্যবিবাহিতার বাবা-মা। আমাকে হতচকিত এবং লজ্জিত করে বাবাটি সটান ডাইভ দিয়ে পড়লেন আমার পায়ে।

সেই সঙ্গে বাকিরাও!

মেয়েটির মাথার চুল উঠে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে 'দুরারোগ্য' ব্রণজনিত সমস্যা। সব পাত্রপক্ষ তাকে বাতিল করেছিল, অবশেষে আমার চিকিৎসায় সে নাকি সেরে ওঠে এবং পাত্রস্থ হয়।

চিকিৎসক হিসেবে এমন গল্পের সাক্ষী প্রায় রোজই হতে হয়। তাই এসবে খুব একটা বিগলিত হই না।

কিন্তু মেয়েটির বাবা-মা যখন উচ্চৈঃস্বরে, প্রায় বিলাপ করতে করতে আমার দীর্ঘজীবন কামনা করে কান্নাকাটি শুরু করলেন, তখন বিচলিত হতে হল। ওঁদের আবেগটা খাঁটি, কিন্তু আমার বিরক্তিটাও তো আর ভেজাল নয়।

দাঁতে দাঁত চেপে, ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে সহ্য করছিলাম। এবার হাতে এল একটি প্যাকেট।

—তারাপীঠের প্যাঁড়া স্যার! মহাপ্রসাদ!

শুনলাম সারা রাত উপোস করে ওঁরা সপরিবারে আজ ভোরে তারাপীঠে পুজো দেন। প্রসাদ নিয়ে, ঘণ্টা-তিন বাস-জার্নি করে আমার চেম্বারে আসেন। তারপর আরও ঘণ্টা পাঁচেক অপেক্ষা করে, আমাকে 'দর্শন' করে এইবার ওঁরা কিছু অন্নগ্রহণ করবেন, বাইরের ভাতের হোটেলে। এই পুরো ব্যাপারটাই নাকি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

আমার শহুরে, অর্ধ-বুদ্ধিজীবীসুলভ, অসূয়ক, উন্নাসিক তথাকথিত শিক্ষিত সত্তা গলে, ধসে, চুরমার হয়ে গেল এই কৃতজ্ঞতা, প্রত্যয় আর বিশ্বাসের জোড়া সুনামির ধাক্কায়!

সমস্ত দর্শকবন্ধুদের জানাই
শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

উর্বশী সিনেমা

ধাত্রীগ্রামী, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৫৬৪০২০৫৮৬

Sl. No. 29

সুনীলের রাতদিন

গীষ্পতি চক্রবর্তী

—ইনসিওরেন্স আছে?

—নেই।

—তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিন।

—এক মিনিট।

ছেলেটা কাউন্টার থেকে ছুটে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের কাছে যায়। কাউন্টারের ওপার থেকে মেয়েটা লক্ষ করে, হাত-পা নেড়ে ছেলেটা ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু কথা বলাবলি করে। প্রায় ছুটতে ছুটতে আবার কাউন্টারে আসে।

—ম্যাডাম, তিরিশ হাজার টাকা এনেছি আমরা। বুঝতেই পারছেন, হঠাৎ ইমার্জেন্সি!

মেয়েটি হাত তুলে ইশারায় ছেলেটিকে থামতে বলে। রিসিভার তুলে কাকে ফোন করে। ছেলেটা ধৈর্য ধরে রাখতে পারে না। প্রায় চিৎকার করে বলে—ম্যাডাম, বাবার অবস্থা সিরিয়াস। পেশেন্টকে অন্তত ভেতরে নিয়ে যান।

—দেখুন, ওপর থেকে পারমিশন না পেলে আমাদের করার কিছু নেই।

—ততক্ষণে পেশেন্টের যদি কিছু হয়ে যায়?

মেয়েটি নরম সুরে বলে—আমরা আটমোস্ট চেষ্টা করছি। কিছু নিয়ম তো করপোরেট হাসপাতালে ফলো করতেই হয়।

—ম্যাডাম, পাড়ার ডাক্তার বলেছে বাবার স্ট্রোক হয়েছে, আনকন্সাস। বাবা ভালো নেই। এক্ষুণি ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু না করলে...

মেয়েটা ততক্ষণে আবার ফোন তোলে। ওপর থেকে সম্মতি পেয়েছে পেশেন্ট ভর্তি করার। সে মাইক্রোফোনে হাসপাতালের স্টাফকে ডাকে। ইউনিফর্ম পরা ক-জন শক্তসমর্থ লোক এগিয়ে আসে। মেয়েটির নির্দেশে তারা অ্যাম্বুলেন্সের দিকে ছুটে যায়।

মেয়েটি হাত তুলে ছেলেটিকে ডাকে। ছেলেটি কাউন্টারে পৌঁছে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটির দিকে। —এখানে সই করুন। বাকি টাকা কাল সকালে জমা করতে হবে। দেখুন, ওপর থেকে আমার কথায় পারমিশন দিয়েছে পেশেন্ট ভর্তির। কথার খেলাপ করবেন না। আমার বিপদ হয়ে যাবে। মোবাইল নম্বরটা লিখুন। দুটো

নম্বর দিলে ভালো হয়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল। কলকাতার পশ্চিম আকাশ আজ লাল হয়ে আসছে। বিকেলটা শান্ত। দুপুরে দু-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভাদ্র মাস। পুজোর ছোঁয়া শহরের গায়ে। রুগিকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার পর বাকিরা দাঁড়িয়ে রইল বাইরে। রুগির বাড়ির একজনকে ভেতরে যেতে দিল গেটের দরোয়ান। সে ভেতরে গিয়ে বুঝে নেবে প্রয়োজনীয় টুকিটাকি। বেড নম্বর, আইসিইউ কোন দিকে, কততলায় রুগির ঠাঁই হল—সব বুঝে সে এসে জানাবে বাইরে উৎসুক আর সবাইকে। এরকমই ব্যবস্থা এইসব হাসপাতালে।

ছেলেটা শুধু জানাল, এখন জুনিয়র ডাক্তার, ডা. অনিকেত রায় রুগি দেখছে। বেশি রাতে আসবেন সিনিয়র ডাক্তার।

□

সনীল, মানে ডা. সুনীল ঘোষ খালের ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল পড়ন্ত বেলার আকাশ। কালো হয়ে আসা গাছপালা স্থির ছবির মতো ঘিরে আছে ওকে। মাঠে জল দাঁড়িয়ে আছে। চারদিক ভেজাভেজা। সূর্য ডুবছে। ধীরে ধীরে এবার আঁধার ঘিরে ধরবে সবকিছু চারদিক থেকে। মাঝে মাঝে সুনীল এখেনে এসে দাঁড়ায়। বেশ লাগে ওর। নিঃস্তব্ধ চারিদিক। কেউ কোথাও নেই। কখনও কেউ এপথে এসে পড়লে অবাক হয়ে তাকায় ওর দিকে। হয়ত বলে, কী ব্যাপার ডাক্তারবাবু? এখানে, একা? ও কিছু বলে না। শুধু হাসে। রাত গভীর হওয়ার আগে ফিরে আসে ও।

আজ নিত্যগোপাল এসেছে ওর কোয়ার্টারে। বাইরে সিঁড়িতে বসে। নিত্যগোপালের বয়স ষাট পেরিয়েছে। সুনীলকে দেখে উঠে দাঁড়ায়। দরজা খোলে সুনীল। দুজনে একসঙ্গে ঘরে ঢোকে। সুনীল একা থাকে কোয়ার্টারে। বিয়ে করেনি। নতুন চাকরি পেয়েছে। প্রায় এক বছর হতে চলল। আরও একজন ডাক্তার ছিল। সে না বলে কয়ে চলে গেছে মাস কয়েক হল। তারপর নতুন কেউ আসেনি। কোনোরকমে একা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

—কোথায় ছিলে ডাক্তার? নিত্যগোপাল জানতে চায়।

—খালের ধারে।

—ও জায়গাটা ভালো না।

—কেন?

হাসে নিত্যগোপাল, বলে—ভূত আছে?

—ভূত? নিত্যদা, তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

—চারিদিকে কত ভূত! এই তো সেদিন এসেছিল তোমার ওপর হামলা করতে। এটা নেই কেন, ওটা নেই কেন? রুগি ভর্তি হবে না তো যাবে কোথায়? দিদিমনি কই—কত কী? উপরি আছে, খিস্তি। এসব সহ্য হয়, ডাক্তারবাবু?

আনমনা হয়ে যায় সুনীল। কেন পড়ে আছে এখানে? চিকিৎসা করার সুযোগ কতটুকু? ওষুধ, স্যালাইন, অক্সিজেন, সবকিছুরই অপ্রতুলতা। বোঝাতে বোঝাতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। বোঝানো শেষ হয় ঝগড়ায়। প্রতিদিন এই ব্যাপার। সত্যিই তো! কেন পড়ে আছে এখানে?

সম্বিত ফেরে নিত্যগোপালের ডাকে।

—কী ভাবছো ডাক্তার? গ্রাম কি আর আগের মতো আছে? কত বদলে গেছে। আমি মুখ্যু মানুষ। বুঝতে পারি না। শুধু মন বলে—ভালো নয়, ভালো নয় চারদিকের বাতাস। কী যেন ভর করেছে বাতাসে।

—ভূত, ভূত ভর করেছে। বলে সুনীল।

—খালের ধারে বড় বটগাছটা চারিদিকে ঝুরি নামিয়ে ঘিরে রেখেছে অনেকটা জায়গা। লোকে বলে, ভূত আছে ওখানে। বুঝলে ডাক্তার, আমাদের ছেলেবেলা—সে অনেকদিন আগের কথা। তখন কারা রাতে রাতে আসত-যেত গাঁয়ে। দিনে মাঝে মধ্যে দেখা মিলত। একজন একদিন আমাদের বাড়িতে দুপুরে খেল। মুখ ভর্তি দাড়ি। বেশ মনে আছে। আমার দাদার বয়সী হবে। কত কথা বলল সে সন্ধেবেলায়। বাড়ির চাতালে জড়ো হয়েছিল অনেকে। মিটিং হল। চারিদিক কেমন অন্যরকম হয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। কিসের যেন আভাস। ফিসফিসানি, বড়দের ধমক, এদিক ওদিক না যাওয়ার ফরমান। শুনলাম, জমি নিয়ে কীসব কাণ্ড হবে। বুঝিনি কিছু। শুধু আঁচ করছিলাম, হবে একটা কিছু। নতুন নতুন মুখ, অচেনা লোকের আনাগোনা বেড়ে গেল। তারপর এক রাতের বেলায় চারদিকে বোমার গন্ধ, পুলিশের বাঁশি। বড়রা হুটহাট বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মেয়েরা আর আমাদের মতো ছেলেমানুষেরা পড়ে রইল ঘরে। এরকম চলত মাঝেমধ্যেই। শুনতাম, পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে এপাড়ার, ওপাড়ার কজনকে। আমার দাদাও ধরা পড়ল একদিন। বাড়িতে সব চুপচাপ। মা চোখ মোছে লুকিয়ে। সারা দিন চলত বাবার গুজুর-গুজুর—উচ্ছন্নে গেছে দেশটা, হতভাগা কার পাল্লায় পড়ল? একেবারে হাজতবাস! বাবুর লড়ার শখ। বড়লোকদের সঙ্গে লড়তে গেল, হাঁদা কোথাকার। এখন আমাকে ছুটতে হচ্ছে ধম্মের ষাঁড়কে ছাড়াবার জন্য। মনে পড়ে বাবার এসব কথা। বুঝলে ডাক্তার?

—চা খাও। সুনীল চা এগিয়ে দেয় নিত্যগোপালের দিকে।

—আচ্ছা নেত্যদা, সেসব হুজ্জুত বাঁধানো লোকগুলোর ওপর রাগ হত না?

—ছেলেগুলো আমার দাদার মতো। ওদের ভালো লাগত। কেন লাগত, তা জানিনা। শুধু মনে হত, এরা কিছু একটা করছে, যেটা অন্যরকম।

—ওদের মধ্যে কেউ কেউ ওই হুজুগে খতম হয়নি?

—হয়েছিল বটে। একদিন দুপুরে চারিদিকে খুব গোলমাল। বেলা যত গড়াতে লাগল, ঝামেলা বাড়তে লাগল। কার জমি নাকি দখল হবে। ওঃ! সে এক কাণ্ড বটে। লাঠি, টাঙ্গি, সড়কি নিয়ে একদল লোক বিকেলে নেমে পড়ল মাঠে। আর একদল এল তাদের তাড়াতে। আমরা প্রথমে পিছু পিছু গিয়েছিলুম রগড় দেখতে। তারপর বড়রা লাঠি নিয়ে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল বাড়িতে। রাতে চলল বোমাবাজি। শুধু বুঝলাম, আজ চারিদিকে গোলমাল। বড় ছেলেরা কেউ বাড়িতে নেই। ভোরবেলা শুনলাম—লাশ পড়েছে। ওই বটগাছের নীচে। ছুটলাম আর সব বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে লাশ দেখতে। চারিদিকে ভিড়। পুলিশভ্যান। এলাকার সব লোক ঢল দিয়ে নেমেছে লাশ দেখতে। আমিও দেখলাম।

একটু চা মুখে দিয়ে থামল নিত্যগোপাল।

—তারপর?

—ডাক্তার, তোমার বয়সী একজন। উপুড় হয়ে পড়ে। পিঠে রক্তে ভিজে সাদা জামাটা লেপ্টে আছে। চ্যাংদোলা করে গাড়িতে লাশ তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। তারপর থেকে রটে গেল—ভূত আছে ওই বটগাছে। রাতে কেউ কেউ দেখেছে ছেলেটাকে। সাদা জামা পরে আবছা চেহারা, ঘুরে বেড়াচ্ছে বটগাছের নীচে। মনে পড়ে, একদিন ওই বটগাছের গোড়া থেকে পুলিশ এসে এক বস্তা বোমা নিয়ে গেল। শুনলাম, আমাদের গ্রামে নাকি বোমার কারখানা আছে।

□

অনিকেত দেখতে পেল ছেলেটাকে। কী মনে করে ইশারায় ডাকল।

—আপনি তিন নম্বর বেডের, আই

মিন, আইসিইউ-র তিন নম্বর বেডের রুগির পার্টি?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনার কে হন উনি?

—বাবা।

—আজ থার্ড ডে। জ্ঞান ফেরার তেমন লক্ষণ নেই। কী ভাবছেন?

—বুঝতে পারছি না স্যার।

—বিল দেড় লাখের কাছাকাছি হয়ে গেছে।

—জানি স্যার। ধার করতে হবে এবার।

—এভাবে টানতে পারবেন?

—জানিনা স্যার। কোথায় যাব?

—কেন, সরকারি হাসপাতাল তো আছে।

—ওখানে গেলে বাবা বাঁচবে না।

—বহু লোক তো সরকারি পরিষেবা নিচ্ছে।

—ধরা করা না থাকলে ওখানে কিছু পাওয়া কঠিন।

—মামা-কাকা কেউ নেই?

—আমরা নেহাতই সাধারণ মানুষ। বাবার একটা ছোটো মুদির দোকান। বুঝতেই পারছেন।

—এখানে আসতে কে বলল?

—আমাদের পাড়ায় লোক আছে স্যার। সব ব্যবস্থা করে দেয়। ভেলোর অবধি নিয়ে যায়। কোথায় কোথায় ভালো, বড় ডাক্তার আছে সব জানে। ওর সাহায্যেই সব ব্যবস্থা। নইলে এই কোলকাতায় আমরা কি পারি?

—যাই হোক, আপনার বাবার যা কন্ডিশন, কবে জ্ঞান ফিরবে বলা সম্ভব নয়। আবার এভাবে দিনের পর দিন টেনে যাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভেবে বলবেন।

অনিকেত আর দাঁড়ায় না। পা বাড়ায়। ছেলেটা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে হাসপাতালের আলোমাখা কড়িডোরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া অনিকেতের পিঠের দিকে।

□

সুনীল তৈরি হচ্ছে হাসপাতালের আউটডোরে যাবে বলে। মোবাইলটা বেজে উঠল। কার কল? ওঃ অনিকেত?

—বল, কী খবর?

—এমনি, মনে হল ছাগলটা গ্রামে বসে কী রাজকাজ করছে দেখি।

—কী আর করব? আউটডোর ঠ্যাঙাতে যাচ্ছি। তোদের তো এসব নেই। ভালোই আছিস। দু-দিন এখানে ডিউটি দিয়ে যা। আমি তোর জায়গায় একটু সেন্ট্রাল এ.সি-র হাওয়া খেয়ে আসি।

—ক্ষেপেছিস? ওই চক্করে আমি নেই। বেশ আছি ইয়ার। তুই জনসেবা কর। গরমে ঘেমে, নেয়ে হাউস-স্টাফ্‌শিপ করেছি। ওদিক আর মাড়ায়? তোদের মতো দু-চারটে ছাগল আছে সরকারি পরিষেবা টানার জন্য। টেনে যা যদ্দিন পারিস।

—বাদ দে ওসব কথা। তোর বাড়ির খবর কী? মাসিমা, মেসোমশাই, সব ভালো?

—সবাই ভালো আছে। চলে আয় একদিন ছুটি নিয়ে।

—ছুটি? আমি একা চালাচ্ছি। শোন অনি, ওদিকে চ্যাঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। রাতে কল করব।

সুনীলের কোয়ার্টার থেকে হাসপাতাল, একটুখানি পথ। ওই পথটুকু পার হতে ঘামে ভিজে যায় সুনীলের পিঠ। হাঁটতে হাঁটতে ওর মন বলে—ভুল করলাম? সরকারি চাকুরে ডাক্তার হয়ে গ্রামের মানুষের কাছে এসে? লোকে ওকে শোনায়, পয়সা থাকলে মরতে কে আসে হেল্‌থ সেন্টারে? গরিব, তাই দুটো ট্যাবলেটের জন্য হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে আছি—এসব শুনতে হয় ওকে। হতাশা এসে গ্রাস করে ওর মনকে। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যায় সুনীল।

ভিড় ঠেলে টেবিলে পৌঁছে দেখে, এক বুড়ো উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে।

—কী হয়েছে?

বাচ্চা কোলে এক বছর পঁচিশ-তিরিশের মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল—দেখছো না, বুড়ে হেগে হেগে কেমন নেতিয়ে গেছে। কাল থেকে হাগছে।

—তোমার কে?

—কে আবার, বাপ।

সুনীল নীচু হয়ে রুগি দেখে। চোখ গর্তে ঢুকে গেছে। সাড়া প্রায় দিচ্ছে না বললেই ভালো। পাল্‌স প্রায় না পাওয়ার মতো।

স্যালাইন দিতে হবে। মনে মনে ভাবে সুনীল। একজন জিডি-কে ডাকে। রুগিকে বেডে নিয়ে গিয়ে স্যালাইন দেওয়ার মৌখিক নির্দেশ দেয়। ওদিকে মেয়েটা সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—ও দিদিমণি, ও দিদিমণি। করোগো তাড়াতাড়ি। বাপ মলে মুখে মুড়ো ঝাঁটা দেব। আরে ওই মিনসে মালখোর, বাপ যদি মরে যায় তোর মাল খাওয়া ঘুচোবো।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে ওঠে—অ্যাই ক্ষেপি, মুখ খারাপ করিস না থাম্‌। কাজ করতে দে। মেয়েটা দ্বিগুণ শক্তিতে চেঁচাতে থাকে—কে রে বাপের ব্যাটা? ইদিকে আয়। তুর মা ক্ষেপি, তুর গুষ্টি ক্ষেপি।

ওদিক থেকে আবার একজন টিপ্পনি কাটে—ক্ষেপি বাপকে ধর। বকবকানি থামা।

—তু ধর তুর বাপকে, হারামির বাচ্চা।

চেঁচামেচির ধাক্কায় কটা বাচ্চা চিলচিৎকারে কাঁদতে থাকে। মাথায় ওঠে সুনীলের আউটডোর। টেবিল ছেড়ে উঠে সবাইকে ধমকে দিতে যায়। প্রচুর কথা, গালাগালি স্রোতের মতো ভাসিয়ে দেয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে। এভাবে বেলা দুটোয় শেষ হয় আউটডোর। সুনীল দেখে মেঝেতে শুয়ে সেই বুড়ো। সিস্টার স্যালাইন চালিয়েছে। বুড়োর পাশে ঝিমুচ্ছে সেই মুখরা মেয়েটা। কোলের বাচ্চা ঘুমে কাতর। বাচ্চার মাথাটা কাত হয়ে আছে একদিকে। এভাবেই কাটে সুনীল ডাক্তারের দিন। মাসের পর মাস একই ছবি প্রদর্শনী।

□

তিন নম্বর বেড ফাঁকা। সিস্টারের কাছে জিজ্ঞাসা করে অনিকেত জানতে পারে রুগির বাড়ির লোক ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। অনিকেত বোঝে পকেটে টান পড়েছে, তাই কোনো সরকারি হাসপাতালে বা কম খরচের কোনো নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে ওই রুগিকে তার বাড়ির লোক। এসব কর্পোরেট হাসপাতাল ইন্সিওরেন্স করা লোকেদের জন্য। আর একদল লোক, যাদের পয়সার লেখজোখ নেই, তারা আসে এখানে। মাঝে মাঝে সারা শরীরের সব যন্ত্রপাতি ঝাড়পোঁছ করতে এইসব লোকেরা আসে। কর্পোরেট হাসপাতালে এদের বাড়তি খাতির। যে এসব জায়গায় বিনা প্রশ্নে টাকা ঢালতে পারে, তার বাড়তি আদর। ঘড়ি দেখে অনিকেত। আজ অনেক কাজ ওর। এই হাসপাতালে নতুন একটি উইং খোলা হবে কদিনের মধ্যে। চারিদিকে সাজোসাজো রব। বিদেশ থেকে একজন সাহেব ডাক্তার আসবে ফিতে কাটতে। এ ব্যাপারে অনিকেতের বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে। ওর এক আত্মীয় লন্ডনে থাকে। তার মাধ্যমে অনিকেতই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে ওই ডাক্তারের। ফলে ওর বাড়তি দায়িত্ব,

বাড়তি খাতির। বড় বড় হোর্ডিং শোভা পাচ্ছে কলকাতার ব্যস্ততম জায়গায়। বড় কাগজে প্রচুর খরচ করে 'অ্যাড' দেওয়া হচ্ছে—'এবার আপনি হাত বাড়ালেই পাবেন বিদেশি ডাক্তারের সাহায্যের হাত'। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খরচ করতে কসুর করেনি। এরা মানুষের মন বোঝে। এরা ভালো করেই জানে, এদেশে গ্রামের ডাক্তারের চেয়ে শহরের ডাক্তারের কদর বেশি, দেশি ডাক্তারের চেয়ে বিদেশি ডাক্তার অনেক আদরের। ঘনিষ্ঠ আলাপচারিতায় কর্পোরেট হাসপাতালের কর্তারা বলে, পাবলিক 'খাবে' সেন্ট্রাল এসি, নামি যন্ত্রপাতি, বিদেশি ডাক্তার, আরও আরও উন্নত আধুনিক পরিষেবা। ওরা পাবলিককে তাই-ই 'খাওয়ায়'।

অনিকেত ছুটছে আইসিইউ-র এক বেড থেকে আর এক বেডে। সব রোগীর সব তথ্য ঠিকঠাক দেখানো আছে কিনা, কার্ডিয়াক মনিটর ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা, সব বুঝে নেয়। সিস্টারদের টুকিটাকি নির্দেশ দেয়। তারপর নেমে আসে নীচে লাউঞ্জে। কফি শপে গিয়ে বসে। অন্য দু-একজন ডাক্তারের সঙ্গে হাই, হ্যালো করে। মনে পড়ে সুনীলের কথা। একটা এসএমএস করে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে। উদ্বোধনের দিন আসুক ও। নিজে চোখে দেখুক চারিদিকে কত পরিবর্তন হচ্ছে। এগিয়ে চলেছে সবকিছু। ছেলেটা পড়ে আছে সেই মান্ধাতার আমলে। সুনীলের জন্য অনিকেতের মনের কোথায় একটা দুর্বলতা আছে। পড়বার সময় হস্টেলে এক ঘরে থাকত ওরা। একটু লাজুক, মুখচোরা ছেলেটার জন্য মনে একটা দুর্বল জায়গা তৈরি হয়েছিল ওর। সময়ের তালে তালে ওরা ছড়িয়ে, ছিটকে গেল নানাদিকে। যোগাযোগ শুধু মোবাইলের দৌলতে। ওর ইচ্ছে, ওরা দু-জনে এই হাসপাতালে কাজ করবে পাশাপাশি। মন খুলে দুটো কথা বলা যাবে। দিনের শেষে একটু আড্ডা, কখনও রবীন্দ্রসদন, গঙ্গার ধার, কখনও স্রেফ গল্প করে কাটানো যাবে কিছুটা সময়। এখানে অনিকেতকে মেপে কথা বলতে হয়, মেপে হাসতে হয়, মেপে ডাক্তারি বিদ্যার প্রয়োগ। চারিদিক সামলে, কথার মুখে লাগাম পরিয়ে, মাপা জীবনের সাজানো কুঠুরিতে ওর মন হাঁপিয়ে ওঠে। এই সাজানো গোছানো ব্যাপারটাকে খারাপ তো বলা যায় না। তবু কেন যে ওর মন এর মধ্যে সুখ খুঁজে পাচ্ছে না তা ও নিজেও বুঝতে পারে না। কে জানে, হয়তো মনের অসুখে পড়েছে ও। ও জানত, এসবের মধ্যেই জীবন সার্থক। এখন ও বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কী? সব আছে, তবু কিছু একটা নেই। ব্যাপারটা ওর নিজের মনের অসুখ হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে অনিকেত।

□

গোলমাল শুরু হয়েছে গ্রামে। নিত্যগোপাল সাবধান করে দেয় সুনীলকে। খালের ধারে সন্ধ্যার মুখে ও যেন না যায়। ফাঁকা জায়গা। সুযোগ পেয়ে পুরোনো রাগ কেউ উশুল করতেই পারে। আউটডোরে কথা কাটাকাটি, ঝামেলা লেগেই থাকে। ডাক্তারের ধমক-ধামক খেয়ে অনেকেই তখনকার মতো চুপ করে যায়। হয়তো রাগ পুষে রাখে। হয়তো তার হিসেবে ধমক তার পাওনা ছিল না। ডাক্তারের 'অন্যায়' ধমকের জের ধরে ফাঁকায় একা পেয়ে হাঁসুয়া চালিয়ে দিলেই হল। কে দেখতে যাচ্ছে? গ্রামের এসব ব্যাপার নিত্যগোপালের হাতের তালুর মতো চেনা। সুনীল এখানে নেহাতই ছেলেমানুষ। রক-রাস্তার ভাষায় যাকে বলে নাদান। হাসপাতাল সামলানো দিনকে দিন কঠিন হয়ে উঠছে সুনীলের একার পক্ষে। গাঁয়ের গোলমালের আঁচ পাওয়া যায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভেতর-বাইরে। যে-যার মতো আসে-যায়। সুযোগ বুঝে ফাঁকি বাড়তে থাকে। অসহায় লাগে সুনীলের। সামনে কিছু না বললেও, সুনীল বোঝে, ওর অসহায়তা উপভোগ করে কিছু কর্মচারী। মোটরসাইকেলে মাঝে মাঝে দু-একটা ছেলে-ছোকরা পান চিবোতে চিবোতে, চোখে কালো চশমা পরে এসে দাঁড়ায় স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সামনে। হুটহাট ঢুকে পড়ে ভেতরে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। একদিন সুনীলের মুখোমুখি হয়ে হাত তোলে আধো নমস্কারের ভঙ্গিতে। জানতে চায়—সব ঠিকঠাক আছে? সুনীল কোনো কথা বলে না। শুধু ঘাড় নাড়ে। ছেলেগুলোর মুখে মদের গন্ধ। মদ খেয়ে হাসপাতালে ঢোকা যায় না। কে বলবে? নিত্যগোপাল ওকে বারবার সাবধান করে। কিছুদিন চুপচাপ থাকতে বলে ওকে, গাঁয়ের গোলমাল মিটুক। তারপর নিয়মকানুনের কথা।

সেদিন সকাল থেকে টানটান উত্তেজনা। সুনীল খবর পায়, মারপিট হয়েছে দু-দলে। সম্পত্তি নিয়েও ঝামেলা। শেষমেশ গড়িয়েছে রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জারে। শরিকি বিবাদ, রাজনীতি, পাড়া-সেন্টিমেন্ট, সব নিয়ে এক জটিল অবস্থা। কে বোঝাবে কাকে? একটা বছর পনেরোর ছেলে, খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা, ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—জোর মারপিট। মাথা ফেটেছে অনেকের। হাসপাতালে আসছে সব। উত্তেজনায় ফুটছে ছেলেটা। প্রথম খবর দেওয়ার তৃপ্তি ওর চোখে-মুখে। এক ছুটে বেরিয়ে গেল ছেলেটা। দৌড়ল ঝামেলার দিকে।

আধঘণ্টার মধ্যে প্রায় মিছিল করে এলো এক দঙ্গল লোক। ভ্যানে করে এলো আহতরা। দুজনের মাথা ফেটেছে। আর দু-জন বোধহয় চাকু খেয়েছে। রক্তে ভেজা সকলের জামা-গেঞ্জি। সিস্টারকে সেলাইয়ের সরঞ্জাম জোগাড় করতে বলে রুগি দেখতে শুরু করল সুনীল। আগে দেখতে হবে হেড ইনজুরি আছে কি না।

ততক্ষণে মাঠের মধ্য দিয়ে আর একদল লোক এগিয়ে আসছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে। হাতে লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি। হাসপাতাল চত্বর মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। প্রথমে কেউ ভেতরে ঢোকেনি। মারপিট, গালাগাল চলতে থাকে হাসপাতাল চত্বরে। তারপর বাঁধ ভেঙে যায়। ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর শুরু করে একদল লোক। কিছু বোঝবার আগে কোথা থেকে এক টুকরো ইট এসে লাগে সুনীলের মাথায়। কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নামে। জিভ চাটতে গিয়ে রক্তের স্বাদ পায় সুনীল। এরই মধ্যে কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে আসে নিত্যগোপাল। সিস্টার, জিডিএ, ঝাড়ুদার, সব স্টাফ, যে যেদিকে পেরেছে দৌড়চ্ছে। বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল সুনীল। ওর হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দেয় নিত্যগোপাল।

—হাঁ করে দেখছ কী? জান দেবে নাকি? সম্বিত ফিরতেই নিত্যগোপালের সঙ্গে ছুটতে থাকে সুনীল। এক ছুটে পৌঁছায় কোয়ার্টারে। ভেতর থেকে বন্ধ করে দরজা। দড়াম করে পড়ে চৌকিতে। মাথার রক্ত মুছতে থাকে। 'কাপড় দিয়ে কাটা জায়গাটা চেপে ধরো নিত্যদা'—বলে সুনীল। ওর কথামতো ক্ষতটা কাপড় দিয়ে চেপে ধরে বসে থাকে নিত্যগোপাল।

□

এই সন্ধেটা অনিকেতের মনে থাকবে অনেকদিন। ঝলমলে আলো, রঙিন বেলুন, রঙিন কাগজে সাজানো নতুন উইং-এর উদ্বোধন হল এই হাসপাতালে। বহু মান্যগণ্য মানুষের সমাবেশ। এত মানুষের মধ্যে হাপাতালের ডিরেক্টর তাঁর বক্তৃতায় ডা. অনিকেত রায়ের নাম নিজ মুখে বলেছেন। ব্যাপারটা ওঁকে কেউ আগে বলেনি। ওকে অবাক করে দেবে বলে

ডিরেক্টর স্বয়ং বিষয়টা পাঁচকান করেননি। ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন ডিরেক্টর। সাহেবকে এখানে ফিতে কাটতে আনায় ওঁর সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন উনি। এর পাশাপাশি ওর ডেডিকেশন, ইনস্টিটিউটের প্রতি ভালোবাসা, রুগির প্রতি যত্ন ইত্যাদির উল্লেখ করে ওকে হতবাক করে দেন উনি। সাহেব ডাক্তারের সাহায্যে আরও কজন ডাক্তার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আসবেন এখানে। সাংবাদিকদের হুড়োহুড়ি, টিভি চ্যানেলের লোকেদের ছুটোছুটি, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির পর্ব শেষ হয় একটু বেশি রাতে। নিজের ঘরে ফিরে স্নান করে রাতের খাবার খেয়ে নেয় অনিকেত। টিভি চালিয়ে খবর শুনতে শুনতে ওর মনে পড়ে সুনীলের কথা। অনিকেত দেখে, আজকের খবরে ওরা ভালো কভারেজ পেয়েছে। প্রথমে সুনীলকে কল করে। নো আনসার। এস.এম.এস. করে ও। আজকের সাফল্যের ছোট্ট খবর পৌঁছে যায় সুনীলের মোবাইলে।

□

পুলিশ সুনীলের কোয়ার্টারে কড়া নাড়ে। সুনীল নিত্যগোপালকে দেখতে বলে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে ওর মাথা ফাটার খবর পেয়ে সিস্টার, জিডিএ সহ আরও কজন জড়ো হয়েছিল ওর কোয়ার্টারে। সিস্টার ওর মাথায় চারটে সেলাই করে। ইঞ্জেকশন দেয়। পরিষ্কার করে, ভালো করে একটা ব্যান্ডেজ করে যত্ন করে। সিস্টার সুনীলকে বলে ওর বাড়িতে খবর দিতে। প্রথমে না না করলেও সবার চাপে দাদাকে মোবাইলে জানায়, সংক্ষেপে। মাথা ফাটার খবরটা মাকে বলতে নিষেধ করে। পুলিশ মামুলি দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে চলে যায়।

নিত্যগোপাল ঠায় বসে আছে। সুনীল মাঝে মাঝে তাড়া লাগায়—ও নেত্যদা বাড়ি যাও। রাত হচ্ছে। ধমক দেয় নিত্যগোপাল—থামো। শুয়ে থাকো চুপচাপ। রাতে খাবে কী?

—তুমি রাঁধতে বসকে নাকি? পাগলামো কোরো না। আমার হয়ে যাবে। একটা রাত। চলে যাবে।

—আজ আমি থাকবো। আলু-সেদ্ধ ভাত হয়ে যাবে দু-জনের।

—পারো তুমি নেত্যদা। তেমন কিছু হয়নি আমার।

—এখন তুমি রুগি। আমি ডাক্তার। চুপচাপ শুয়ে থাকো।

হেসে ফেলে সুনীল।

মাঝরাতে জ্বর আসে সুনীলের। ঘুম থেকে উঠে জ্বরের ট্যাবলেট খায়। ঠায় বসে আছে নিত্যগোপাল। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে সুনীল ওকে ডেকে তোলে। ও লজ্জা পায়।

—বাড়ি যাও নেত্যদা। পরে এসো না হয়। একটু চা খেয়ে নাও।

ওরা দুজন চা নিয়ে বসে। নিত্যগোপাল ওকে বাড়ি যাওয়ার পরামর্শ দেয়। কাল মাথা ফেটেছে। এরপর বড়সড় কিছু একটা যদি হয়ে যায়? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। চারিদিক ঠাণ্ডা হলে তারপর আসার কথা ভেবো। বোঝায় সুনীলকে। সুনীল অনিকেতের এস.এম.এস দেখে সকালে। আপন মনে একটু হেসে তাকায় নিত্যগোপালের দিকে।

—হাসলে?

—ও কিছু না। বন্ধু একটা খবর পাঠিয়েছে।

বেলার দিকে দাদার সঙ্গে ফিরে যায় সুনীল। নিজের বাড়িতে। কলকাতার আশপাশে শহরতলির বাসিন্দা সুনীল।

এরপর কেটে গেছে প্রায় ছ-মাস। ডাক্তারের অভাবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র ধুঁকছে। রুগি নেই, ডাক্তার নেই। কজন স্টাফ আসে-যায়। দু-একজন এলে টুকিটাকি যা পারে করে। ধুলো জমে হাসপাতালের ভেতরে-বাইরে। ডাক্তারের কোয়ার্টার ডুবে থাকে অন্ধকারে। হাসপাতালের ছাদে মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে কার এসে হুল্লোড় করে। মদের বোতল পড়ে থাকে হাসপাতাল চত্বরে। মাঝেমধ্যে জুয়ার ঠেক বসে। তাস পেটায় অনেকে। সিস্টার একে ওকে ধরে বদলি হয়ে গেছে অন্য হাসপাতালে।

নিত্যগোপাল দূর থেকে দেখে সবকিছু। ওর স্মৃতির ঝুলিতে সুনীল জমা হয়ে আছে। অনেকটা সময় কেটেছে ছেলেটার সঙ্গে। কোথায় আছে, কে জানে?

□

ভালো চলছে হাসপাতালের নতুন উইং। অনিকেতের কাজ বেড়েছে। দায়িত্ব বেড়েছে। ব্যস্ততার মধ্যে অনিকেত ভুলে গেছে, ওর বহুদিন আগের একটা এসএমএস-এর উত্তর ও আজও পেল না।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ কুন্তলিকা স্টেশনার্স

দত্ত সেন্টার, বর্ধমান

প্রো. নৃপেন্দ্রকুমার চৌধুরী

Sl. No. 38

With best compliments of

A
Well Wisher

Sl. No. 136

প্রবন্ধ

এক সুরশিল্পী ও এক বিজ্ঞানী

শামল চক্রবর্তী

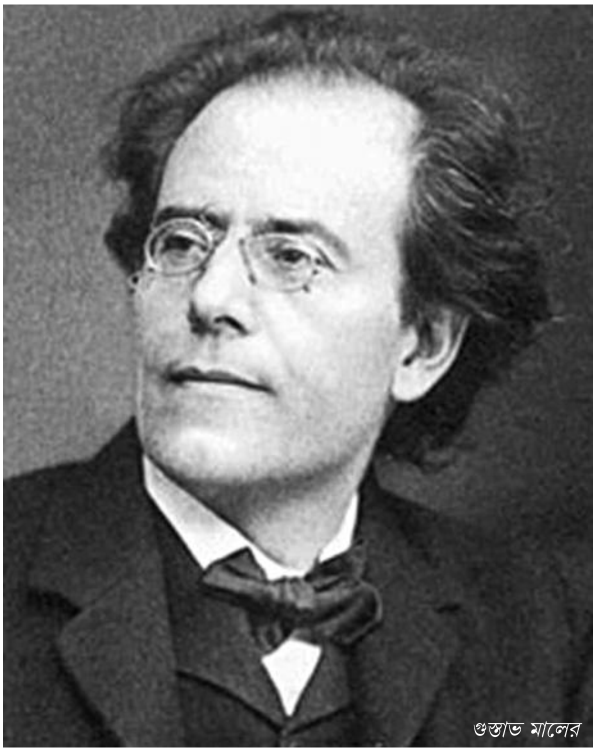
গুস্তাভ মালের

এক.

হারিয়ে যাওয়া মানুষ যিনি, তিনি আলাদা। তিনি বিজ্ঞানী। আর যাঁর কথা দিয়ে এই লেখা শুরু করব, তিনি কোনো হারিয়ে যাওয়া মানুষ নন। পশ্চিমি সঙ্গীতে আগ্রহী যে-কোনো মানুষই তাঁকে চেনেন। তাঁর নাম গুস্তাভ মালের। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই বোহেমিয়ায় জন্মেছেন। জায়গাটি এখন অবশ্য চেক প্রজাতন্ত্রে পড়েছে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১১ মে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় তিনি মারা যান। এঁরা ছিলেন ইহুদি। জার্মান ভাষায় কথা বলতেন। চিরকাল 'অবহেলিত' থেকে গিয়েছেন, এমনটাই গুস্তাভ বলতেন। পয়সাকড়ি বলতেও তেমন কিছু ছিল না বাবা বার্নহার্ড মালের। গুস্তাভের ঠাকুমা তাঁর বাবা বার্নহার্ডকে খুব কষ্ট করে বড়ো করেছেন। ঠাকুমা ফুটপাতের হকার ছিলেন। পরিশ্রম করতেন দিনরাত। ছেলে বার্নহার্ড-ও মায়ের কষ্ট দূর করতে পরিশ্রম করেছেন। প্রথমে ঘোড়ার গাড়ি চালাতেন। তারপর একটা সরাইখানার পাহারাদার হয়েছিলেন। বাবা রোজগার করে গাঁয়ে একটা ছোটোখাটো বাড়ি কেনেন। সংসার পাতেন সেখানে। গুস্তাভের মায়ের নাম মেরি মালের। চৌদ্দটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন মা। বড়ো ছেলে শৈশবেই মারা যায়। দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন গুস্তাভ। পরের বারো সন্তানের মধ্যে ছয় সন্তান শৈশবে মারা যায়।

গুস্তাভের বয়স তখনও এক বছর হয়নি। বার্নহার্ড ও মেরি একটা ছোটো শহরে চলে যান। পানীয়ের ব্যবসা শুরু করেন। শহরের বাসিন্দা ছিল কুড়ি হাজারের মতো। ছোটোবেলা থেকেই যে-কোনো সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ গুস্তাভকে আকর্ষণ করত। পথে গান হচ্ছে শুনলে ছুটে যেতেন। কোথাও নাচ দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। নানা লোকগানের সুর তার মনপ্রাণ ভরিয়ে তুলত। এমনকি স্থানীয় মিলিটারিরা যখন কুচকাওয়াজে বেরোত, কুচকাওয়াজের চেয়ে তাদের ব্যান্ড বাজনা তাঁর কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল।

গুস্তাভের বয়স যখন মাত্র চার বছর, তিনি তাঁর দাদুর পিয়ানো বাজাতেন। দশ বছর বয়সে গুস্তাভ শহরের এক থিয়েটার হলে পিয়ানো বাজান। শ্রোতারা তখন থেকেই তাঁকে 'বিস্ময় বালক' বলতে শুরু করে। সঙ্গীতের যাদুতে তিনি এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন, জিমনাসিয়ামের লেখাপড়ায় ভালো ফল হত না। বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন। ছেলে পড়াশুনো না করলে চলবে কেমন করে? এগারো বছর বয়সে গুস্তাভকে তিনি প্রাগের একটা নতুন জিমনাসিয়ামে ভরতি করে দেন। ভালো লাগেনি একদম, দিন কয় পরেই বাবা-মায়ের কাছে ফিরে এলেন। চোখের সামনে দেখলেন, অনেকদিন অসুখে ভুগে তাঁর ছোটো ভাই আর্নস্ট মারা গেল। গুস্তাভের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর। এই শোকে তিনি গান বাঁধেন। সুর রচনা করেন। বন্ধু যোসেফ স্টেইনারকে নিয়ে অপেরা তৈরি করেন। তাঁর সেই প্রথম অপেরার সুর আর কথা কিছুই বেঁচে নেই। কোথায় হারিয়ে গিয়েছে কে জানে! বাবার এক সময় ভুল ভাঙল। বুঝতে পারলেন বাবা, লেখাপড়ায় নয়, সঙ্গীতেই তাঁর এই সন্তান অনেক দূর যাবে। ভিয়েনা কনজারভেটরি-তে ছেলেকে জায়গা করে দেওয়া যায় কিনা তার খোঁজখবর নিলেন বাবা। আজ এর নাম বদলে নতুন নাম হয়েছে 'ইউনিভার্সিটি অব মিউজিক অ্যান্ড পারফর্মিং আর্টস, ভিয়েনা'। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান দ্বিশতবর্ষে পা দেবে। সাড়ে আটশো প্রশিক্ষক ও তিন হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে এই সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক ও চলচ্চিত্রের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য রয়েছে মোট চব্বিশটি বিভাগ। সারা পৃথিবী থেকে শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে। তার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তালিকা আমাদের বিস্মিত করে। অনেক ঝড়ঝাপটা অর্থকষ্ট অতিক্রম করে আজ এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বের দরবারে প্রশস্তির শিরোপা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

যাই হোক, বিখ্যাত পিয়ানোবাদক জুলিয়াস এপস্টাইন গুস্তাভের পিয়ানো বাজানো শুনে তাঁকে তাঁর ছাত্র হিসেবে ভরতি করে নেন। এপস্টাইন ভিয়েনা কনজারভেটরিতে ১৮৬৭ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেছেন।

১৮৭৫ থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গুস্তাভ এই সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। প্রথম দু-বছর শুধু এপস্টাইনের কাছে পিয়ানো বাজনা শেখেন। প্রতি বছর সেরা স্বীকৃতি পেয়েছেন। পরের দু-বছর তিনি নিজে কম্পোজিশন ও ছন্দের ওপর জোর দেন। তখন দুই শীর্ষস্থানীয় কম্পোজার রবার্ট ফুক্‌স (১৮৪৭-১৯২৭) ও ফ্র্যাঞ্জ ক্রেন (১৮১৬-১৮৯৭)-এর কাছে তালিম গ্রহণ করেন। নিজের সৃষ্টির প্রতি খুবই নির্মম ছিলেন গুস্তাভ। ছাত্রজীবনে যা সৃষ্টি করেছিলেন, পরিণত জীবনে ভালো লাগেনি বলে সব নষ্ট করে দিয়েছেন। তাঁর ছাত্রজীবনের কোনো কাজই প্রায় পাওয়া যায় না। পরে তিনি যাঁর কাজে সবচেয়ে বেশি ডুবে ছিলেন, সঙ্গীতরসিকেরা এক ডাকেই তাঁকে চেনেন। তিনি রিখার্ড ভাগনার। এই সঙ্গীতস্রষ্টাকে বাদ দিয়ে ইউরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণ হয় না।

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীতের ডিপ্লোমা নিয়ে গুস্তাভ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন। পরীক্ষা দিতে মন চাইছিল না। বাবার অনুরোধে পরীক্ষা দিয়ে কোনোরকমে পাশ করেন। সে-সময় গুস্তাভ প্রচুর সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়েছেন যা তাঁকে সঙ্গীত রচনার বেলায় সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণ শেষ হল তাঁর। এবার জীবন যাপনের সংস্থান চাই। এখানে ওখানে পিয়ানো শিখিয়ে রোজগার করছিলেন। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করলেন প্রথম স্মরণীয় কম্পোজিশন 'দ্য সঙ্‌ অব ল্যামেনটেশন'। সঙ্গীতবেত্তারা বলেছেন, ভাগনার ও ব্রুখনারের প্রভাব থাকলেও এই রচনায় গুস্তাভের নিজস্বতা ধরা যায়। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ গুস্তাভের শিল্পীজীবনের প্রথম পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তখন তিনি একাধিক ছোটোখাটো থিয়েটারে কাজ করেছেন। অপেরা তৈরি করেছেন। জুসেপ্পে ভার্দির বিখ্যাত অপেরা 'The Troubadour' তাঁকে খুবই জনপ্রিয়তা এনে দেয়। কম করে তিনি পঞ্চাশ বছরের বেশি এই অপেরা পরিবেশন করেছেন। ভিয়েনার বাইরে কাজ করলেও মাঝে মাঝে ভিয়েনায় এসে কিছু কাজ করে যেতেন।

শিল্পীর দ্বিতীয় পর্বে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল দুই বিখ্যাত শহর প্রাগ্‌ আর লিপ্‌জিগ। একের পর এক মোৎসার্ট ও ভাগনারের কম্পোজিশন তিনি নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন সে-সময়। রুশ কিংবদন্তী সঙ্গীত স্রষ্টা পিটার ইলিচ চাইকফস্কি গুস্তাভের পরিবেশনা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। জার্মান রোমান্টিক সঙ্গীতস্রষ্টা কার্ল ভেব্যর-এর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে পরিবেশন করে গুস্তাভ তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে ভেব্যর মারা গিয়েছিলেন। এক সময় জার্মান দার্শনিকেরা যেমন তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন, তেমনই জীবনের এই পর্বে জার্মান লোককবিতা তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। সহযোগীদের সঙ্গে সকল সময় তাঁর পক্ষে সদ্ভাব রাখা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের শেষে বুদাপেস্ট শহরে 'রয়াল হাঙেরিয়ান অপেরা'-র পরিচালক পদে মনোনয়ন পেয়ে তিনি সেখানেই চলে যান। এই সময় গুস্তাভ মেলার যে 'দ্বিতীয় সিম্ফনি' রচনা করেন তা তাঁকে অবিস্মরণীয় করে দেয়। 'অষ্টম সিম্ফনি' রচনা করেও তিনি একই রকমের খ্যাতি পেয়েছেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর বাবা বার্নহার্ড মারা যান। কয়েক মাস পরে এক বোন ও মা মারা যান। তিন প্রিয়জনের স্বল্প ব্যবধানের মৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে বিষণ্ণ করে তোলে। যাই হোক, বুদাপেস্টের পর গুস্তাভ হামবুর্গে যান। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে হামবুর্গের একদল শিল্পী নিয়ে তিনি ছয় সপ্তাহের সফরে লন্ডন যান। সেখানে শ্রোতাদের মন জয় করেন। পরে যখন লন্ডন থেকে তাঁকে আবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সঙ্গীত রচনার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানিয়ে দেন। যতই অর্থের হাতছানি থাকুক, বিশেষত সামারে তিনি অস্ট্রিয়া ছেড়ে কোথাও যেতে রাজি হতেন না। অসামান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে স্টাইনবাখ্‌-এ তিনি তাঁর 'সঙ্গীত রচনার ঘর' গড়েছিলেন।

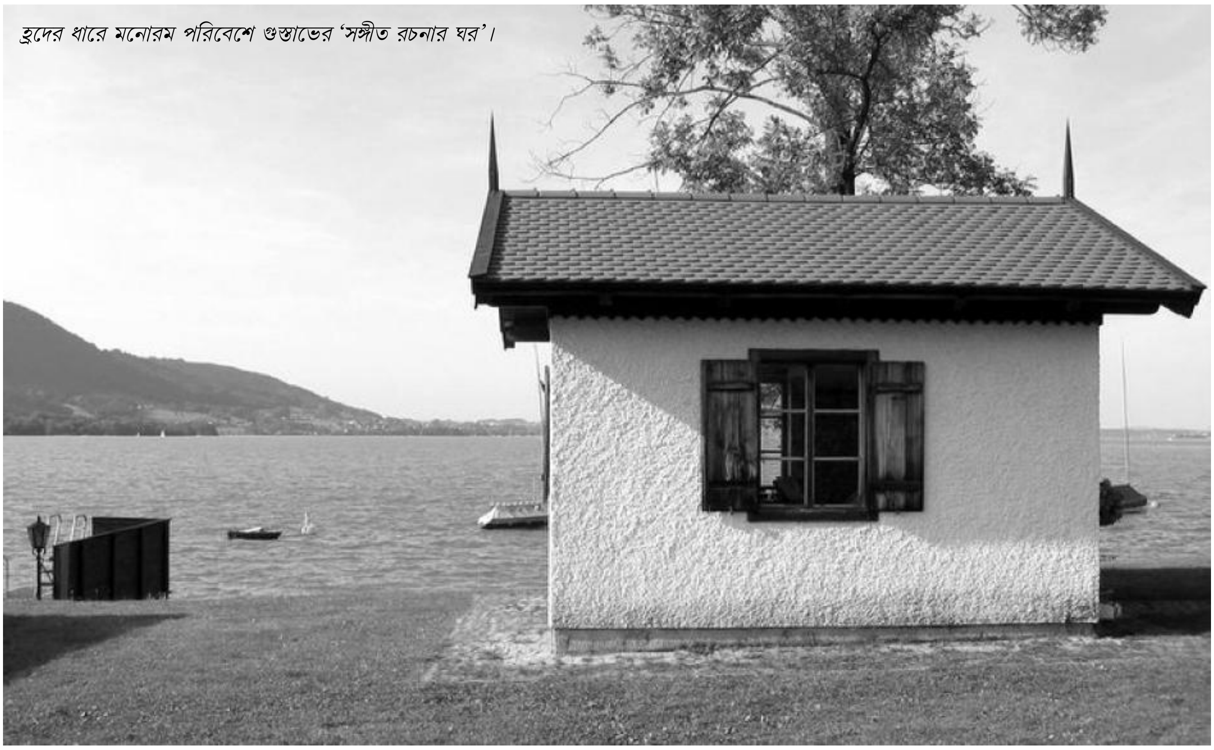

হ্রদের ধারে মনোরম পরিবেশে গুস্তাভের 'সঙ্গীত রচনার ঘর'।

বিশাল এক হ্রদের ধারে ছিল এই ঘর। প্রচুর সঙ্গীতে সুর দিয়েছেন গুস্তাভ এই ঠিকানায়।

শোকের তীব্র আবহ তাঁর জীবন থেকে পিছু হটছে না। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গুস্তাভের এক ভাই আত্মহত্যা করেন।

নানা জায়গায় ঘুরে কাজ করতে তাঁর মন চাইছিল না। তিনি ভিয়েনায় থেকেই কাজ করতে চান। ভিয়েনা থিয়েটারে পরিচালকের কাজ পেলেন গুস্তাভ। তারপর থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর জীবনের স্মরণীয় দশক (১৮৯৭-১৯০৭)। এ পদ লাভ সহজ ছিল না। যোগ্যতা যতই থাকুক, বড় 'অযোগ্যতা', তিনি একজন ইহুদি। যদিও ওই ধর্মের তিনি কোনো আচারই প্রতিপালন করতেন না। ভিয়েনা থিয়েটারের নাম ছিল 'ভিয়েনা কোর্ট অপেরা'। বিশাল তার ঐতিহ্য। বিখ্যাত অস্ট্রিয় ঔপন্যাসিক স্টেফান ৎসোয়াইক ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অব ইয়েস্টারডে' নামের স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'আটত্রিশ বছর বয়স্ক গুস্তাভকে যখন কোর্ট অপেরার পরিচালক করা হল, অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে।' পরে এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'এই গুস্তাভকেই যখন কেউ ভিয়েনার রাস্তায় দেখতে পেতেন, পরদিন গর্ব করে তার বন্ধুদের কাছে বলতেন। ভাবখানা এমন দেখাত যেন বিশ্ব জয় করে ফিরেছেন।' পৃথিবীর একজন সেরা পাণ্ডুলিপি সংগ্রাহক ছিলেন স্টেফান ৎসোয়াইক। গুস্তাভের লেখা পাণ্ডুলিপিও তাঁর সংগ্রহে ছিল। নাৎসিরা তাঁর লেখার তীব্র বিরোধী ছিল। তাঁর বইপত্র এরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের বলতে খারাপ লাগছে, যেদিন স্টেফান আত্মজীবনী লেখা শেষ করেন, তারপর দিন তিনি ষাট বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন।

'ভিয়েনা কোর্ট অপেরা'কে এক ভিন্নমাত্রায় উন্নীত করেছিলেন গুস্তাভ। সে কাহিনি বিশাল। বই লেখার দাবি রাখে। দেশবিদেশে গুস্তাভের খ্যাতি ছড়াতে থাকে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নিউইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরায় যোগ দেন তিনি। ওই বছর ১৪ অক্টোবর ভিয়েনা শহরে ৬৪৮-তম প্রযোজনা পরিবেশন করেন। তারপর আমেরিকায় চলে যান। তবে যাওয়ার আগে ২৪ নভেম্বর শেষ বারের মতো ভিয়েনায় 'দ্বিতীয় সিম্ফনি' পরিবেশন করেছিলেন।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে অল্প কিছুদিন 'ভিয়েনা ফিলহারমোনিক'-এ যোগ দিয়েছিলেন গুস্তাভ। যিনি জার্মান নন, তিনি জার্মানি-সঙ্গীত রক্ষা করবেন? বিতর্ক হচ্ছিল। তবে এখানে তাঁর ভালো কাটেনি। ওই সময় নিজের সঙ্গীত রচনায় অনেক বেশি মন দিয়েছিলেন গুস্তাভ। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে 'চতুর্থ সিম্ফনি' শেষ করেন। ১৯০১ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সিম্ফনি শেষ করেন। অবিস্মরণীয় 'অষ্টম সিম্ফনি' তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পয়লা জানুয়ারি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটান অপেরায় গুস্তাভ প্রথম তাঁর প্রযোজনা পরিবেশন করেন। ভাগনারের কম্পোজিশন পরিবেশন করেন তিনি। প্রাচীন চীন দেশের কবিতা নিয়ে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনায় বসে 'দ্য সঙ অব দ্য আর্থ' রচনা করেছিলেন। এর ধরন অনেকটা সিম্ফনির মতো। 'নিউ ইয়র্ক ফিলহারমোনিক'-এ তিনি একাধিকবার অনুষ্ঠান করেছেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে গুস্তাভ নেদারল্যান্ড সফর করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মিউনিখ শহরে 'অষ্টম সিম্ফনি' পরিবেশন করেন। যাঁকে গুস্তাভ বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন সঙ্গীতবোধ ও পরিবেশনায় পারদর্শী। অনেকে লিখেছেন, গুস্তাভ অনেকটা জোর করেই তাঁর পত্নী এলমা-র সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এসব কারণে সংসারজীবন সুখের ছিল না। মনোবিদ সিগমন্ড ফ্রয়েডের সঙ্গে কথা হয় গুস্তাভের। ফ্রয়েড জানান, এলমা-র শিল্পীজীবনে সীমানা টেনে তিনি সঠিক কাজ করেননি। সেকথা মেনে নেন গুস্তাভ। তিনি এলমাকে আবার সঙ্গীত জীবনে উৎসাহিত করেন। গুস্তাভ তাঁর প্রিয়তম ও সর্বাধিক বিখ্যাত 'অষ্টম সিম্ফনি' পত্নী এলমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তখন গুস্তাভের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। কার্নেগি হল-এ ইতালির সঙ্গীত নিয়ে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি জীবনের সবশেষ পরিবেশনা পেশ করেন। তখন তাঁর গায়ে ১০৪ ডিগ্রি জ্বর। ৮ এপ্রিল এলমা ও গুস্তাভ একজন সর্বক্ষণের সেবিকা নিয়ে প্যারিস শহরে যান। চিকিৎসা শুরু হয় তাঁর। ১১ মে ভিয়েনা চলে এলেন। ১৮ মে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যান। 'নিউইয়র্ক টাইম্‌স' লিখেছিল—'সমকালের এক শীর্ষস্থানীয় সাঙ্গীতিক ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান হল।'

দুই.

এবার এক বিজ্ঞানীর কথায় আসা যাক, যাঁর পরিচয় আমরা মাত্র অল্প কয়েক বছর আগে গুস্তাভের কারণেই খুঁজে পেয়েছি। গুস্তাভ ছিলেন ওই বিজ্ঞানীর নিবিড় বন্ধু। গুস্তাভের নথিপত্র খুঁজে বিজ্ঞানীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীর কোনো আলোকচিত্রও আমাদের ছিল না। গুস্তাভের বাড়ির সংগ্রহ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এতকাল আমরা একজন শিল্পীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখেই বিজ্ঞানীকে চিনেছি। এবার তাহলে বিজ্ঞানীর কথায় আসা যাক।

বিজ্ঞানীর নাম আর্নোল্ড বার্লিনের। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর জন্ম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ আশি বছর বয়সে বার্লিন শহরে তিনি মারা যান। তাঁর প্রয়াণের পর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ৫ সেপ্টেম্বর 'নেচার' একটি ছোটো শোকসংবাদ ছাপিয়েছিল। আর্নোল্ড মারা যাওয়ার প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস তখন কেটে গিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, 'নেচার' জার্নাল দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে যিনি জার্মান ভাষায় 'Naturwissenschaften' পত্রিকা সম্পাদনা শুরু করেছিলেন, তাঁর বিষয়ে 'নেচার' ঔদাসীন্য দেখিয়েছে বলব। তবে এমনটা হতে পারে। হিটলার ও নাৎসিদলের চরম অত্যাচারে যুদ্ধের আবহে 'নেচার' পত্রিকার কাছে খবর হয়ত দেরিতে এসেছিল। তাঁর ওই মৃত্যু যে স্বাভাবিক ছিল না, সে কথাও প্রকাশিত হল। অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর অনেক সময় স্বাভাবিক সময়সীমায় প্রকাশিত হয় না।

ব্রেসলাউ শহরে আর্নোল্ডের জন্ম হয়। শহরটি এখন পোল্যান্ড পড়েছে। তাঁর বাবা সিগফ্রায়েড বার্লিনের। মা মারিয়ানা বার্লিনের। ফ্যানি ও এলজি নামে আর্নোল্ডের দুই বোন ছিল। ইহুদি শিক্ষিত পরিবার ছিল এঁদের। তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন ত্বক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অ্যালবার্ট নাইজের (১৮৫৫-১৯১৬)। তাঁকে দেখে শুরুতে আর্নোল্ড চিকিৎসাবিদ্যার পাঠগ্রহণে আগ্রহী হন। কিন্তু পরে বিজ্ঞানের জগতে চলে যান। পদার্থবিদ্যা নিয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আর্নোল্ড পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'জৈব তরলের আণবিক প্রতিসরণ'। তিনি পরে একটি সাম্মানিক ডক্টরেট পেয়েছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে 'রৌপ্য লিবনিৎজ পদক' পেয়েছিলেন। লেখাপড়ার জগতে জার্মানির ওই পদক সে-সময় সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ছিল।

বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের নাম আমরা সকলেই শুনেছি। তাঁর পেটেন্টের সংখ্যা ছিল প্রচুর। জার্মানিতে এডিসনের কিছু পেটেন্ট কিনে নিয়ে যিনি কারখানা শুরু করেছিলেন তাঁর নাম এমলি রাথেনাউ (১৮৩৮-১৯১৫)। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে এমিল 'জার্মান এডিসন কর্পোরেশন ফর অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রিসিটি' নামে কারখানা

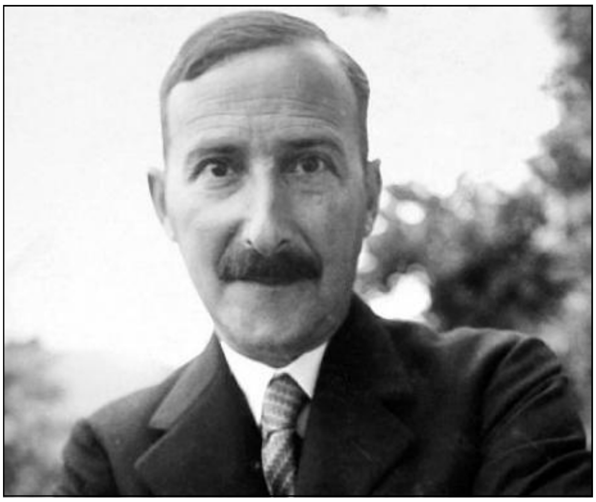

স্টেফান ৎসোয়াইক

প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই কারখানাই 'জেনারেল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এমিলের কারখানায় যে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগার ছিল তার প্রধান পদে যোগ দেন আর্নোল্ড। তাঁর তত্ত্বাবধানে ল্যাম্প কারখানা তৈরি হল। গ্রামোফোন ও অন্যান্য কারিগরি বিষয়েও আর্নোল্ডের অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। এক্স-রশ্মি তৈরির নল উৎপাদন করেছেন প্রচুর। যদিও তিনি ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এর ক্ষতিকর প্রভাব কী জানতেন না। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর এক গভীর আকর্ষণ ছিল। নইলে গুস্তাভ মালের-এর মতো সঙ্গীত বিশারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তৈরি হতে পারত না। সঙ্গীত যাতে সহজে মানুষ শুনতে পায় তার কারিগরি দিকে নজর দেন আর্নোল্ড। ফনোগ্রাফের জন্য তিনিই প্রথম 'ডিস্ক রেকর্ড' উদ্ভাবন করেছিলেন। দিনগুলি ভালোই কাটছিল তাঁর। এক সময় প্রতিষ্ঠাতা এমিলের সঙ্গে বনিবনা হল না। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে আর্নোল্ড বার্লিনের 'জেনারেল ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি' ছেড়ে দিলেন। পড়াশোনার বিষয়ে আর্নোল্ডের ছিল বিচিত্র আগ্রহ। নিয়মিত কবিতা পড়তেন। গির্জার ইতিহাসে ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ, যদিও মানুষটি ছিলেন ইহুদি। ধ্রুপদী সাহিত্য ও ইতিহাসে এক কথায় তাঁকে সুপণ্ডিত বলা যায়। চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতের প্রতি তাঁর প্রীতির কথা আগেই বলেছি। সময় পেলেই তিনি রিখার্ড ভাগনার-এর সৃষ্টি শুনতে যেতেন। ওই যে আমরা ত্বকবিশেষজ্ঞ পারিবারিক বন্ধুটির কথা বলেছিলাম, তাঁদের পরিবারে গভীরভাবে সকলেই প্রায় ভাগনারের সঙ্গীতচর্চা করতেন। সে থেকে ছোটোবেলা থেকেই আর্নোল্ডের এক ধরনের ভালোবাসা জন্মে যায়। আর্নোল্ডের বয়স যখন একুশ বছর, সে-সময় ভাগনার পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।

জার্মানির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা স্প্রিঙ্গার ভার্লাক তখন বার্লিন থেকে একটি বিজ্ঞানের নতুন জার্নাল বের করার কথা ভাবছিল। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আর্নোল্ড সে কাজে যোগ দেন। ওই সময় আর্নোল্ড যে শুধুমাত্র একজন কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন পদার্থবিদ হিসেবেই পরিচিতি অর্জন করেছিলেন তা নয়, গবেষণাগারে পদার্থবিদ্যার নানা পরীক্ষা নিয়ে তাঁর লেখা একটি বই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বইটির যখন তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তখন তার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪০০। তিনি একা নন, আরও অনেক বিশেষজ্ঞের রচনা সংকলিত হয়েছে এই বইয়ে। যাই হোক, 'নেচার'-এর মতো একটি জার্মানভাষী বিজ্ঞানের জার্নাল নিয়ে আর্নোল্ডের সঙ্গে প্রথম অ্যালবার্ট নাইজেরের সঙ্গে কথা হয়েছিল। পরে স্প্রিঙ্গার প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ফার্দিনান্দ স্প্রিঙ্গারের সঙ্গে কথা হয়। জার্নালের নাম ঠিক হয়েছিল 'Naturwissenschaften'। বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের লেখা থাকবে। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে আর্নোল্ড লিখেছিলেন, 'গবেষক ও শিক্ষকদের জন্য এই কাগজ, যারা নিজের বিষয়ের বাইরে অন্য বিষয় জানতে আগ্রহী, এই জার্নাল তাদের খুব দরকারি হবে।' জার্মানিতে তখন ভাইমার প্রজাতন্ত্র চলছিল। এই প্রজাতন্ত্রের রাজত্বকাল বলতে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ ধরা হয়। সে সময় আর্নোল্ড সম্পাদিত এই জার্নালের প্রভূত চাহিদা ছিল। সম্পাদনার কাজে এমনই নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন আর্নোল্ড বার্লিনের, তাঁর সত্তরতম জন্মবর্ষে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, ''আমাদের জীবন ও সময় থেকে তাঁর সম্পাদিত জার্নালকে আলাদা করে ভাবা যাবে না।'' তবু ঘটনা এই, আর্নোল্ড হয়ে পড়েন প্রায় অজ্ঞাত। থেকে যান বহুকাল আলোচিত। জানাল তার সুসময়ের কাল কাটিয়ে দুঃসময়ের মুখোমুখি হয়। ইহুদিদের তো 'জঞ্জাল' ভাবা হচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরেই। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিটলারের 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল' ক্ষমতায় এল। শুরু হল আরও বেশি নির্যাতন আর অবজ্ঞা। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফতোয়া জারি হল, ইহুদি বিজ্ঞানীদের গবেষণাপত্র 'ভেবেচিন্তে' ছাপতে হবে। এমন শব্দ যে কী বিভীষিকা ছড়ায়, ভুক্তভোগীরা জানেন। ইহুদি বিজ্ঞানীদের অনেককেই গবেষণা ছেড়ে দিতে হল। গবেষণাপত্র লেখা বন্ধ হয়ে গেল। আর্নোল্ডের জার্নালে আর তেমন গবেষণাপত্র আসছে না। খোদ আক্রান্ত হলেন আর্নোল্ড বার্লিনের। তিনি 'ইহুদি'। তাই জার্নালের সম্পাদক পদে তিনি থাকতে পারবেন না আর। ঘৃণ্য আর্য-অনার্য রাজনীতির আক্রোশে দগ্ধ হলেন আর্নোল্ড। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট স্প্রিঙ্গার কর্তৃপক্ষ আর্নোল্ডের হাতে বরখাস্তের চিঠি ধরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। 'বাধ্য' হলেন বলছি কেন না, ১৯৩৩ মে মাসে 'ইহুদি বিতাড়নের' নোটিশ জারি হলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান তা তক্ষুণি কার্যকর করেনি। স্প্রিঙ্গার সংস্থা ছিল তেমনই। আর্নোল্ড চেয়েছিলেন, পঁচিশ বছর সম্পাদনা করে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পাদক পদ ছেড়ে দেবেন। সেই সুযোগ তিনি পেলেন না। ম্যাক্স প্লাঙ্ক জার্মানির এক সর্বজনমান্য বিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর উপরে নাৎসি হামলা হয়নি, এমন বলা যাবে না। সন্তানেরাও নাৎসি অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন, আর্নোল্ড 'সম্পাদক' থাকুন। চাইলে কী হবে? সমাজ যখন হিংস্র ও বিকৃতমনস্কদের কবলে চলে যায়, প্রকৃত যোগ্য ও ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষেরা সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর আর্নোল্ড জার্নালটির সম্পাদনার ভার ছেড়ে দিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা ছিলেন ম্যাক্স ফন লাউয়ে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। মার্কিন বিজ্ঞানীবন্ধুদের আমন্ত্রণে আর্নোল্ড ও লাউয়ে একসঙ্গে আমেরিকা যান। বন্ধুরা বারবার বলেছিলেন, আমেরিকা ছেড়ে যেন জার্মানিতে ফিরে না যান। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা গেলেন যদিও, কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার জার্মানি ফিরে এলেন। তখন আকাশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ একটু একটু করে জমতে শুরু করেছে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আবার তিনি আমেরিকা যান। কিন্তু থাকলেন না। স্বদেশভূমিতে ফিরে এলেন।

আর্নোল্ড বার্লিনের এক ঈর্ষণীয় বন্ধুমহল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। সেই বন্ধুদের কেউ কেউ শিল্প ও সংস্কৃতি জগতের দিকপাল, কেউ কেউ বিজ্ঞান জগতের দিকপাল। বন্ধু তালিকায় ছিলেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, ম্যাক্স বর্ন, বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসক-গবেষক পল এরলিখ (১৮৫৪-১৯১৫) ও ১৯১৫

খ্রিস্টাব্দে রসায়নে নোবেলজয়ী রিকার্ড ভেল্‌শটেটের (১৮৭২-১৯৪২)। যে জার্নাল এককালে সম্পাদনা করেছেন আর্নোল্ড, সেই জার্নাল তার নাম বদল করলেও আজও নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তার নতুন নাম 'দ্য সায়েন্স অব নেচার'। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় জনৈক লেখক আর্নোল্ড বিষয়ে অনেক নতুন খবর খুঁজে পেয়ে আমাদের জানিয়েছেন। আমরা তাই আর্নোল্ডকে আবার নতুনভাবে চিনতে পারি। অনেক কথা জানতে পারি। আর যেকথা বলতে হবে, এই নিবন্ধ লেখক সব কথা জেনেছেন এক সম্পর্কের ভেতর থেকে। সেই সম্পর্কের চরিত্র দু-জন পরস্পরের নিবিড়তম বন্ধু। গুস্তাভ মালের আর আর্নোল্ড বার্লিনের।

কবে গুস্তাভ আর আর্নোল্ডের প্রথম দেখা হয়? ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ হামবুর্গের হোটেল রয়্যাল-এ দু-জনের প্রথম দেখা হয়েছে। গুস্তাভ ইংল্যান্ড সফরে যাবেন। তাঁর কনসার্ট তৈরি করছিলেন। বার্লিনের তাঁকে ইংরেজি শেখাতে শুরু করেন। থিয়েটারের নানা শব্দকে ইংরেজি করে শোনান। প্রথম দিন থেকে দু-জনের আমৃত্যু নিবিড় যোগাযোগ ছিল। যদিও গুস্তাভকে নানা জায়গায় অনুষ্ঠান করতে যেতে হত বলে দু-জনের নিয়মিত দেখা হত না। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মে ভিয়েনায় গুস্তাভ প্রয়াত হলেন। আর্নোল্ড শেষ শয্যায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন। দু-জন দু-জনকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। কেমন করে গুস্তাভ আরও বেশি অনুষ্ঠান পেতে পারেন, সেকথা প্রতিদিন ভেবেছেন আর্নোল্ড। দু-জনের জগৎ আলাদা। গবেষণার বিষয় আলাদা। অনুভূতি আলাদা। সেই বৈপরীত্য মেনেই ওঁরা অতি নিয়মিত নিজেদের মধ্যে চিঠি লিখতেন। সেখানে বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবনার কথা থাকত। গুস্তাভকে আর্নোল্ড সাহিত্য ও নানা বিষয়ের অনেক বই কিনে দিয়েছেন। বোন জাস্টিনের কাছে গুস্তাভ মালের লিখেছেন, 'আর্নোল্ড বার্লিনের একজন বড্ড বেশি পণ্ডিত গোছের মানুষ। তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল।' কথাটা পুরোপুরি মিথ্যে নয়। যখন তিনি 'সম্পাদক' বা 'গবেষণার প্রধান' তখন তাঁকে এই রূপেই চলতে হয়। আর্নোল্ডের সম্পাদনার কাজ কোন চোখে দেখতেন আইনস্টাইন, আগে তা আমরা একটিমাত্র পংক্তিতে বলেছি। বলছি এখন আইনস্টাইনের এক বিস্তৃত অনুভূতির কথা। ইচ্ছে করেই বাংলা রূপান্তর থেকে নিবৃত্ত রইলাম।

> Berliner's fight for clarity and comprehensiveness of outlook has done a great deal to bring the problems, methods, and results of science home to many people's minds. The scientific life of our time is simply inconceivable without his paper... It is just as important to make knowledge live and to keep it alive as to solve specific problems. We are all conscious of what we owe to Arnold Berliner.
>
> Do not be angry with me for this indiscretion, my dear Berliner. A serious-minded man enjoys a good laugh now and then.

আইনস্টাইনের চোখে মানুষটি যেভাবে ধরা পড়েছিলেন, তাঁর কেন এমন পরিণতি হবে? তাঁকে যখন জার্নালের সম্পাদক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, সে খবর 'নেচার' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫, নেচার, ভল্যুম-১৩৫, পৃ. ৫০৬)। সংবাদ পরিবেশনায় এমন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভই প্রকাশ করেছিল 'নেচার'। আর্নোল্ড যে সম্পাদনার গুণে জার্নালটিকে উচ্চাসনে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, সেকথা 'নেচার' দ্বিধাহীন ভাবে ঘোষণা করেছে।

আর্নোল্ড বার্লিনের। গুস্তাভ মালের বাড়ির সংগ্রহ থেকে বিজ্ঞানীর এই আলোকচিত্র পাওয়া গিয়েছে।

কী হয়েছিল এমন মানুষের শেষ পরিণতি? ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ তিনি আত্মহত্যা করেন। যেদিন তিনি জানতে পারলেন, ইহুদিদের ধরে নিয়ে গিয়ে নাৎসি গুণ্ডারা বন্দিশিবিরে জীবিত মেরে ফেলবে, সেদিন তিনি আত্মহত্যা করেন। ঠিক তার এক মাস আগে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি আত্মহত্যা করেছেন সাহিত্যিক স্টেফান ৎসোয়াইক। যে দুই মানুষ বেঁচে থাকলে পৃথিবী আরও বেশি সমৃদ্ধ হত, তাঁদের আত্মহনন আমাদের বিষণ্ণ করেছে, কিন্তু সমৃদ্ধ পৃথিবী গড়ার লড়াইয়ে সহযোদ্ধা হতে অনুপ্রাণিত করেছে। কাপুরুষতার সামান্যতম চিহ্নও ধারণ করেনি এই আত্মহনন। তন্নিষ্ঠ প্রজন্মকে শ্রমদান ও আত্মত্যাগের স্পৃহায় উজ্জীবিত করেছে।

কোথা থেকে কী হয়ে যায়! ব্রেসলাউ-এ জন্ম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ইউজিন স্পাইরো (১৮৭৪-১৯৭২)-র আঁকা ছবি দেখে এতদিন আমরা আর্নোল্ডকে চিনেছি। গুস্তাভ আর আর্নোল্ড বন্ধু ছিলেন। গুস্তাভের পরিবার যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন সকল নথিপত্র। আমরা তাই আর্নোল্ড বার্লিনের-এর আলোকচিত্র খঁজে পেলাম। নতুন অনেক কথা খুঁজে পেলাম।

With best compliments of

SONAR BANGLA AGRO PRODUCTS

Manufacturer of :

BEST QUALITY RAW RICE
100% STONELESS

Vill. Sripurhitta, P.O. Shyamdasbati
Dist. Burdwan, PIN : 713424, WB
E-mail : skkamaluddin.mondal@rediffmail.com
mondalanowar9@gmail.com

Sk. Kamaluddin Mondal
Mob. 9434668317, 9093914605

Sl. No. 137

প্রেমচন্দের ছোটোগল্প : বাঙালি পাঠক

সুমিতা চক্রবর্তী

উত্তরপ্রদেশের একটি নিম্নবিত্ত কৃষক পরিবারে যে শিশুটির নাম একদা রাখা হয়েছিল ধন্‌পত্‌ রায়—সেই নামের খোলস থেকে পরবর্তীকালে নিঃশেষে বেরিয়ে এসেছিলেন তিনি। ধনপতি হবার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা দূরে সরিয়ে নির্ধন ও নির্বলের মধ্যে জ্যোতি বিকীর্ণ করে হয়ে উঠেছিলেন প্রেমচন্দ। সৌভাগ্য হিন্দি সাহিত্যের শুধু নয়, ভারতীয় সাহিত্যের। জনজীবনের যে ভূমিখণ্ডে পদক্ষেপে অপারগ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সেই মাটিতেই ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি।

হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দ কী করেছিলেন সে আলোচনার এখন আর কোনো মানে হয় না। হিন্দি সাহিত্যে তখন ছিল রূপকথা, লোককথা, পুরাণ ও হিতোপদেশের যুগ। প্রেমচন্দ তাকে করলেন কালোপযোগী ও বয়স্কপাঠ্য। আজ তাঁর প্রথম প্রথম লেখাটির (১৯০১-এ 'জমানা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'অসরারেম আবিদ' নামে একটি উর্দু ভাষায় লেখা উপন্যাস) এত বছর পরেও তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে তাঁকে কি অতিক্রম করতে পেরেছি আমরা?

আগে দেখা যাক প্রেমচন্দের সেই নিজস্ব ক্ষেত্রটি কী? জন্মেছিলেন গ্রামে। দরিদ্র পিতা সামান্য জমির আয়ে সংসার চালাতে না পেরে ডাক বিভাগে চাকরি নেন এবং একদিন পনেরো বছর বয়সের মাতৃহীন বালকের কাঁধে দ্বিতীয়া স্ত্রী ও আরও দুটি পুত্রের ভার তুলে দিয়ে মারা যান। তার ওপর ধন্‌পত্‌ তখন দেশাচার অনুসারে বিবাহিত। চাষবাস দেখে ও সাধ্যমতো ছাত্র পড়িয়ে ধন্‌পত্‌ সংসার চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সংসার চলে না। উপরন্তু অশিক্ষিত, স্বার্থপর মমতাহীন সেই সংসার তাঁর খাদ্যপানীয় জুটছে কিনা তাও দেখে না। টাকার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ। বালিকা পত্নীর কষ্ট সহ্য করবার মতো শরীর ও মন না থাকায় সেও একদিন পিত্রালয়ে ফিরে যায়। জীবিকা নির্বাহকর্মে প্রথম কিছু স্বাচ্ছন্দ্য আসে ১৯১৯-এ। চুনারে লন্ডন মিশন স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন। বহু কষ্টে, অর্থাভাবে মাঝে মাঝে বহু সময়ের ব্যবধান রেখে শেষ পর্যন্ত ১৯১৯-এ তিনি বি.এ. পাশ করেছিলেন ঊনচল্লিশ বছর বয়সে। তারপর থেকে মোটামুটি দিন চলে যায়। মাঝে মাঝে অর্থাগমের জন্য নানারকম কাজের চেষ্টা করেছেন। সাবডেপুটি ছিলেন কিছুদিন। সরকারি চাকরি ইচ্ছেমতো সাহিত্য সৃষ্টির বাধা হওয়ায় সে কাজ ছেড়ে দেন। অজন্তা মুভিটোন স্টুডিওর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন একবার। চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারায় অল্পদিন পরেই সে কাজ পরিত্যাগ করেন। জীবিকার্জন করেছেন দুটি উপায়ে—পত্রিকা সম্পাদনা আর শিক্ষকতা। আদর্শগত অবনিবনার ফলে মাঝে মাঝেই কাজে ইস্তফা দিতেন। এছাড়া করেছেন কৃষিকর্ম ও গোপালন। এই দুটি কাজ ভালোবাসতেন। মোটামুটি এই হল

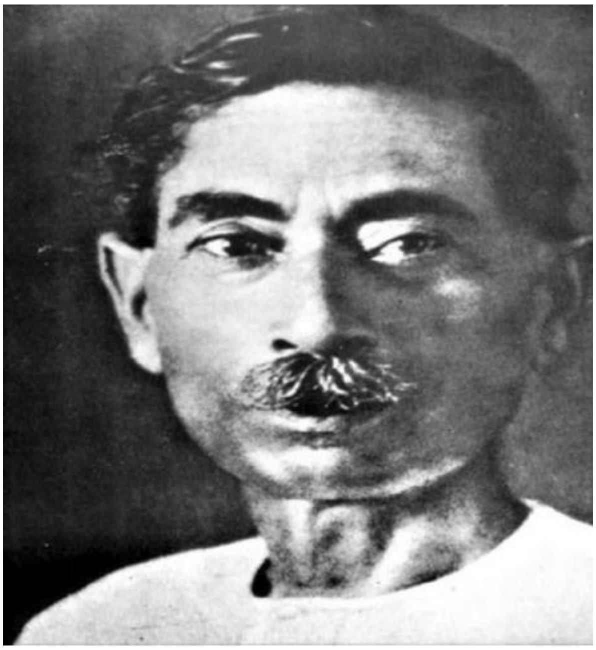

নিজে হাতে লাঙল চালানো কৃষক শ্রেণি থেকে বাংলার প্রধান লেখকরা কেউই আসেননি। সুশিক্ষিত, অভিজাত ধনী পরিবার থেকে এসেছেন কয়েকজন; বাকিরা এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, কলকারখানায় কাজ করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতায় ও মনোরাজ্যে আধিপত্য করেছে ভদ্র মধ্যবিত্তের জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধ। গ্রামীণ কৃষককে অভিন্ন একাত্মতায় দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে-জন্যই প্রেমচন্দের সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ আমাদের একটু অন্যরকম লাগে।

প্রেমচন্দের জীবন। একটি সৌভাগ্য ছিল—দ্বিতীয়া স্ত্রী শিবরানি দেবী স্বামীর মন ও আদর্শের মূল্য দিয়েছিলেন বলে পারিবারিক অশান্তি ছিল না।

সহজেই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রধান লেখকদের সঙ্গে তাঁর মূল তফাৎ কোথায়। নিজে হাতে লাঙল চালানো কৃষক শ্রেণি থেকে বাংলার প্রধান লেখকরা কেউই আসেননি। সুশিক্ষিত, অভিজাত ধনী পরিবার থেকে এসেছেন কয়েকজন; বাকিরা এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ব্যক্তিগত জীবনে দারিদ্র্য ভোগ করেছেন, কলকারখানায় কাজ করেছেন কেউ কেউ, কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতায় ও মনোরাজ্যে আধিপত্য করেছে ভদ্র মধ্যবিত্তের জীবন-চেতনা ও মূল্যবোধ। গ্রামীণ কৃষককে অভিন্ন একাত্মতায় দেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে-জন্যই প্রেমচন্দের সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ আমাদের একটু অন্যরকম লাগে। শরৎচন্দ্রের মমতাময় দৃষ্টিকোণ এ নেয়, নয় বিভূতিভূষণের সৌন্দর্যদর্শন; রবীন্দ্রনাথের মনোময় দৃষ্টি থেকেও তাঁর খোলা চোখের দেখার দূরত্ব অনেক। তিনি তারাশংকরের বিস্তৃত জীবনবোধের পটভূমিতে লেখেন না, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লক্ষ্যভেদী টর্চ ফেলেও তিনি দেখেন না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি আসলে নিজের ঘরবাড়িকে দেখার মতোই সহজ। জমিদার, কৃষক, ভিক্ষুক, দেশাচার, জাতিভেদ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ধর্মীয় সংস্কার—গ্রামজীবনের প্রতিটি খাঁজ তাঁর জানা। এগুলি জানবার জন্য কোনো চিন্তা বা কল্পনার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয় না। অতিপরিচিতি মানুষকে নির্মোহ করে, মুগ্ধতার অবকাশ রাখে না। প্রেমচন্দের দেখার মধ্যেও সেই অনাবরণ সত্যতা আছে। জীবনের যে অনির্বচনীয় দীপ্তি ও মাধুর্য, রুদ্রতা ও কান্তি; ভীষণতার, ব্যাকুলতার অথবা বিচিত্রতার টুকরোগুলি মুগ্ধ করেছে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বা তারাশংকরকে—সেগুলি প্রেমচন্দ্রকে প্রায়ই বিচলিত করে না। তিনি স্পষ্ট বাস্তবকে দেখেন, বোঝেন ও লেখেন। অতিস্পষ্টতায় সাহিত্য-ধর্মের হানি ঘটে কি? সম্ভবত কিছুটা ঘটে। প্রেমচন্দের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো তা ঘটেছে। কিন্তু কেউ তো কখনো কোথাও সাহিত্যের করণ-কৌশলের ওপর মানুষের কথাকে, দরিদ্র জীবনের স্পষ্ট সত্যকে জায়গা দেবেই। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যে এই চেতনা কিছুটা লক্ষ করা যায়, আর দেখা যায় প্রেমচন্দের লেখায়। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রুপতীক্ষ্ণতার ঈষৎ কৃত্রিমতা ও নিরাশাবোধের অস্বাভাবিক আত্যন্তিকতা বাদ দিলে হয়ত জগদীশ গুপ্তের হাতে এ জিনিস পাওয়া যেত। রামচরিতমানসের পৌরাণিক কাঠামোর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ভারতীয় ঐতিহ্যবোধের সেচনে নরম করে না দিলে, স্বাধীনতা ও গান্ধী-আন্দোলনের উচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গগুলি পরিহার করলে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াইচরিতমানস'-এ সেই জীবন-দৃষ্টির স্বাদ পাওয়া সম্ভব ছিল। ধরা যাক, সেই বিখ্যাত 'কফন্' গল্পটির কথা। মৃত বধূর শবাচ্ছাদনের জন্য গ্রামবাসীদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে সেই পয়সা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মদ খেয়ে শেষ করে ঘিসু ও মাধব। যে সমাজ এই শ্রেণির উদ্ভব ঘটায় তার পাপ নির্মম ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন তিনি। মৃতদেহকে সামনে রেখে এতখানি নির্মম হতে পারেন না মধ্যবিত্ত মানসিকতার লেখক। এর ধারেকাছেও যেতে পারেননি শরৎচন্দ্র 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে। 'অভাগীর স্বর্গ' বস্তুত প্রেমচন্দের গল্পটির বিপরীত কোটির মানসিকতাকেই তুলে ধরেছে। এর পাশেই 'অলগ্যোঝা' গল্পটি স্মরণ করতে পারি। এ যেন তাঁরই জীবনের কথা। পিতার মৃত্যু, বিমাতার অপ্রীতি, নায়ক রঘুর বৈমাত্রেয় ভাইবোনের প্রতি স্নেহ ও বিমাতার ক্রমে প্রসন্ন হয়ে ওঠা, বিবাহ এবং স্ত্রীর অসন্তোষ। সংসার ভাঙে, রঘু মারা যায়, দুঃখের মধ্য দিয়ে রঘুর বিমাতা ও স্ত্রীর আবার মিলন ঘটে। সংসার জোড়ে। রঘুর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে তার বৈমাত্রেয় ভাই কেদারের পুনর্বিবাহ হয়। এই পুনর্বিবাহ কোনো সংস্কার-আন্দোলনের ধারক নয়। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে দেবর ও বিধবা ভ্রাতৃবধূর বিবাহ প্রচলিত দেশাচার। গল্পটির মূলরস গ্রামজীবনের অপরূপ কথকতায় ও মধুরান্তিক সমাপ্তিতে। আশা ও নিরাশায় বোনা স্বাভাবিক জীবনই প্রেমচন্দের উপজীব্য। বাস্তবসচেতন বাঙালি লেখকদের মধ্যে এই আশাবাদী সহজ সুরটির অভাব, যেহেতু তাঁদের প্রেরণা মূলত মস্তিষ্কপ্রসূত, নিহিত সংস্কার থেকে সরাসরি তার জন্ম নয়। চেষ্টা বা আন্তরিকতার অভাব তাঁদের নেই কিন্তু চেতনার শিকড় অন্য মাটিতে প্রোথিত বলে গ্রামজীবন তার একান্ত অন্দরমহলের চাবিকাঠিটি তাঁদের হাতে তুলে দেয়নি। এ-কথাটি হয়তো একান্ত সাম্প্রতিক বাঙালি গল্পকারদের ক্ষেত্রেও সত্য। তাঁরা দরিদ্রজীবনের দুঃখের খবরগুলিকে যথার্থ মর্মান্তিকতায় প্রকাশ করেন। কিন্তু একান্ত দরিদ্রেরও সুখ-মুহূর্ত আছে। সে সংবাদ প্রেমচন্দের লেখায় পাই।

আগেই বলেছি, প্রেমচন্দের লেখায় শিল্পসৌকর্য কখনোই বড়ো হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু গল্পের অমোঘ নান্দনিক সিদ্ধি বাদ দিলে—যেমন 'কফন্', 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'ঈদগাহ্'—তাঁর অধিকাংশ গল্প বিবৃতিধর্মী এবং একেবারেই বাহুল্যবর্জিত নয়। প্রায়ই তাঁর ছোটোগল্পগুলি জীবনের কোনো খণ্ড মুহূর্তের অনুভবকে তুলে ধরে না—অনেক দিন জুড়ে ব্যাপ্ত থাকে তাদের কালপরিসর। 'মা' গল্পটিতে করুণা একটি শিশুকে নিয়ে স্বামীকে হারিয়েছিল। দেশের জন্য জেলখাটা আদর্শবাদী স্বামীর মতো করে ছেলে প্রকাশকে গড়ে তুলতে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু কৃতী ছাত্র প্রকাশ শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে য়ুরোপ যায় এবং পুরোপুরি একজন ব্রিটিশ আমলা তৈরি হয়ে ওঠার পথে পা রাখে। 'শান্তি' নামে অপর একটি গল্পেও একটি পিতৃহীনা বালিকার বড়ো হয়ে ওঠা—বিবাহ এবং স্বামীর সঙ্গে অবনিবনা—ফলে আত্মহত্যা দেখানো হয়েছে। তাঁর আরও অনেক গল্পেই কাহিনি এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হয়। উপন্যাসে এই পরম্পরার একটি প্রয়োজন স্বীকার করলেও ছোটোগল্পে নির্দিষ্ট মধ্যবিন্দুর অভাব তাঁর অনেক গল্পকেই একটু ক্লান্তিকর করেছে। অমোঘ পরিসমাপ্তির অভীষ্ট লক্ষ্যবিন্দুর অভাবও প্রেমচন্দের গল্পে দেখা যায়। গল্পটির আগাগোড়া জুড়ে স্পষ্ট হয়ে থাকে তাঁর অভিপ্রায়—গল্পশেষে কোনো উদ্‌ঘাটন পাঠকচিত্তের অনুভূতিকে উদ্বেল করে তোলে না। মোটামুটি গল্পের শুরু থেকেই তাঁর বক্তব্যবিষয় বোঝা যায় এবং গল্পটির বয়নে থাকে সেই বিষয়ের বিস্তার। সেখানে স্থান পেয়ে যায় গ্রামজীবনের অনেক পার্শ্ব-প্রসঙ্গ, অনেক বাহুল্য বর্ণনা, অপ্রয়োজনীয় সংলাপ, শিথিল আবেগ। শিল্পসচেতন, বুদ্ধিজীবী সাহিত্যরসিকের কাছে শরৎচন্দ্র যে কারণে কিছুটা অপাঙক্তেয় হয়ে থাকেন সেই কারণটি প্রেমচন্দের ক্ষেত্রেও বর্তমান। তাঁর লেখাতেও আবেগের আতিশয্য, বর্ণনার অতিরঞ্জন ও আদর্শবাদের প্রতি সুস্পষ্ট ঝোঁক লক্ষ করা যায়। কিন্তু এসব ত্রুটি প্রেমচন্দের সৃষ্টির মূল্য কমিয়ে দিতে পারে না। যেমন পারে না শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও। যাদের কথা বলা হচ্ছে তাদের ভাষায় বলতে পারা চাই—এই হল সর্বজনের সাহিত্যের মূল কথা। এই বিচারে শরৎচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের সফলতম কথাসাহিত্যিক। মধ্যবিত্ত বাঙালি সমস্যা ও আনন্দবেদনাকে মধ্যবিত্তের সাহিত্যবোধের সীমায় রেখে শিল্পসৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি। একই বিচারে বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত হয়ে থাকেন নজরুল ও সুকান্ত। 'যুগের হুজুগ' কেটে গেলে নজরুলের আবেদন থাকবে না—একথা দীর্ঘকাল ধরে শুনেছি। বাঙালির কাছে এই পণ্ডিতবচন সত্য হয়ে ওঠার এখনও কোনো লক্ষণ দেখা দেয়নি। দারিদ্র্য, দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ আর ধর্মীয় কুসংস্কার ভারতবর্ষে

'যুগের হুজুগ' হয়ে উঠবে কতদিনে?

প্রেমচন্দের অন্তরচারণা শরৎচন্দ্রের চেয়ে কঠিনতর ভূমিতে। দৃঢ়তর তাঁর পদক্ষেপ। ভারতবর্ষের শ্রমিক-কৃষকের একান্ত বাস্তব সমস্যা নিয়ে তাঁর কাজ; শিল্প-সৃষ্টিকে সেই পাঠকদের গ্রহণক্ষমতার সীমায় রাখতে সমর্থ হওয়া তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব। নিজের লেখাকে নিখুঁত, আন্তর্জাতিক বা কালোত্তীর্ণ করবার কোনো চেষ্টাই ছিল না তাঁর। দেশকে ভালোবাসতেন, পরাধীনতাকে ঘৃণা করতেন। তাঁর দেশপ্রেমের গল্পসংকলন 'সোজে বতন' এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। সেই সময়ে বিনা অনুমতিতে কোনো রচনা প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ায় গ্রহণ করেছিলেন ছদ্মনাম। তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলি ঈশ্বরবিশ্বাসী, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বরের করুণা সম্পর্কে ছিলেন সংশয়ী। দরিদ্র মানুষ ছিলেন প্রেমচন্দের আত্মীয়। প্রথম জীবনে গান্ধীবাদী ছিলেন—ক্রমশ শ্রমিক, কৃষক, বেঠবেগার, ভূমিদাসদের দিকে তাকিয়ে সমাজতন্ত্রী মতবাদকে সমর্থন করতে শুরু করেন। পুঁজিপতিদের ঘৃণা করেছেন, বিরোধিতা করেছেন সাম্রাজ্যবাদের। পীড়িত ও দুর্বলের অবস্থা বদলানো দরকার—এই বোধ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির উৎস ছিল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি বিত্তহীনের লেখক। তাদের অভাব, বেদনা, অত্যাচারকে তিনি দেখিয়েছেন গভীর সহমর্মিতায়। 'ঠাকুর কা কুয়া' গ্রামের প্রান্তে বাস করা দুটি নরনারীর কাহিনি। বহুদূরের জলাধার থেকে সংগ্রহ করা জল ময়লা হয়ে যাওয়ায় জোখুর জন্য জল আনতে যায় গংগী উচ্চবর্ণজাত ঠাকুরের কুয়ো থেকে। কিন্তু লুকিয়ে নিতে গিয়ে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে সে পালিয়ে আসে। ''ঘর পঁহুচ কর দেখা কি জোখু লোটা মুঁহ সে লগায়ে বহী মৈলা গন্দা পানী পী রহা হ্যায়''—এই পরিমাপ্তিতে কোনো অভিনবত্ব নেই—খুব প্রত্যাশিত শেষ। কিন্তু সমস্ত গল্পটি অনবদ্য বাস্তবতা-গুণমণ্ডিত। গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থানের সত্যতা থেকে শুরু করে কুয়োর পাড়ে লুকিয়ে থাকা গংগীর কানে ভেসে আসা দুই রমণীর একান্ত স্বাভাবিক সংলাপ গল্পটিকে খুব জীবন্ত করেছে। সবশেষে জ্বরপীড়িত ক্লান্ত জোখুর ময়লা জল পান করার মধ্যে যে পিপাসার্ত আত্মসমর্পণের ছবিটি রয়েছে তা অদ্ভুত সত্য হয়ে ওঠে ''লোটা মুঁহ সে লগায়ে'' এই বাক্যবন্ধটির ব্যবহারে। অথচ তীব্র সত্যতাগুণ ও মরমি সহ-অনুভব ছাড়া গল্পটিতে তেমন কিছু শিল্পকৌশল নেই।

প্রেমচন্দ দরিদ্র মানুষের মূঢ়তা, স্বার্থপরতাকে এঁকেছেন স্পষ্ট রেখায়। ছেলে মা-কে ঠকায়, স্বামী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অনুষ্ঠানে সামান্য ত্রুটির অছিলায় প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে বিপদে ফেলে—এসব দেখিয়েছেন তিনি। আবার তাদের সুখের মুহূর্তগুলিও ফোটাতে ভোলেন নি। ইদ্-এর দিন শিশু হামিদের আনন্দ প্রকাশ করেছেন একটি সরল সুন্দর উক্তিতে—''হামিদকে পাঁওমে জুতে নহী হ্যায়, সির পর এক পুরানী টোপী হ্যায়, জিসকা গোটা কালা পড় গয়া হ্যায়, ফির ভী বহ্ প্রসন্ন হ্যায়।'' তাঁর গল্পে দেখা যায় ফলন্ত শস্যখেতের দিকে তাকিয়ে কৃষকের আনন্দ-স্বপ্ন, দেখা যায় ভালোবাসার স্পর্শে বঞ্চিতা রমণীর সঞ্জীবিত হওয়ার ছবি—''বৈধব্যকে শোক সে মুরঝায়া হুয়া মুলিয়া কা পীত বদন কমল কী ভান্তি অরুণ হো উঠা। দশবর্ষোঁ মেঁ জো কুছ খোয়া থা, বহ্ ইসী এক ক্ষণ মেঁ মানোঁ ব্যাজকে সাথ মিল গয়া। বহি লাবণ্য, বহি বিকাস, বহি আকর্ষণ, বহি লোচ।'' এ কথা স্বীকার্য যে এই বর্ণনার মধ্যে উচ্ছ্বাস ও আবেগের ভাষারূপ খুবই সাধারণ—কিন্তু এইসব সাধারণত্বের মধ্য দিয়েই প্রেমচন্দ যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। তাঁর যে-কোনো লেখার মধ্যেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রত্যক্ষতাজাত একটা জোর আছে; তাঁর তুচ্ছতম আবেগোক্তিরও উৎসভূমি হিসেবে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা অনুভূতি ও আদর্শবাদের ক্ষেত্রটি রয়ে গেছে—একথা তাঁর লেখা পড়ামাত্র সৎ পাঠকের বিচারে ধরা পড়ে।

শ্রেণিচেতনা গড়ে ওঠার প্রাথমিক স্তর সংঘবদ্ধ কর্মপ্রাণনার ইঙ্গিত তাঁর কোনো কোনো গল্পে পাওয়া যায়। ''পিশুনহারী বা কুয়াঁ'' গল্পে একটি গ্রাম্য বালিকা খেলাচ্ছলে একটি গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে তার খেলার সাথীরা তার সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর গ্রামের সমস্ত লোক হাত লাগিয়ে একটি প্রয়োজনীয় কূপ খননকার্য সমাধা করে। কিন্তু প্রতিবাদ প্রতিরোধের সুর ক্ষীণভাবে থাকলেও গল্পটিতে সেই সুর প্রবল নয়। বরং একটি মৃত বৃদ্ধার শেষ ইচ্ছা যেন সেই বালিকাটির ওপর ভর করেছিল—এমন একটি সংস্কারের ইঙ্গিত আছে। এ-জাতীয় সংস্কার অ-যৌক্তিক কিন্তু আজও গ্রামের মানুষের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো এগুলি সত্য। প্রেমচন্দ এসব জানতেন। জানতেন কোন মন্ত্রে বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে পৌঁছোনো যায়।

ঠিক এমন একজন লেখক বাংলা সাহিত্যে নেই। শরৎচন্দ্র থেকে মহাশ্বেতা পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতিটি সৎপ্রচেষ্টাই মধ্যবিত্তের চোখে দেখা ও বুদ্ধিজীবীর মস্তিষ্কে বিশ্লেষিত। তাঁদের সব চেষ্টাই আন্তরিক এবং বহু প্রচেষ্টাই সার্থক। তবু তাঁরা মধ্যবিত্ত মানসের ঈষৎ উচ্চ ভূমি থেকে যে ছবিটি আঁকেন তা নিঃস্ব মানুষগুলির রক্তমাংসের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে যায় না। শৈল্পিক সিদ্ধির প্রয়াসে তাঁরা কিছুটা সময় খরচ করেন। ভাষাকে ঘষে মেজে আপাত নিরাসক্ত করতে হয়, খুঁজে নিতে হয় একটি সুন্দর প্রতীক, বস্তুবাদী হবার প্রয়োজনে ঘেঁটে দেখতে হয় সরকারি নথিপত্র, কাগজের রিপোর্ট। এসব কথা কোনো অর্থেই সমালোচনা নয়। আমাদের মধ্যে মহাশ্বেতার মতো বিবেকী, পরিশ্রমী, নির্ভয় লেখক আর কে আছেন? কিন্তু তাঁর আঘাত গিয়ে বাজে যে পীড়ক তাকে, তাঁর লক্ষ্য মমতাহীন 'সিস্টেম'গুলি। পীড়িত ও রিক্ত মানুষটি থেকে যায় উপকরণের মতো; তার স্বাভাবিক পরিচয় একটু যেন আবৃত হয়। এমন হবেই। এমন হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

শুনেছি লেখার জন্য প্রেমচন্দের কোনো পরিশ্রমসাধ্য মালমশলা লাগত না। কোনো পরিকল্পনা বা প্রেরণা—আইডিয়া বা মুড—কিছুই দরকার হত না তাঁর। শিক্ষকতা, কৃষিকর্ম, গরু-বাছুর দেখার ফাঁকে ফাঁকে লিখতেন। কেউ দেখা করতে এলে কলম রেখে খোঁজ খবর নিতেন, গল্প করতেন, চলে গেলে আবার লিখতেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কয়েকটি শিক্ষাগত, শ্রেণিগত বিভেদ রয়েছে যে, কৃষক-শ্রমিক পরিবার থকে সহজে লেখক সৃষ্টি হয় না। ভারতে প্রেমচন্দ একজনই 'যে আছে মাটির কাছাকাছি'।

তাহলে কি আমরা বলতে চাইছি শৈল্পিক বিচারে বিশ্বসাহিত্যের সর্বকালের মানদণ্ডে তিনি মহৎ লেখক হয়ে উঠতে পারেননি? 'মহৎ লেখক' সম্পর্কে আমাদের সর্বশেষ উপলব্ধি এই যে, সাহিত্যের নান্দনিক বিচারের মানদণ্ড যুগে যুগে বদলায়, কিন্তু মানবিক বিচারের মানদণ্ড থাকে প্রায় অপরিবর্তিত। কালের কষ্টিপাথরে মহৎ সাহিত্য শেষ পর্যন্ত নির্ণীত হতে দেখেছি সেই মানবিকতার বিচারেই। তাই একাধিক শতাব্দীর ব্যবধান পার হয়ে শিথিল-বিন্যস্ত, পুনরুক্তি ভারাক্রান্ত, অযৌক্তিক ও অবাস্তব ঘটনা সমন্বিত মঙ্গলকাব্যগুলি আমাদের মনের ঘরে চলে আসে। আজও আমাদের তৃপ্ত করে সুখদুঃখের বারোমাস্যার সহজ সরল বিবৃতি, বিচলিত করে অত্যাচারী মনসার বিরুদ্ধে চাঁদ সদাগরের উত্তেজিত পৌরুষের প্রতিবাদ, ক্ষুব্ধ করে তথাকথিত দেবতাদের লোভী চোখের সামনে নৃত্য প্রদর্শনে বাধ্য হওয়া বেহুলার অসম্মান।

যে অকৃত্রিম আন্তরিকতার গুণে একান্ত সাসাসিধে, ব্যবহারিক জীবনের কাব্যব্যঞ্জনাহীন চলতি কথায় গাঁথা সরল সুরের রামপ্রসাদী

গান আজও আমাদের টানে; যে প্রবল পার্থিবতার শিরাস্নায়ু থাকার জন্য লোকসাহিত্যের আকর্ষণ আধুনিকতম সাহিত্যবোদ্ধাও কাটিয়ে উঠতে পারেন না, সেই 'এসেন্স অব্ লাইফ'-ই শেষ পর্যন্ত মহৎ সাহিত্যের অভিধা হয়ে দাঁড়ায় যা আমরা প্রেমচন্দের লেখায় পাই।

কিন্তু এই অভিযোগ কি তাহলে সত্য যে নিছক শিল্পগত বিচারে প্রেমচন্দ মহান হয়ে ওঠেন না? এ কথা ঠিক যে শৈল্পিক সিদ্ধিতে পৌঁছানোর কোনো চেষ্টা তাঁর ছিল না। পল্লি-ভারতকে আতিপাতি করে জানবার কাজেই কেন্দ্রিত ছিল তাঁর লেখনীশক্তি। আঞ্চলিকতার ও সমকালীনতার বেড়া ভেঙে নিজের প্রতিভাকে বিশ্বের দরজায় পৌঁছে দেবার কথা বোধহয় তিনি ভাবেন নি। যে পটভূমিতে কাজ করেন রবীন্দ্রনাথ বা টলস্টয় সে পটভূমি তাঁকে তেমন আকৃষ্ট করে না। তাঁর মন বাঁধা ছিল এই দেশের ''ঘানি ঘোরার টালে/লাঙলের ফালে/লোহা গলানে আঁচে...'' আর কোথাও তিনি মন দেননি।

কিন্তু দরিদ্রজীবন সম্পর্কে মমত্ববোধ থাকলেও মোহ না থাকায় স্বচ্ছ ও মুক্তদৃষ্টিতে দেখার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল তা তাঁর গল্পগুলিতে বিচারবুদ্ধিজাত একটি সূক্ষ্ম দীপ্তি ছড়িয়ে দেয়। ফলে তাঁর ছোটোগল্প একটি বিশেষ আয়তন পায় যা বিভূতিভূষণের কোমল ও গ্রহণধর্মী মানসিকতাজাত গল্পগুলিতে থাকে না। একই বিষয় ও পরিবেশ নিয়ে লেখা বিভূতিভূষণ ও প্রেমচন্দের বহু গল্প পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় প্রথম জনের লেখা গল্প অগ্রসর হয় সরলরেখায়, দ্বিতীয়জনের লেখা স্পষ্টতই দ্বিমাত্রিক। প্রীত, প্রসন্ন, প্রশান্ত চিত্তবৃত্তির সহমর্মিতা বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্পের প্রাণধর্ম। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর সম্পর্কে একটি প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন, অ-বিতর্কিত স্নিগ্ধতা সেখানে বিচ্ছুরিত হয়। ফলে কোনো কোনো দিক থেকে অসাধারণ হলেও বিশ শতকের মানসিকতায় তাঁর জীবনবোধ একটু একপেশে লাগেই। প্রেমচন্দের লেখার উৎসেও একই সহমর্মিতা রয়েছে কিন্তু তিনি দরিদ্র জীবনকে তার সামগ্রিক রূঢ়তা সহ দেখাবার পক্ষপাতী। তাঁর জীবনদৃষ্টিতে তৃপ্ত প্রসন্নতার চেয়ে বিশ্লেষণী মননের জায়গা বেশি। বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে একেবারে মিশে না গিয়ে নিজের চিন্তাশক্তিকে একটু আলাদা রাখতে তিনি সক্ষম ছিলেন। প্রকৃত শিল্পিতার এই লক্ষণটি—ঈষৎ দূরত্ব, নিজেকে একটু বিচ্ছিন্ন রাখার শক্তি—তাঁর মনোগঠনে ছিল। সামগ্রিক রচনাকর্মে এই মনোধর্ম অবশ্য পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি। অনেক গল্পেই, বিশেষত যেখানে গ্রামীণ কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের কথা তিনি বলেছেন সেখানে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ সেই কাম্য শৈল্পিক দূরত্বের অন্তরায় হয়েছে। তবু এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান ও টানাপোড়েন তাঁর সব লেখাকেই একটা পৃথক চেহারা দেয় যা বিভূতিভূষণের লেখায় যেমন নেই তেমন নেই মহাশ্বেতার লেখাতেও। মহাশ্বেতার লেখায় উচ্চবর্গের প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত ও ভাষা প্রয়োগ গল্পকে অনেক সময়ে নিবিড় সহমর্মী হবার পথে বাধা হয়ে ওঠে।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী', 'সদ্গতি' ও 'কফ্ন্'-এ প্রেমচন্দকে সর্বোত্তম নান্দনিক সার্থকতায় পাওয়া যায়, তার কারণ সম্ভবত শিল্পী হিসেবে আত্মবিযুক্তির সঠিক জায়গাটি তিনি এই গল্পগুলিতে পেয়েছিলেন। প্রথম গল্পটিতে ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ের পটভূমিতে জাতীয় মানসের পত্তন চিত্রিত হয়েছে। যে বিকারহীন অসাড়তায় এত বড়ো একটি জাতির বিশাল এই দেশ বিদেশি বণিকের পদলুণ্ঠিত হয়েছিল সেই অবস্থানটি তিনি এঁকেছেন। উত্তর ভারতের বিলাসমত্ত নাগরিকতার ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সুগভীর ইতিহাসচেতনা ও তীব্র জাতীয়তাবোধ-প্রসূত বিপুল আত্মধিক্কার গল্পটিকে অসাধারণ করে তুলেছে। ইতিহাসগত কালব্যবধান থাকায় লেখকের ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন হতে পারেনি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নিম্নবর্ণ ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান মানুষকে কি অবর্ণনীয় অমানবিকতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে তারই কৃষ্ণরক্তিম রেখাচিত্র 'সদ্গতি' গল্পে। 'কফ্ন্' গল্পটির পটভূমিগত বিশালতা কিছু কম কিন্তু তীব্রতা আরো বেশি। ভারতের মানুষের প্রকৃত দারিদ্র্য—যা শুধু একটি অর্থনৈতিক অবস্থামাত্র নয়, যে দারিদ্র্য তার দেহ, মন ও মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষকে দরিদ্র করে রাখে, তা তিনি দেখেছিলেন। এই জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সূচিমুখ সমাজবোধ। এখানেও কিন্তু ঘিসু ও মাধব যে শ্রেণিভুক্ত লেখক সেই শ্রেণিভুক্ত নন। সেজন্যই সম্ভব হয়েছিল শিল্পরচনার সঠিক দূরত্বটুকুর অনুভব, যার অভাবে শিল্প সাধারণত সিদ্ধিসীমা স্পর্শ করে না। জীবনের প্রতি থাকবে প্রগাঢ় প্রীতি অথচ আবেগ উচ্ছ্বসিত হবে না; চিত্ত নিহিত থাকবে গভীর বেদনাবোধে অথচ দৃষ্টি হবে না আচ্ছন্ন, জীবনদৃষ্টি একই সঙ্গে সংহত হতে পারবে একটি ধূলিকণায় আর বিস্তৃত হতে পারবে আকাশের নিঃসীমতায়—এত কিছু ঠিক মাপমতো মিশলে তবেই শিল্পকর্ম হয় একই সঙ্গে জীবনসম্ভব ও শিল্পসিদ্ধ। কম লেখকেরই উত্তরণ ঘটে এই শীর্ষবিন্দুতে। কোনো লেখকেরই সব লেখা এই শিখর স্পর্শ করে না। প্রেমচন্দের কয়েকটি ছোটো গল্প এই সারিতে এসেছে। একটি 'কফ্ন্' ও একটি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী'-র জন্য বিশ্বসাহিত্য প্রেমচন্দের কাছে ঋণী থাকবে।

With best compliments of

BHADRESWAR RICE MILL

...we care for your health...

Sl. No. 30

রবীন্দ্রনাথের নাটকে যাত্রার উপাদান

অশোক দাস

রবীন্দ্রনাথ কি কোনোদিন যাত্রা দেখেছেন? জনশ্রুতি আছে যে রবীন্দ্রনাথ নাকি নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণযাত্রা দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনীগ্রন্থে অথবা তাঁর 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'য় কোথাও তার উল্লেখ আছে বলে মনে পড়ছে না। তবে 'সহজপাঠ' গ্রন্থে নীলকণ্ঠ-র যাত্রার উল্লেখ আছে। সন্দেহ নেই যে রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর বা সদ্যযুবক, তখন নীলকণ্ঠর কৃষ্ণযাত্রার জনপ্রিয়তা দুই বঙ্গ অতিক্রম করে আসাম ও ত্রিপুরায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং, পাঠ্যপুস্তকে বা কোনো রচনায় নীলকণ্ঠর যাত্রার উল্লেখ থাকা অসম্ভব ছিল না। উল্লেখ থাকলেই যে রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণযাত্রা দেখেছিলেন একথাও জোর দিয়ে বলা যায় না। এমনকি, তিনি আদৌ যাত্রা দেখেছেন কিনা এ সম্পর্কেও বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি যে যাত্রা সম্পর্কে নিরাসক্ত ছিলেন একথাও বলা ভুল। তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> আমাদের সময়কার কিছু ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার দল। মিহি-গলা-ওয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বাঁধার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এ-পাড়ায় ও-পাড়ায়, এক একজন নামকরা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত।[১]

'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ যে যাত্রার উল্লেখ করেছেন তা উনিশ শতকের পরিশীলিত যাত্রার কথা। তাঁর জন্মের আগে থেকেই কোলকাতার বাবু-সমাজে যাত্রার চল ছিল। প্রথম দিকে শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রাপালা রচনা করতেন না বা সংগীতজ্ঞ গুণীজনেরাও সংগীত যোজনা বা সুর রচনায় যুক্ত ছিলেন না। ১৮৪০-এর আগে পরে কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ যাত্রাকে পরিশীলিত বা মার্জিত করার চেষ্টা করেছিলেন। মতিলাল রায়ের হাতে যাত্রার সংস্কারসাধন হয়ে তা গীতাভিনয় বা অপেরার রূপ ধারণ করে। তার আগে গোপাল উড়ের যাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র গোপাল উড়ের যাত্রার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। গোপাল উড়ের রচিত গোটা বিদ্যাসুন্দর পালাটাই তাঁর কাছে রুচিহীন মনে হয়েছে। অথচ, ঠাকুরবাড়ির নাট্যামোদীদের মধ্যে যিনি প্রধান পুরুষ, সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি গোপাল উড়ের যাত্রা দেখেই জোড়াসাঁকোয় নাট্যশালা স্থাপনে উদ্যোগী হন।

মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের বহু আগে থেকেই এই দেশে বিদেশি থিয়েটারের প্রভাবে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮২১ সালে হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলিকে তখনকার মানুষ বিলাতি যাত্রা বলতো। গোড়ার দিকে বাংলা থিয়েটারে যাত্রার প্রভাব ছিল একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাবলিক থিয়েটারের জনপ্রিয়তা এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু প্রমুখ পেশাদার দক্ষ অভিনেতাদের অভিনয় বাংলার নাগরিক শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যাত্রা অপেক্ষা থিয়েটারেই বেশি আকৃষ্ট করে। অথচ, পাবলিক থিয়েটারের এইসব জনপ্রিয় অভিনেতা, নাট্যকার ও প্রয়োগপ্রধানেরা এসেছিলেন শখের যাত্রাদল থেকেই।

উনিশ শতকের শেষের দিকে মনোমোহন বসু প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সাথে যাত্রার আঙ্গিককে মেলানোর চেষ্টা করে যাত্রার আধুনিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তখনও যাত্রা নাগরিক সমাজে অপাংক্তেয় থেকে গিয়েছিল। আজকের যাত্রার অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার-সৌরীন্দ্রনাথ-ফণিভূষণ-শশাঙ্ক-আনন্দময়-জিতেন বসাক-উৎপল দত্ত-শম্ভু বাগ-ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের যাত্রাপালার যে নতুন রূপ তার বীজ বপন করেছিলেন মতিলাল রায়-মনোমোহন বসু-ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রী-অঘোর কাব্যতীর্থরা। এই সময়েই যাত্রায় থিয়েটারের প্রভাব পড়তে শুরু করে, নৃত্যগীতের বাহুল্য ও অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা বাদ দিয়ে মেদহীন আঁটসাঁটো বাঁধনে নাটকের আকারে পালা রচিত হল।

রবীন্দ্রনাথ যাত্রার এই রূপান্তর কতখানি লক্ষ করেছিলেন, জানিনা। যাত্রা যদি তিনি দেখেও থাকেন, তবুও তাঁর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কোথাও ব্যক্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটেছে যখন তখনই যাত্রা ও থিয়েটারের পরিবর্তনগুলি ঘটে যাচ্ছে। তাঁর মতো জগৎ-সংসারের যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে কৌতূহলী মানুষ যে এ সম্পর্কে উদাসীন থাকবেন একথাও বলা যায় না।

প্রশ্ন উঠতে পারে বাংলার দেশজ যাত্রা যখন পরিশীলিত ও মার্জিত হচ্ছে, তখন কি তার দেশজ বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে? কারো কারো মতে বাংলা যাত্রা তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সনাতন রীতি থেকে কিছুটা সরে এসেছিল। একে 'থিয়েট্রিকাল যাত্রা'ও বলা হত। অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায়[২] একে 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বলে পরিহাস করলেও প্রযোজকগণ দেশজ বৈশিষ্ট্য অনেকটাই রক্ষা করে চলেছিলেন। যাত্রা কখনোই খোলা মঞ্চ ছাড়া অভিনীত হয়নি। সাজঘর থেকে আসর পর্যন্ত অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থানের মধ্যে প্রবহমানতা ব্যাহত হয়নি। আলো ও দৃশ্যপটের ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। অভিনেতাদের কায়িক ও বাচিক অভিনয়ের দ্বারাই বক্তব্য পরিস্ফুট করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেশজ বাদ্যযন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মনোমোহন বসুরা যাত্রাকে কালোপযোগী করে তুলেছিলেন মাত্র। যাত্রা যেমন থিয়েটার থেকে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছে, থিয়েটারও তেমনি যাত্রা থেকে অনেক কিছু নিয়েছে। গিরীশচন্দ্র ঘোষের নাটকে তো যাত্রার উপাদান যথেষ্টই রয়েছে। উনিশ শতকের শেষ দিকে রোমান্টিক ও ঐতিহাসিক

নাটকগুলিও দেশের মাটিকে বাদ দিয়ে রচিত হয়নি। ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী' নাটকদুটির নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও সে-সময়কার নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকেও দেশজ রীতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক দেখেই ব্রিটিশ সরকার নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল প্রবর্তন করে।

যাত্রার অভিনেতারা যেমন আসর ও দর্শকের দূরত্বকে সহজেই ভেঙে ফেলতে পারেন তাঁদের ব্যক্তিগত অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বারা, গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফিরাও তেমনি মঞ্চসজ্জা বা দৃশ্যপট ছাড়াই দর্শকের সাথে একাত্ম হতে পারতেন, সে ক্ষমতা তাঁদের ছিল। তাঁদের অভিনয়ের স্টাইলটা ছিল অনেকটা যাত্রা অভিনেতাদের মতোই। কিন্তু তাঁরাও পাবলিক থিয়েটারে এসে প্রসেনিয়ামের মায়ায় মজে গেলেন, দেশীয় যাত্রার ধাঁচে নাট্যশালার কথা চিন্তা করলেন না।

রবীন্দ্রনাথ পেশাদার যাত্রাদলের জন্য কোনো পালা লেখেননি। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন, সর্বত্রই তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, কিন্তু জীবনে একটিও যাত্রাপালা কেন লিখলেন না সেটা বিস্ময়ের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানের নাট্যকার। কৈশোর অবস্থা থেকেই তিনি থিয়েটারের আবহাওয়াতেই মানুষ। তাঁর অগ্রজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের আদর্শ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বড় মাপের নাট্যকার একথা আমরা সকলেই জানি। রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নাটক রচনা করে গেছেন তা-ই না, নাটক প্রযোজনা, পরিচালনা এবং নাটকে অভিনয়ও করেছেন। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা'তে বাল্মীকির এবং 'বিসর্জন'-এর রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয়ের প্রশংসা সে-যুগের বহু পত্রপত্রিকাতেই উল্লিখিত আছে। রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু'তে ১৮৭৭ সালে মাত্র ষোল বছর বয়সে প্রথম অভিনয় করেন। তখন এই নাটকটির নাম ছিল 'এমন কর্ম আর করবো না'। আবার যাত্রা সম্পর্কে তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে :

> থিয়েটারে এসেছিলেন গেটে-সোনার চেন ঝোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়ো ছোটোয় ঘেঁসাঘেসি।... এর সুর এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাটমাঠঘাট পয়দা করা, এর ভাষা পণ্ডিতমশাই দেননি পালিশ করে।[৩]

যাত্রা সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এ সত্য কথাটা তিনি লিখতেন না। একথা বলার কারণ, উনিশ শতকের যাত্রায় অনেকটা পরিবর্তন এলেও বাংলা থিয়েটারে য়ুরোপীয় প্রভাব যতখানি পড়েছিল, বাংলা যাত্রা ঠিক ততটাই বিদেশি প্রভাব বাঁচিয়ে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তা কোথাও না কোথাও লক্ষ করেছিলেন। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে নাটক রচনা ও অভিনয়ে উদ্বুদ্ধ হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের নাটকগুলিতে ইউরোপীয় মঞ্চরীতিকে মেনে চলেননি। কারো কারো মতে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চায়নের কথা ভেবে নাটকগুলি রচনা করেন নি। কিন্তু 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' বা 'বিসর্জন' নাটক অভিনয়যোগ্য করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কম ছিল না। আজও প্রথম দুটি নৃত্যনাট্য এবং 'বিসর্জন' নাটকটির জনপ্রিয়তা যে-কোনো কমার্শিয়াল নাটকের চেয়ে কম নয়। 'বিসর্জন' নাটকটিকে তিনি বহুবার সম্পাদনা করেছেন। বেশি বয়সেও তিনি 'বিসর্জন'-এ জয়সিংহ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

অনেকে মনে করেন 'বিসর্জন' নাটকটিতে বলিদান প্রথার বিরুদ্ধে মানবতাবাদের জয় দেখানো হয়েছে বলে পেশাদার থিয়েটারের প্রযোজকরা এ নাটক অভিনয় করতে সাহস করেন নি। বলিদান প্রথার বিরোধিতা করা নাটক ভারতীয় ঐতিহ্যের বিরোধী। অথচ, এই নাটক বহু স্কুল, কলেজ, গ্রুপ থিয়েটার প্রযোজনা করেছে সাফল্যের সাথেই। কোথাও যাত্রার ফর্মে 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছে সাফল্যের সাথেই। বলিদান প্রথা যদি ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী হয়, আচার-সর্বস্ব ধর্মাচরণের বিরোধিতাও তেমনি ভারতের ঐতিহ্যানুসারী। মানবতার জয়গান করার জন্যই 'বিসর্জন' নাটকের এত জনপ্রিয়তা। এছাড়াও নাটকটিতে অঙ্কবিভাগ, দৃশ্যবিভাগ আছে যাত্রাপালার মতো। সংলাপ রচনাতে এই নাটকে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ব্যবহার করা হয়েছে। এই নাটক গদ্যছন্দে যখন থিয়েটার ওয়ার্কশপ প্রযোজনা করে, তখন মঞ্চে কোনো উপকরণ ছিল না, শুধু একটি খড়্গ দৃশ্যপট জুড়ে অঙ্কিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নাটকটি প্রযোজনা করেন, তখনও এই নাটকের বিশেষ কোনো মঞ্চোপকরণ ছিল না। আমরা প্রত্যন্ত গ্রামের এক স্কুলে 'বিসর্জন' নাটকটিকে যাত্রার ফর্মে অভিনীত হতে দেখেছি। যাঁরা বলেন যে এই নাটকটি লোক-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার জন্য সফল প্রযোজনা সত্ত্বেও দর্শকের আনুকূল্য পায়নি, তাদের বলি—ব্রজেন্দ্রকুমারের বহু যাত্রাপালা আছে যা অন্ধ কুসংস্কারের বিরোধী। অথচ তাঁর সেই পালাগুলি কোনোদিন দর্শকানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। মনে রাখতে হবে 'বিসর্জন' নাটক ঐতিহ্যবিরোধী নয়, কুসংস্কারবিরোধী। বলিদান এদেশের ঐতিহ্য না, কুসংস্কার। গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধচরিত' নাটকটিকেও তাহলে ঐতিহ্যবিরোধী বলতে হয়। এই নাটকেও বলিদানের বিরোধিতা করা হয়েছে, অথচ গিরিশচন্দ্র দর্শকানুকূল্য পাননি, একথা বলা যায় না।

'বিসর্জন' ছাড়াও 'রাজা ও রানি' 'গোড়ায় গলদ' কিংবা 'মালিনী' নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাজনে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতিকেই মেনে চলেছেন। 'গোড়ায় গলদ' নাটকটি 'শেষ রক্ষা' নামেও বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে পেশাদারী থিয়েটারে অভিনীত না হলেই যে সেই নাটকটি দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় একথা বলা চলে না। এখনো বহু নাটক গ্রুপ থিয়েটারে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে অভিনীত হয়, যেগুলি পেশাদারী থিয়েটারে অভিনীত হয় না। উনিশ শতকে আমাদের দেশে যে জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা দেখা যায়, তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলা যায়। তাই 'ন্যাশনাল' বা 'জাতীয়' শব্দটির পরিবর্তে 'হিন্দু' শব্দটিরই বেশি ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যেমন 'হিন্দু থিয়েটার' 'হিন্দু মেলা'—পত্রিকার নাম 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ যে সজ্ঞানে হিন্দু মৌলবাদীদের মতো চিন্তাধারায় এইসব সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, তা নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই নামকরণ হিতে বিপরীত আকার ধারণ করেছিল এবং এ কারণেই হয়ত পেশাদারী থিয়েটার 'বিসর্জন' বা 'মালিনী' প্রযোজনা করতে কুণ্ঠিত ছিল। 'মালিনী' নাটকেও আচার-সর্বস্ব হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব হয়ত হিন্দু মধ্যবিত্তদের কাছে গ্রহণযাগ্য হবে না, পেশাদার মঞ্চগুলি হয়ত এই ভয় করেছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি লিখেছেন—

> সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে পারে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।... যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে।[৪]

এই প্রবন্ধ রচনার আগে উল্লিখিত নাটকগুলি ছাড়াও তিনি লিখেছেন 'রুদ্রচণ্ড' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকটি ষোলোটি দৃশ্যে বিভক্ত হলেও ঘুরে ফিরে ছটি দৃশ্যেই অভিনয়স্থল সীমাবদ্ধ। এবং এই দৃশ্যগুলি ফুটিয়ে তুলতে কোনো কৃত্রিম মঞ্চোপকরণের প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও এ-সময় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ

হয়েছিল। মির্নার্ভা-তেও পরবর্তীকালে 'প্রতাপাদিত্য' নামে এ নাটকটি অভিনীত হয়েছে। তবে, এর নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথ দেন নি বলে এর আলোচনা থেকে বিরত থাকা গেল।

১৯০৮ সালের পর রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি রচনা করলেন, সেগুলি পূর্বতন নাটকগুলির ধারা থেকে ভিন্ন। 'শারদোৎসব' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত নাটকগুলি যতটা না থিয়েটারের তার চেয়ে বেশি যাত্রার কাছাকাছি। 'রক্তকরবী' নাটকটি যখন 'নন্দিনী' নাম দিয়ে তিনি লেখেন তখন এটিকে তিনি পালা বলেই উল্লেখ করেছেন। যাত্রা-নাটককে নাটক বলে না, বলে পালা। তাহলে কি তিনি 'রক্তকরবী'কে যাত্রার ফর্মে পরিবেশনের পক্ষপাতী? এ প্রসঙ্গে পারে আসা যাবে। প্রসঙ্গত বলা যায় ইউরোপের নাট্যকারগণ, বিশেষ করে, বার্নার্ড শ যেমন মঞ্চের বিস্তারিত বিবরণ দিতেন, অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকের মঞ্চনির্মাণে স্বাধীনতা থাকত না, রবীন্দ্রনাথের নাটকে তেমনি কোনো দৃশ্যসজ্জার বর্ণনা নেই। যাত্রা পালায় যেমন দৃশ্যান্তরে লেখা থাকে শুধু 'রাজপথ' অথবা 'নদীতীর' ইত্যাদি, রবীন্দ্রনাথও তেমনি তাঁর নাটকের প্রতিটি দৃশ্যেই এই রীতি অবলম্বন করেছেন। জনতার দৃশ্যগুলি দৃশপটের সেই অভাব পূর্ণ করেছে। এছাড়া তাঁর অধিকাংশ নাটকে 'ঠাকুর্দা' 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'-র মতো চরিত্রগুলি যাত্রাপালার বিবেকেরই অনুরূপ। আবার 'তাসের দেশ', 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর' ইত্যাদি বহু নাটকেই আসরে বা নেপথ্যে রয়েছেন রাজা-মন্ত্রী পারিষদবর্গ। যাত্রাপালায় যেমন দীর্ঘকাল জুড়ে পুরাণ ও ইতিহাসের রাজারা রাজত্ব করেছেন, এমনকি উৎপল দত্ত-র যাত্রাপালাতেও আফগানরাজ শাহসুজার আবির্ভাব যাত্রার ঐতিহ্য বহন করেছে, তেমনি একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে। তবে 'ডাকঘর'-এ রাজা মঞ্চে অবতীর্ণ হননি। 'ডাকঘর' প্রযোজনার সময় রবীন্দ্রনাথ স্টেজের মধ্যেই একটা পাড়াগাঁয়ের ঘর তৈরি করেছিলেন। অতি সম্প্রতি মুম্বই-এর সুনীল সানবাগের প্রযোজনায় 'ডাকঘর'-এর মঞ্চসজ্জায় দেখানো হয়েছে শুধু একটি খাট, শুয়ে আছে অমল, আর সামনে একটি লম্বা খুঁটি, তাতে রড দিয়ে তৈরি একটি জানালা। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে অসুবিধে হচ্ছে না অমলের বন্দীদশা। একেবারে নিরাভরণ মঞ্চে 'ডাকঘর'-এর অভিনয় যে সম্ভব তা প্রমাণিত।

অনুরূপভাবে 'ফাল্গুনী' এবং 'রক্তকরবী'কেও দৃশ্যপট একেবারে বর্জন করে অভিনয় করা চলে। অতি সম্প্রতি দুটি গ্রুপ থিয়েটারকে দু-ধরনের আঙ্গিকে একেবারে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন বা আলো ব্যবহার না করে দিনের আলোয় 'রক্তকরবী' অভিনয় করতে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' এবং 'রথের রশি'-তে দৃশ্যপট ব্যবহার আবশ্যিক করে তোলেন নি। এই নাটকগুলিতে যে স্থানগুলির নাম রয়েছে তার তো কোনো ভৌগোলিক অস্তিত্বই নেই। এগুলি তো বিমূর্ত। সুতরাং দর্শক যদি কল্পনাশক্তির সাহায্য নেন তাহলে ক্ষতি কী? যে দুটি গ্রুপ থিয়েটারের 'রক্তকরবী'র অভিনয়ের কথা বলা হল, তাদের একটি হল পথসেনা, কাঁচড়াপাড়া এবং অপরটি হল দেশবন্ধুভবন, দুর্গাপুর।

১৯০৮ সালের পর থেকে যে-সমস্ত নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সেগুলি প্রযোজনার স্বাধীনতা তিনি তুলে দিয়েছেন পরিচালকদের হাতে। একদা বিশ্বভারতীর কর্তাব্যক্তিরা হস্তক্ষেপ করতেন বলেই পরিচালকরা সে সুযোগ পাননি। ইতিমধ্যে ইউরোপে তখন নায়কনির্ভরতা অপেক্ষা নাটকে এসে গেছে টিমওয়ার্কের যুগ। পরিচালক সফল হলে দু-একজন আনাড়ি অভিনেতা নিয়েও টিমওয়ার্কের জোরে অনেক নাটক উতরে দিতে পারেন। আমাদের দেশেও পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত সত্যম্বর অপেরা, নিউ গণেশ অপেরা, রয়েল বীণাপাণি অপেরা, নিউ আর্য অপেরা, নবরঞ্জন অপেরা, নট্ট কোম্পানি, অম্বিকা নাট্য কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে উৎপল দত্তর নির্দেশনায় লোকনাট্য যাত্রাপার্টিতে যে টিমওয়ার্ক দেখা গেছে, তা ইউরোপীয় গ্রুপ থিয়েটারের প্রভাবান্বিত না হলেও তার সাথে তুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'রাজা' নাটক প্রযোজনা করে ১৯১১ সালে সেই টিমওয়ার্ক প্রদর্শন করেছিলেন। তবে অন্যান্য নাটকগুলিতে দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাবে প্রযোজনার সাফল্য আসেনি। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের নাটকগুলিতে নায়ক নেই। ডাকঘরের অমল বা মুক্তধারার অভিজিৎকে ঠিক নায়ক বলা চলে ন। 'রক্তকরবী'র নন্দিনীও নায়িকা নয়। 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা'তে জনতাই যেন মূল চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে। গ্রুপ অ্যাকটিং ব্যতিরেকে তাই 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা' বা 'রথের রশি'র প্রযোজনা সফল হওয়া সম্ভব নয়।

নায়ক-নির্ভরতার অভাব আছে বলেই আবার এ নাটকগুলিকে যাত্রার স্বগোত্রীয় বলা চলে কিনা সে নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। কারণ, পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকে টিমওয়ার্ক-সমৃদ্ধ যে যাত্রা অপেরা পার্টিগুলির কথা বলা হল, সেগুলিও ছিল নায়ক-নির্ভর। এমনকি, তরুণ অপেরার হিটলার, লেনিন, কার্ল মার্কস, মাও জে দং ইত্যাদি পালাগুলি তো নামেই জানান দিচ্ছে এগুলি নায়ক-নির্ভর। কিন্তু নায়ক-নির্ভর না হলে যে সেগুলি যাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে একথা বলা যায় না, কারণ নায়ক-নির্ভরতাই যাত্রার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তাহলে রবীন্দ্রনাথ 'নন্দিনী'কে পালা বলে উল্লেখ করতেন না।

'শারদোৎসব-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত নাটক লিখলেন, সে-সমস্ত নাটকের সংলাপে তিনি যে রীতি আনয়ন করলেন সেই রীতি কিন্তু যাত্রা থেকে ভিন্ন। যাত্রা অভিনয় করতে হয় খোলা মঞ্চে। পনেরো বিশ হাজার দর্শকের সামনে। ষাটের দশক পর্যন্ত তো খালি গলায় মাইক্রোফোন ছাড়াই অভিনয় করতে হত। ফলে যাত্রার অভিনেতা নির্বাচন করতে হত দীর্ঘদেহীদের মধ্যে থেকে, দূর থেকে যাদের চোখে পড়ে। অভিনয় করতে হত অষ্টাঙ্গ ব্যবহার করে উঁচু পর্দায়। জ্যোৎস্না দত্ত আসার আগে ছেলেদেরই মেয়ে সাজতে হত, না হলে দূর থেকে মেয়েদের গলা শোনা যাবে না, তাই অভিনয়ের বদলে করতে হত অতি-অভিনয়। দর্শকরা ছিল অধিকাংশই শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত। পালার বিষয়বস্তু বুঝতে হয়ত তাদের কোনো অসুবিধা হত না। কিন্তু ঋজু স্পষ্টভাষায় সংলাপ না বলে পরিশীলিত সাংকেতিক ভাষায় অথবা রূপকাশ্রিত ভাষায় সংলাপ বললে দর্শকদের অসুবিধা হয় বলে পালাকারগণ সাহিত্যগুণ বজায় রেখেই সহজ সরল সংলাপ ব্যবহার করতেন তাঁদের পালায়। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপের সাথে যাত্রাপালার সংলাপের আশমান-জমিন ফারাক। গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু বা মাইকেলের নাটকের সংলাপ এবং পরবর্তীযুগের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের সংলাপ মানুষের কাছে যতটা বোধগম্য, রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ ঠিক ততটাই দুর্বোধ্য। শচীন সেনগুপ্ত যে ভাষায় সংলাপ লিখতেন সে সংলাপ উচ্চারণ করতে গেলে যাত্রার মতো সুরেলা অভিনয় করতে হবে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে নির্মলেন্দু লাহিড়ী তত উচ্চৈস্বরে অভিনয় করেন নি, কিন্তু তাঁর প্রতিটি সংলাপ ছিল সুরে বাঁধা। শিশিরকুমার ভাদুড়ী যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটকে সুরেলা অভিনয় করেছেন, সীতা নাটকের গানগুলিও যাত্রার আঙ্গিকে গেয়েছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংলাপ বলার ক্ষেত্রে বা গান গাওয়ার ক্ষেত্রে সুরেলা অভিনয় বা ঝোঁক দিয়ে গান গাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

রবীন্দ্রনাটকেও দীর্ঘ সংলাপ আছে। 'রক্তকরবী' এবং 'রাজা'তেই সেই সংলাপ রয়েছে যা তৃপ্তি মিত্র নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করেছেন।

তাঁর গলাতেও সুরেলা অভিনয়ই ফুটে ওঠে। কিন্তু এর সুর আর যাত্রার সুর এক নয়। নাটকে বা পালায় সঙ্গীতের বহুল ব্যবহার যাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন যাত্রার মতোই। অথচ পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ব্রজেনবাবুর সময় থেকে, যাত্রায় গানের ব্যবহার কমতে থাকে। উৎপল দত্ত তো গানের ব্যবহার খুবই কম করতেন। সে হিসেবে বলতে গেলে প্রাক্-ব্রজেন্দ্রকুমার যুগে পালায় যে ধরনের গান ব্যবহৃত হত, রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান গাইবার রীতি তা থেকে আলাদা। চারণকবি মুকুন্দদাসের স্বদেশীযাত্রায় অবশ্য ঘন ঘন সঙ্গীতের অবতারণা করা হত। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান ও সংলাপ ছিল পরস্পরের পরিপূরক। 'তাসের দেশ' নাটকে গান যেন সংলাপ। এ গানের সাথে যাত্রার বিবেকের গান বা জুড়ির গানের বিস্তর ফারাক। অভিনয়ের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কখনো অতি-অভিনয়কে প্রশ্রয় দিতেন না। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইউরোপে হেনরি আর্ভিং-এর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন, আবার পরবর্তীকালে ১৯৩৯ সালে তিনি লিখেছেন—

> আর্ভিং-এর প্রচণ্ড অভিনয় দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করে ফেলে; তাতে কেবল বাইরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে ঢোকবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখিনি।[৫]

শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন'-এ যখন রঘুপতি করেছিলেন তখন তিনি অতি-অভিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর নাটকের সংলাপ উচ্চারণে অতি-অভিনয়ের সুযোগ নেই। তাহলে প্রথাগত নাট্যরচনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে কি তিনি যাত্রা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেন নি?

প্রথমেই বলা হয়েছে যাত্রাভিনয় বা যাত্রার অভিনেতাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হয়ত ছিল, কিন্তু যাত্রা কেন দেশজ লোকসংস্কৃতি, লোকনাট্য সমস্ত কিছুর প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। সঙ্গীত রচনায় তিনি যেমন দেশের ক্ল্যাসিকাল ধারাকে গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি লোকসঙ্গীতের ধারাকেও তিনি প্রবলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যাত্রা দেখেছেন কি না, বা দেখলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল সে সম্পর্কে প্রামাণ্য কোনো তথ্য না থাকায় তিনি নাটক রচনায় যে যাত্রা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বা যাত্রাপালা রচনার কোনো পরিকল্পনা তাঁর ছিল একথা বলা যায় না। তাঁর নাটকগুলিকে মঞ্চনাটকই বলতে হবে, এমনকি গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কাব্যনাট্য—সমস্ত ধরনের নাটকেই প্রসেনিয়াম মঞ্চে অভিনয় করার জন্যই তিনি রচনা করেছেন। তিনি স্বয়ং যতগুলি নাটক প্রযোজনা করেছেন কোনোটাই যাত্রার আঙ্গিকে খোলা মঞ্চে অভিনয় করেননি। বরং তাঁর প্রথম দিককার নাটকগুলিতে মঞ্চসজ্জায় ও পোশাক ব্যবহারে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনই লক্ষ করা গেছে। পরবর্তীকালে হয়ত সীমিত মঞ্চোপকরণ নিয়েই তিনি নাটকগুলি প্রযোজনা করেছেন, কিন্তু তা কখনোই খোলা মঞ্চে করেন নি। অথচ ভালো করে পড়ে দেখলে বা প্রযোজনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের নাটকে যাত্রার প্রচুর উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল—কার নাটকে যাত্রার উপাদান নেই? রবীন্দ্রনাথও তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু তাঁর ব্যতিক্রমী সত্তা হল তাঁর নাটক পূর্বসূরীদের নাটক থেকে সম্পূর্ণ নতুন ছকে বাঁধা। বাংলা নাটক সচেতনভাবেই দেশজ লোকনাট্যের ধারা গ্রহণ করেছে, রবীন্দ্রনাথও করেছেন। তবুও তাঁর নাটক 'যাত্রা' নয়। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে ব্যবধান ঘোচানোর কথা বলেছেন, মঞ্চে শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের গাছের আড়াল থেকে দেখার জন্য আস্ত গাছের গুঁড়িকে দাঁড় করিয়ে দেওয়াকে তিনি বিড়ম্বনা বলেছেন, কিন্তু মঞ্চের অস্তিত্বকে তিনি অস্বীকার করেননি। তাহলে দেখা যাচ্ছে তিনি নিরাভরণ মঞ্চের পক্ষপাতী হলেও প্রসেনিয়াম মঞ্চকে বাদ দেওয়ার কথা বলছেন না। তাঁর নাটকগুলি তাই প্রসেনিয়াম মঞ্চের জন্যই রচিত, অথচ তাঁর নাটকেও যাত্রার উপাদান রয়ে গেছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি শেষ জীবনে যাত্রায় ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র যাত্রার পথেই মুক্তি চেয়েছিলেন, উৎপল দত্ত তো সরাসরি যাত্রায় দু-দশক ধরে যুক্ত থেকে যাত্রাপালা রচনা করে যাত্রার যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কখনো যাত্রায় ফেরার কথা বলেন নি। উৎপল দত্তর নাটক ও যাত্রাপালা এক নয়। তাঁর 'রাইফেল', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'দিল্লি চলো', 'ঝড়', 'বৈশাখী মেঘ', 'সীমান্ত', 'তুরুপের দাস', 'মুক্তিদীপ' প্রভৃতি যেমন যাত্রাপালা হিসেবেই রচিত, তেমনি 'অঙ্গার', 'কল্লোল', 'ফেরারি ফৌজ', 'ব্যারিকেড', 'টিনের তলোয়ার' প্রভৃতি থিয়েটারের জন্য রচিত। যাত্রা-অভিনয়যোগ্য কোনো পালা রবীন্দ্রনাথ লিখে যাননি, যতই তাঁর নাটকে যাত্রার উপাদান থাকুক না কেন। তাঁর 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন' প্রসেনিয়ামের বাইরে অভিনীত হচ্ছে, সাফল্যও আসছে, তবু তা নাটক।

শুধু আমাদের দেশে নয়, রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন তখন ইউরোপেও লোকজ সংস্কৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নাটকচর্চা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও ইদানীংকালে গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীরা, পরিচালকেরা দেশজ সংস্কৃতির ফর্মকে নাটকে ব্যবহার করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচিবোধ ছিল প্রখর। তাই দেশীয় সংস্কৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও সৌন্দর্যের প্রলেপে মুড়ে তা অপরূপ সৃষ্টিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন তাঁর স্বীয় প্রতিভাবলে। বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকার আর কেউ নন—রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপীয় নাটকের মধ্য দিয়ে আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে তিনি যে নাট্যধারার প্রবর্তন করলেন, তাঁর সেই সৃষ্টি তাঁকে বিশ্বমানের নাট্যকারে পরিণত করেছে। শম্ভু মিত্র তাই স্বীকার করেছেন যে বাংলা থিয়েটারের তথা ভারতীয় থিয়েটারের ভিত্তি তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটককেই অবলম্বন করে।

ঋণ

মলয় রক্ষিত, *রবীন্দ্রনাটকে যাত্রার অধিকার*, যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা ৫

সূত্র নির্দেশ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছেলেবেলা*, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৭
২. অমৃতলাল বসু, *অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি*, পৃ. ১২৭
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছেলেবেলা, বিশ্বভারতী, পৃ. ২৯-৩০
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিচিত্র প্রবন্ধ*, বিশ্বভারতী, পৃ. ৭৩-৭৮
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *অন্তর বাহির*

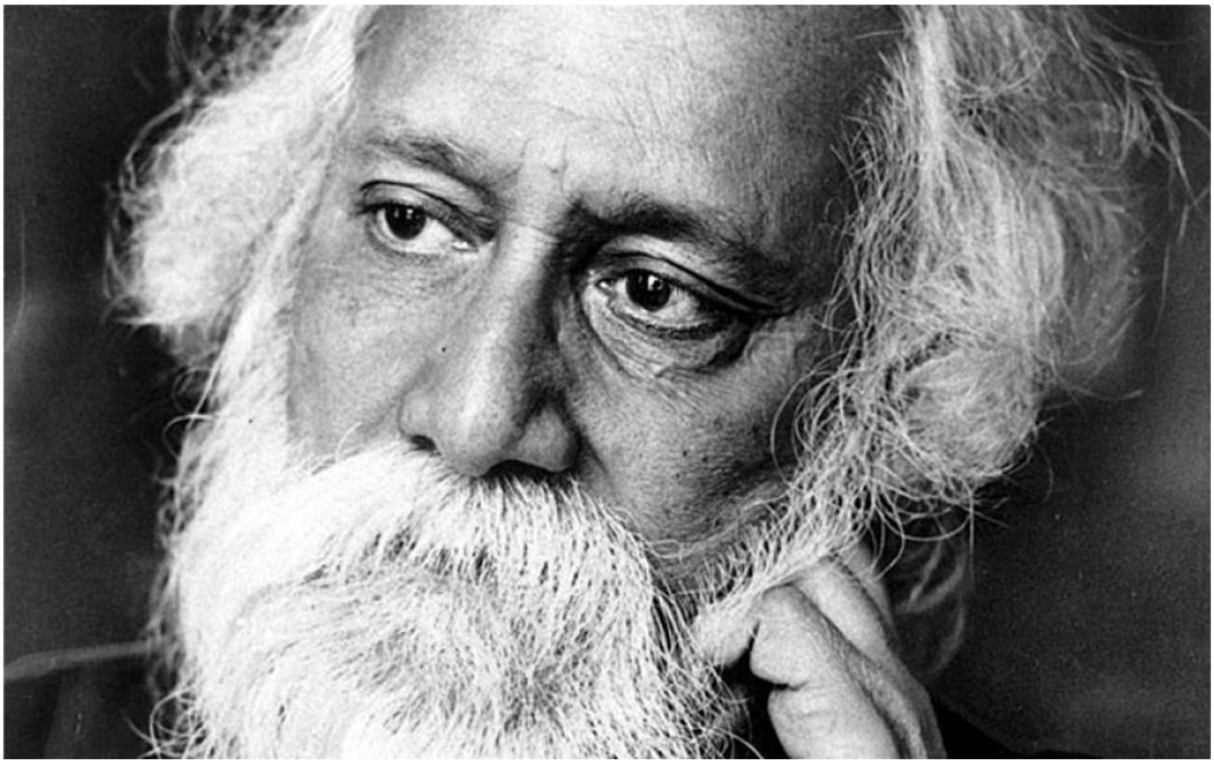

আজও রবীন্দ্রনাথ

সুধীর রায়

কবি বিষ্ণু দে একবার রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের ঘনঘটা দেখে প্রশ্ন করেছিলেন—

তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি?
হরেক উৎসবে হই হই
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?

কিন্তু শুধুই কি তাই? তাঁর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী অতিক্রম করে এসেও কি আমরা তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করতে পারি?

আজকাল আমরা এক সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য লিঙ্গবৈষম্যের অবসানের কথা বলি। এই লিঙ্গবৈষম্যের জন্যই আমাদের অর্ধেক আকাশ এখনো কালিমালিপ্ত। আমরা এখনো মনুর বিধান থেকে মুক্ত হতে পারছি না। কেন না মনু বলেছেন, ''পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।/রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।'' (৯/৩)

অতএব স্ত্রীলোকদের স্বাতন্ত্র্যের কোনো প্রয়োজন নেই। যদিও মনু অন্য এক পাঠে যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হল—কন্যাদেরও পালন করতে হবে। তাদের যত্নের সঙ্গে রক্ষা করতে হবে আর বিদ্বান পাত্রের কাছে ধনরত্ন সহ অর্পণ করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অজস্র গল্পে ও কবিতায় এই লিঙ্গবৈষম্যের কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'দেনাপাওনা' গল্পে আমরা দেখি নিরুপমা নামে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান একটি কিশোরীকে রায়বাহাদুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু নিরুপমার বাবা যেহেতু পণের টাকা পুরো মেটাতে পারেননি, তাই শ্বশুরবাড়িতে তার লাঞ্ছনা আর গঞ্জনার সীমা ছিল না। অনাহারে, অবহেলায় সেই স্বর্ণপ্রতিমার কিছুদিন পরেই মৃত্যু হল। আবার 'স্ত্রীর পত্র'-তে মৃণাল তার দীর্ঘদিনের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে, কেননা স্বামী তার আত্মমর্যাদা ও অনুভবের কোনো মর্যাদা দেয়নি। মৃণাল তার বড় জা-র বোনকে পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই বিন্দীকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পুরীতে থেকে গেল। আর একটি কবিতায় দেখি রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছেন, 'মঞ্জুলিকা' নামে একটি মেয়ের সম্পর্কে লিখতে, যে বাবার অমতে একটি ভালোবাসার লোককে বিয়ে করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী নারীদের সম্ভ্রম, নারী স্বাধীনতা, নারীদের শিক্ষার প্রসারের কথা বলেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে তাই কবি বলেছেন যে নারী পুরুষের পাশে থাকবে, তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা পুরুষকে সাহস ও প্রেরণা দেবে। ভারতের সংবিধানেও নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্পর্কে বক্তব্য আরও বেশি বেশি করে এখন প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তাঁর শৈশবে কলকাতায় স্কুলগুলি ছিল

ইটকাঠের খাঁচা, যেখানে যমদূতের মতো শিক্ষকরা ছাত্রদের নির্মমভাবে বেত মারত। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর শৈশবস্মৃতিতে আমরা এই রকম নির্মম প্রহারের উল্লেখ পাই। সেখানে ছাত্ররা কোনো উদার মুক্ত প্রকৃতির স্পর্শ পেত না। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন তপোবনের আদর্শে এক মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা গাছের নীচে বসে অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিত। নিদাঘের তপ্ত দিন, বর্ষার ঘন গম্ভীর স্তনন, নীল নবঘন আষাঢ় গগনের বৃষ্টিমুখর দিন, শরতের অমলধবল মহিমা, রিক্তশস্য পৌষের অবারিত মাঠ, আর বসন্তের মধুযামিনী ছাত্রদের মন স্পর্শ করত। তাদের হৃদয়ে দোলা দিত। অথচ ছাত্রদের আবশ্যিক কাজ ছিল নিজের বিছানা পাতা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, খাদ্য পরিবেশনে সহায়তা করা। বিকেলের খেলাধূলা আবশ্যিক ছিল। ছাত্রদের প্রতি নির্দেশ ছিল প্রান্তজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, তাদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা, তাদের রোগ পীড়ায় সেবা শুশ্রূষা করা। প্রথম দিকেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, তেজেশ চন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর সেন শাস্ত্রী শান্তিনিকেতনে শিক্ষা দিতেন। তাঁদের উদারতা, পাণ্ডিত্য ছাত্রদের মন স্পর্শ করত। আর সেই শান্তিনিকেতনে যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত হল, আদর্শ ছিল 'যত্র বিশ্ব ভবেদৈক্যনীড়ম্', অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব সেখানে এক হল। তাই দেশ বিদেশ থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি, বগদানাভ, স্টেলা ক্রাময়িশ, তুচ্চি, দীনবন্ধু এমহার্স্ট এখানে এসে অধ্যাপনা করেছেন। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন সুধীরঞ্জন দাশ, বিখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী, ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব কৃষ্ণ কৃপালনি আর আধুনিক বিশ্বের বিবেক, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন ভারত আত্মার মর্মবাণী—'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে'। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা ভারত চিরদিন করে এসেছে। শকহুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন। প্রাদেশিকতার, সাম্প্রদায়িকতার তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন। কোনো রকম সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করত না। তাঁরই রচিত দুটি গান আজ ভারত এবং বাংলাদেশ—দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। তিনি তাঁর নিজের দেশ, নিজের ভূমির জন্য অত্যন্ত গর্বিত ছিলেন। তাই তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নাখোদা মসজিদের বৃদ্ধ ইমামকে গিয়ে রাখি পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসের রাজনীতি তিনি সমর্থন করতে পারেননি। জনজাগরণ না হলে কখনো জাতীয় মুক্তি সম্ভবপর হয় না। 'চার অধ্যায়' গ্রন্থে অতীন আর এলা এই সন্ত্রাসের বিহ্বলতার শিকার।

ভারতের বর্ণভেদের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। প্রতিটি নরনারীর সমানাধিকার ও মর্যাদার কথা তিনি বলেছেন। তাই তিনি লিখেছিলেন—''হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'' বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কবি স্বদেশি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই তিনি লিখেছিলেন, 'নয় বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা।' জালিয়ানওয়ালাবাগের একটা ঘেরা জায়গায় যখন জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি চালান, তখন কবিকণ্ঠ এই নিষ্ঠুর নরমেধ যজ্ঞের বিরুদ্ধে ঝলসে উঠেছিল। তিনি বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডকে চিঠি লিখে জানালেন যে তিনি নাইটহুড বর্জন করছেন।

বাংলার অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। কিন্তু এই কৃষকেরা অধিকাংশ সময়েই ঋণভারগ্রস্ত। এই ঋণের ভার কমাবার জন্য তিনি তাঁর পাবনার জমিদারিতে সমবায় সমিতি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। লোকশিক্ষা প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বভারতী থেকে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে লোকশিক্ষা সিরিজ বের করেছিলেন। গান্ধীজি বিহারে ১৯৩৪ সালে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পের পর মন্তব্য করেছিলেন যে বিহারের মানুষের পাপকর্ম বা পাপমুক্তির জন্য এই ভূমিকম্প হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিবাদ করে বলেছিলেন যে ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, মানুষের পাপ-পুণ্যের ওপর তা নির্ভর করে না। তিনিই প্রথম গান্ধীজিকে মহাত্মা হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু উপলক্ষে তিনি লিখেছিলেন—'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

মৃতুর এক বছর আগে তিনি সুভাষচন্দ্রকে জাতীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন সুভাষচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম, তাঁর তেজস্বিতা, তাঁর উদাত্ত আহ্বান বিফল হবে না। অন্যান্যদের সঙ্গে কবিও চেষ্টা করেছিলেন যাতে কল্পনা দত্তকে আন্দামানে না পাঠানো হয়। তাঁর আন্তর্জাতিকতাবোধ খুবই প্রখর ছিল। তাই ফ্যাসিস্ট ইটালির আবিসিনিয়া অভিযান তিনি সমর্থন করেননি। 'আফ্রিকা' কবিতায় তিনি আফ্রিকার ওপর শ্বেতাঙ্গ শোষণ, বর্ণবৈষম্যের তীব্র নিন্দা করেছেন। বঙ্গভাষা, ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে গঠিত ভারতবর্ষে তাঁর কল্পনা ছিল এক মহাভারত গঠনের যেখানে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী সহাবস্থান করবে। তাই তিনি 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছিলেন, ''শকহুনদল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'' রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হচ্ছে ভারতের মূল সুর।

রবীন্দ্রনাথ লোকশিল্পের ও লোকসংস্কৃতির অনুসারী ছিলেন। তাই পুত্র রথীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় শ্রীনিকেতন গড়ে উঠেছিল। শ্রীনিকেতনে নানারকম কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, মাদুর ও শোলা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি হত। এখনও শ্রীনিকেতন, আমার কুটির প্রভৃতি সংস্থা এইসব জিনিসপত্র তৈরি করে। গ্রামবাংলায় হাট একটা বড় মিলনক্ষেত্র। এখনো দিল্লির দ্বারকা, কনকপুরি প্রভৃতি অঞ্চলে সপ্তাহে একটা বড় হাট বসে। বাংলার দধিয়া বৈরাগীতলায় মেলা, জয়দেব কেন্দুলির মেলায় হাজার হাজার লোক সমবেত হয়। আর এইসব মেলায় বা হাটে তারা তরিতরকারি, তৈজসপত্র, নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনে। তাই তিনি প্রধানত কৃষকদের জন্য পৌষমেলার প্রবর্তন করেন। পৌষমেলা ছিল প্রান্তজনের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। বাউলগান ছিল পৌষমেলার অঙ্গ। আমি নিজে দেখেছি নবনীদাস বাবাজী বাউল বা তাঁর ছেলে পূর্ণদাস বাউল পৌষমেলায় নাচছেন, ঘুরে ঘুরে বাউল গান গাইছেন। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অজস্র কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে, পত্রাবলীতে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। শেষ জীবনে তিনি চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করেন। গগন্দ্রেনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অমিতকুমার হালদার, রামকিঙ্কর বেইজ, দীনকর কৌশিক, শঙ্খ চৌধুরী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। তাই চিত্রাঙ্কনেও তিনি একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর তাবৎ শিল্পী সমাজ এখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার তাৎপর্য অনুধাবন করছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ আরও বেশি বেশি করে বাঙালি মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যেমন জার্মানিতে হয়েছিলেন মহাকবি গ্যেটে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) : সেদিনের ও আজকের নান্দনিক প্রাসঙ্গিকতায়

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুবিমল ছবি এঁকেছে। নিজের মায়ের একটা প্রতিকৃতি। সে ছবিতে চোখ রাখলে চোখ জুড়িয়ে আসবে কুলীন প্রশান্তির আবেশে। রুচির মাধুর্যে, পরিতৃপ্তির ঘনতায় তার পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছরের মাকে সবে চল্লিশ বছরে নামিয়ে এনেছে অজয় তার আঁকায়। সে ছবির বাজারদর তো গরম হবেই। কিন্তু কোন দুঃখে সেটা বিক্রি করবে সুবিমল। খালি মুগ্ধ সব চোখের পরিতৃপ্তি রোজগার করবে তার শিল্পনৈপুণ্য। সুবিমলের বন্ধু অজয়ও ছবি আঁকে। সুবিমলের মায়ের প্রকৃতি তার ভেতরের আঁকিয়ে গুণপনাকেও খুঁচিয়ে দিয়েছে। নিজের মায়ের একটা প্রতিকৃতি আঁকবে সে। কিন্তু তার মা তো কবে চলে গেছে। বাবাও। মুস্কিল তার মায়ের কোনো ফটো নেই। একটা পরিবার-ছবি আছে। ঘরের সবাই সেখানে আছে, নেই শুধু তার মা। জেঠিমার মুখে শুনেছে মায়ের চেহারা নিয়ে বাবার ঠাট্টায় মা সেই ফটোটা তোলানোর ঘর-জমায়েত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল লজ্জায়। তবে তার মা দেখতে খারাপ ছিল না। একটু কালো ছিল। কিন্তু টানা টানা বড় বড় চোখে, পাতলা ঠোঁটে আর একরাশ কালো চুলে তার মাকে নাকি বেশ ভালো দেখাত। তবু অল্প বয়সে মারা যাবার কারণে বাড়তি কিছু ভালোবাসার তাড়সে মায়ের চেহারার বর্ণনায় কিছু অতিকথাও থাকতে পারে বলে অজয়ের মনে হত। বাবার রাশভারি স্বভাবের জন্য তার সঙ্গে মায়ের সম্পর্কে কোনো কথাবার্তাই অজয়ের হয়নি। শেষ পর্যন্ত মায়ের বিরাশি বছরের বৃদ্ধ মামার কাছে মায়ের আসল চেহারা চলন জানতে পারল অজয়। না, ঘরের পাঁচ জনের কাছ থেকে মায়ের যে চেহারার কথা সে শুনেছিল তা কথার কথা ছিল। টানা চোখ, চোখা নাক তার মায়ের ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই মা-বাপ হারা তার মা। মামার বাড়িতেই তার বিয়ের আগে পর্যন্ত দিনগুলো কেটেছিল। মামার বাড়িতে খাটাখাটুনি করতে হত। টাকার অভাবে দোজবরে, বয়েস-বেশি পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা তখন ভালো ছিল না। ফলে অভাব অনটন, ঝগড়াঝাটি লেগেই ছিল। অজয়ের বাবা স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তাকে ঘরের আর পাঁচজনের খোঁটা খেতে হত। বাড়ির ভয়ে তাকে স্ত্রীকে কিছু না কিছু কটু কথা বলতে হয়। বাড়ির ময়লা কাপড় কাচা নিয়ে ঝগড়া হয়। স্বামীর কাছেও কিছু কটু কথা শুনে অজয়ের মা জ্বর গায়ে বৃষ্টির মধ্যে এঁদো পুকুরে একগাদা কাপড় কেচে ডবল নিমোনিয়ায় পড়ে মারা যায়। মরতে মরতে তার বাচ্চাদের জন্য সে বাঁচার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

'সন্ধান' গল্পটি এবার বাঁক নেয়। অজয় তার বাড়ির কাজের মেয়ে সরলার চেহারা ও চলন-বলনের মধ্যেই খুঁজে পায় তার মায়ের প্রতিকৃতি আঁকার ছাপ। অথচ সেই বস্তিতে থাকা সরলা কয়েক বাড়ির ঠিকে-ঝিগিরি করে চরম অভাবের মধ্যেও বুড়ি শাশুড়িকে নিয়ে সংসার চালায়। তার স্বামী চুরির দায়ে জেল খাটছে। কাজ করে ভাল, তবে বকবক করে বেশি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এই গল্পটি 'নতুন সাহিত্য' বলে একটি পত্রিকায় ১৩৬১ সালে বেরিয়েছিল, অর্থাৎ আজ থেকে ৬১ বছর আগে ১৯৫৫ সালে। প্রথম কথা, একান্নবর্তী পারিবারিক আবহাওয়া তখনও মূলত গ্রামাঞ্চলে অনেক পরিবারেই দেখা যেত। ভাব-ভালোবাসায় পরস্পরকে মানিয়ে নেওয়ার ও ঘরবাইরের গৃহস্থালী কাজকর্ম সামর্থ্যসাপেক্ষে ভাগ করে নেওয়ার উদাহরণ যে

ছিল না, তা নয়, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তা ঘটত না। যৌথতার খোলসে ভেতরে ভেতরে পরিবারের দু-চার জনকে যৌথতার দায়ধাক্কা মেটাতে হত। মোটা ও ছিঁচকে অত্যাচার আর অপমান সহ্য করেও সংসারের জন্য খেটে খেটে অনেকেই ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। কী অপূর্ব নান্দনিক মোচড়ে গল্পটিতে অকালে চলে যাওয়া অজয়ের খাটিয়ে মায়ের বুকের ভেতর জমে থাকা একরাশ মান, অভিমান, রাগ রোষ যেন খালাসের চেহারা চরিত্র পেয়েছে সরলার বকবকানিতে! মধ্যবিত্তের দূষণ-সংক্রামিত যৌথতার প্রতিপক্ষে গরিব পরিবারের অভাবপোড়া খাটিয়ে যৌথতার ভেতর বাঁচার মূল টানের সন্ধান দিয়েছে গল্পটি। সরলার মধ্যেই তার নিজের মায়ের জ্যান্ত তাপউত্তাপ নিবিড়ভাবে পেয়েছে অজয়।

২.

গোঁয়ার রাজেশ্বর বাড়ি করছে। আগাছার জঙ্গল, ভাঙা পোড়ো শিবমন্দির আর মজা পানাপুকুর পেরিয়ে আরও ঝোপজঙ্গলের মাঝে তার বাড়ি উঠছে। একদিকে ইট-সুরকির স্তূপ। খানিকটা গাঁথনি হয়েছে। দেয়াল মাত্র হাত-দেড়েক উঁচুতে উঠেছে। পাশেই অতি পুরোনো ঝাঁঝরা একটা একতলা বাড়িতে সে বউ, শ্বশুর আর মেয়েকে নিয়ে ভাড়া থাকে। শহুরে কলকাতামাফিক জীবনযাপন তার ঘোর অপছন্দের। সাধাসিধে মিতব্যয়ী আর গাছপালার সহবাসে চলা সাবেকি ও খোলাখুলি চলনবলন সে শুধু পছন্দই করে না, নিজের পরিবারকেও চলতে বাধ্য করে। অবশ্য তার যৎসামান্য আয়ে নামমাত্র বাঁচা ছাড়া তার চলা সম্ভবও নয়। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়াঝাটি প্রায় নিত্যকার। বছর দশেকের ছেলে স্কুলে ঠিকমতো যায় না, বিড়ি খায় ইত্যাকার অভিযোগ মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনে তাকে এমন মেরেছিল রাজেশ্বর যে ছেলে পরের দিন পালিয়ে গিয়ে সারাদিন রোদে রোদে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে ধুম জ্বর বাধায়। কিন্তু সে ছেলে প্রায় হাতুড়ে চিকিৎসায় মারা যায়।

রাজেশ্বরের স্কুল-সহপাঠীর জবানিতেই গল্পটি এগোয়। রাজেশ্বরের শ্বশুরের হাজার অভিযোগ রাজেশ্বরের বিরুদ্ধে। তার অতিমাত্রায় আঁটোসাঁটো সংসার চালানোতেও তার স্ত্রী উত্যক্ত। বাচ্চা মেয়েটি শুধু প্রাণোচ্ছল। শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত পাতকুয়োয় মেয়ের ফেলা সরু চেনহার খোঁজার জন্য নামলে রাজেশ্বর মারা যায়। বউয়ের গয়নাগাটি সবই সে ঢেলেছিল বাড়ির পেছনে। খালি মেয়ের সেই সরু চেনহারটির ওপর তার যত মায়া জড়ো হয়েছিল। তার মরার পর তার সেই স্কুল-সহপাঠী কেনা মহাভারতটি দিতে তাদের বাড়ি যায়। রাজেশ্বর পাঁচটি টাকা দিয়ে বিশেষ কমিশনে তাকে মেয়ের জন্য একটি মহাভারত কেনার জন্য অনুরোধ করেছিল। মেয়েটি তাকে বলে যে তার মা বলেছে তার বর এসে রাজেশ্বরের অসমাপ্ত বাড়ি শেষ করবে কারণ তার বর রাজেশ্বরের মতোই হবে।

গল্পটি 'বৈশাখী' পত্রিকায় ১৩৬২ সালে বেরিয়েছিল। গল্পটিতে আমরা জানতে পারছি তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তান থেকে ঘরবাড়ি বিক্রি করে জমির টাকা জুটিয়েছে রাজেশ্বর। তাছাড়া যেখানে যা ছিল, মায় বোনের গয়নাও বিক্রি করে বাড়ি তৈরির পেছনে ঢেলেছে সে। বাস্তবে পূব বাংলার মাটিছুট হলেও তার সারা শরীর মন জুড়ে ফেলে আসা মাটির বাড়ি, গাছপালা, নদীনালা বিজড়িত গেরস্তচল বয়ে যাচ্ছে। যে পরিবেশ, পরিস্থিতির মধ্যে ছিন্নমূল হয়ে সে এসে পড়েছে, সেই কলকাতার জীবন মেনে নিয়ে সে তার বাঁচার ধরনকে খাটো করতে পারছে না। উল্টে প্রতিদিনের চরম অভাব অনটনের মধ্যেও সে তার মতো করে একটা বাড়ি করতে চায় যার ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে সে তার ওপড়ানো জীবনকে পুনর্বাসন দেবে। যে সংবেদনহীন কুটিলতায় অবিভক্ত ভারতকে ভাঙা হল, তার প্রতিক্রিয়া তো ভয়াবহ হতে বাধ্য। স্বাধীন ভারতে সমাজসংসারকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য আত্মত্যাগ উন্মুখ পরিশ্রমতৎপর নানা স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাগুলিকে বিপুল জনশক্তির চেতনা ও কর্মসামর্থ্যকে প্রশিক্ষিত ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হল না। উল্টে তাদের চেতনাকে খোলা ও কর্মশক্তিকে পারস্পরিক আস্থাচলের বনেদভাঙার ক্ষেত্রে অপব্যবহার করার চেষ্টা চলতে লাগল। গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে-সব সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশেই মানুষের আহত প্রত্যাশা, আর্থিক সংকট ও পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন শিল্প-সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ছিল বিপর্যস্ত সমাজ সংসারের হাতে পর্যুদস্ত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবল রোখ যা পরিব্যাপ্ত হতাশা ও যন্ত্রণায় জ্বালাপোড়া মানুষকে একদিকে তাদের পারস্পরিক জখম সম্পর্ককে শুশ্রুষা করত, অন্যদিকে এই খাটুনিখাদক ব্যবস্থাকে বদলে দেবার চাড় মানুষের মধ্যে কমবেশি চাগিয়ে তুলত। 'গোঁয়ার' গল্পটাতে আমরা দেখি অপঘাতে মৃত্যুর পরেই রাজেশ্বর তার স্ত্রীর শরীরমনে জ্যান্ত রয়ে গেছে। নতুন বাড়ি তৈরির তাগিদে নিজেকে আর নিজের সংসারকে সে সীমা ছাড়িয়েও বঞ্চিত করেছে। ছেলের মৃত্যু তাকে দিনরাত দগ্ধেছে। তার শ্বশুর রাগের বশে তার সেই ক্ষতস্থান বারবার খুঁচিয়েছে। প্রতিক্রিয়ায় ভেতরের জ্বালা-পোড়ায় সেও রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু যে লোকটা অভাবপেষা যন্ত্রণা ছাড়া নিজেও কোনো শান্তি পায়নি, সংসারকেও শান্তি দেয় নি, তার স্ত্রীই কেন তার মৃত্যুর পর বাচ্চা মেয়েকে বলবে যে মেয়ের বর বাবার মতোই হবে। বোঝা যায়, রাজেশ্বরের তার অবস্থান বদলানোর লড়াইটান পরিবাহিত হয়েছে তার স্ত্রীর ভেতরেও। ভেতরে ভেতরে সে বুঝেছে স্বামী তাদের উন্মূল সংসারকে মাটিঠাঁই করার জন্যই এত লড়ে গেছে। দেশবিভাগের কুটিল ষড়যন্ত্রই হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের মতো তাদেরও সংসারে আগুন জ্বালিয়েছে। রাজেশ্বর আগুনপোড়া হয়েই এত বদলে গিয়েছিল।

গত শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে-সব সাহিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশেই মানুষের আহত প্রত্যাশা, আর্থিক সংকট ও পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন শিল্প-সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ছিল বিপর্যস্ত সমাজ সংসারের হাতে পর্যুদস্ত মানুষের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রবল রোখ যা পরিব্যাপ্ত হতাশা ও যন্ত্রণায় জ্বালাপোড়া মানুষকে একদিকে তাদের পারস্পরিক জখম সম্পর্ককে শুশ্রুষা করত, অন্যদিকে এই খাটুনিখাদক ব্যবস্থাকে বদলে দেবার চাড় মানুষের মধ্যে কমবেশি চাগিয়ে তুলত।

৩.

'দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর মাচার উপরে মাদুর পেতে মেয়েকে নিয়ে শুয়ে ছিল জোবেদা। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। তাই শুতে না শুতেই চোখ ভেঙে কালঘুম এসেছিল। কখন যে ময়না কোলের কাছ থেকে উঠে গেছে সে জানতেও পারেনি। ঘরের মধ্যে মাচার ওপর দিনের পর

দিন বসে থেকে থেকে ময়নারও হাঁফ ধরে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে সে ডিঙিতে উঠে বসেছিল। বেশিক্ষণ সেখানেও বসে থাকতে ভালো লাগেনি। দড়ির বাঁধন খুলে লগি ঠেলে উঠান-সমুদ্রের এপার-ওপার হবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু খোঁচ দিয়ে বোধ হয় টাল সামলাতে পারেনি।'

দিনের পর দিন গ্রামের পর গ্রাম বানবন্দী। গরিব মানুষগুলোর পেটের ভাত, পরার কাপড়—সব খেয়ে নিয়েছে বন্যা। নৌকার পর নৌকায় সর্বহারা মানুষগুলো শহরে যাবে সরকারি সাহায্যের দাবি নিয়ে। আইনুদ্দিনও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। শহরে খুঁজে খুঁজে সে বাচ্চা ময়নার জন্য চুলের ফিতে, গন্ধ তেল আর রাতঘরের জন্য কেরোসিন তেল নিয়ে যখন ফিরল, তখন ময়না সদ্য লাশ। আইনুদ্দিন পাথর, জোবেদা আঁকড়ে আছে মরা মেয়েকে। জোর করে নিয়ে যেতে হল বাপমায়ের বুকের কলজে মেয়েকে। মাটি কোথা যে কবর দেওয়া হবে! স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হল লাশ।

দিনের পর দিন গ্রামের পর গ্রাম বানবন্দী। গরিব মানুষগুলোর পেটের ভাত, পরার কাপড়—সব খেয়ে নিয়েছে বন্যা। নৌকার পর নৌকায় সর্বহারা মানুষগুলো শহরে যাবে সরকারি সাহায্যের দাবি নিয়ে। আইনুদ্দিনও তাদের সঙ্গে গিয়েছিল। শহরে খুঁজে খুঁজে সে বাচ্চা ময়নার জন্য চুলের ফিতে, গন্ধ তেল আর রাতঘরের জন্য কেরোসিন তেল নিয়ে যখন ফিরল, তখন ময়না সদ্য লাশ। আইনুদ্দিন পাথর, জোবেদা আঁকড়ে আছে মরা মেয়েকে। জোর করে নিয়ে যেতে হল বাপমায়ের বুকের কলজে মেয়েকে। মাটি কোথা যে কবর দেওয়া হবে! স্রোতে ছেড়ে দেওয়া হল লাশ।

১৩৬২-তে শারদীয়া 'আনন্দবাজার'-এ নরেন্দ্রনাথের এই 'বন্যা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির শেষ কিন্তু অপ্রত্যাশিত এক মোচড়ে। একে বন্যার জল, তার ওপরে পরপর দুদিন অঝোর বৃষ্টি। রাতবন্দী তো বটেই। দিনবন্দীও মানুষগুলো। গভীর রাতে উত্তাল জল ভেঙে আইনুদ্দিন আর জোবেদার কাছে বাঁচানোর আকুতি জেল-খাটা গফুর শেখের আসন্নপ্রসবা বউ সাকিনার। সেই প্রলয় রাতেই মেয়ে প্রসব করল সাকিনা। সাকিনা হঠাৎ বলে উঠল, ''দুঃখ কইরো না দিদি। বানের জলে সে-ই আবার ভাইসা আসছে। এ তোমাগো সেই ময়না।'' স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আর তাদের মেয়ের নাম শুনতে চায় না, বলল। কিন্তু তাদের শোকের প্রলয়কে আবার খুঁচিয়ে দিল সেই নবজাতিকা না কি শোকের ঘরটান সেই-জাতিকার স্পর্শে আবার তাদের পোড়া বুকে লালনদায়ের ঘূর্ণি তুলল?

সংকটের পর সংকটের উথালপাথালে মূলত গরিব ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি কীভাবে তাদের আর্থিক অবস্থান, পারিবারিক নিরাপত্তা, সামাজিক বিনিময়ক্ষমতা ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ভেঙে যাচ্ছে, নরেন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে, বিশেষ করে তার প্রারম্ভিক গল্পগুলিতে তার সংবেদনতীব্র স্বাক্ষর আমরা পাই। কিন্তু সে-সব গল্পে দুর্যোগ, দুর্বিপাক এমনকি মৃত্যুদত্ত বিচ্ছেদের মধ্যেও জীবন নতুন নতুন তাৎপর্যের গতিমুখ পায়। লড়াইও অনেক সময় নতুন অবস্থান তৈরি করে। পূর্ণবাবু ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে অকুল পাথারে পড়েছেন। বিভুঁই-কলকাতায় গ্রামসুবাদে পরিচিত সন্তানসম শৈলেনের কাছে এসেছেন। কাতর অনুরোধ, একটা চাকরি তাকে যোগাড় করেই দিতে হবে। শৈলেনই সামান্য চাকরিতে টানাটানি করে সংসার চালায়। সুতরাং বার বার তার কাছে এসেও কাজের কাজ কিছু হয় না। অভাবের চরমে রাস্তায় চানাচুর বিক্রি করতে নামে মধ্যবিত্ত গেরস্ত পূর্ণবাবু। গল্পের শেষে দেখা যায় চাকরি চাওয়ার কাঙালিপনা ছেড়ে হকারি পেশাতেই তিনি সংসারদায় মেটানোর মাটি রোজগার করেছেন। আজীবনের চাকরি করার স্বভাব ছেড়ে মুটে মজুরের সঙ্গে তিনি পেশাগত আত্মীয়তায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

৪.

'মানিকবাবুর ঘরের এই চেহারাই যেন সবচেয়ে মানানসই। এ যেন বাইরের ঘর নয়, স্রষ্টার মনের অন্দরমহল যেখানে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি-বিদ্যুতের বিরাম নেই।' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে ১৩৬৩ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় 'স্মৃতি' নামের লেখায় তিনি লিখেছিলেন। 'সাধারণ মানুষের ওপর তাঁর আন্তরিক দরদ আর সহানুভূতি, আশা করি, কোনোকালে কোনো শিল্পরসিকেরই চোখ এড়াবে না।' মানিকবাবু সম্পর্কে নরেন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে যথাযথ মান্যতা দিয়েও বোধকরি বলতে হয় সাধারণ মানুষের ওপর খালি দরদ ও সহানুভূতি নয়, বাঁচার যে-সব বিকল্প লড়াইসৃষ্ট পথ তারা উপার্জন করে গেছে, সে সব পথেরও নান্দনিক সনাক্তি খালি মানিকবাবুই নয়, তৎকালীন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ নিজের নিজের অভিব্যক্তিতে করে গেছেন। অন্যদিকে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধহীনতায় বেড়ে চলা নৈরাশ্য যে অনেক মধ্যবিত্তকে আত্মবিলয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তাও এদের লেখায় দেখা যায়। মানিকবাবুর লেখন যেমন অনেক তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট ও বিশ্লেষণদীপ্ত, নরেন্দ্রবাবুর লেখা সেখানে অনেক সংযত, ইঙ্গিতবহুল ও নরম। কিন্তু গল্পের চলনবলনে কারুকৃতি ও পরিবেশনায় যত ফারাক থাকুক না কেন, অভিমুখগুলো কিন্তু শুধুমাত্র সার্বিক নিরাপত্তা-বিপন্নতার বহুমুখী চালচিত্র নয়, বরং উল্টে সেই বিধ্বংসী বিপন্নতার সঙ্গে লড়াইয়ের নানা পথের রেখাচিত্র। ব্যক্তিজীবনেও বহু ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে উল্লিখিত লেখকদের যেতে হয়েছে। নরেন্দ্রনাথকেও তাঁর জন্মভূমি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার সদরদি গ্রামের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছে। একটা বড় পরিবার, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো প্রাকৃতিক বদান্যতা ও পারিপার্শ্বিক হৃদয়বহতা লেনদেনের সামাজিক আবেষ্টনী ছেড়ে আসার যন্ত্রণার ক্ষরণের সঙ্গে কলকাতায় বাঁচার জন্য লড়াইয়ের কঠিন অনুশীলন-ই কি আলোড়িত করেছে তাঁর নান্দনিক সামর্থ্যকে যার ফলশ্রুতিতে আমরা তাঁর কাছ থেকে যোগ্য অনেক ছোটোগল্প ও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস পেয়েছি? আত্মকথায় তিনি বলেছেন, 'শুধু নিজের যন্ত্রণাকে ভাষায় ব্যক্ত করার কথঞ্চিৎ ক্ষমতা। এই আমার উত্তরাধিকার।' তাঁর বাবা বহুকর্মা ছিলেন। যেমন দৈহিক, তেমনি সাংস্কৃতিক, তেমনি পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে তাঁর করিৎকর্মা ব্যক্তিত্ব সন্তানে সঞ্চালিত করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে সন্তান নরেন্দ্রনাথ মনে করতেন। বাবার কষ্ট তাকে আহত করত কিন্তু নিজেকে তিনি বদলাতে পারতেন না। এই আত্মগ্লানি থেকেই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করতেন, 'এই নৈরাশ্য আর অসহায় নিঃসঙ্গতাই কি আমাকে কাগজ কলমের আশ্রয় নিতে শিখিয়েছিল?' আবার উত্তরও তিনি দিচ্ছেন—'কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণার মূলে শুধু নেতিবাদের একাধিপত্য মেনে নিতে আমার মন সায় দেয় না। যা অস্মিতাসূচক বা সদ্ভাববাচক বাল্যে কৈশোরে তাও কি আমি প্রচুরভাবে দুহাত ভরে পাইনি? আমি যেমন বর্জন করেছি, বর্জিত হয়েছি, তেমনি কি গৃহীতও হইনি? গ্রহণ করিনি?' নরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখার সারশাঁসে ঢুকতে হলে আত্মকথায় বলা তার এই

পরস্পর-বিপরীতমুখী ভাব-ভাবনার অমিল-মিলের মিথস্ক্রিয়াকে উপলব্ধি করতে হবে। দেখতে হবে তার অধিকাংশ লেখায় কেমন করে বাইরের ঝড়ঝঞ্ঝা ঘরের শান্ত চলনকে গুলিয়ে দিয়েছে। কেমন করে সঙ্ঘনতা ফেঁসে গেছে। বিপন্নতার চাপ সংসারে কেমন ঘূর্ণিপাক তুলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে দুর্যোগ চিরে আলো যেন চুঁইয়ে নামছে। ঘর বুঝতে পারছে তার অভ্যাসের গিঁটে গিঁটে জড়িয়ে ছড়িয়ে থাকার ঘরোয়া চেহারা চরিত্রগুলোকে সে বাইরের চাপে ভুল বুঝেছে। এমনকি বাইরেকে দেখাও তার একপাক্ষিক হয়ে গেছে। খালি সংকট আমদানি নয়, সংকটের সঙ্গে লড়াইয়েরও নানা উপাদানকে সে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে শেখেনি। সবিস্ময়ে সে আবিষ্কার করেছে তার প্রতিরোধী শক্তিকে উৎকেন্দ্রিকতার টানে আলগা হয়ে যাওয়া পারস্পরিক দায়দায়িত্বকে আবার সংহত করার দিকে পাল্টা টান দিয়েছে। জীবিকার বিপন্নতা নরেন্দ্রনাথকে রেহাই দেয়নি। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সৈন্যদের জিনিসপত্র গোনা ও হিসেবে করার কাজ দিয়ে তাঁর জীবিকা শুরু। পরে যুদ্ধের সরবরাহ বিভাগে কেরানির কাজ। সন্তোষকুমার ঘোষ জানিয়েছেন, সেসব কাজ তাঁর একেবারেই ভালো লাগত না। ১৯৪২-এ তাঁর বাবা মারা যাওয়ায় আয়ের মূল পথ বন্ধ হয়ে যায়। বড় ছেলে হিসেবে বউ, দুটি শিশুপুত্র ও ছোটো ভাইকে নিয়ে ১৯৪৩-এ যুদ্ধ ও মন্বন্তরের মধ্যে কলকাতায় ফিরে আসেন। ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে চাকরি পান। সেখানেও একটা জাল চেক ভুল করে পাশ করে দেবার অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু তিনি ব্যাঙ্কে যোগ দিয়ে পদত্যাগ করেন। তারপর 'কৃষক' ও 'স্বরাজ' বলে নতুন পত্রিকায় সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। সাংসারিক অভাব চরমে ওঠে। বস্তিবাড়ির একটা টালির ঘরে তিনি উঠে আসেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালে তিনি 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় চাকরি পান। অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়। তৎকালীন নানা শক্তিশালী লেখকদের জীবিকার নিরাপত্তাহীনতা ও অভাব অনটনের সঙ্গে লড়াই করার প্রাণদম তাদের উত্তরোত্তর অস্থির বাইরের পরিবেশে নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ঘনত্ব বাড়িয়েছে। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা বেড়েছে। দৃষ্টিভঙ্গির নানা সংশোধন তাঁরা করতে পেরেছেন। অনুভব করেছেন মানুষের অসহায়তা, লড়াইজেদ, নীচতা আবার হৃদয়বৈভবও। পরস্পরবিরোধী নানা প্রবণতার ককটেলে মানুষ কত রহস্য আর বিস্ময়ের জীবনচল, তা তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। তাই বছরের পর বছর কেটে গেলেও তাঁরা এখনও আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক থেকে যান। নরেন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন। আজ যখন আমাদের আর্থিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে, যখন সংবেদনহীনতার দাপট ঘর-বাইরের নানা সম্পর্ককে দূষিত করে যাচ্ছে, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার জোটে যখন নানা ফাট-ফাটলকে চওড়া ভাঙনের জন্য যখন মদত দেওয়া হচ্ছে, তখন নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো গঠনপিপাসু লেখকদের কাছে আমাদের শিখতে হবে কেমন করে বুকের সাড়গুলোকে আবার স্পন্দিত করা যায়, কেমন করে চোখকে আরও চোখা করে বিচ্ছিন্ন প্রলোভন ও প্ররোচনার বিরুদ্ধে লড়া যায়। তাঁরা মানুষের বিচিত্র ও ব্যাপ্ত লড়াইয়ের নান্দনিক রেখাচিত্র আমাদের দিয়েছেন। জানিয়েছেন, প্রলোভনে আপস করলেও খুচরো খুচরো স্বার্থ পূরণের জন্য আত্মসমর্পণ করলেও বিপদমুক্ত হওয়া যায় না। বরং বিপদ আরও ঘনিয়ে আসে। নানা লেখায় নরেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের লড়াইচল মেজাজ ও জীবনচলই বেড়ে চলা সামাজিক ও পারিবারিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাতিয়ার।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত

গলসী-২ ব্লক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গলসী বাজার সন্তোষ শপিং সেন্টারের পাশে, গলসী, জেলা : বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯৭৩৪২৪৪৬৬২, ৯৪৭৬৪৯৪৬০৪, (০৩৪২) ২৪৫১৪৩৩

Sl. No. 31

With Best Compliments of

Sonatani Food Industries Pvt. Ltd.

Vill. Bolpur, P.O. Paraj, P.S. Galsi, Burdwan-713403 (WB)
Mob. 9434318290, 9841516780

Manufacturer of KONARAK GOLD RICE

Sl. No. 32

কৈলাসবাসিনী দেবী
উনিশ শতকের এক নারীকণ্ঠ

কল্যাণী ভট্টাচার্য

উনিশ শতকে আমাদের বাংলায় যে জাগরণ হয়েছিল তা একদিকে যেমন ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক, অন্যদিকে তা মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। মনের ভাবকে লিখে প্রকাশ করতে গেলে যে ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন উনিশ শতকের প্রথম দিকে মেয়েদের কাছে তা ছিল অনায়ত্ত। মেয়েদের জীবনের কথা, তাদের পাওয়া না-পাওয়া, আশা-হতাশা, সফলতা-নিষ্ফলতা—সবই পুরুষের কলমে প্রকাশিত হয়েছে। পুরুষেরাই চেষ্টা করেছেন অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করে মেয়েদের জীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হলেও তা পর্যাপ্ত ছিল না। শুধু রামমোহন বা বিদ্যাসাগরই নন, সে যুগের অনেক মানুষই চেয়েছিলেন মেয়েরা যাতে লেখাপড়া শেখে। অনেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং কয়েকজন মানুষের প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হল আজকের বেথুন স্কুল। মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরজা খুলে গেল। অন্যদিকে আবার শিক্ষিত মানুষের একাংশ বাড়িতে বসে স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে শুরু করলেন। কারণ তাদের অনেকেই জীবনসঙ্গিনীকে মাটির পুতুলের মতো দেখতে রাজি ছিলেন না। এরই ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শোনা গেল নারী-কণ্ঠ। এতদিন পুরুষের কণ্ঠে মেয়েদের কথা বলা হয়েছে; এবার মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলতে শুরু করলেন।

একথা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না যে, পুরুষের ইচ্ছা ও চেষ্টায় মেয়েদের শিক্ষা শুরু হয়েছে; সেই সঙ্গে একথাও মানতে হবে মেয়েরা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। কখনও স্বামীর চেষ্টায়, কখনো প্রাতিষ্ঠানিক আবার কখনো স্বশিক্ষায় সে যুগের মেয়েরা শিক্ষিত হয়েছেন; তাঁদের জীবনের ব্যথা ও বেদনাকে অনুভব করেছেন। সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে নিজেদের চলার পথ তৈরি করেছেন। আজকের মেয়েরা যেখানে এসে পৌঁছেছে তা তো একদিনে বা একটিমাত্র কারণে সম্ভব হয়নি। এর পিছনে বহু পুরুষ যেমন আছেন তেমনি বহু মেয়েও আছেন যাঁরা তিল তিল করে পথ তৈরি করেছেন। কৈলাসবাসিনী দেবী ছিলেন এমনই একজন মানুষ—মেয়েদের জীবনের অন্ধকার যুগে যাঁরা আলোর দিশারী হয়েছেন তাঁদেরই একজন—সেকালে যে মুষ্টিমেয় মেয়েরা নারী-পুরুষের অসাম্য নিয়ে ভেবেছেন, মেয়েদের অগ্রগতির পথ নির্দেশ করতে চেয়েছেন তাঁদেরই একজন তিনি।

কৈলাসবাসিনীর জীবন সম্পর্কে আমরা খুব একটা জানতে পারি না। তাঁর রচনার মধ্যে তিনি নিজের জীবনের কথা যেটুকু বলেছেন তার থেকে জানা যায় সেকালের প্রথা মতো তাঁর বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত ছিলেন শিক্ষিত। গুপ্ত ব্রাদার্স নামে দুর্গাচরণের একটি বইয়ের দোকান ছিল। এছাড়া মুদ্রণের ব্যাপারে ও বইয়ের ব্যবসা সম্পর্কে তিনি ছিলেন আগ্রহী। প্রকাশনার জগতে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা'র জন্য। মূলত দুর্গাচরণের আগ্রহেই কৈলাসবাসিনীর লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়। 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' বইয়ে 'গ্রন্থকর্ত্রীর নিবেদন' অংশে তিনি নিজের কথা কিছুটা বলেছেন। কৈলাসবাসিনী জানিয়েছেন ১৭৭১ শকের শ্রাবণ মাসে তাঁর স্বামী তাঁকে পড়াতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁর বয়স বারো বছর। এর থেকে অনুমান করা যায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আরও বলেছেন—

> আমি কন্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব নারীগণের বিদ্যাবিষয়ক কোনো কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয়ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধী ছিলাম। সুতরাং তাঁহার সেই যত্ন আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। আমি কোনমতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিলাম না। কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরো অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

এর বাইরে কৈলাসবাসিনীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। দুর্গাচরণের মৃত্যুকালে তিনি জীবিত ছিলেন কি না সে তথ্যও আমাদের অজানা। কিন্তু তিনি তাঁর রচনার মধ্যে বেঁচে আছেন। তাঁর রচিত বইয়ের প্রকাশক ছিলেন তাঁর স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত। দুর্গাচরণ 'গ্রন্থ প্রকাশকের উক্তি' অংশে কৈলাসবাসিনী সম্পর্কে বলেছেন—

> দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত ইনি কার্যত শিক্ষা করেন নাই, পরে আমার নিকট কিঞ্চিৎ কাল বর্ণ বিষয়ে উপদেশ পাইয়া স্বয়ং বাংলা গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করত অল্পদিনের মধ্যেই যে পরিমাণ তদ্বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা অনেকে বহুকাল শিক্ষকের অধীনে থাকিয়াও পারেন কিনা সন্দেহ। সমস্ত দিবা সংসার ও সন্তান সন্ততিগণের কার্যে ক্ষেপণ করিয়া সায়ংকালে যে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন তাহাতেই একপক্ষ মধ্যে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।

কৈলাসবাসিনী সম্পর্কে তথ্য খুব কমই জানা যায়। পাঠকের কাছে তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর রচনার মধ্যে। বাংলার মেয়েরা যখন পুরুষের হাত ধরে হাঁটতে শিখেছে সেই সময়ে তিনি শুধু সমাজ সম্পর্কেই চিন্তা করেন নি, সেই চিন্তাকে ভাষায় প্রকাশ করে ভবিষ্যতের জন্য রেখে গিয়েছেন।

কৈলাসবাসিনী তিনখানি বই লিখেছিলেন। তাঁর রচিত প্রথম বই হল 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা'। ১৮৬০ সালে এই বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় বই 'হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাঁহার সমুন্নতি' এবং তৃতীয় বইয়ের নাম 'বিশ্বশোভা'।

কৈলাসবাসিনীর আগে দু-জন বাঙালি রমণীর বই প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণকামিনী দাসীর 'চিত্তবিলাসিনী' এবং বামাসুন্দরী দেবীর 'কী কী কুসংস্কার তিরোহিত হইলে এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে'। কৈলাসবাসিনী লিখেছেন—

> বামাসুন্দরী আমাদিগের পথপ্রদর্শিকা রূপে এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমার মনকে উত্তেজনা করিলেন... তিনি উৎসাহিনী না হইলে আমরা কখনও এই ভাব প্রাপ্ত হইতাম না, চিরকালই জড় পদার্থের মত অবস্থিতি করিতাম... তাহার অনুকম্পা প্রাপ্ত না হইলে আমার এই হাড়িবেড়ি ধরা হত লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।

কৈলাসবাসিনী তাঁর রচনায় মেয়েদের সামাজিক অবস্থান দেখিয়েছেন, তাঁদের হীন অবস্থার কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কী করে সম্ভব তাও আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত তিনি নারী-পুরুষের অসাম্যের কথা বলেছেন :

> পুত্র জন্মাইলে যে রূপ বাদ্যবাদন, ব্রাহ্মণ পূজন, দরিদ্রভোজন, স্বস্ত্যয়ন, পুত্রের আয়ুবৃদ্ধির কারণে বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী দান, দেশ-বিদেশস্থ আত্মীয়-কুটুম্বগণের জ্ঞপনার্থ নাপিত প্রেরণাদি যে সকল মঙ্গলাচরণ হইয়া থাকে, কন্যা জন্মাইলে তাহার কিছুই হয় না বরং তদ্বিপরীত কার্যই হইয়া থাকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেছেন, ''হা বিধাতঃ আমরা কি এতই নিকৃষ্ট যে আমাদিগের জন্ম মৃত্যু উভয় কালই সমান হইবে?''

শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েতে পার্থক্য রয়েছে। আজ থেকে অনেক বছর আগে জন্মেও কৈলাসবাসিনী এই পার্থক্যের কথা বলেছেন, এই পার্থক্যকে দূর করার কথা ভেবেছেন।

সেকালের সমাজে মেয়েদের জীবনবিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল কয়েকটি প্রথা। বৈধব্য, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ—এই প্রথাগুলি সম্পর্কে সেকালের বুদ্ধিজীবীরা অনেক ভেবেছেন, সেই সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন। কৈলাসবাসিনীও এই সবকটি বিষয় নিয়েই ভেবেছেন, যুক্তি দিয়ে নিজের মত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

হিন্দুধর্মে বিয়েকে জন্মজন্মান্তরের বন্ধন মনে করা হয়। এমন একটা সময় ছিল। সেই বিশ্বাস থেকেই স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হত। কৈলাসবাসিনীর সময় 'সতীদাহ' বন্ধ হয়েছিল কিন্তু বৈধব্যের কঠিন অনুশাসনে বাঁধা ছিল মেয়েদের জীবন। কৈলাসবাসিনীর পূর্বসূরী বামাসুন্দরীকে আমরা বলতে শুনি ''বাল্যবিধবাগণের মনের অবস্থা এবং দুঃখ বর্ণনা করিতে হইলে পাষাণ পর্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া যায়।'' বামাসুন্দরী ছিলেন বিধবা বিবাহের পক্ষে। আর বামাসুন্দরীরও আগে কৃষ্ণকামিনী তো তাঁর 'চিত্তবিলাসিনী' কাব্যের একটি চরিত্রের মুখে বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি করেছেন :

> ধন্য ধন্য ধন্য বটে বিদ্যার সাগর
> রাখিলেন চিরকীর্ত্তি ভারত ভিতর
> বিধবার দুঃখভার করিতে সংহার
> মহীতে ঈশ্বর বুঝি তাই অবতার।

বৈধব্য-যন্ত্রণার বর্ণনা প্রসঙ্গে কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণকামিনী ও বামাসুন্দরীকে অনুসরণ করেছেন। কৈলাসবাসিনী মনে করতেন মেয়েদের হীনাবস্থার একটি কারণ হল বৈধব্য। বৈধব্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখলেন, ''দুঃখের বিষয় এই যে, এই দাবানল সদৃশ বৈধব্যানল প্রায় প্রতিগৃহেই প্রবেশ করিয়াছে এবং এই দুঃখানলে পতিত হইয়া অনেকেই দগ্ধ হইতেছে।'' একাদশীর দিনে বিধবার নিরম্বু উপবাস, বিধবার যন্ত্রণা তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন। তিনি দেখেছেন ঘরে ঘরে বিধবা। বিধবাদের দুঃখে কাতর হয়ে তিনি বলেছেন—

> হায়! দুঃখের কথা কি কহিব, যদি কোন অভাগিনী একাদশী দিবসে ঘোর বিকারাক্রান্ত হইয়া মহানিদ্রাপ্রাপ্ত হয়, তথাপি সেই সময় তাহার আত্মীয়গণ তাহার পারলৌকিক হিত সাধনের নিমিত্ত তাহার বদনে পবিত্রবারি প্রদানে অসমর্থ হইয়া ঐ বারি তাহার কর্ণকুহরে প্রদান করেন।

তিনি মনে করতেন বৈধব্যযন্ত্রণার তীব্রতা সহমরণের কষ্টকেও হার মানায়। 'বিধবা বিবাহ'কে সমর্থন করে তিনি কৃষ্ণকামিনী বা বামাসুন্দরীর মতো কোনো মন্তব্য করেননি। এ ব্যাপারে তিনি নীরব। এই নিদারুণ প্রথাটি সমাজ থেকে দূর করবার জন্য তিনি যেমন ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছেন, তেমনি স্বদেশহিতৈষী বান্ধবদের কাছেও সাহায্য প্রার্থনা করে বলেছেন, ''হে স্বদেশহিতৈষী বন্ধুগণ, তোমরা সচেষ্টিত হইয়া এই অবলাবৃন্দকে পরিত্রাণ কর।'' মানুষের সৃষ্ট এই সমাজব্যবস্থার কুফল মানুষই দূর করতে পারবে এই বিশ্বাস থেকেই তিনি স্বদেশহিতৈষী বন্ধুদের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

সেকালের সমাজে আর একটি কুপ্রথা হল বাল্যবিবাহ। কৈলাসবাসিনী বাল্যবিবাহকে মেয়েদের হীনাবস্থার একটি প্রধান কারণ বলেছেন। তাঁর মতে বাল্যবিবাহ হল মেয়েদের দুর্ভাগ্যের 'সোপান স্বরূপ'। অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হলে সংসারশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারে না। অল্পবয়সী মেয়ের বুড়ো বরের সাথে বিয়ে হয় বলেই তাকে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। বাল্যবিবাহের ফলে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি বাবা হন; সংসারে আবদ্ধ হয়ে পুরুষেরাও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা করতে পারে না। ফলে অর্থ উপার্জনের পথও বন্ধ হয়। অপরপক্ষে, মেয়েরা অকালে পুত্রবতী হন। ফলে অকালে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কখনো বাচ্চাটি মারা যায়, কখনো প্রসূতি নিজে মারা যান। তাঁর দুশ্চিন্তিত মত হল—

> পুরাকালের ন্যায় সকল আত্মজনকে অতিযত্নপূর্বক নানা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের রূপগুণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করত তুল্যপাত্রে অর্পণ করিলে কতই সুখের বিষয় হয়।

তাঁর মতে, ছেলেদের বিয়ের বয়স কুড়ি এবং মেয়েদের তের-চৌদ্দ বছর হওয়া উচিত। কৈলাসবাসিনীর এই সব অভিমত থেকে বোঝা যায় সমাজকে তিনি কী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই সমস্যাগুলি সমাধানের পথ খুঁজেছেন।

উনিশ শতকের সমাজজীবনে কৌলীন্য প্রথা যে ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করেছিল কৈলাসবাসিনী সেই সংকট থেকে মেয়েদের পরিত্রাণ চেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন মেয়ের দশ এগারো বছর বয়স হলেই বাবা-মা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যে-ভাবেই হোক কন্যাকে পাত্রস্থ করে তারা কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতে চান। পাত্র পাওয়া না গেলে অনেক সময় ফুলগাছের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। সমাজের বিধান ছিল এমনই নিষ্ঠুর। সেই যুগে বসে কৈলাসবাসিনী দুরন্ত সাহসের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : ''আহা, এরূপ বিবাহ না দিয়া যদ্যপি ঐ কন্যাগণকে কন্যাবস্থাতেই রাখেন, অথবা তাহাদের সদৃশ পাত্রে প্রদান করেন তবেই মঙ্গল, নচেৎ এরূপ বিবাহ দেওয়া ভ্রমমাত্র।'' উনিশ শতকে একজন বাঙালি নারীর দেশাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা, প্রতিবাদ করা এক বিরল দৃষ্টান্ত।

বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্রটি তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। কৌলীন্য প্রথা ও বাল্যবিবাহ দূর করলে বিধবাদের আবার বিয়ের প্রয়োজন অনেক কমে যাবে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছেন

> এই বঙ্গদেশ নানা প্রকার অনিয়মে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার সমুদয় পরিবর্ত্তন করিয়ে হয় নতুবা একের উপর টান পড়িলে অন্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্যবিবাহটি উঠিল না এবং বহুবিবাহ নিবারণের আইন প্রচলিত হইবে, কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদাটি থাকিবে। বিধবা ও বহুবিবাহ ফলস্বরূপ কিন্তু কৌলীন্য মর্যাদা ও বাল্যবিবাহ বৃক্ষস্বরূপ হইয়াছে।

বিয়ে সম্পর্কে কৈলাসবাসিনীর মত হল বর ও বধূ উভয়কেই উভয়ের যোগ্য হতে হবে। কেউ যদি বেশি উৎকৃষ্ট হয় তাহলে অন্যের দুঃখের কারণ হয়।... দম্পতির যদি স্বামী নিকৃষ্ট, ভার্যা উৎকৃষ্টা হয় তবে ভার্যার আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না।

কৈলাসবাসিনী মনে করতেন শিক্ষার অভাবই সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের দুর্দশার কারণ। প্রত্যেক মেয়েকে শিক্ষালাভ করতে হবে। তিনি শ্বশুরালয়ে বালিকা বধূর জীবনযন্ত্রণার পরিচয় দিয়েছেন। সে-যুগের আর একজন লেখিকা রাসসুন্দরী দেবী তাঁর বালিকাবেলায় পিতৃগৃহ ছেড়ে শ্বশুরালয়ে যাওয়ার বেদনার ছবি এঁকেছেন আর কৈলাসবাসিনী দেখিয়েছেন অশিক্ষাই শাশুড়ি এবং বধূর জীবনযন্ত্রণার মূলে :

> শ্বশ্রূগণ যদ্যপি বিদ্যারত্নে ভূষিতা হইতেন তবে তাঁহাদিগের সেই বিদ্যারত্ন প্রভাবে এই বিষম অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইত, তবে বধূগণের আর এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না, এবং বধূগণও যদ্যপি বিদ্যাবতী হইতেন তবে সেই বিদ্যারূপ মহাদ্রুম অবলম্বন করিয়া ঐ যন্ত্রণারূপ মহাবন্যা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেন।

মেয়েদের প্রতি আহ্বান, ''তোমরা বিদ্যারূপ ভূষণে ভূষিতা হইয়া জ্ঞানবস্ত্র পরিধান কর।'' তিনি দেখেছেন মেয়েদের বিদ্যা অর্জনের পথে বহু বাধা, যে নারী বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন তিনি পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির চক্ষুশূল স্বরূপ হইয়া বহু যন্ত্রণা সহ্য করেন। একটা প্রচলিত কথা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া করলে বিধবা হয়। কৈলাসবাসিনী প্রশ্ন তুলেছেন, ''বিদ্যার কি পতিঘাতিনী শক্তি আছে যে তদ্দারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে?'' মেয়েদের শিক্ষা লাভের বিপক্ষীয় যুক্তিগুলিকে তিনি একে একে খণ্ডন করেছেন।

প্রসঙ্গত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কৈলাসবাসিনী সুস্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তব্য রাখলেও বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে কিন্তু তিনি তাঁর পূর্বসূরি বামাসুন্দরীর মতো সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখেননি। তিনি বলেছেন, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ সমাজ থেকে চলে গেলে বিধবাদের সমস্যার অনেকটাই নিরসন হবে। নারীশিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। কিন্তু এর থেকে যদি আমরা মনে করি তিনি সামগ্রিকভাবেই নারী-পুরুষের বৈষম্য-বিরোধী ছিলেন তা হলে ভুল হবে।

যেমন, মেয়েদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি কট্টর প্রাচীনপন্থী। তিনি বলেছেন, ''নারীগণের অধীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত।... স্ত্রী পুরুষ উভয়েই গমন করিলে, গৃহের রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে?'' আজদের দিনে, কৈলাসবাসিনীর এ মতকে মানা যায় না। তিনি বিশ্বাস করতেন এদেশের মেয়েরা পতিপ্রাণা ও পতি-অনুগামিনী হবার আকাঙ্ক্ষা করে।

তাঁর ব্যক্তিজীবনও তারই সাক্ষ্য দেয়। তাঁর লেখা 'বিশ্বশোভা' বইটি তিনি তাঁর স্বামীকে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, 'পরম পুজ্যপাদ বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু' এবং নিজেকে 'হীনজাতি নারী' বলে উল্লেখ করেছেন।

কৈলাসবাসিনীর এই রক্ষণশীলতা আমাদের জাতব্যবস্থার সমর্থনের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতব্যবস্থাকে তিনি পুরোপুরি মেনেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন জাতব্যবস্থার সংস্কার আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন—

> নীচজাতি হাডডি এবং চণ্ডালদিগকে দৃষ্টি করিবা মাত্র যখন ঘৃণা উপস্থিত হয় তখন কি প্রকারে তাহাদের অন্ন-পানীয় গ্রহণ করিতে সকলের অভিরুচি হইবে, দুই একজন গ্রহণ করিতে পারেন করুন, কিন্তু সাধারণে তাহাদের কখনোই প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। অতএব যাহা সাধারণে প্রচলিত না হইল তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি?

অপরপক্ষে তিনি বিশ্বাস করেন, জাতি, আচার-ব্যবহারাদি সকলই মনুষ্যের সৃষ্ট কিন্তু জাতিভেদপ্রথা যে সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, তাকে যে দূর করা প্রয়োজন সেকথা তাঁর মনে হয়নি।

কোনো মানুষকে বিচার করতে বসলে কতটা তিনি পারেন নি তার চেয়েও বড় সত্য হল কতটা তিনি পেরেছেন তা ফিরে দেখা। তাছাড়া আজ যেটা ভাবা সম্ভব আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে সেটা ভাবা অত সহজ ছিল না। কৈলাসবাসিনী সেই সময়ে যেভাবে সমাজকে দেখেছেন সমাজে নারীর অবস্থানকে বিশ্লেষণ করেছেন—সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পথ নির্দেশ করেছেন সে কারণেই তিনি বাঙালি মেয়ের এগিয়ে যাওয়ার ইতিহাসে চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

তথ্যসূত্র

১. বন্দ্যোপাধ্যায় অনিন্দিতা (স.), *কৈলাসবাসিনী রচনা সংগ্রহ*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
২. গুপ্ত চিত্ররেখা, *প্রথম আলোর চরণধ্বনি (উনিশ শতকের লেখিকাদের কথা)*, উর্বী প্রকাশন

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিরঞ্জন খাদি গ্রামোদ্যোগ সেবা সমিতি

সন্দোলপুর, পোঃ অষ্টঘড়িয়া, জেলা বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩৪০৫
যোগাযোগ : ৯৬৪১২৪৫২৩৭ (সেক্রেটারি), ৮৬০৯৬৫২৬১৪

Certified by : KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION (Govt. of India)
BGL No. EZ 207, WB, Reg No. S/71259

Sl. No. 27

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন অব্যাহত রাখতে
সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

গোপগন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ক্ষুদিরাম কোঁড়া
উপপ্রধান

শম্পা ক্ষেত্রপাল
প্রধান

Sl. No. 86

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in
Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works
Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Burdwan
Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 93

নারী শুধু নারী নয়, কন্যা জায়া জননী

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

যুগ পাল্টেছে, সেই কবেই। এখন সেই আদ্দিকালের মতো কেউ বলবে না— ''পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই/তবেই মেয়ের গুণ গাই।'' তবু আজও চোরাগোপ্তা ভাবে আমাদের সামাজিক পরিকাঠামো খুব সুচতুর ভাবেই নারীমনে গেঁথে দিয়েছে—পুরুষ সব অর্থেই সবল, পুরুষ প্রতিভাবান, পুরুষ মেধাবী, পুরুষ বোহেমিয়ান, এবং পুরুষ হল 'সোনার আংটি', যে আংটি কিঞ্চিৎ বাঁকা হলেও তেমন কিছু নয়।

হ্যাঁ সত্যি, এখন বিশ্বায়নের যুগ। তবু আজও রবিবারের পাত্রপাত্রী চাই কাগজের ঢালাও বিজ্ঞাপনের সার কথাটি হল— পাত্রীকে হতে হবে প্রকৃত সুন্দরী কিংবা নিদেনপক্ষে সুশ্রী, মৃদু তথা কোমলভাষী, ফর্সা, গৃহকর্মনিপুণা, শিক্ষিতা, রুচিশীলা, ঘরোয়া ইত্যাদি। মানে পাত্রপক্ষের আবদার মতো পাত্রীকে এক কথায় সব গুণাবলী অর্জন করতে হবে। অনেকে তো আবার সাফ জানিয়ে দেন, প্রকৃত সুন্দরী না হলে যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। কারোর চাহিদা আবার চাকুরিরতা মেয়ে ঘরে আনবেন। আর খুল্লামখুল্লা না হোক, উপঢৌকনের লালচ তো মনে মনে থাকেই। আদপে এই সবই হল ক্ষমতালিপ্সু পুরুষতান্ত্রিকতার এক দারুণ ভিত্তিহীন হাতিয়ার।

যুগ পাল্টালেও, সমাজ নতুন আলোয় পথ চললেও, আজও কোথায় যেন অনেক ক্ষেত্রেই লিঙ্গভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিধায়করা শুধু নারীর মর্যাদা ও অধিকারকেই খর্ব করে না, একটা অলিখিত দেওয়াল তুলে রাখে। সেই অতীত থেকে আজও ভোগবাদী সমাজ দুনিয়ায় মেয়েরা বরাবরই পণ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সমাজ যতই আধুনিক মনস্ক হোক না কেন, আজও না-বলা লুকোছাপা ভাবে তা অনেকাংশে রয়ে গেছে। নানান অছিলায় মেয়েদের নানারকম নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখার চেষ্টা আগেও হয়েছে, এখনও কমবেশি হয়। সেই শিশুবয়স থেকে মেয়েদের পই-পই করে শেখানো হয় বা শিখে নিতে হয়—পা ফাঁক করে বসবে না, জোরে কথা বলবে না, লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবে, অযথা বায়না করবে না। পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর থেকে অনুশাসন আরও জারি হয়। ছেলেদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করবে না, সদা সতর্ক হয়ে থাকবে, গা-ঢাকা পোশাক পরবে, সন্ধ্যে বা ভর-দুপুরে ফাঁকা রাস্তায় একা একা হাঁটবে না, একা একা ট্যাক্সিতে উঠবে না। এসবই মেয়েটির ধর্ষিত না হওয়ার জন্য সাবধানবাণী। যে বিকার দিল্লিতে 'নির্ভয়া' ঘটায় কিংবা যে বিকার পশ্চিমবাংলায় 'কামদুনি' ঘটায়— সেইসব থেকে নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার অভিভাবকসুলভ তাগিদ সবই।

সংবাদপত্র খুললে, টেলিভিশনের রিমোট নিউজ চ্যানেল ঘোরালেই নারী নির্যাতনের খবর। আজ যেখানে মেয়েরা ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে সাংবাদিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়াবিদ, চলচ্চিত্রকার, সাহিত্যিক, শিক্ষক, ফ্যাশন ডিজ়াইনার, বিচারক, রাজনীতিবিদ,

পাইলট এমনকি মহাকাশচারী—সমস্ত দিকেই নিজেদের কৃতিত্ব স্থাপন করেছে, সেখানে সমাজের কতিপয় স্বঘোষিত ধ্বজাধারী রক্ষক নারীকে কাঁটাতারের বেড়াজালে আটকে রাখতে চায়। কালো ধোঁয়া যেন অনবরত পাক খাচ্ছে মেয়েদের শুচিতার ওপর। এমনকি অনিচ্ছুক স্ত্রীকেও কত সময় বিপন্ন হয়ে স্বামীর কাছেই ধর্ষিতা হতে হয় বার বার। শয্যাসঙ্গী নিজের বিবাহিত স্বামীকেও হয়তো সে বলতে দ্বিধা করে যে আজ তার মন ও শরীর দুটোই স্বামীর ইচ্ছার সাথে পাল্লা দিতে নারাজ। একটা অভিমানরূপী প্রতিবাদ চোরাগোপ্তা পথে আস্তে আস্তে ব্যবধান বাড়িয়ে তোলে দু-জনের মধ্যে। রঙিন স্বপ্ন দেখা ভবিষ্যৎ তখন আবছা হয়ে আসে। যমুনায় শ্যামের বাঁশি বাজলেও তা আর রাইয়ের কানে পৌঁছয় না।

আবার নারী নির্যাতনের ঘটনাবহুল খবর বা ধর্ষণের রগরগে খবর যখন সংবাদপত্রে বা টেলিভিশনের পর্দায় রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করা হয়, কিছু মানুষ কেমন উৎসুক হয়ে সেই সমস্ত খবর পড়ে বা দেখে, নারীদেহ নিয়ে লালসা বা আগ্রহ কোনো কিছুরই অভাব থাকে না তখন।

মহাভারত-রামায়ণ আমাদের অনেক শিখিয়েছে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের কথা। কিন্তু বিশাল গ্রন্থদুটিতে নারীর অসম্মানও প্রকট। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, শকুন্তলার প্রতি উপেক্ষা, পঞ্চস্বামী, সীতার বনবাস, সীতার সতীত্ব পরীক্ষা, রামের সন্দেহ, শেষমেশ সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ। বেদ-উপনিষদ-পুরাণে-মহাকাব্যে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আধুনিক দৃষ্টিতে যা দেখি বা বুঝি তা মোটেও সুখপ্রদ নয়। সেই সমাজের নিয়ন্ত্রক ছিলেন মুনি ঋষি রাজন্যবর্গ। তাঁদের বিধানই ছিল সংবিধান। মহাভারতের যুগে সমাজব্যবস্থা এমন এক শৈলীতে বুনে দেওয়া হল যেখানে নারী শুধুই ভোগ্যপণ্য। সে-সময় পুরুষসমাজ অলিখিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল রাজাদের স্ত্রীদের মুনিঋষিদের দ্বারা যখন তখন গর্ভসঞ্চারের। অথবা বংশরক্ষার সংকট থাকলে মুনি-ঋষি অথবা বংশেরই অন্য কাউকে সেই দায়িত্ব দেওয়া। মহাকাব্যে এর ঝুরি ঝুরি নিদর্শন রয়েছে।

আর ছিল 'নিয়োজন' প্রথা। অর্থাৎ প্রয়োজনে বংশরক্ষার জন্য অন্য পুরুষকে নিয়োগ করা যেতে পারে। রাজন্যবর্গ ও মুনিরাও এটা খুশি মনেই মেনে নিলেন। বিবাহ নামমাত্র। মুনিঋষিরা কামতাড়িত হলেই অন্য মুনির স্ত্রীকে সঙ্গমে ডেকে নিতেন। পুরুষের চাহিদার সাথে তাল রেখে খোলস বদলে নেয় নারীজীবন। কখনও সে দেবী তো কখনও সে সেবাদাসী, দেবদাসীর ভূমিকায়।

প্রাচীন বৈদিক সমাজে সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীজাতির সাধারণ নাম ছিল 'নারী'। লক্ষণীয় যে এই নারী শব্দটি কিন্তু 'নর' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ নয়। সুপ্রাচীন বেদ সংহিতায় নর শব্দটি প্রচলিত নয়। কারণ সে যুগে নাকি নর শব্দটিই ছিল না। কিন্তু 'নৃ' শব্দটি ছিল। সংস্কৃতে নৃ + ঈ = নারী এবং স্ত্রীজাতিকে বোঝানোর জন্য নারী শব্দের যথাবিহিত প্রচলন ছিল। সেখানে নারী শব্দের অর্থ 'নেত্রী'—পারিবারিক বিষয়ের নেত্রী।

মহাভারত-রামায়ণ আমাদের অনেক শিখিয়েছে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের কথা। কিন্তু বিশাল গ্রন্থদুটিতে নারীর অসম্মানও প্রকট। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, শকুন্তলার প্রতি উপেক্ষা, পঞ্চস্বামী, সীতার বনবাস, সীতার সতীত্ব পরীক্ষা, রামের সন্দেহ, শেষমেশ সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশ। বেদ-উপনিষদ-পুরাণে- মহাকাব্যে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে আধুনিক দৃষ্টিতে যা দেখি বা বুঝি তা মোটেও সুখপ্রদ নয়। সেই সমাজের নিয়ন্ত্রক ছিলেন মুনি ঋষি রাজন্যবর্গ। তাঁদের বিধানই ছিল সংবিধান। মহাভারতের যুগে সমাজব্যবস্থা এমন এক শৈলীতে বুনে দেওয়া হল যেখানে নারী শুধুই ভোগ্যপণ্য।

হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। সেই তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে বেশিরভাগই পুরুষ অর্থাৎ দেব। কিন্তু সেই দেব-দেবীগণের মধ্যেও 'একম্ সত্যম্' হিসেবে দেবীশক্তিকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। চতুর্বেদ শাস্ত্রের জননীস্বরূপা হিসেবে প্রণম্য হয়ে আছেন গায়ত্রী। 'মাতা' হিসেবে তিনি পূজিতা হয়ে এসেছেন। শাস্ত্রীয় যাবতীয় হোম, যজ্ঞ, পুজোপাঠ, উপনয়ন সর্বত্রই গায়ত্রীমন্ত্র পাঠের বিধান আছে। তিনি শুধু দেবীই নন—বৈদিক শাস্ত্রমতে তিনি দেবী মাতৃকা। পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্রে ''ওম্ ভূর্ভূবস্ব/তৎসবিতুর্বরেণ্যম্/ ভর্গদেবস্য ধীমহি/ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ''—স্মরণে এই দেবীমাতাকে আরাধনা করা হয়।

মাতৃপূজার ভাবনা আমাদের ভারতে বহু প্রাচীন। মাতৃশক্তিকে পরমারাধ্যা জ্ঞানে ভাবা হয়—এই শক্তি পরমাত্মারই পূর্ণশক্তির বিচিত্র প্রকাশ। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই পরাশক্তিকে আশ্রয় করেই হয়। সভ্যতার আদি যুগ থেকে এই মাতৃশক্তি জাগতিক দুর্দশা থেকে মানুষকে রক্ষা করবে, এই বিশ্বাস রয়ে গেছে মানবমনে।

মার্কণ্ডপুরাণেও উল্লেখ আছে দেবতাদের মতোই অন্যান্য উপদেবতারাও ঐশ্বরিক মাতৃশক্তির কাছেই নতজানু হয়েছিলেন। দেবী অদিতি-কে সমস্ত প্রধান দেবতা, যথা ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, আর্যমন, মিত্র—এঁদের মাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। দেবী সরস্বতীকে জ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীতের প্রতিরূপ বলা হয়। দেবী অন্নপূর্ণাকে শস্য সুজলা সুফলার প্রতিরূপ মানা হয়। লক্ষ্মীকে ধনসম্পদ ও গৃহলক্ষ্মী হিসেবে, বনদেবীকে গাছপালা বনজঙ্গলের প্রতিভূ ইত্যাদি হিসেবে কল্পনা করা হয়। কখনও দেবতাও 'অর্ধনারীশ্বর' রূপে ধর্ম নির্মাণে মূর্ত হন, যেমন বিষ্ণু। বিষ্ণুর স্ত্রীর নাম 'শ্রী'। আমরা বলি 'শ্রীবিষ্ণু'। ভক্তের কাছে দেবতাদের যুগল মূর্তিই বেশি প্রণিধান পেয়ে এসেছে বরাবরই। যেমন রাধে-শ্যাম, সীতা-রাম, শ্রী-বিষ্ণু, উমা-মহেশ ইত্যাদি। ভক্তরাও যুগলমূর্তি ভজনায় 'স্ত্রী' নামটিকেই প্রথমে রাখতে মানসিকভাবে আশ্বস্তবোধ করেন। হিন্দু বৈদিক প্রার্থনামন্ত্রেও স্বয়ং ভগবানকে আর্তি করা হয়—''ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব'। অর্থাৎ হে সৃষ্টিকর্তা ভগবান, আপনিই আমাদের 'মাতা' আপনিই আমাদের 'পিতা'। পৌরাণিক শাস্ত্রে এমনতর নানা উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে।

আদি প্রস্তরযুগে সমস্ত পুরুষজাতির কাছে নারীই ছিলেন অলৌকিক দেবীস্বরূপা। এমনকি সন্তানজন্মের রহস্যকেও বলা হত দৈব-জাদু। নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। কৃষিযুগ শুরু হওয়ার পরই ফসল উৎপাদনের সাথে নারীর সন্তান প্রজননের এক যোগসাজস পুরুষের কাছে উন্মোচিত হল ক্রমশ। অচিরেই পুরুষ আবিষ্কার করল নারী সন্তান ধারণের উপযুক্ত ক্ষেত্রভূমি। এই উর্বর ক্ষেত্রকে উৎপাদনের মাধ্যম করে তুলল পুরুষ। নারীকে সন্তান উৎপাদন ও সন্তান পালনের জন্য পণ্য মনে করা শুরু হতে লাগল, এটাই ছিল পুরুষের সমাজ গঠনের একটা ধরন। এক সময় সেখানে নারীকে শস্যদাত্রী হিসেবে দেবীরূপে বন্দনা করা হত, তার পাশাপাশি

নারীকে ভোগের পণ্য করে তোলার চতুর পন্থা শুরু করলেন সেকালের যজমান-পুরোহিতরা। তাদের নিদান ছিল অধিক ফলন। নারীর ভূমিকা পরবর্তী সময় সংস্কারাচ্ছন্ন পুরুষতন্ত্রে ও সমাজে ধর্ষণ প্রতিশব্দে অজান্তেই কখন জড়িয়ে গেল।

অন্যদিকে আবার সংস্কৃত ভাষায় রচিত মান্য শাস্ত্র ও সাহিত্যে দেখা গেছে, পুরাকালে উচ্চকণ্ঠে বলা হয়েছে নারী যেন বৈদিক শাস্ত্র না পড়ে। বৈদিক শাস্ত্র পড়ার অধিকার খর্ব করায় এক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে, সেই সময় অনেক নারীই বৈদিক শাস্ত্রপাঠে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেই তো আছে, ঋষি যাজ্ঞবল্কের মতো প্রভাবশালী ঋষিকে বিদুষী গার্গী বাক্-যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। যাজ্ঞবল্কের স্ত্রী মৈত্রীও স্বামীকে আত্মা ও ঈশ্বর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করেছিলেন।

হিন্দু পুরাণে নারীর প্রধান 'অষ্টগুণ' চিহ্নিত ছিল। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, এই গুণ আরোপ করেছিলেন ভোগসর্বস্ব বহুস্বর পুরুষরাই। সেখানে নারীর কী কী গুণ থাকতে হবে তার সুচারু ভাবচিত্র কল্পনা করে বলা হয়েছে—

কার্যেষু দাসী, করণেষু মন্ত্রী,
ভোজেষু মাতা, শয়নেষু রম্ভা,
রূপেষু লক্ষ্মী, ক্ষমায়েষু ধরিত্রী,
সৎকর্মে নারী, কুলধর্মে পত্নী।।

এই সমস্ত শাশ্বত হিন্দুবাদী রূপক পেরিয়ে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমাদের সমাজ যতই আধুনিক হোক না কেন—নানা অছিলা ও বিধিনিষেধ নারীর ওপর আজও। তাই কখনও সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নাবালিকা বিবাহের ঘটনা ঘটে। লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রবণতাও দেখা যায়। শুধু তাই নয়, বিবাহিতাদের এয়ো চিহ্ন শাঁখা-সিঁদুর-মঙ্গলসূত্র থেকে স্বামীর মঙ্গলার্থে বার-ব্রতপালনের হিড়িক দেখা যায়, ধারাবাহিকে সুখী পরিবার বোঝাতে অতিনাটকীয়তা।

এই পরিবর্তন এসেছে ধীর লয়ে। কিন্তু নারী সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রে একটা ভিন্নতর দৃষ্টিকোণও রয়েছে। নারীকে আপাত মহত্বের আসনে বসিয়ে সেখানে তাকে ত্যাগ, ঔদার্য, সেবা, কোমলতা, সারল্য ইত্যাদি নির্মল গুণ আরোপ করে তাকে কূপমণ্ডুক করে রাখা আর কি! অনেক পুরুষই মেয়েদের প্রতি ততটা সমঝদার হন না। আসলে মেয়েদের তো সেই মেয়েবেলা থেকেই শেখানো হয় তাদের ভূমিকা কী হবে। তাদের তো বরাবরই বাইরের আর ভেতরের—দু-ধরনের কাজই শেখানো হয়। কিন্তু একজন ছেলের ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না। নারীর 'গৃহকর্ম নিপুণা' ভূমিকাই সমাজমানসে গেঁথে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে পুরুষদের কিচ্ছুটি শেখানো হয় না। শিখতেও হয় না। মেরি অ্যাস্টেল তাঁর 'Some reflections upon marriage'-এ তো যথার্থই বলেছিলেন— 'if all men are born free, how is it that all women are born slaves?'

সমস্ত পুরুষ-প্রতাপের একেবারে বিপ্রতীপে হেঁটে একক উপস্থাপন কি মহিলাদের একান্ত বিপ্লব হিসাবে প্রত্যয়িত হতে পারে না! যখন সংবাদপত্রের পাতায় কখনও সখনও চোখে পড়ে, প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো নাবালিকা বিবাহ করবে না, পড়াশুনা করবে বলে পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে স্থানীয় পুলিশচৌকিতে সরাসরি হাজির হয়ে পুলিশি সহায়তায় সেই বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে আরও কিছুদূর পড়াশুনা চালিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকে, আমরা মনে মনে বাহবা দিই। কোনও 'পিছড়ে বর্গ'-এর মেয়েরাও যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে রুখে দাঁড়িয়ে তার আত্মমর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তা দেখে আমরা তাৎক্ষণিক চমকিত হই। আমরা সরকারি পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করে এও মনে করি তখন—এমন এক সর্বজনীন স্ত্রী-শিক্ষা এসব অঞ্চলে কায়েম করা দরকার যা শুধু তাদের মনে কেবল বিষয়বুদ্ধিই নয়, বিবেকের উজ্জীবনেও সাহায্য করবে। একটাই আশার আলো যে, প্রত্যন্ত গ্রামে স্ত্রীশিক্ষার হার বেড়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও পড়াশুনার দিকে আসছে। একইভাবে চাকরির ক্ষেত্রে তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে গেছে। পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ মেয়েরাও হাতে কলমে নানা কাজ শিখছে। তবে রক্ষণশীল গোষ্ঠীরা অনেক সময়ে এর প্রতিরোধ করতে চায়। মাতব্বর ও প্রভাবশালী কিঞ্চিত ধনী স্থানীয় মানুষ চায় না তাদের গ্রামের স্ত্রীজাতি সার্বিক জেগে উঠুক। তাহলে যে তাদের মৌরসিপাট্টা সফল হবে না। তবে এখন ঘুম ভাঙছে তাদেরও। তবে সে খুব ধীরে।

এদেশের মেয়েদের জন্য তখনকার দিনে জবরদস্ত উদাহরণ তৈরিই ছিল—'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই'। সংসারে সকাল থেকে উদয়াস্ত খেটেখুটেও সহজে নাম পাওয়া যায় না। বিয়ের আগে থাকতেই তাদের পই পই করে সেখানো হতো সুগৃহিণী হয়ে থাকার প্রচলিত নিয়মকানুন আর স্বামীকে তুষ্ট রাখার যাবতীয় কূটকৌশল। স্বামীরা তো দিব্যি আছেন, তাদের কিছুই শিখতে হয় না, শেখানো তো দূর অস্ত্।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

শুভেন্দু রায়

গভ. কনট্রাক্টর ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার

মন্তেশ্বর, বর্ধমান

Sl. No. 34

With best compliments of

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Burdwan
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 40

With best compliments of

JAISHREE TIMERS

M I L L
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rabari-713358
Phone : 0341-2444002
E-mail : jaishreetimbers@rediffmail.com

R E S I
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 91

বিশ্বসৃষ্টি ও লোকপুরাণ

রত্না রশীদ

লোকসংস্কৃতি চর্চা, লোকগান সংগ্রহ ইত্যাদি করতে গিয়ে দেখেছি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে বিভিন্ন ছড়া, প্রবাদ, গল্প, মিথ্ ইত্যাদি। কবে থেকে, কোথা থেকে, কার কাছ থেকে তাঁরা ওগুলো জেনেছেন বা পেয়েছেন জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে পারেন না। আবহমানকাল ধরে বংশপরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে এগুলি চলে আসছে। মনুষ্য সভ্যতার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে এই মুখে মুখে চলে আসা ছড়া-প্রবাদ-গল্প বা মিথ্—এগুলোর খুব বড়ো ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে, মিথ্ বা লোকপুরাণ মানুষের সভ্যতার বিবর্তনে, ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভাসনে এবং শিল্প-সাহিত্যের সৃজনময়তায় প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজনীন একটি ঐতিহ্যকেই গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মিথ্-এর বহু বিচিত্র প্রকরণের মধ্যে সৃষ্টি-স্থিতি এবং প্রলয়ের কাহিনিগুলি একটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে।

একেবারে প্রাথমিক অবস্থার মানবসভ্যতা থেকে এখন পর্যন্ত মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা, বিভিন্ন জিজ্ঞাসা, এবং যেমন যেমন অভিজ্ঞতা তেমন তেমন প্রাপ্তব্য জিজ্ঞাসার উত্তরগুলি থেকেই মিথ্ বা লোকপুরাণের উৎপত্তি। সুদীর্ঘ বিবর্তনের পথ বেয়ে লোকপুরাণগুলি পৌঁছেছে এই বর্তমান যুগে। লোকপুরাণ বা মিথ্ ধারণ করে থাকে মানবমনের শৈশব স্তরের জিজ্ঞাসা। আজকের জটিলমনস্ক মানুষের মধ্যেও মাঝে মাঝে ওই শৈশব স্তরের জিজ্ঞাসাগুলি দেখা যায়। সেই জিজ্ঞাসাগুলির উত্তরগুলির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির সূত্রেও এখনও পর্যন্ত মানুষ বাঁচিয়ে রেখেছে লোকপুরাণগুলি। বস্তুত, সমাজের বিভিন্ন স্তরে সৃষ্ট লোকপুরাণ বা মিথ্গুলির মধ্যে জিজ্ঞাসা কিন্তু প্রায় একই ধরনের, অর্থাৎ কিনা শুধুমাত্র এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজে বার করার মধ্যে। এবং যেহেতু সমাজ ও পরিস্থিতি সব সময়েই ছাপ ফেলে মানুষের সৃষ্টির ওপর, তাই দেখা যায় যে কাহিনি যত পুরোনো, তার উত্তর ততই সহজ ও সরল। পরবর্তীতে ক্রমশ জটিল হয়ে উঠেছে মিথ্গুলি।

এখন লোকপুরাণ বা মিথ্গুলিকে যদি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, দেখা যাবে এই সৃষ্টি আধুনিক মানুষের প্রয়াস নয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী গোমে (Gomme) লোকপুরাণের গল্পগুলিকে চিহ্নিত করেছেন মানুষের আদিমতম অবৈজ্ঞানিক মনের বিজ্ঞানমনস্কতার ফসল বলে। আদিম মানুষের সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসের ওপরই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন লোকপুরাণগুলি। তার নিজের শারীরিক বা প্রাকৃতিক যে-কোনো ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের একটা সহজ ব্যাখ্যা আদিম মানুষ তার শিশুসুলভ বুদ্ধি বা স্বল্প অভিজ্ঞতায় করেছিল। ঘটনা যখন ঘটে, তখন তার কারণও নিশ্চয়ই আছে,—এই সত্যটি আদিম মানুষের কাছে যুক্তিপূর্ণ অনুমান হিসেবে দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি আকাশ-বাতাস-পাহাড়-পর্বত-গ্রহ-নক্ষত্র-নদী-নালা-সমুদ্র-ভূমি-বৃক্ষ ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যে যে কোনো-না-কোনো শক্তি বাস করে, এ বিষয়ে আদিম মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। যখন আকাশ জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ চমকে, বজ্রপাতে নেমে আসে আগুন, তীব্র বেগে ঝড় আসে, তছনছ করে দেয় জনজীবন, ভূমিকম্পে মাটি কেঁপে ওঠে, ফাটল ধরায়, ত্রস্ত হয় মানুষ, দাবানলে মাইলের পর মাইল বন আগুনের গ্রাসে ভস্ম হয়, মাত্রাছাড়া বর্ষণ ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় সহায়-সম্বল-বাসস্থান, তখন মানুষ এই অতিপ্রাকৃতিক দুর্ঘটনাগুলির পেছনের শক্তিটির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। লোকপুরাণে কল্পিত এই ব্যক্তিত্ব হতে পারে কোনো শক্তিশালী বৃহৎ জানোয়ার বা কোনো পাখি বা অন্য কোনো শক্তিশালী কেউ। বলাই বাহুল্য, পরবর্তীকালের লোকপুরাণে সেই কল্পিত অজানা শক্তিই রূপান্তরিত হয়েছে দেবতায়। ক্রমশ ব্যক্তির জীবনে ও বস্তুবিশ্বের মধ্যে আত্মার আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত এই সর্বপ্রাণবাদকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে থাকে, ও ক্রমশ তা নিয়োজিত হয় দেবতা আবিষ্কারে।

মিথ্ বা লোকপুরাণ হল আদিম মৌখিক সাহিত্য। এতে তাই ধরা আছে আদিম মানুষের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে প্রাথমিক জিজ্ঞাসা ও নিজেদের আয়ত্তের অভিজ্ঞতাসম্ভূত সেই সব জিজ্ঞাসার সম্ভাব্য উত্তরসমূহ। নিম্নপ্রস্তর যুগে মানুষ যখন প্রকৃতিকে কিছুটা বশে এনে ফেলেছে—অর্থাৎ আগুন এসেছে তাদের আয়ত্তের মধ্য, ফলে খাদ্যে ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এবং সেই সূত্রেই উন্নত হয়েছে মস্তিষ্ক। জীবনে এসেছে কিছুটা নিশ্চিন্ত অবসর, এবং তখনই সৃষ্টি হল 'মন'-এর যে নাকি প্রতিটি পদে পদে প্রতিটি ঘটনা প্রশ্ন করে মস্তিষ্ককে নতুন কিছু সৃষ্টির শক্তি যোগাতে লাগল। একেবারে জান্তব জীবন যাপনের সময় যে প্রকৃতিকে চোখ তুলে দেখার সময় হয়নি একেবারে প্রকৃতিরই বুকে বসবাস করেও, এতদিনে সেই প্রকৃতি যেন তার দৈনন্দিন লীলার মাধ্যমে নব নব রূপে ধরা দিতে লাগল এবং সম্মুখীন করতে লাগল নানাবিধ প্রশ্নের। সকাল হল কেমন করে? আকাশের ওপরে ওই আলোর আর আগুনের গোলাটা কী? ওটা এল কোত্থেকে? যেখানে আছি এই মাটিই বা কোত্থেকে এল? জল তৈরি হল কেমন করে? রাতে হঠাৎ করে অন্ধকার নেমে আসে কেন? আবার মাঝে মাঝে সেই অন্ধকারেও একটা কেমন আলোর গোলা কখনো বড়ো, কখনো ছোটো হয়ে দেখা দেয় কেন?

এবার যখনই মনে এই প্রশ্নের উদ্ভব হল, মানুষ তার সহজ-সরল মন দিয়ে তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা করল তার চেনা-জানা-ছুঁতে পারা চারপাশের পরিবেশ থেকে। সে সূর্যকে ভেবে নিল রাজহাঁসের সোনার ডিম। রাতে তো অন্ধকার ভয়াবহ, তাই তারা মনে করে নিল কোনো শত্রু হয়তো সোনার ডিমটা ভেঙে দিয়েছে, আর ডিমের কুচি কুচি অংশগুলো জ্বলজ্বলে তারা এবং

কোনো কোনোদিন তুলনায় বড় অংশ হল চাঁদ, একেক দিন, ডিমের কুচির সাইজ অনুযায়ী, চাঁদের এক এক আয়তন। শত্রু সম্পর্কিত ধারণাটা মানুষর বহু আগে থেকেই তৈরি হয়েছে। আদিম মানুষ জন্মের পর থেকেই বিভিন্ন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে। প্রাথমিক বাধা—প্রকৃতি। খরা, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, খাদ্যাভাব, বন্যজন্তুর আক্রমণ ইত্যাদি। এর পরের বাধা—মানুষের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে খাদ্য-বাসস্থান-অধিকার ইত্যাদি নিয়ে। এখান থেকেই মানুষের মনে শত্রু সম্পর্কিত ধারণার উদ্ভব। এবং একই সঙ্গে 'বন্ধু' সম্পর্কিত ধারণাও গড়ে উঠেছে। আদিম যুগে মানুষকে তো সব ব্যাপারেই পশুর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পশুর সঙ্গেই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সে কারণেই, তার মনে উদয় হওয়া যাবতীয় 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়ে যখন গল্প বলতে লাগল, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার ঘনিষ্ঠ পশুপাখিই হল তার গল্পের বিষয়বস্তু। পশুকে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। কারণ একাধারে পশুই মানুষের বন্ধু এবং শত্রুও ছিল সে-ই। তাই এটা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকপুরাণে দেখা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা বা দেবতার সঙ্গে পশুরা সমানভাবে কাজ করে চলেছে এই পৃথিবী সৃষ্টির যজ্ঞে। দেবতার সৃষ্টিকার্যে পশুরাই প্রধান সহকারী। আসন্ন এই দুর্গামূর্তির কথাই একটু ভেবে দেখি না কেন, প্রতিটি দেবদেবীর সঙ্গে মজুত তাঁদের বাহন হিসেবে কোনো-না-কোনো পশু বা পাখি। অস্ত্র হিসেবে, বা অলঙ্কার হিসেবে সাপও তো দেখি আমরা।

স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে লোকপুরাণের গল্পগুলি, কারণ এগুলি সবই অভিজ্ঞতানির্ভর। যে দেশে নদী, খাল, বিল, সমুদ্র আছে, সেসব দেশের লোকপুরাণ জলকেন্দ্রিক। অর্থাৎ বৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি লক্ষ করা যায়। তার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় জলজ প্রাণী—যেমন কচ্ছপ, মাছ, তিমি, ভোঁদড়, হাঁস প্রভৃতি। আদিম মানুষ শুরু থেকেই পশু-পাখির ডিমের সঙ্গে পরিচিত। ডিমের যে জড় থেকে প্রাণে পরিবর্তন, তা নিয়তই অবাক করত মানুষকে। তাই ডিমকে কেন্দ্র করে মানুষ অনেক সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ গড়ে তুলেছে। পৃথিবীটাকে ডিমের মতো ভেবেছিল মানুষ। ডিমের জলীয় অংশটি জলভাগ এবং কুসুমটিকে স্থলভাগ বলে মনে করেছিল। তাহলে পরিবেশের ভূ-প্রকৃতিটা ব্যাখ্যা করতে বেশ সুবিধে হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বে এমন উল্লেখ আছে। আমরা মহাভারতেও দেখতে পাই এমন বর্ণনা : 'তিনি (নারায়ণ) রাত্রি অবসানে জাগরিত হইয়া প্রথমত জীবগণের জীবনোপায় ধান্যাদির সৃষ্টি করিয়া পরে হিরণ্যডিম্ব মধ্যে ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। ওই ব্রহ্মা সমুদয় ভূতের মূর্তি স্বরূপ। তিনি এক বৎসরকাল অণ্ডমধ্যে অবস্থানপূর্বক পরিশেষে তাহা হইতে নির্গত হইয়া সমুদয় পৃথিবী, স্বর্গ ও দ্যাবাভূমির (পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের) মধ্যবর্তী আকাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সার্দ্ধসপ্তসহস্র (সাড়ে সাত হাজার) কল্পে উহার একদিন এবং ওই পরিমাণে উহার একরাত্রি হয়।'

চীন দেশের সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণেও আমরা প্রায় একই ছবি পাই : ''সারা পৃথিবীটা ছিল ঠিক ডিমের মতো। সেখানে আকাশ ও মাটিতে কোনো বিভেদ ছিল না। তারা একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। এই ডিমের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল প্যাংগু নামে এক মানুষ। বাড়তে বাড়তে যখন সে দৈত্যে পরিণত হল, তখন তার হঠাৎ একদিন ঘুম গেল ভেঙে (ঠিক যেন ডিমের মধ্যেকার পাখির বাচ্চাদের বৃদ্ধি) সে চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেল না শুধুমাত্র গভীর অন্ধকার ছাড়া। বিরক্ত হয়ে প্যাংগু একটি কুঠার দিয়ে ডিমের গায়ে আঘাত করল এবং ডিমটি দু-খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল। হালকা অংশটা উপর দিকে উঠে গিয়ে সৃষ্টি হল আকাশ তথা স্বর্গ। আর বাকি অংশটা রূপ নিল পৃথিবীর। কিন্তু যদি তারা আবার মিলিত হয়, সেই ভয়ে প্যাংগু নিজে একটা স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থেকে দু-জনের মাঝখানে দূরত্ব বজায় রাখতে লাগল।

''এমনি করে কেটে গেল দশটি হাজার বছর। এতদিনে স্বর্গ উঠে গেছে আরও উঁচুতে, পৃথিবীর সঙ্গে মিলন তার একেবারেই সম্ভব নয়। এতদিনে প্যাংগুর মৃত্যু হল। তার বাঁ চোখ হল সূর্য। ডান চোখ হল চাঁদ, দেহটা পাহাড় পর্বতে রূপান্তরিত হল। তার রক্ত হল নদী, চুল রূপান্তরিত হল গাছ এবং ফুলে। প্যাংগুর হাড় থেকে সৃষ্টি হল ধাতু এবং শক্ত পাথর। আর ক্লান্ত অবসন্ন প্যাংগুর ঘাম থেকে সৃষ্টি হল বৃষ্টি এবং শিশিরকণা। প্যাংগু শুধুমাত্র স্বর্গ-মর্ত্যকে আলাদা করেনি, তার দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে নতুন পৃথিবী।''

আমরা দেখতে পেলাম যে, চীন দেশের প্যাংগু, বহদারণ্যক উপনিষদের মধুকৈটভ এবং মহাভারতে উল্লিখিত বিষ্ণু শুধুমাত্র নামভেদে ভিন্ন ব্যক্তি। এদের সকলের জন্ম মানুষের একই ধরনের কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়, যা কোনো ভৌগোলিক পরিসীমার দ্বারা পরিমাপ করা যাবে না।

আরও বলার কথা এই যে, মানুষের মানবিক আত্মপ্রকাশের কাল থেকেই ব্যক্তিমন সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে গোষ্ঠীভাবনাকে বহন করে এনেছে, ''তার প্রতি স্তরেই কোনো না কোনোভাবে এক বা একাধিক শক্তির দ্বন্দ্বের লব্ধফলরূপে সংস্কৃতির গড়নটা কিছু একটা চেহারা ধারণ করেছে। দ্বন্দ্বের পাত্র বা বিষয়ভেদ হতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বটা নিজে তো চিরন্তন। ফলে ওই দ্বন্দ্বজাত সব কাহিনির মধ্যেই ভাবগত অন্তর্কাঠামোতে এক ধরনের সহধর্মিতা থাকেই, নিছক ব্যাখ্যামূলক মিথ্ বা লোকপুরাণগুলিতে এটা অস্পষ্ট। সেইগুলিই আদিমতম উপকরণ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এর পরের পর্যায়ের লোকপুরাণে দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট।—সাপের জিভ চেরা কেন, না—মানুষকে ঠকিয়ে অমরত্বের মহাজ্ঞান নেবার শাস্তি হিসেবে দেবতার অভিশাপে এমন হয়েছে—এই মিথে মানুষ এবং প্রকৃতির (যার প্রতীকী প্রতিনিধি হল সাপ) অস্পষ্টভাবে সূচিত হয়েছে।''

এছাড়া পুরাণে সমুদ্রমন্থনের কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই দেবতা ও অসুরদের মধ্যে অমৃতবন্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে, এবং সেখানে দেবতারা শঠতা আশ্রয় করে অসুরদের ঠকিয়ে অমৃত চুরি করেছেন। বঞ্চিত করা হয়েছে, অত্যন্ত চতুরভাবে অসুরকুলকে। এখানে যদি আমরা দেবতা ও অসুরদের যথাক্রমে সমাজের উঁচু তলা ও নিচুতলার মানুষ হিসেবে ধরি, তাহলে আজও সমাজে অবিকল এই ছবিটা দেখতে পাবো, যার শুরু হয়েছিল আদিম যুগেই শক্তিশালী ও দুর্বল গোষ্ঠীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বে। পরবর্তীকালে সাহিত্যে বিষয়টি রইল এক, শুধু ছবিটার উপস্থাপনায় কিছুটা পরিবর্তন এলো, যা পরিবর্তনশীল সময় ও সমাজের ফসল।

অতএব আমরা বলতে পারি যে মিথ্ বা লোকপুরাণ হল প্রাগৈতিহাসিক দেবকল্পনার প্রকাশ। লোকপুরাণের এই দৈবশক্তির প্রভাব যখন সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কমে এসেছে, তখনই লোকপুরাণের থেকে জন্ম নিয়েছে লোককাহিনি ও কিংবদন্তি, এবং বলাই বাহুল্য যে এগুলি আধুনিক মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি। আদিম কথ্য লোকপুরাণের চেয়ে আধুনিক লোককাহিনি ও কিংবদন্তি চরিত্রগত দিক থেকে তুলনায় অতি সরল-সহজ থেকে জটিল-জটিলতর পথ পরিক্রমারত।

তথ্যসূত্র

১. ভগ্গুতৈ— ভ্রক্ষ্মক্ষ্মক্তঅত্ত' ব্র গক্ষক্রধ — ১৯৮২— ক্ষ্মক্ষ্মত্ত

২. Cyril, Brich, *Chinese Myths and Fantasies*, 1962, London

৩. গত্যক্ষ্মভত্য পন্তু ক্ষ্মত্যজ্জ- ভ্রভক্ষ্ম ক্ষ্মত্যভভ' গ.ক্ষ্মঐবটস্টিমীভড /হঁ— ১৯৯৫— ক্ষ্মক্ষ্মত্ত

কবিতার গান, গানের কবিতা

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

মুখবন্ধ

বিষয় : কবিতার গান, গানের কবিতা। কবিতার গান কথাটি একটুখানি বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে আমাকে। হয়ত আমি যথার্থ অর্থে বিষয়টি বুঝতে অপারগ বলেই এমনটা হচ্ছে। আমি বিভ্রান্ত, কী বলতে চাওয়া হয়েছে এই শিরোনামে? যে কবিতায় সুর আরোপ করা হয়, তার কথা? নাকি কবিতার অন্তরমহলে যে গান বাস করে তার কথা। যদি প্রথমটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তবে আলোচনা এগোবে এক পথে। আবার যদি বোঝানো হয় দ্বিতীয়টি, তবে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক অনুসন্ধানে ব্রতী হতে হবে আমাদের।

কবিতার গান

কবিতার গান কথাটিকে দ্বিতীয় অর্থে ধরে নিয়ে শুরু করি প্রথমে। কবিতার অন্তরমহলের গানের কথা বলতেই মনে পড়বে এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি কথা—

> বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল করে, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে, ফুঁও আছে—কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়।'

রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন কাব্যে সঙ্গীতের কথা। এই সঙ্গীতটি আসলে কী? এ তো সচরাচর যে অর্থে আমরা সঙ্গীতকে বুঝি তার কথা নয়। তা হয়ত বোঝা গেল, কাকে বোঝানো হচ্ছে না। কিন্তু কী বোঝানো হচ্ছে, তার কি কোনো আভাস পাওয়া গেল? এখানে একটি কথা বলার আছে। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের প্রথম বেশ কয়েকটি গানকে যদি স্মরণ করি, দেখব বেশিরভাগ গানের বিষয়ই গান অথবা সুর। এই গানগুলির পাঠ এবং শ্রবণ থেকেই বুঝব হয়ত, রবীন্দ্রনাথের কাছে গান, সঙ্গীত বা সুর কথাগুলি সব সময় শব্দার্থে আসেনি। কখনো শব্দার্থের গভীরে গেঁথে নিয়েছেন বৃহত্তর ব্যঞ্জনা, কখনো অন্য এক ভাবার্থে স্থাপন করেছেন এই শব্দগুলিকে। কোনো কোনো গানে তিনি কথাকে প্রত্যাখ্যান করে সুরকে আবাহন করেছেন। যেমন—

যারা কথা দিয়ে তোমার কথা বলে
তারা কথার বেড়া গাঁথে কেবল দলের পরে দলে।।
একের কথা আরে
বুঝতে নাহি পারে,
বোঝায় যত কথার বোঝা ততই বেড়ে চলে।।
যারা কথা ছেড়ে বাজায় শুধু সুর
তাদের সবার সুরে সবাই মেলে নিকট হতে দূর।
বোঝে কি নাই বোঝে
থাকে না তার খোঁজে,
বেদন তাদের ঠেকে গিয়ে তোমার চরণতলে।।

কিংবা

আমার বেলা যে যায় সাঁঝ-বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।।
একতারাটির একটি তারে গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে হার মেনেছি এই খেলাতে

শান্তিদেব ঘোষের 'সংগীতসাধনা' নিবন্ধের কয়েকটি লাইন এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

''...সমস্ত মানবজীবনও অনন্তের রাগিনীতে বাঁধা এক সংগীত ছাড়া কিছুই নয়" এবং ''সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি, সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা না একটা বিশেষ সুর যোগ দিয়েছে।"

যখন আমার ক্ষুদ্র আমি আবহমান মানবধারার একজন, এই বোধে দীপ্ত হয় এবং যখন আমার ক্ষুদ্র পৃথিবী মহাজাগতিক বিশ্বের অঙ্গ হয়ে ওঠে আমার চেতনায়, তখনই বিশ্ববীণার সাথে আমার একতারার সুর মিলে যায়। আমাদের খণ্ডকালের মধ্যে যখন চিরকাল জেগে ওঠে, তখনই কথা গান হয়ে ওঠে। নচেৎ 'সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা, সেই তো আঁধি সেই তো ধাঁধা'।

যদি কোনো কবি ও সঙ্গীতপ্রাণ এক দেহে মিলিত হয়, তখন বোধহয় সঙ্গীতময় কবিতার আরও নানা উদাহরণ পেতে পারি আমরা। এমনটি ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে আমার বন্ধু কবি অমিতাভ দেব চৌধুরীর কিছু কবিতা। বরাক উপত্যকার এ-সময়ের অন্যতম প্রধান কবি অমিতাভ-র কবিতার প্রধান প্রাণ তাঁর কবিতার অন্তরের গান। তাঁর কিছু কবিতার শরীর গড়ে উঠেছে গানের বাঁধনে, কিছু কবিতা সুরের সাধনে। সময়াভাবে ছোটো ছোটো তিনটি কবিতার উল্লেখ করব—

১.
তোমার বাড়িটি আমি বানাব নিজের হাত দিয়ে।
ছাদ আর মেঝে দুইই বানাব স্থায়ীটি দিয়ে যেন
ঝড়ে কিংবা ভূমিকম্পে কখনো না তারা ঝরে যায়।
ভিতর বাড়িটি হবে অন্তরায়, যাতে তুমি সব সময়ই
নিজের বাড়িটিকে পার ভাবতে পরের বাড়ি বলে।
উঠোনটি হবে সঞ্চারীর—বাউল ও ফকির যদি
দুদণ্ড জিরোতে পারে সঞ্চরণের মাঝখানে...
স্নানঘর হবে আভোগের, প্রতিটি স্বপ্নের শেষে
তোমার স্নানের তৃষ্ণা যাতে বেড়ে যায় প্রত্যহ।
বাড়ির খিলানে থাকবে মিড়ের সজল কারুকাজ,

থাম জুড়ে গেঁথে দেব গমকের তীব্র কারসাজি।
দরজা ও জানালায় লিখে দেব তোমার ঘরানা :
নিজের বাইরে গিয়ে অন্যকে নিজের বলে চেনা।
(গানের বাড়ি)

২.
সব সুর যেখানে গিয়ে মেশে, সেই মোহানায়
একটি একা নৌকা পাড়ি দেয় আরও দূরে
ঢেউয়ের মাথায় ওঠে সে,
ঢেউ বেয়ে নেমে আসে।
চারদিকে কালোর স্তব্ধতা, চারদিকে কালোর অনন্দ

নৌকাটি বায় যে, সে একটি রাগ
আমি সম্পর্কে তার মেঘ হই।
(মালকোষ)

৩.
ফজরের নামাজের আগে কে গাইছে ওই গান?
বোরখা-পরা কোমল মেয়েটি
ঘর থেকে বেরিয়ে এল,
সূর্যের চোখে চোখ মেলাতে।

আজ সারাদিন তার অভিসার।
যাকে কেউ কখনও পায় না,
তার সঙ্গে।
(আহির ভৈরব)

অমিতাভর আরেকটি দীর্ঘ গদ্যকবিতা, যা এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় তার দৈর্ঘ্যের জন্য, নাম 'কোমল মা'। সঙ্গীতের ব্যাকরণের সাথে যাঁদের সামান্য পরিচয় রয়েছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে সা ও পা ছাড়া সমস্ত স্বরের শুদ্ধ ও কোমল স্বর রয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মধ্যম বা মা। মা স্বরে রয়েছে শুধু তীব্র স্বর। এই কবিতায় অমিতাভ খুঁজে ফেরেন সেই 'কোমল মা' স্বরটিকে, যা হয়ত এই পৃথিবীর সমস্ত জননীর একান্ত আপনে মনের গভীরে বেজে ওঠা দীর্ঘশ্বাসের সুর। যাকে হয়ত কোনো নিভৃত ক্ষণে শোনে তাঁর সন্তান, যদিও শোনাতে পারে না।

কবিতার গানের কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে আরও কিছু কবিতার কথা, যেগুলির শরীর বহন করছে কোনো-না-কোনো গানের স্মৃতি। প্রথমেই মনে আসে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করেই লেখা বিষ্ণু দে-র এই কবিতাটি।

তুমি কি কেবলি স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য কবি?
হরেক উৎসবে, হই হই
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ?

'তুমি কি কেবলি ছবি' গানটিই যেন এই কবিতার শরীর নির্মাণ করেছে। একইভাবে বিষ্ণু দে-র আরও দুটি কবিতার কথা এভাবেই আমাদের মনে পড়তে পারে। 'এ অন্ধকারে কি দেখা সুরঙ্গমা' কবিতার পংক্তিগুলি এরকম—

এই আমাদের ক্লান্তি কি পাবে ক্ষমা?
ক্ষমা কে করবে? তারাও ক্লান্ত নয় কি?
এমন কি যাকে জড়পিণ্ড বলো,
মনে হয় সেই সেই পাহাড় ঝর্না নদীও
ক্লান্তির দাহে ঝুরুঝুরু বালিচড়া।
পূর্ণিমা চাঁদে ও কারা জমায় অমা?

বিষ্ণু দে-র একটি কবিতা শুরু হচ্ছে এমন একটি পংক্তি দিয়ে 'তবুও লাবণ্যে বলো একী পূর্ণ প্রাণ'। কবিতাগুলি যেন বহন করছে নানা রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্মৃতি। অমিতাভ-র একটি কবিতার প্রারম্ভিক পংক্তি—'অনেকখানি সুদূর একটুখানি নিকটের কাছে এলে, একটি গানের জন্ম হয়।' তারপর দুটি স্তবকের পর শুনি একটি পংক্তি, 'অনেকখানি সুর একটুখানি পাথরের কাছে এলে, একটি ঝর্নার জন্ম হয়।' যিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ শ্রোতা, তাঁর মনে নিশ্চয়ই রিনরিনিয়ে উঠবে এক বা একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীত ('ওগো সুদূর বিপুল সুদুর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি' বা 'আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো/তাই তো তোমার বাণী বাজে ঝর্না-ঝরানো'।

শুরুতেই বলেছি 'কবিতার গান' কথাটিকে দুটি অর্থে দেখতে পারি। আলোচনা শুরু করেছিলাম দ্বিতীয় অর্থকে গ্রহণ করে অর্থাৎ কবিতার অন্তরমহলের গান সম্পর্কিত বিষয়ে। প্রথম অর্থে অর্থাৎ সুর প্রয়োগের মাধ্যমে কবিতাকে গানে রূপান্তরিত বিষয়ক আলোচনা আপাতত মুলতুবি রেখে এবারে একটু দেখতে চাই 'গানের কবিতা'কে। 'কবিতার গান'-এর আলোচনায় ফিরব শেষে।

গানের কবিতা

আমরা সাধারণ গান শব্দটি 'song' বা 'music' দুটো অর্থেই ব্যবহার করি। প্রথম অর্থে গান মানে সুর ও বাণীর রসায়নে জন্ম নেওয়া একটি তৃতীয় সৃজন। বাণীর পিতৃত্ব তাতে রয়েছে, রয়েছে সুরের মাতৃত্বও। এই দুয়ের মিলনে গান একটি স্বতন্ত্র সত্তা। যাঁরা সুরের সাধক, তাঁরা গানকে দেখতে গিয়ে খানিকটা হেলে পড়েন তার সুরের সৌন্দর্যে। আবার সাহিত্যরসিক, সাধারণত তাঁদের একটু হলেও পক্ষপাত থাকে গানের বাণী অংশের প্রতি। আমরা গানকে দেখার চেষ্টা করব তার সামগ্রিকতায়। দ্বিতীয় অর্থে গানকে 'music' ধরলে এটি বাণীহীন বিশুদ্ধ সুরপ্রবাহ। এমনিতে সঙ্গীত ও কবিতার জগতে প্রবেশ ও পরিভ্রমণের পথদুটি মূলগতভাবেই ভিন্ন। সঙ্গীতের প্রধান উপাদান সুর ও ছন্দ। এই দুটি উপাদানের নানা এক ও বহুরৈখিক সঞ্চারের মধ্য দিয়ে যে নান্দনিক সৃজন তাই সঙ্গীত। গানকে যখন 'song' অর্থে বিবেচনা করব তখন এর সাথে যুক্ত হবে বাণী। বাণী বোধহয় আমাদের কাছে পৌঁছয় দু-ভাবে। এক, ধ্বনিতে; দুই, বার্তায়। স্বরসঙ্গতি, স্বরের বিস্তার এবং তালের ছন্দে সঙ্গীত যে নান্দনিক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়, তার কিছু অনির্বচনীয়, কিছুটা বচনীয় সঙ্গীতের যে অংশটি বচনীয় হয়ে ওঠে সেখানেই হয়ত সাহিত্যের উদ্ভাস। অন্যদিকে, কবিতার উন্মোচন শব্দার্থে, ভাবার্থে, দুইয়ের মধ্যেকার দোলাচলে, ধ্বনিতে, পংক্তির বিন্যাসে, ছন্দে, অন্ত্যমিলে, কবিতার সুরে, আবহে। গানের পথ ভিন্ন। তার পথে সুর রয়েছে, বাণীর অন্তর ও বাহির রয়েছে। রয়েছে তাল, লয়, গায়ন, উচ্চারণ। গানের সত্য উন্মোচিত হয় শ্রবণে, গায়নে। কবিতার সত্য পাঠে। কবিতারও হয়ত একটি অন্তঃসলিলা সুর রয়েছে, কিন্তু তাকে শোনা যায় নিবিড় পাঠে। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন পাঠে এই অন্তঃসলিলা সুরটি একটু একটু পাল্টে যেতে পারে। ফলে একই কবিতার ভিন্ন সুর, আবহ, ভাবার্থ থাকতে পারে। গানের সুর অবিচল, তালও। কিন্তু গায়নে তার স্বরূপ পাল্টে পাল্টে যায়। আমার এক কবিবন্ধুর কথায়, কবিতায় শব্দের পুনর্জন্ম ঘটে। শব্দার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে শব্দ যখন অন্য কোনো অনাস্বাদিত আভাস এনে দেয় তখনই সে হয়ে ওঠে কবিতা। একটি সঙ্গীত বা গানেও কখনো কখনো বিদ্যমানের ভেতর এক নতুন জায়মান হয়ে ওঠে। হয়ত সেই মুহূর্তকেই বলব সঙ্গীতের কবিতা।

দেবব্রত বিশ্বাসের জন্মশতবর্ষে তাঁর এক ছাত্র শুনিয়েছেন একটি ঘটনার কথা। যে ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দেয় একজন সার্থক শিল্পী কীভাবে গানের সুরের গভীরে ডুব দিয়ে সুরের পুনর্জন্ম ঘটান। ছাত্রছাত্রীদের 'আকাশভরা সূর্যতারা' গানটি শেখাচ্ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। 'তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান' পংক্তিটি বারবার গাইছেন। ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে চাইছেন এক মহাজাগতিক

বিশ্বের অসীম সময়ের বুকে আমরা আমাদের স্থান খুঁজে পাচ্ছি। অসীমের বুকে খণ্ড আমি-র অস্তিত্বের কথা বলতে বলতে এই পংক্তির একটি টুকরো সুরে আবিষ্কার করেন আবহমান সময়কে। হয়ত এটি আবিষ্কারও নয়, উদ্ভাবন। এই উদ্ভাবন যেন একটি কবিতার মতো বেজে ওঠে। দেবব্রত বিশ্বাস উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করেন, 'তাহারি মাঝখানে সুরটির মধ্যে একটি ইটারনেল ইন্ডিয়া লুকিয়ে আছে। বলুন তো ওটা কী?' পরে নিজেই বলেন, 'তাহারি মাঝখানে সুরে মিশে আছে আবহমান ভারতের 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'-র সুর। সত্যিই তো, দুটির সুরই তো, *সা ম -/ম ম -/গ প ম / ম--।* দেবব্রত বিশ্বাসের অনুভবে এই সুরটি শুধু 'তাহারি মাঝখানে' বাণীর বাহন নয়, কয়েকটি স্তবকের পর পর ফিরে ফিরে আসা পংক্তির মতো আবহমান ভারতের এক চিরনতুন রিফ্রেন।

কখনো একটি সুর দীর্ঘ সময়ের পথ ধরে চলতে চলতে একটি নতুন আখ্যানের রূপ নেয়। একটি বড় সঙ্গীতসজ্জায় একটি বিশেষ সুর যেভাবে রিফ্রেইন হয়ে বার বার ফিরে আসে নতুন নতুন অর্থ নিয়ে, সেভাবেই একটি সুর নতুন নতুন সময়পর্বে মূর্ত হয় নতুন নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে। ধরা যাক এই সুরটিকে, আমাদের খুবই পরিচিত—*প ধ সা' -/নি প ধ -/প ধ প সা'/নি প ধ -/ম ধ প -/ম প গ-/রে প ম প/গ-স রে/স---*

বিভূতিভূষণের উপন্যাস, সত্যজিতের ছবি, রবিশংকরের সুর—এই তিন নিয়েই বাঙালির পথের পাঁচালি। 'পথের পাঁচালি' ছবিতে উপরিউল্লিখিত সুরটি প্রথম বেজে ওঠে আবহ হিসেবে। তারপর বার কয়েক ওই ছবিতেই ওই সুরটি পাই রিফ্রেইন হিসেবে। সত্যজিতের ছবি 'অপরাজিত'-এ কাশীতে হরিহরের মৃত্যুর পর যখন সর্বজয়া অপুকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরে যাওয়ার কথা বলে, তখন নেপথ্যে আবার বেজে ওঠে এই সুর। এবারে নিশ্চিন্দিপুর আর এই আবহ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আবহের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই সুরটি হয়ে ওঠে ঘরে ফেরার সমার্থক। সত্যজিতেরই 'ঘরে-বাইরে'-তে যতবার বিমলা অন্দরমহল থেকে বাইরের পৃথিবীতে পা দিয়েছে, ততবার তার চৌকাঠ পেরোবার মুহূর্তে বেজে ওঠে একটি সুর।

ম--/-পম জ্ঞরে/জ্ঞ--/-মজ্ঞ রেস/রে--/-জ্ঞরে সানি/স--

সুরটি যেন ঘরের আগল ভাঙার দ্যোতক হয়ে উঠেছে ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের 'এ কী লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ' গানটির 'আনন্দবসন্তসমাগমে' অংশের সুরটি ভেঙে তৈরি হওয়া এই অর্কেস্ট্রেশনটিতেও এক ধরনের সুরের পুনর্জন্ম।

একটি গানের শরীরে হঠাৎ একটি সুরের মৃদু মোচড় কীভাবে একটি শব্দের পুনর্জন্ম ঘটিয়ে দেয় তার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে হাতের কাছেই রয়েছে কবীর সুমনের একটি বিখ্যাত গান 'অরুণ মিত্র'। কবি অরুণ মিত্র একবার সুমনের গান শুনতে চেয়েছিলেন। এই খবর শুনে সুমন নিজেই তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে গান শোনাতে চেয়েছিলেন। পরে কবির মেয়ের বাড়িতে বসেছিল গানের আসর। আসর শেষ হওয়ার পর সাম্মানিক হিসেবে কবীর সুমনের একমাত্র দাবি ছিল কবির স্বকণ্ঠে কোনো সদ্য রচিত কবিতা শোনা।

ছাত্রছাত্রীদের 'আকাশভরা সূর্যতারা' গানটি শেখাচ্ছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। 'তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান' পংক্তিটি বারবার গাইছেন। ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে চাইছেন এক মহাজাগতিক বিশ্বের অসীম সময়ের বুকে আমরা আমাদের স্থান খুঁজে পাচ্ছি। অসীমের বুকে খণ্ড আমি-র অস্তিত্বের কথা বলতে বলতে এই পংক্তির একটি টুকরো সুরে আবিষ্কার করেন আবহমান সময়কে। হয়ত এটি আবিষ্কারও নয়, উদ্ভাবন। 'তাহারি মাঝখানে সুরে মিশে আছে আবহমান ভারতের 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'-র সুর।

সেই অনুরোধ শুনে অপ্রস্তুত কবি খানিক ভেবে উঠে দাঁড়ান কবিতা পড়তে। কবির এই উঠে দাঁড়ানো গানওয়ালা সুমনের ভেতরে বিদ্যুৎ-ঝিলিক দিয়ে গেল। কবি বা তাঁর কবিতা হয়ে গেল গৌণ। সদ্য লেখা কবিতা পড়তে প্রবীণ কবির উঠে দাঁড়ানো জন্ম দিল একটি গানের। বাংলা গানের শ্রোতারা এমন কোনো বিষয়ে এর আগে কোনও গান শুনেছে মনে হয় না। সুর বাদ দিলেও এই গানটির বাণী নিজের জোরেই একটি কবিতা। তবে আমি বহুশ্রুত এই গানের অন্য একটি দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

> পৃথিবী দেখছে আমাদের মুখে বেলা অবেলার প্রতিচ্ছবি
> নতুন একটা কবিতা পড়তে উঠে দাঁড়ালেন প্রবীণ কবি
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় পুরোনো মাটিতে গাছের চারা
> সেই উত্থান দেখে নেয় শুধু মহাজীবনের সঙ্গী যাঁরা
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় বন্দিনী এক বাঘিনী চিতা
> চিড়িয়াখানায় অসহায়, তবু উঠে দাঁড়ানোয় অপরাজিতা
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় সাধারণ লোক হঠাৎ রুখে
> অনেক কালের চাপা বিদ্রোহ ফাটল এবার ক্লান্ত বুকে
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় প্রেমিক প্রেমিকা বুকের জোরে
> দুঃখগুলোকে রেখে দেয় তারা আদরে আদরে আড়াল করে
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় সন্তানহারা মায়ের বাঁচা
> একদিন ভোরে খুলে দেন তিনি জোড়া মুনিয়ার ছোট্ট খাঁচা
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় চেনা কবিতায় অচেনা শব্দ
> আবেগের কোনো অভিধান নেই তাই বেরসিক পাঠক জব্দ
> উঠে দাঁড়ালেন যেমন দাঁড়ায় জমকালো মেঘে বকের ডানা
> সহজ সরল কারণে আকাশ মুলতুবি রাখে বিজলী হানা
> অতর্কিতেই আকাশ হানল বিদ্যুৎময় আলোকচিত্র
> নতুন একটা কবিতা পড়তে উঠে দাঁড়ালেন অরুণ মিত্র অরুণ মিত্র।

গানের কথায় কবির উঠে দাঁড়ানো যেমন নানা বিচিত্র উপমায় নতুন নতুন ছবি নিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, সুরেও ক্ষণে ক্ষণে ঘটে যায় পর্ব থেকে পর্বান্তর। কবিতার শেষ লাইনে দুবার উচ্চারিত হয় কবি অরুণ মিত্রের নাম। প্রথমবার অরুণ মিত্র কথাটি সুরের স্বাভাবিক ক্রম ধরেই গানের মূল স্কেলের ষড়জে এসে দাঁড়ায়। গান এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত। না, হল না। আবার উচ্চারিত হল 'অরুণ মিত্র' কথাটি। এবার স্বাভাবিক পর্দায় নয়, একটু ঝুলে থাকার মতো। 'অরুণ' কথাটি মধ্য সপ্তকের গান্ধার ও রেখাবে এবং 'মিত্র' কথাটি মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম ও ধৈবতে। গান শেষ হল এখানে। সুরের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে হয়ত শ্রোতাকে মনে করিয়ে দেওয়া হল, প্রথম 'অরুণ মিত্র'টি বিশেষ্য এবং পরেরটি তার বিশেষণ। আচমকা স্বাভাবিক কর্ড ছেড়ে এই অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো কর্ড বাংলা গানের সমাপ্তিতে সচরাচর শুনতে পাওয়া যায় না। এই না শুনতে পাওয়া কর্ডই 'অরুণ মিত্র' শব্দটির পুনর্জন্ম দিয়ে একটি কবিতার জন্ম দিল।

কবিতা থেকে গান

কারো কারো মতে কবিতায় সুরারোপ একটি লঘুশিল্প। তাঁদের মতে, কবিতায় বেশিরভাগ সুরারোপ শেষ বিচারে অসফলই থেকেছে। সে জন্যেই একজন সংগীতকার কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারেন। কোনো গীতিকার একটি স্বতন্ত্র গান লিখতে পারেন।

কিন্তু কবিতায় সুরারোপ করা উচিত নয়। এটি একটি অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ।

উল্টো মতের লোকেদের বক্তব্য, কবিতা ও গান এই সেদিনও অভিন্ন ছিল। কবিতা ও গানের বিভাজন এক অর্থে খুবই অর্বাচীন ঘটনা। এমনকি কবিতা ও গানকে পৃথক করা হয়ও খুবই সংকীর্ণ সংজ্ঞায়। কবিতা ও গানের ভুবন প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগটাই অভিন্ন। অন্ত্যমিলহীন কবিতা কিংবা গদ্য কবিতার আত্মপ্রকাশে হয়ত কবিতা থেকে গানের দূরত্ব আরও বেড়েছে। কিন্তু আজকের আধুনিক সঙ্গীত গদ্যেও সুর দিতে সক্ষম। তাছাড়া, গদ্যে সুরপ্রয়োগ বিষয়টিও সাম্প্রতিক নয়। আমাদের স্তোত্রে, কিংবা আকাশবাণীর বহুশ্রুত মহিষাসুরমর্দিনীতে আমরা পঙ্কজ মল্লিক কৃত সুর শুনেছি। কীর্তনে বা রামায়ণ গানেও সুরে গদ্য বলা হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। কবিতায় রবীন্দ্রনাথ থেকে সলিল চৌধুরী হয়ে সাম্প্রতিক বহু সংগীতকারের সফল সুরারোপ আমরা শুনেছি। কোনো কোনো কবিতার সংগীতরূপ এতটাই পরিচিত যে তার সংগীতরূপটি মূল কবিতার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়। উদাহরণ, সুকান্তের নানা কবিতার সলিল চৌধুরী কৃত সংগীতরূপ।

সাম্প্রতিক সময়ে কবিতার সংগীত রূপকে নানাভাবে শুনেছি। লোপামুদ্রা মিত্রের আত্মপ্রকাশ কবিতার গানকে প্রধান উপস্থাপনা করেই। জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার খুবই সফল সুরারোপ করেছেন সমীর চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলির আদলে করা এই সুরে রয়েছে কীর্তনের আভাস। বেণীমাধবকে উদ্দেশ্য করে বলা সংলাপ, আর এই রাবীন্দ্রিক সুর খুব স্বাভাবিকভাবে যেন একে অপরের হাত ধরে। কবিতার এমন সার্থক সুরারোপ লোপামুদ্রার অন্য সব গানে ঘটেছে বললে অতিকথন হবে। যেমন অতিকথন হবে এর আগেকার সময়ে অজিত পাণ্ডে কৃত কবিতার সুরারোপগুলি সম্পর্কে একই কথা বললে। যদিও শঙ্খ ঘোষের 'আগে বলবেন গারে, খোকা'-র সুর কবিতার সাথে কোনো সংঘাত তৈরি করে না। অন্যদিকে দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতার সুর সম্পর্কে বলা যায়, মূল কবিতাটির মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রায় গান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। কবিতার সফল সুরকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়ও। শুনেছি সাধারণভাবে কবিতায় সুর প্রয়োগ করা বিষয়ে অনুৎসাহী কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতার প্রতুলের করা সুর প্রথম শুনে এতটাই মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন হয়ে যান যে দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে পূর্ব কলকাতায় তাঁর বাড়ি অবধি দীর্ঘ পথ চলে আসেন একান্তে হাঁটতে হাঁটতে।

সংখ্যায় কম হলেও এ-সময়ের কৃতী সংগীতকার ময়ূখ-মৈনাক বেশ কিছু কবিতায় সুরারোপ করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সাথে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শামসুর রাহমানের 'শ্লোগান'। কবিতার সুর বিষয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ। বাংলা গানের যিনি অন্যতম প্রধান কারিগর, সেই কবীর সুমন প্রায় কখনোই কবিতায় সুরারোপ করেন নি। বাংলাদেশের কবি শহীদ কাদেরীর কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গান লিখেছেন। কিংবা কবিকে নিয়ে গান লিখেছেন, কবির স্বরচিত কবিতাপাঠও তাঁর একটি গানের বিষয়, যার উল্লেখ করেছি। কিংবা তাঁর গানেও আমরা বারবার ঝলসে উঠতে দেখি কবিতার অমোঘ উচ্চারণ। তবু তিনি কখনোই কবিতার সুরারোপের পথে হাঁটতে যাননি। সুমন কি কবিতায় সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত?

যখন একজন সুরকার কোনও কবিতায় সুরারোপ করতে যান, তখন সেই মুহূর্তে কবিতার ভেতরে তিনি নিশ্চয়ই কোনও সুর শুনতে পান, যার পথ ধরে তিনি তাঁর সুর প্রয়োগের কাজে এগিয়ে যান। যদি সেটা না হয়ে তিনি ওপর থেকে কোনো সুরকে কবিতার ওপর চাপিয়ে দেন, তবে দুর্ঘটনাই ঘটার কথা। কবিতার সুরারোপ করতে গিয়ে এমনতর দুর্ঘটনা অনেক সময়েই ঘটতে আমরা দেখি। এই সুর শুনতে পাওয়াও দু-ধরনের। কেউ কবিতার অন্তরালের সুরকে শোনেন, কেউ শোনেন তার পাঠের সুরকে। সলিল চৌধুরী যখন সুকান্তের 'অবাক পৃথিবী' কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পাল্কীর গান' কবিতায় সুর করেন, তখন পাঠের সুর আর গানের সুর মনে হয় পরস্পর হাত ধরাধরি করে আছে। একই অনুভব হয় রবীন্দ্রনাথের 'ছবি' কবিতার পাশে 'তুমি কেবলি ছবি' গানের সুর শুনলেও।

লজ্জার মাথা খেয়ে

ব্যক্তিগতাবে আমাকেও নিতান্তই বন্ধুজনের প্রশ্রয়ে দু-একটি কবিতায় সুর প্রয়োগের দুঃসাহস প্রদর্শন করতে হয়েছিল। বঙ্গীয় পঞ্চদশ শতকে পদার্পণ উপলক্ষে একটি বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জন্য জীবনানন্দের 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাকে সুরে বাঁধার চেষ্টা করেছিলাম। এই কবিতায় সুর দিয়েছেন নামী আরও অনেক সুরকার। সৌভাগ্যবশত সেই সময় অবধি সেই সুরগুলি আমার কাছে অশ্রুত ছিল। এই কবিতায় সুর করতে গিয়ে বারবারই আমার চোখে ভেসে উঠেছে দেশভাগ, আমার পিতৃপ্রজন্মের মানুষের সজল স্মৃতিচারণ দীর্ঘশ্বাস, উত্তরপূর্বেই বাঙালি হওয়ার সুবাদে আমার নির্বাসিত সত্তা। কবিতার ভাষা যেহেতু নাগরিক, তাই এই কবিতায় লোকায়ত সুরের কোনো সুযোগ ছিল না। অন্যদিকে বাংলার মূল ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত ভিটেহারা জনগোষ্ঠীর এক সন্তান হিসেবে বাংলা আমার কাছে সুদূরের স্বপ্ন, এক আজন্ম দীর্ঘশ্বাস। দেশভাগ আমার কাছে এসেছে বাবা-মায়ের বাষ্পাকুল চোখের উদাস চাওয়ায় আর আমার পারিবারিক পরিবেশে শোনা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ভাটিয়ালি সুরে রচিত 'আমার মন কান্দেরে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানের কথা, সুর আর আমার কাকার গায়নে। ওই কবিতাটি যখনই সুর করতে নিয়েছি বারবারই ভাটিয়ালি সুরে বুকের ভেতর বেজে উঠেছে বাঁশি, কবিতাটি যখন পড়ে গিয়েছি তখন কানের কাছে বেজে গেছে আমার কাকার গলায় ওই গান—

ও দরদীরে, আমার আম গাছে ধরে নি মুকুল
ঝিঙ্গামাচায় ফুটে নি ফুল
আয় নি বকুলতলায় আউলা চুলে সন্ধ্যা নামিয়া
গহীন রাইতে একলা ডালে রে
দুঃখিনী ডাকে নি পাপিয়া
দরদীরে, মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা।

তবু আমার করা সুরে কোনও ভাটিয়ালির চিহ্ন বা কোনও লোকসুরই ছিল না, কিন্তু বিষাদ ছিল। এই বিষাদ মাইনর কর্ডে ভর করে একটি নাগরিক সুরের পথে হেঁটেছে। আমার কাছে 'রূপসী বাংলা'-র অন্তরের সুর ভাটিয়ালি, অন্তরের গান হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'মন কান্দে রে'। যদিও কবিতার বাইরের সঙ্গীতরূপে সে সুর নেই। হয়ত একটি কবিতার অপমৃত্যুই হল এভাবে আমার হাতে!

আর একটি কবিতা নিয়ে একটি দুঃসাহস করেছিলাম নিজেই। প্রায় অজান্তেই। কবিতাটি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'অবনী, বাড়ি আছো'। এই কবিতার সাথে আমার সেই মুখোমুখি হওয়া নিয়ে একটি গদ্য লিখেছিলাম, তার পুনরুচ্চারণ করছি। আমার জন্ম শিলং-এ, বড় হওয়া শিলচরে। শিলচরেই ছিল আমার মামার বাড়ি। শিলং থেকে শিলচর যাওয়ার পাহাড়ি পথ আমার আশৈশবের সঙ্গী, সঙ্গী আমার গানের। এই কবিতাও একদিন এই পথেই অন্যভাবে বেজে উঠেছিল আমার কাছে।

পাহাড়ি পথে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে বাস, এ পাশে যদি উজ্জ্বল রোদ, ও পাশটায় হয়ত ঘন ছায়া। ছেলেবেলা থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে এখনো এই পাহাড়ি পথ আষ্টেপৃষ্টে

আছে সমস্ত স্মৃতি জুড়ে। কত গান, কত ছড়া, কত কথা, কত গল্প মনের ভেতর খেলা করছে এ পথে যেতে যেতে। সেবার বাড়িতে কীর্তনের আসরে এক ভদ্রলোক ভৈরবীতে গেয়েছিলেন 'শিবের বুকে দাঁড়িয়ে কেন বল মা শ্যামা শিবানী গো'। এ সুরের নাম যে ভৈরবী তা জানার বয়স হয়নি তখনো। কিন্তু নাছোড়বান্দা সে সুর নেমে এসেছে ক্ল্যাহ্‌রিয়েটের বিজন প্রান্তর থেকে, ডাকবাংলোর চারধার ঘিরে থাকা পাইনের মর্মরে মর্মরে। কিংবা সোনাপুরের পাহাড়ি স্রোতের ওপর ফেরিতে দাঁড়িয়ে দেখা দূরে পাহাড়-মেঘের মিতালিতেও বারবার যেন সেই ভৈরবী। আরেকবার কোনো গান নয়, সমস্ত পথ জুড়েই গাছে গাছে পাতায় পাতায় পাহাড়ে ছিল এক ভয়ার্ত অভিজ্ঞতার ফিরে ফিরে মনে পড়া। এই গানের আসরেই আমাদের বাড়ির প্রতি সহাস্য অতিথি অমিয়াংশু কাকুর দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা যাওয়ার স্মৃতি। মৃগী শব্দটা তখনই প্রথম শুনি। এক ভদ্রলোক আশ্চর্য, এক পাটি জুতো নাকে শোঁকাতে শশব্যস্ত, আর কীর্তনে বেভুল জেঠু একটু চোখ খুলে নির্লিপ্ত হয়েই বলল, এই গানেই কেটে যাবে সব। কিছু করতে হবে না। ওই ঘটনাই বোধহয় শিশুমনে আমার প্রথম মৃত্যুভয় জাগিয়েছিল। সেবার গোটা পাহাড়ি পথ জুড়ে তাই কোনো গান ছিল না, ছিল ওই ভয়ার্ত অভিজ্ঞতার ফিরে ফিরে আসা। এবার এই উজ্জ্বল রোদ ভরা পথে বারবারই ভেসে উঠছে শ্মশানের মতো হাহাকার ভরা মধ্যরাতের ছবি। স্মৃতির গভীর থেকে উঠে আসছে ছোটোবেলায় দেখা কাঠের পাটাতনের লোহার কড়াওয়ালা একজোড়া দরজার ছবি। হয়ত সুধীর মৈত্র বা সমীর সরকারের আঁকা। আড়াআড়ি লেখা 'অবনী, বাড়ি আছো?' গভীর নির্জন রাতে কে কড়া নাড়ে? শ্মশানের মতো নিস্তব্ধতায় কার কড়া নাড়া আর আর্তকণ্ঠ যেন বধির রাত্রিকে খান খান করে গেল, সাড়া পেল না একটুও কোথাও। ফিরে ফিরে যাচ্ছে আর আসছে সেই আর্তি। কেউ শুনছে না, হয়ত কেউ নেই এ শহরে, আছে ঘুমন্ত শহরের বাড়ি ঘর নর্দমা নিষ্প্রভ লাইটপোস্ট আর নিকষ অন্ধকার। কোনো মানুষ নেই, জেগে থাকা বা ঘুমোনো। তবে কড়া নাড়ে কে? বুকের দরজায় আছড়ে পড়ে কড়ানাড়ার অবিরাম খটখটানি। কেবল শুনি রাতের কড়ানাড়া। গভীর রাতই কড়া নাড়ে চেতনে অবচেতনে। এ কী? তিনটে ভিন্ন ধাপে একই সুরে প্রায় কে বলে উঠল, অবনী, বাড়ি আছো? এই পংক্তি উচ্চারণ করলেই কবির স্বকণ্ঠের যে হুঙ্কার বাজত কানে এতদিন। আজ সেই বজ্রকণ্ঠের বদলে অনেক কালের চেনা সেই পংক্তির পরতে পরতে এত রোদন ধ্বনিত হচ্ছে কেন? সুরে ভর করে জাগছে কেন আর্তি? এই ভরদুপুরে পাহাড়ি সবুজের বুকে যেতে যেতে হঠাৎ অন্ধ রাত কেন বুকের দরজায় আছড়ে পড়ে চেনা কবিতার ছন্দে আর অস্ফুট অচেনা সুরে? এক লহমায় কেটে গেল ঘোর, এই অন্যায় অনধিকার অনুপ্রবেশ আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। পরবর্তী এক বছর ধরে চলল এক অদ্ভুত খেলা, একে ভুলে থাকতে চাওয়ার আপ্রাণ বাসনা আর যখন তখন সে সুরের হ্যাংলার মতো হানাদারি। নিতান্ত বেহায়ার মতোই একদিন হার মেনে ফিরে যাই আবার কবিতাটির কাছে নাছোড়বান্দা সঙ্গীকে নিয়ে। সুর করা গেল না কবিতাটির, তা অসম্ভব বলেই। সুরে বলা হয়ে রইল শুধু এক বিশেষ মুহূর্তের সেই কবিতাটির একটি ব্যক্তিগত পাঠ।

কবিতার গান, গানের কবিতা বিষয়ে আমার বলার কিংবা কিছুই বলতে না পারার, এটুকুই।

বিধাননগর সরকারি কলেজ, কলকাতার বাংলা বিভাগ ও বিশ্বকোষ পরিষদ আয়োজিত জাতীয় আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত বক্তব্যের লিখিত রূপ

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

অপরেশ দে

গভ. কনট্রাক্টর ও জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার

মন্তেশ্বর, বর্ধমান

Sl. No. 35

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখুন। আসুন সকলে মিলে আমরা নির্মল বাংলা গড়ে তুলি।

কেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

সালানপুর, বর্ধমান

জ্যোৎস্না দাম
উপপ্রধান

নগেন সরেন
প্রধান

Sl. No. 69

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

এ.এম.সি. এমপ্লয়িজ কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

বার্নপুর, বর্ধমান
রেজি. নং : ১৮১, তাং : ১১-০৮-১৯৮৮

Sl. No. 02

With best compliments of

ACMEE INSULATION CO. LTD.

Burdwan Road, Siliguri-734005

Sl. No. 67

চাঁদ চিবিয়ে খাব না

[আরুশি জৈনকে]

যযাতি দেবল

কোজাগরির চাঁদ ওঠে ভারতবর্ষের আকাশে
বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ ডাক দেয় অযোধ্যা পাহাড়ে
আর রমজানের ফালি চাঁদ হাসে ভালোবাসার আকাশে

চাঁদ আসে
চাঁদ হাসে
চাঁদ ভাসে ভালোবাসার সুগন্ধি বাতাসে।

দাদরি শোনো চাঁদ উঠছে
শোনো খাইবারপাসে চাঁদ হাসছে—
গুলশনের চাঁদ ধুয়ে দিচ্ছে সবুজে রক্তদাগ,
শোনো আরুশি তুমি ঘুমাও; ঘুমাও
তোমার বন্ধুরাও ঘুমাতে গেছে...

আমরা জেগে আছি প্রিয়তমা ভগিনী আমার
আমরা ঘুমাবো না সারা রাত্তির
জেগে থাকব সারাদিনমান
মাথার উপরে চাঁদ হাসবে
তবু, আমরা চাঁদ চিবিয়ে খাব না।

এপিটাফ

মাধুরী অধিকারী

লাল চাদরে ঢেকেছিল যে শরীর
পতাকা শোভায় শায়িত যে শরীর
ডাস্টবিনে উবু হয়ে বসা যে শরীর
অথবা তীরবিদ্ধ সেই যে শরীর
কেউ কি জেনেছিল—সেদিনও গভীর রাতে
নিদ্রামগ্ন শরীরের ভেতর থেকে
সাদা মুখোস অনুসঙ্গী
সটান সীমানা পেরোলো

তুমি প্রশ্ন করেছিলে অমলকান্তিকে দেখেছি কিনা
ঈষৎ চিন্তিত তৎক্ষণাৎ—
ডুব সাঁতারে উঠে আসে ধীরে ধীরে—
দুই জোড়া চোখ জায়গা বদল করে
আগুন আর জলের পরিণতি
—অট্টহাসিতে
এ এক নতুন ভুবন।

পজিশন্ নে...

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

মিছিলের পুরোভাগে অবেলায় হন্তদন্ত হেঁটে যাচ্ছে
কে?

যে
আমারে মারতে গিয়ে চাকু ফেলে অগত্যাই পিছু হটেছিল—
সে?

হাঁটছে মাঠের আল বেয়ে।
সরাণের পথে ধুলো। পিঠে কুলো বেঁধে
কারা আসছে অকাতরে গানের মতন কেঁদে-কেঁদে...
বাতাস তাদের দিকে ধেয়ে
আসছে। ভাসছে চোখে রোদ।
তারও চেয়ে লেলিহান দুর্বাসার প্রস্ফুরিত ক্রোধ
ছড়াচ্ছে হাড়হিম জাড়ে।

আরে,
এ তো সেই গজানন্দ! গাজনে যে আকারে-প্রকারে-ব্যভিচারে
আল্‌কাপ সেজেছিল!
মানুষের হাড়ে
ডুগডুগি বাজিয়েছিল,
মেজেছিল ভাঙা দাঁত শুকনো নিমডালে!
দে
হাতে ওর মধুভাণ্ড। কী প্রকাণ্ড প্রশস্ত চিবুক।
কী তামাটে উজ্জ্বল শ্রীমুখ!
আর না অপেক্ষা, আর বিলম্ব না-করে
অফেন্সিভ খেল্ হারু,
শজারুর কাঁটা মেলে দেবদারু সাক্ষী রেখে তুই
এই বেলা তড়িঘড়ি অব্যর্থ নিশানা নিয়ে পজিশন্
নে।

শেষ সম্বল

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

দুচোখে আমার আজ ধূসরের সর পড়ে আছে
ধারদেনা করে কেনা চশমার কাচে তার ছায়া
রাশি রাশি ঘনঘোর মেঘ যেন বাগানের গাছে
কিছুতেই মুছবে না ঝরোঝরো শ্রাবণের মায়া!

ছলনারা মরসুমি জুটেছিল পরিযায়ী হেসে
ঠিক এইভাবে হাত ধরে কেউ বেসেছিল ভাল
তখন বুঝিনি আমি আলেয়ার চোরাটানে ফেঁসে
আগুনে ঝাঁপাবো আর পরিণামে পুড়ে হব কালো!

এখন লাবণ্য দিয়ে মুখটাকে ধুয়ে করি সাফ
যে তাকায় চলে আসে তরুণেরা করে কোলাহল
এখন প্রমাণ নেই আগেকার যৌবনের পাপ
বর্তমানে তুমি শুধু হাতে আছ শেষ সম্বল!

নামহীন কবিতা
দীপেন ভাদুড়ী

মহামান্য ধর্মাবতার! আমার একটা অভিযোগ আছে। ধর্মাবতার বললেন, অভিযোগের চাপে আমার পিঠ বেঁকে গেছে। শান্তিরক্ষকদের কাছে যাও। গেলাম। দেখলাম সেখানে শান্তিতে সকলে নিদ্রামগ্ন। তারা আমার ডায়েরি নিল না। ফিতে কাটার ভিড়ে নতুন ডায়েরির ফিতে কাটার তারিখ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের চোখে তাচ্ছিল্যের ছায়া দেখছিলাম। তারা বলল, ফ্রি মানসিক চিকিৎসালয়ে যাও। একদম ফ্রি পেলাম না। সকলে বলল, বোকা! সোনার পাথরবাটি খুঁজতে এসেছে। সূর্য উদয়কালে গেলাম। অনেক পরে টাকা দিয়ে টিকিট কাটলাম। শবরীর প্রতীক্ষা। শুনলাম জুনিয়াররা ব্যস্ত সফেন সুরা যোগে খানাপিনায়, ওষুধ কোম্পানিগুলোর দৌলতে। মাঝে মাঝে ওষুধ কোম্পানির বদান্যতায় তারা চাঙা হতে যায়, সঙ্গে উর্বশীর দল। সূর্য অস্তাচলে। তারা ফিরল, ঢুলুঢুলু নয়নে, ক্লান্ত বিধ্বস্ত, তাদের চোখে দেখেছিলাম প্রশ্নের ছায়া। কীটপতঙ্গের বেঁচে থাকার কী দরকার? হে মহামান্য ভগবান! আমার অভিযোগ—গণতন্ত্র নিখোঁজ—গণতন্ত্রকে পাওয়া যাচ্ছে না—

উপনিষদ
সোমনাথ রায়

সেই সকালে উঠে বসেছ তুমি আমার রথে
ছাপ্পান্ন বছর টেনে যাচ্ছি দু-চাকায়
কতবার যে ভয় দেখালে নেমে যাচ্ছো এই
এক পা তুলে ফিরিয়েছিলে আর একটি পাও
পরমাত্মা তুমি আমার ভালোবাসার রথী
অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকো তুমি
কিংবা জেগে থাকো ভিন্ন সুখে
বুদ্ধিটা তো বেপরোয়া সারথি
বেড়াতে নিয়ে দেখায় যা যা আঁকতে ওঠো তুমি
ভয় দেখাও ফিরেও আসো লাগাম দাও মনে
যেদিন তুমি বিদায় নেবে শরীর রথ ছেড়ে
সারথিহীন লাগামছাড়া নচিকেতার কোলে
সেদিন যেন তোমার ঠোঁটে একটু হাসি দেখি
শুনতে পাই শুধু শান্তিধ্বনি

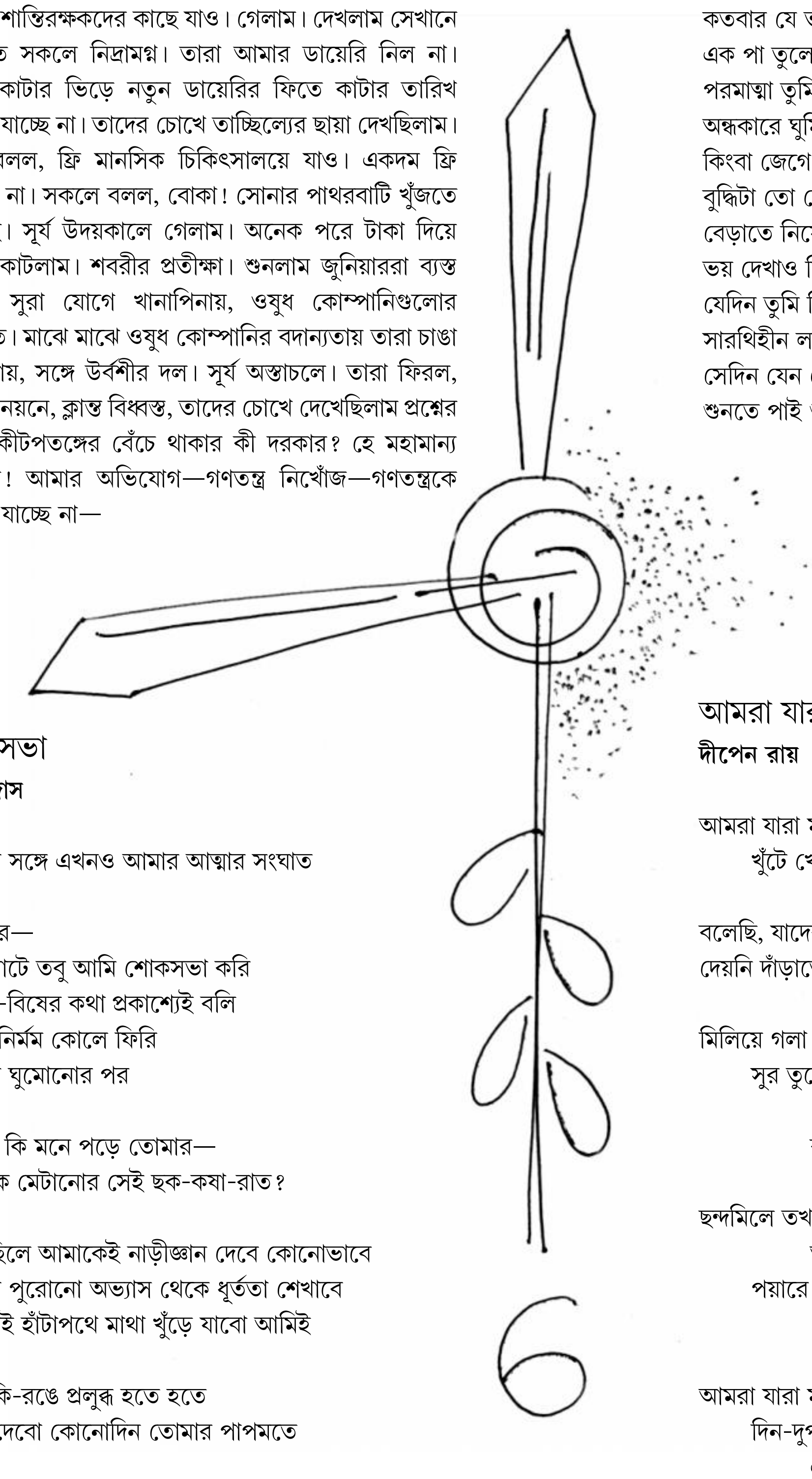

শোকসভা
তপন দাস

তোমার সঙ্গে এখনও আমার আত্মার সংঘাত

অতঃপর—
পথে-ঘাটে তবু আমি শোকসভা করি
গোপন-বিষের কথা প্রকাশ্যেই বলি
রাত্রির নির্মম কোলে ফিরি
ভগবান ঘুমোনোর পর

কখনও কি মনে পড়ে তোমার—
নিজেকে মেটানোর সেই ছক-কষা-রাত?

ভেবেছিলে আমাকেই নাড়ীজ্ঞান দেবে কোনোভাবে
তোমার পুরোনো অভ্যাস থেকে ধূর্ততা শেখাবে
তোমারই হাঁটাপথে মাথা খুঁড়ে যাবো আমিই

পোশাকি-রঙে প্রলুব্ধ হতে হতে
ধরাও দেবো কোনোদিন তোমার পাপমতে

তোমার জলবায়ু সঙ্গ দেয়নি, তোমারই যাবার পথে

আমরা যারা মাদুরে বসে
দীপেন রায়

আমরা যারা মাদুরে বসে
খুঁটে খেয়েছি পাখির মতন...

বলেছি, যাদের বিরুদ্ধে—
দেয়নি দাঁড়াতে তারা,

মিলিয়ে গলা আন্তর্জাতিকে
সুর তুলেছি যাদের সঙ্গে

বলে না কথা বর্তমানও

ছন্দমিলে তখন
অনুপ্রাসে
পয়ারে গাঁথি
কথার কথা,

আমরা যারা মাদুরে বসে
দিন-দুপুর এক করেছি
একের ভাত
অনেকে খেয়ে...

ফুটন্ত সকাল

উজ্জ্বলকুমার ঘোষ

কারখানা মোড়ের চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তোমাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম
ফেলে আসা কিছু পাবার আশায়।

আনন্দের জোয়ারে মনটাকে ভাসিয়ে
উড়ে গিয়েছিলাম দূর বহু দূরে
কোনো এক অজানা জগতে।

চায়ের কাপে তুফান তুলে
প্রতিশ্রুতির ত্রিনয়নে হাত রেখে বলেছিলে
এনে দেবে ফুটন্ত সকাল।

স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেখেছিলাম
নীল আকাশ, সবুজ জমি, হাসিমুখ
শৃঙ্খলমুক্তা মা দু-হাত তুলে ডাকছে

হঠাৎ তীব্র আর্তনাদে স্বপ্ন ভেঙে দেখি
মুখে অ্যাডিস মেখে পড়ে আছে
এক নারী, ভাবী ভারতবর্ষ।

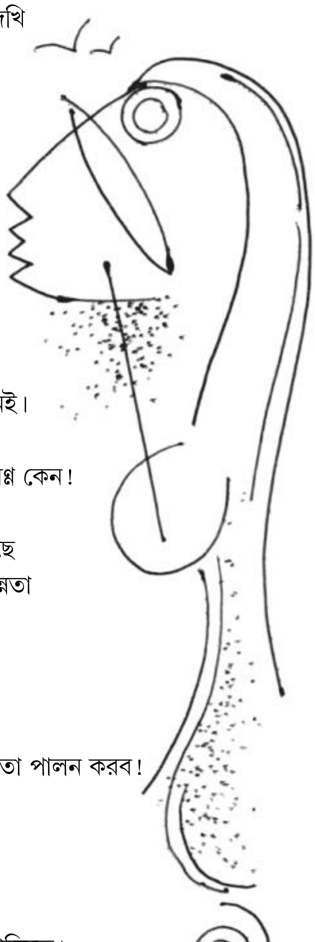

মা

নরেশ মণ্ডল

—কেমন আছো তুমি
মা-র গলায় বিষণ্ণতা। —ভালো নেই।
ভালো নেই, ভালো নেই। মাকে
এমন দেখিনি কোনোদিন। এত বিষণ্ণ কেন!
—দেখ, ভালো করে দেখ
মানুষ কাঁদছে। মানুষ বড় কষ্টে আছে
এক বিপন্নতা থেকে আর এক বিপন্নতা
বিরুদ্ধ বাতাস। পুড়ছে মানুষ।
প্রতিটা দিন চলছে ছলাকলা
মা হয়ে কি ভালো থাকা যায়!

—অন্তর্গত সময়ে আমরা কি নীরবতা পালন করব!
মা এক আকাশ ভালোবাসায়
বাড়িয়ে দেয় দু হাত।
—মাগো মা আমার।
দাও তোমার কোল, উষ্ণতা
আর একবার একবার মাথা রাখি শান্তিতে।

আমরা কি এখনও নীরবতা পালব করব!

একটা সিন্দুকের গল্প

রসুল করিম

আস্ত একটা সিন্দুক। পাথর প্রমাণ ভারি। অনেকের সাহায্যে সরানো সম্ভব, নইলে নয়। তার শরীরের সমস্ত লাবণ্য এখনও ঝরে পড়ে। খোল, নলচে, খিলানগুলোও যে যার জায়গায় নিশ্চুপ। একটা গোটা সমুদ্র ভরা আছে সিন্দুকের ভেতর। তার থেকে জল গড়াতে পারলে গোটা দেশ যাদু বনে যেত। যাদু বনে যাওয়ার অনেক নিদর্শন জমা আছে। দেশলাই বাক্সের সাথে এর গভীর সম্পর্ক। জাপানিজ বা ইউরোপিয়ানরা নাম শুনলে ক্ষেপে ওঠে। এখানেও তাই। খুলতে পারি না তার খিলান।
এবার বর্ষা নেমেছে। হাল বরষায় সিন্দুক সমেত উপুড় করা হবে। একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে। খিলান ভেঙে সাধ্যমতো বিলি বন্টনের ব্যবস্থা হতে পারে। বিদেশি পারফিউমের চেয়ে আরও অনেক বেশি সুগন্ধ বেরিয়ে আসবে। ছড়িয়ে পড়বে গ্রাম শহরের অলিন্দে অলিন্দে। একেবারে বিনে পয়সায়। নেবে বন্ধু, যার যা খুশি?

কর্কট সঙ্গীত

মুরারী মণ্ডল

জ্যোৎস্নায় ভাটার টানে, ভরা নদী
কাদাভরা নদীগর্ভে, কুমির ভয়ঙ্কর।
আলোর আকাশে মেঘ, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়
আশায় বুঁদ কেউ কেউ, বৃষ্টিতে ভিজবে দেদার।।

স্বর্ণ-অলঙ্কারে ঢাকা, এক কঙ্কালকে
স্বাস্থ্যবতী দেখানোয় বাজে হরেক সুরেলা গান।

কালান্তকে কোনও দিনে, খুলে যাবে নিশ্চয়
রঙিন সাজ, ফুরোবে কর্কটমোড়া প্রাণ।

সন্ত্রাস

তপন মণ্ডল

মৃতদেহ কোলে নিয়ে কেটে যাচ্ছে এক একটা দিন
নিঃশব্দ কুয়াশার ভেতর আবছায়া চশমার কাঁচে
ইথার তরঙ্গ ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ার আগেই
আর একটা প্রতিবাদী লাশ
মৃত্যু মিছিলে মিলিয়েছে পা।

মুখে কুলুপ এঁটে আপাত নিরীহ প্রাণী
সেও তো নিশ্চিত না—আগামী সকালে
কার সাঁকোটা দুলে ওঠে।

কে বলতে পারে
রাষ্ট্র বা হাতকাটা কেষ্ট কার কাছ থেকে
কখন বিপদ আসে।

ষাটের শাসন

কণিষ্ক আচার্য

ষাটের শাসনে মনপ্রাণ কণ্টকিত
ডাক্তারি ফর্দ ঝোলে মাথার উপরে
—যেন তীক্ষ্ণ খাঁড়া
নাহ! আর নাহ! কাঁটার বুনন
করেছে হাতের মুঠি ভয়ে জড়সড়
নিষেধের এটা, ওটা কেন ধর?
ও সবে তো ধরতে বারণ : তর্জনী ওঠায়—
রক্তচক্ষু হানে!
জীবনের মানে যেন উচ্ছ্বাস কমায়।
আত্মীয়, অনাত্মীয় পড়শির গায়েপড়া
উপদেশে—চতুর্ভিতে বেড়া বেঁধে দেয়

খড়ি হাতে লক্ষ্মণ, শিয়রে শমন
প্যাথোলজি মেপে যায়, রক্ত মধু, রক্ত চাপ
সোডিয়াম, পটাসিয়াম, কোলেস্টরল
পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা
সবার উপরে সঙ্কটতারিণী
সুসতর্ক, স্বয়ং গৃহিণী—শুধুই বরাদ্দ করেন—
পেঁপে, কাঁচকলা, গন্ধবাদুলে, বাসক, কোকিলাক্ষ
পক্ক শ্রীফল, শাজিনার শাক; যাক তাঁর কথা থাক।
পৌত্র-পৌত্রীর আদিখ্যেতা রাখা দায়।

কোথায় এসেছে শিখে, ত্রিফলার সদ্ব্যবহার
আর রক্ত সাফাই করে—চিরতার জল।
ফল বলতে নিরাপদ স্বাদহীন শশা—
মাঝে মধ্যে মনে হয়—তবে কি কাটবে জীবন
শধু শশ(আ)ধর হয়ে।
এই ভেবে ফলে ত্যাগ দিয়ে
ঝালে ভাবি, করি আত্মসমর্পণ।
আচ্ছা মশাই, বলুন তো—টক ঝাল মিষ্টি
দুই-এক মুঠো ঝাল চানাচুর খেলে
—পৃথিবী যাবে কি রসাতলে?
বাঁশ থেকে কঞ্চি দড়, ছোট ডাক্তারবাবু,
ফাঁকে কেউ কেউ ডেকে থাকেন—কম্পাউন্ডারবাবু বলে
তাঁর তো ব্যবস্থাপত্রে—জল সাবু মহৎ পানীয়।
বুঝে দেখুন—বিধাতার ফন্দিফিকির,
ষাটের একটি তীর মানবজীবনে রাখা
তবে কি ভীষণ জরুরি! রাখতেই হবে?

জীবনের ষাটের দুঃশাসন কিনা—সেকথা জানিনা
তবে শকুনির পাটোয়ারি—এটা হতে পারে;
ষাটের শাসন বড় স্বস্তিনাশী
এটা কিন্তু ঠিক!

সভ্যতার সারিগান

সুকমল ঘোষ

আমাদের বাড়ির চারপাশে
শালগাছের সারি
মাঝখানে হেঁটে যাওয়া মোরাম রাস্তা
দুধারে দোতলা ফ্ল্যাটবাড়ি।
রাস্তার পাশের ভ্যাট থেকে উপচে পড়া আবর্জনা—
দুটো খয়েরি এবং কালো কুকুর
টেনে হিঁচড়ে নগ্ন করছে তাদের
রাস্তার মাঝখানে।

আমাদের সুকান্ত খ্যাপা, একমুখ খোঁচা দাড়ি
আজানুলম্বিত জামা, ছেঁড়া পাতলুন
নিবিষ্ট মনে খুঁজে চলে পরশমণি
উথাল পাথাল করে ডাস্টবিন
বার করে আনে কয়েক টুকরো কাগজের ফালি
সানন্দা কিংবা গণশক্তি বা আনন্দবাজার
শকুনের দৃষ্টিতে খুঁজে ফেরে—যদি মেলে
দুমুঠো খাবারের নিশ্চিত আভাস
সাথে সুন্দরী রমণী কিংবা বিগ্‌বসের মুখচ্ছবি।

দোতলা বাড়ির জানালা থেকে উঁকি দেয়
প্রতিবেশীর অজস্র যুগল চোখ
ভুরু কুঁচকে ওঠে, খাবারের দলা উঠে আসে গলায়
দু-একটা শব্দ ছিটকে পড়ে জানালার বাইরে :
'রামোঃ' 'ছ্যাঃ'!!
সপাটে জানালায় পড়ে খিল।

তবুও বাড়ির চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকে
স্থির শালগাছের সারি
মাঝখানে হেঁটে যাওয়া মোরাম রাস্তা
দুধারে দোতলা রংচটা
সরকারি ফ্ল্যাটবাড়ি।
ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে পরশমণি
সুকান্ত খ্যাপা শিরদাঁড়া সোজা
হেঁটে চলে যায় আর একটা
বর্তমান ডাস্টবিনের দিকে...।।

প্রত্যহ ঋণ

অমিত বাগল

জীবন কী! জীবন কী কী
কী কী করতে বলেছে
কী কী করতে বলেনি
আর কোনো পরীক্ষাতেও আসবে আমার!

কত কিছু যে শিখিয়েছে
মা
বাবা
দিদি-দাদা
দু-হাতে দুধেবালা...
গলায় মাছের কাঁটা ফুটে গেস্‌লো
বিড়ালের পা ধরেছি

হাজি মজা, দিয়েছে কান্নার জন্য রক্তের মধ্যেও জল
আর আমি ওকে দিয়েছি, কী দিয়েছি, কী দিয়েছি!

ওর বোচ্‌কায় বেঁধে দিয়েছি উস্কোখুস্কো বেঁচে থাকাটি

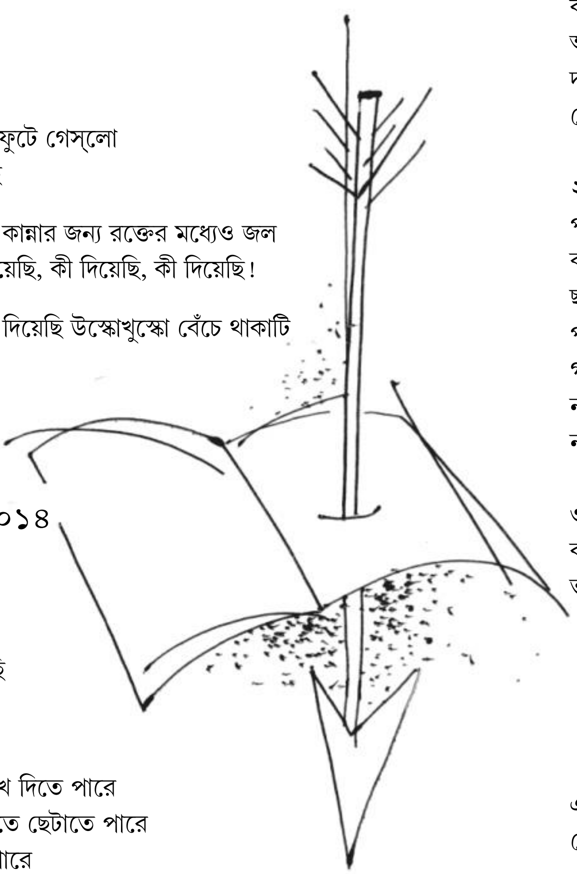

২ অক্টোবর, ২০১৪

মানস মণ্ডল

তারপর থেকে
খুব সহজ হয়ে গেছি

জলের মতো

যে পাত্রে খুশি, রেখে দিতে পারে
যে যার মতন, ছড়াতে ছেটাতে পারে
ভাঙতে, ভাঙাতে পারে

আমার আর কোনো ব্যথা-বোধ নেই
মান-অপমান নেই

উপর-নীচ, ডান-বাম, নেই,

চেয়ারের ভাষায়, দল-উপদলের ভাষায়
কেন্দ্রের, রাজ্যের ভাষায়

যে কেউ এখন, যেভাবে খুশি
আমাকে পড়াতে, পড়তে পারে
ঘাট-আঘাটায়
নামতে, নামাতে পারে
নামতে নামতে

রাজঘাট হারিয়ে যায়, খাগড়াগড়ের ঘাটে।

তিনটি ছড়া

পুষ্পজিৎ রায়

১.
চলছে শুধু খিটিমিটি
স্কুল-কলেজ-ইউনিভারসিটি
লেখাপড়ার জায়গাতে ভাই
হচ্ছে যে কী কেলেংকারি
তোলা দেওয়ার হুকুম জারি
কলেজে চাই অ্যাডমিশন?
আনতে হবে পারমিশন
দাদা-দিদির কাছে
পে-করো যা আছে!

২.
পড়াটড়ার সিলেবাস
বন্ধ রাখো কয়েকমাস
ছাত্র-কর্মী-প্রফেসর
পড়ে বুঝুক সার্কুলার
গরমেন যা করবে আইন
না মানলে হবেই ফাইন
নইলে বহিষ্কার!

৩.
কপাল আমার ফাটারে ভাই—কপাল মানে FATE
ভাগ্‌ছে কোথায় SSC আর ছুটছে কোথায় TET?
    এই রাজ্যে
    নৈরাজ্য (কৈরাজ্য?)
    হচ্ছে বটে ফিলিং
    ফালতু হল ইন্টারভিউ
    ফালতু কাউন্সেলিং
এক্সপিরিয়েন্স বহুত হল—অভিজ্ঞ এক বেকার
লেখাপড়া কম করিনি—কম করিনি শেখার
    (খোঁজ নেয় আজ কে কার!)
    এসপ্ল্যানেডে
        মুড়ি ভাজি
    বেগুনি রেডরোডে
    তিনি বলছেন
        লিস্টি হবে
    ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ডে!

ঘৃণা করি যাকে
অনিল মাইতি

তোমার কবিতা একদিন
পড়েছি বারে বারে,
আবৃত্তি করেছি সভা সমিতি আর
পদাতিক মিছিলে।
সেদিন তোমাকে
বড় আপন ভেবেছিলাম।
ভাবিনি সেদিন
বিক্রি হয়ে যাবে তুমি পশুর হাটে
অনেক বেশি দামে,
ঘাতকের উচ্ছিষ্ট খাবে চেটেপুটে,
সরকারি পুরস্কারে ভূষিত হয়ে
হাসবে নির্লজ্জের হাসি।

আজ সংগ্রামের কামারশালায়
ইস্পাৎদৃঢ় হচ্ছে মানুষ,
প্রস্তুত হচ্ছে ঘরে ঘরে

আবার সকাল হবে,
পুব আকাশ রাঙা হয়ে
উঠবে সূর্য, নতুন সূর্য।
আবার বইবে যখন বাতাস,
বিষাক্ত বারুদগন্ধ যাবে দূরে,
শিশু নির্ভয়ে হাসবে মায়ের কোলে
মা-বোনেরা পথ চলবে নির্ভয়ে।
উদাসী বাউল ভাটিয়ালি সুরে
আবার গাইবে গান।
শ্রমিকের হাতুড়ির তানে আর
কৃষকের কাস্তের গানে
মুখরিত হবে
বাংলার আকাশ বাতাস...

ইতিহাস
তপনজ্যোতি চৌধুরী

প্লাটফর্মে প্রতীক্ষমান অসংখ্য মানুষ—
স্ব-স্বার্থে—আপন উদ্দেশ্য পথের সন্ধানে!

শক্তির শেষ পর্যায়ে—দুরন্ত গতিতে—
ইঞ্জিনটা টেনে নিয়ে যায় ভারী কামরাগুলোকে!
স্মৃতির মণিকোঠার স্থানাভাবের কারণে—
অপলকে চেয়ে থাকে গার্ডের কামরার পিছনে!

ইতিহাস বিস্মৃত হয়—
ইতিহাসের স্তূপে!

একা
বিশ্বজিৎ সরকার

তুমি বলেছিলে একা আমি
সেদিন দেখেছিলাম তোমার পাশে
নির্মম এক অপূর্ব আলো।
মনের এক কোণে হিংসা আর উল্লাসের
উত্তাল প্রণয়ে, ম্লান হয়ে যায়
চোখের জল।
আজ আমি একা তুমি নও।
একা থাকি বলে নিস্তব্ধ দূর দেখা যায়
বিবেক যন্ত্রণা শুধু এক সাথে রয়।
যত দূরে যাই তত গম্ভীর বিস্ময়।।
দূর থেকে দেখি ভাঙা গৃহকোণ
টুকরো টুকরো কাচের বাসন।

যখন সর্বত্রই অন্য কিছু নেই
একাকীত্বের বন্ধনে অসহায়তা
স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে
বড় হওয়ায় স্বপ্নগুলো।
শ্লথ আশা—
তাই তো হারিয়ে যাচ্ছে সব ভাষা।
জীবনের সাথে লড়াই করতে করতে
আজ বড় পরিশ্রান্ত,
কতদিন কতকাল গভীর নিদ্রা যাইনি।
তাই একা ঘুমোতে চাই নির্জন ওই গাছের ছায়ায়।

ভুল শ্রাবণ
অতনু ঘোষ

বেশ স্বাভাবিকই ছিল ধূলি-ধূসরিত দিগন্তের মাঠ
এই শ্রাবণ, ভিজে মাটি, কী বিষাক্ত বৃষ্টিপাত।
কৃষকের ব্যস্ততা, শ্রমিকের শ্রম, মজুরের কালঘাম
এত আত্মত্যাগের পরও দাবি একটাই ফসলের দাম।
এখানে বন্ধুর মাটি, নিষ্ক্রিয় জরায়ু—তুমি কি শুনেছো?
বারবার পরাজিত হয়ে, কোন সুখে তবে বীজ বুনছো?
যে বীজ অঙ্কুর শেষে উদ্ভিদ হলে নির্লজ্জ কীট করবে ক্ষত
তাকে রোপণ কোরো না, অন্তত লজ্জায় মাথা হবে না নত।
আকাশে এখন মধুমাস। তোমাকে তো জাগাবেই
লালসার মেঘ
নিশ্চিন্তে ঘুমাও, যদি কখনো জেগে ওঠো জানবে—
প্রেম নয় আবেগ।
পুরুষত্বের অহম, তাই কি ইস্পাতি লাঙ্গল দেহ চিরে দিচ্ছে...
একবার ভেবে দেখো। খাদ্যের থেকে অনেক ভালো
খিদের ইচ্ছে।।

খুশি

দেবদত্ত রায়

এমন জানলে কি খুশিকে কোলে তুলে নি? নির্ঘাত নিতুম না। ফুটফুটে চাঁদের মতো মায়ের কোল আলো করে আমার ছোট্ট কুটিরে চৌকাঠ পেরুলো। মায়ের কোলে করেই। দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। প্রায় অস্ফুট কালো কালো চোখ দুটো কখনও খুলছে। কখনও বা স্থির। মুঠি করা হাত। জোর করে আঁকড়ে ধরে আছে যেন একমুঠো যখের ধন। কেউ যেন ছিনিয়ে নিতে না পারে। শক্ত মুঠি তার আরও শক্ত হচ্ছে।

নতুন বৌ বললে, অ্যাই নিন আপনার নাতনি।

বোঝার আগেই আলতো করে দু-হাত দিয়ে আড়কোলে তুলে নিলুম। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, প্রথম দর্শনে কী দিই, কী দিই? পকেটে তো কিচ্ছুটি নেই। কাঁচু মাচু করে বললুম, তুমি তো আমাকে অস্বস্তিতে ফেললে গো বৌমা। আচ্ছা দাঁড়াও পকেটে তো আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদই আছে। কলম। অ্যাই নে এটাই দিচ্ছি। ধর দিনি শক্ত করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। কী বুঝলো কে জানে, হাতের আঙুল গলিয়ে কলমটি গুঁজে দিলাম। হাত থেকে গড়াল না। শক্ত করেই ধরল। মন দারুণ খুশিতে ভরে উঠল। পেছন থেকে কে যেন হাততালিও দিলে। নাম দিলুম, আজ থেকে তুই আমার খুশি। খুশি তো খুশিই খুশি। সেই থেকে এই মেয়ে সবার খুশি। সবার কাছে খুশি।

কিছুদিন পরে বুঝলুম ওইটুকু বাচ্চার কেমন যেন একটা বোধশক্তি তৈরি হয়ে গেছে। হাততালি দিলে হাসে। চোখ বড় করলে ঠোঁট বাঁকায়। তেমনই সবাই একসঙ্গে হাততালি দিলে খুশি সতেজ হয়ে ওঠে। আবার নতুন উদ্যোগে হাত-পা নাড়ায়। খুকিকে নিয়ে এ-বাড়িতে একটা মিঠে হাওয়া বয়ে যায়। সারা বাড়িতে একটাই শিশু। সবার কাছেই যেন সুগন্ধী গোলাপ। সবার কোলে কোলে।

নতুন বৌ, মাঝে মাঝে বিরক্ত হন। সম্ভবত ঈর্ষার ছাপও পড়ে তার মুখটেপা হাসির মধ্যে। মিষ্টি করে বলে—বাবা, আপনাদের জ্বালায় মেয়েটাকে একটু খাবারও দিতে পারি না। কথার মধ্যেই তো একটু ক্ষোভ। একটু সলজ্জ হাসি। আমরা বুঝি না? মাতৃস্তন্য চাপ দিচ্ছে আসলে। তবু আমরা সবাই ঈষৎ লজ্জিত হই। যারা তার কেউ না হয়ও দখলদার। এই পাতানো দাদু, দিদা, মামা, পিসে, কাকু।

এর মধ্যেই খুশির এই পাতানো দিদা কোল থেকে খুশিকে মায়ের কোলে দিয়ে বলে, এই নাও, যাও, দুধ দাওগে। কোলছুট তো হয়নি। যাও বৌমা, ওকে পেট ভরে খেতে দাও। এই সুধাই তো ওর এখন জীবন-মরণ গো। এই নাও তোমার মেয়ে। দাও, নে গিয়ে দুধ দাও। বলাই শুধু নয়। মায়ের কোলে তুলে দেন খুশিকে। দিতে গিয়েও গাল টিপে আদর করতে ভোলেন না।

রক্তের টান বলতে কিছুই নেই। বছর তিনেক আগে ছেলেটা প্রায় হাত জোড় করেই এসে দাঁড়িয়েছিল, শুনেছি আপনার একটা ঘর খালি আছে। ভাড়া দেবেন? যদি আমাকে দেন। ছেলে মানে বলাই। তার পেছনেই প্রায় কচিমুখের মিষ্টি মেয়েটি। কাতর দু-চোখে কী যেন আকুতি। প্রথম দেখাতেই মন টেনে নিয়েছে।

বললুম, কী কর? পেছনে ওটি কে? বৌমা?

মেয়েটিই এগিয়ে এলো, হ্যাঁ বাবা। আপনার নিজের বৌমা বলেই ধরে নিন।

চমকে উঠলুম। জানল কী করে? আমার একটিমাত্র বৌমাই ঘর আলো করে রাখত। ছোট্ট শিশুটি পেটেই নষ্ট হয়েছিল। সম্ভবত সেই শোকেই একদিন আমার ঘরটির একমাত্র আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেল। নিজের অলক্ষ্যে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বললুম, কী কর বললে না তো? ছেলেটির আগে মেয়েটিই বলে উঠল, মাস্টারমশাই। রবীন্দ্র শিশু শিক্ষা নিকেতনে। সেই সঙ্গে ছেলেটি সলজ্জ ভঙ্গি যোগ করলে চারটে টিউশনি আছে। অংকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াতে পারি। ম্যাথামেটিক্সে অনার্স তো।

—বেশ তো, দিতে পারি। যেন নিজের অজান্তেই বলে বসি। একটা ঘর। সঙ্গে এক ফালি রান্নাঘর। পায়খানা কিন্তু কমন। চলবে? ছেলেটি বোধহয় কিছুটা লাজুক। মেয়েটিই আগ বাড়িয়ে এগিয়ে এল। খুউব চলবে বাবা। বেশি কিন্তু দিতে পারব না। বলুন বাবা কত করে দিতে হবে?

—দুশো দিতে পারবে?

মেয়েটি যেন কিছুটা ইতস্তত করছিল। একটু বোধহয় বেশিই হচ্ছে। তাই নিয়েই হয়ত ভাবনা। না কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু মেয়েটির ওই চোখ যে আমার বুকের ভেতরটা কেবল তালপাড় করে তুলছে। নিজেই বলে উঠলুম—আচ্ছা, দেড়শ করে দেবে। এর কমে হবে না। তবে ইলেকট্রিকের বিল আলাদা।

ছেলেটি একবার নিজের স্ত্রীর দিকে ঘাড় ফেরালো। মেয়েটির ইশারা চোখে পড়ল।

ছেলেটি সেই হাতজোড় করেই বললে, ঠিক আছে তাই দেব।

—তবে প্রতি মাসেই দেবে কিন্তু। আমি কিন্তু তাগাদা দিতে পারব না।

মেয়েটিই প্রায় খলখল করে উঠল, হ্যাঁ বাবা, তাই দেব। আপনাকে চাইতে হবে না। কাল থেকে আসি? দেড়শ টাকা দিয়ে দাও না। আছে তোমার ব্যাগে। বলেই সামনে স্বামীটিকে ইশারা করল।

সূত্র শুধু এইটুকুই। ততক্ষণে আমার পেছনে বাড়ির অন্যদের ভিড়। সবার কৌতূহল আমি কী করে বসি। বিশ্বাস নেই তো আমার ওপর! শুধু তাই নয়। তাদের কৌতূহলী খিল খিল হাসি বুঝিয়ে দিল, ওরা যা ভেবেছে তাই। মানে চেনা নেই, জানাশোনা নেই। এককথায় অমনি রাজি হয়ে যাওয়া—সে যে আমি ছাড়া অন্য কারো কম্ম নয়, সে বিষয়ে একদম সঠিক হয়েই খিলখিলে হাসির ঢেউ তোলা।

ঘাড় ফিরিয়ে সবাইকে লক্ষ করে বলি, কী হল, এত হাসি কিসের? নির্ঘাত ভুল করেছি। তা যা করেছি করেছি। তোমরা কাল থেকেই চলে এসো।

হ্যাঁ, এইটুকুই সূত্রপাত। প্রাণী-দুটিও যেন হাতে স্বর্গ পেল। মেয়েটি টপ করে আমার পা ছুঁয়ে বসল। বলল, বাবা, কাল থেকেই তাহলে আসছি আমরা। আমাদের বেশি তো মালপত্র নেই। চলে আসতে অসুবিধা হবে না।

সেই তো চলে আসা। এসেই মিশে গেল। সবার সঙ্গে। বরঞ্চ আমিই যেন দূরের হয়ে গেলাম। সেখান থেকে যেন নতুন চলা।

একদিন এ-বাড়িতে খুশিও এলো। তকে নিয়ে এ বাড়িতে যেন চাঁদের হাট। মধ্যমণি খুশি। কখনও সখনো বেশি ব্যস্ততা থাকলে নতুন বউ খুশিকে আমার কোলে দিয়ে দিব্বি নিজের কাজটাজ সেরে তারপর এসে খোঁজ নিত—খুব জ্বালাচ্ছিল? ভিজিয়ে টিজিয়ে দেয়নি তো আপনার কোল?

সঙ্গে সঙ্গে বলে দি—না না। তোমার মেয়ে তো লক্ষ্মী। দিব্বি আছে দ্যাখো।

এমনি করেই খুশি এ বাড়িতে বড় হল। আমরা সবাই যেন ভুলেই গেলাম খুশি আমাদের কেউ নয়।

খুশি একটু বড় হল। মুখে ফুটল দু-একটা কলি। অমনি সবারই হাততালি। দেখ, দেখ কেমন কথা বেরুচ্ছে। একটু দুটো করে কথা ফুটল। দেখতে দেখতে খুশি বছর তিনেক গড়িয়েও দিলে। এখন তো টরটরে বুড়ি। একটা করে কথা বলে, আর সবাই হাততালি দেয়। খুশি যেন হাততালির মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। আবার বলে—দাদু ভালো। তুমি ভালো না। তাতেই সবার হাসি। তাতেই সবার হাততালি। অমনি খুশিও যেন আনন্দ পায়। উৎসাহ বাড়ে তার। আবার অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, পিসি ভালো। পিসি মানে আমার ছোটো মেয়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে গাল টিপে চুমু খায় একবার। কোল থেকে নামিয়ে দিতেই খুশিও হাততালি দেয়। এর মধ্যে দেখে দেখে খুশি কথায় কথায় হাততালি দিয়ে ওঠে। ও যেন বুঝতে পারে, হাততালি দিলেই আদর পাওয়া সহজ হয়। বারবার হাততালি দেয়। সবাই খুশিতে ফেটে পড়ে। আবার বলে দা-দু ভালো। মাম্মি ভালো না।

আবার সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে। নতুন বউ ছদ্ম-অভিমানে বলে, হ্যাঁরে, আমিই ভালো না। আমার খেয়েই এত বড় হলি। সারাক্ষণ তো চুষে চুষেও তেষ্টা মেটে না। সেই আমিই খারাপ। এক নম্বরের নিমকহারাম হবি দেখছি। কথার মধ্যে বৌমার ছদ্ম শ্লেষ থাক না কেন, আমার মনে ধক করে এসে লাগল। আমি মৃদু বিরোধিতা করে বলি, এ কথা কেন বলছ বৌমা। এই তো অতটুকু বয়স? ও কি ভালোমন্দ কিছু বোঝে? ওকে যা শেখাব আমরা খুশি তো তাই শিখবে। তাই না খুশি?

বুঝুক না বুঝুক, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে বলে হ্যাঁ তো দাদু, বলেই বলে ওঠে হাততালি, হাততালি।

যারা যারা শুনছিল, সবাই হাততালি দিয়ে সমর্থন জানায়। খুশি আরও খুশি হয়। সে তখন ঘুরে ঘুরে হাততালি দিতে থাকে। নতুন বৌ লজ্জা পেয়ে বলে ওঠে, আমি তো ভেবে বলিনি বাবা। আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আর হবে না।

নতুন বৌ তো অনায়াসে মেনে নিলেন। আমার মনে আবার ঝটকা লাগল। সত্যি কি নতুন বৌ সত্যি বলেই মেনে নিলেন? না, একদিন আমি তাদের এক কথায় আশ্রয় দেবার ফলে কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে কোনো বিরোধিতা না করে মেনে নিলেন? তা, যাকগে, মরুগগে। যাই হোক, আপাত মেনে নিয়েছে। আমি যেন তাতেই খুশি। এ এক ধরনের সুখ। তৃপ্তি। শুধু আমি না। জগতের সব নরনারীরাই যে তার মতের একবাক্যে সমর্থন হলে খুশিই হন। তাতে তার ইগোবোধ আরও বেড়ে যায়। খুশিটা তাতেই পুলক হয়ে দেখা দেয়। তাতে আরও বেশি হাততালি পেতে মেতে ওঠে। হাততালির লোভ আরও বেড়ে যায়।

কিন্তু আমি চাই না খুশি সবাইকে খুশি করার জন্যই হাততালি দিক। আমি চাই খুশি হাততালির পার্থক্যটা বুঝুক। যা ভালো যা সে উচিত বুঝবে তাতেই যেন হাততালি দেয়। যা অন্যায়, যার সঙ্গে একমত না হয়—সে যেন কোনো দিন তাতে হাততালি না দেয়। সত্যিকারের ভালো-মন্দটা সে যেন বুঝতে পারে। সে যেন সত্যি করেই খুশি হয়ে ওঠে। ওকে আমি শেখাবই—কথায় কথায় হাততালি দিস না মেয়ে—তাতে যে অনেকের দুর্বুদ্ধি বেড়ে যায় রে মামনি। বুঝে শুনেই হাততালি দিস।

কৃকলাস

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী

রণজয়ের আজ সকাল থেকেই পেট গড়বড়। বেলা বারোটা বাজতে চলল দশ-বারো বার বাথরুমে দৌড়তে হল। শেষমেশ আর থাকতে না পেরে পরিচিত এক ডাক্তারবাবুকে ফোন করতে বাধ্য হয় রণজয়। সব শুনে ডাক্তারবাবু বললেন তাড়াতাড়ি নুন চিনি জল করে খান, আর কটা ওষুধ বলছি নিয়ে আসুন দেখুন আরাম পাবেন। রণজয় একজনকে দিয়ে ওষুধগুলো দোকান থেকে আনিয়ে নেয়, আর দু বোতল নুন-চিনির জল সময় অন্তর খেতে থাকে। বেগ খানিকটা কমলেও একেবারে থামে না। তবে অত ঘন ঘন নয় এই যা।

সেদিন আবার মনসা পুজোর দিন, রাত্রে রণজয়ের নিমন্ত্রণ ছিল বাউরি পাড়াতে, রাত্রি অনেক হওয়ার পরও রণজয় খেতে না যাওয়াতে বাউরি পাড়ার ছেলেগুলো একটা টিফিন কৌটোতে খিচুড়ি আর মনসার থানে বলি হওয়া পাঁঠার মাংস নিয়ে হাজির হয়। ওরা রণজয়ের ঘরে এসে দ্যাখে রণজয় বিছানায় শুয়ে আছে, কী হয়েছে জিজ্ঞাসা করাতে রণজয় চিঁচিঁ করে আজ সারা দিনের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে মনসার ভোগ খেতে যেতে না পারার কথা বলে। ছেলেগুলো আর কী করবে? আনা খাবার তো আর ফেরত নিয়ে যেতে পারা যায় না—ওগুলো রেখে বলল 'জানেন আমাদের পাড়ার একটা গাছ আছে, ওই গাছের পাতার রস সকালে একবার খালি পেটে খেলে আর দেখতে হবে না, যতই জোরদার হাগা হোক বন্ধ হবেই। কাল সকালে আনব কি? খালি পেটে থাকবেন কিন্তু?' —রণজয় কোনোক্রমে বলে—'ঠিক আছে আনবি, দেখি তোদের গাছের পাতা কেমন কাজ করে?' পরদিন সক্কালে জগা বাউরি অনেকগুলো পাতা নিয়ে এসে বলে 'কই তোমার 'শিল-নোড়া' কোথায় দাও, রসটা বার করি—আর কেমন আছো?' 'ওষুধ খেলাম তাও তো কমছে না'—রণজয় উত্তর দেয়।

এদিকে রচনা, রণজয়ের স্ত্রী গজ-গজ করতে করতে জগাকে শিলনোড়া দেখিয়ে দিয়ে বলে 'বাঁটো—রস বার কর, খাওয়াও তোমার দাদাকে, কিপটে মিনসে, ডাক্তার দেখাবে না, লতাপাতা খাবে, ওটা খাওয়ার পর যদি না সারে তাহলে তোমায় মজা দেখাব কিন্তু।' জগা পাতাগুলোর রস বার করতে করতে বলে 'দাদাকে কিপন বলো না, তুমি জাননা, তাই বলছ।' রচনা এবার কপট রাগ দেখিয়ে উত্তর দেয় 'তাহলে তোমাদের দাদাকে নিজেদের পাড়াতে রাখছ না কেন? এরকম দাতাকর্ণ থাকলে তো তোমাদের ভালোই হবে। যাও নিয়ে যাও, রাতটুকু আর এখানে থেকে কী হবে? যাও না নিজেদের পাড়াতেই গিয়ে রাখ।'

অবস্থা বেগতিক দেখে আর কথা না বাড়িয়ে পাতাগুলো থেকে রসটা বার করে একটা গ্লাসে রসটা নিয়ে জগা এগিয়ে দেয় রণজয়কে, বলে 'একবার নাকটিপে খেয়ে নাও দেখবে একবারে দশটার মধ্যে কোম্পানিতে লক-আউট হয়ে যাবে।'

খেতে খুবই বিস্বাদ তবুও একেবারেই সবটা খেয়ে, জল দিয়ে গ্লাসটা ধুয়ে বাকিটাও খেয়ে নেয় রণজয়। 'বাপরে যা মাল খাওয়ালি—কঠিন ব্যাপার রে!' জগা হেসে বলে 'দেখবে কেমন কাজ হবে, দশটার পরেই বুঝতে পারবে।' জগা এবার উঠে পড়ে, ওদিকে রচনা এক কাপ চা করে সাথে দুটো বিস্কুট এনে জগার হাতে দিয়ে বলে 'খাও—কৃতার্থ কর—আর শোন, দশটার সময় আসবে, একবার খবর নিয়ে যাবে, যদি না কমে তোমাকে কিন্তু ছাড়ব না।'

'তাই হবে গো' বলে চা বিস্কুট খেয়ে জগা উঠে পড়ে, যাবার সময় বলে যায় 'তোমার বৌটা কিন্তু খুব ভালো বুঝলে।' রণজয় হেসে বলে 'শালা আমি বুঝলাম না তুই বুঝে গেলি বল?'

'না গো আমি ঠিক বলছি—আর দশটার সময় আসব।' বলেই জগা বেরিয়ে পড়ে।

ঘড়িতে তখন ছ'টা। রচনা চিৎকার করে জগাকে মনে করিয়ে দেয় ছ'টা বাজে—দশটার সময় আসবে কিন্তু।

'হ্যাঁ আসব' বলেই জগা আর দাঁড়ায় না। এদিকে দশটার খানিক পরেই জগা হাজির, রচনার কানে যাতে এই কথাটা না যায় এই রকম ভঙ্গিতে রণজয়ের কানের কাছে মুখটা এনে জিজ্ঞাসা করে 'দাদা আর ক'বার হল?' 'একবারও না, দারুণ ওষুধ—আর শোন পাশের ঘরে রচনা আছে, ওখানে গিয়ে একবার দেখা কর, রচনারও এবার বিশ্বাস হয়েছে বুঝলি? বলছিল তোদের এই ওষুধটার কথা।' ওদের আলোচনার মাঝখানেই রচনা হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁগো জগাদা, তোমার ঐ গাছটার নাম কী? কোথায় আছে?' জগা উত্তর দেয় 'নাম শুনলে তুমি হাসবে।' —'তবুও বল না' রচনা ওকে অনুরোধ করে। এবার জগা বলে গাছটার নাম 'গুয়ে বাবলা' —আমাদের পাড়ায় গোটা পাঁচেক গাছ আছে।' রচনা হেসে ওঠে, বলে 'ঠিকই নাম—গাছ গুলোকে বাঁচিয়ে রেখ, অনেক কাজের।' জগা মাথা নেড়ে বলে 'ঠিক বলেছ আমরা সবাই গাছগুলোকে রক্ষা করি, যা ওষুধের দাম তার চেয়ে এই বিনি পয়সায় ওষুধই ভালো—চলি দাদা, চললাম।'

জগা চলে যেতেই জয়া বুঝতে পারে রণজয় আবার বাড়ি থেকে বেরোবার অছিলা খুঁজে পেয়েছে। বেশ কয়েকদিন ঘরে বসেছিল। কেউ আসা যাওয়া করত না। ভালোই হয়েছিল—কোনো ঝামেলা ছিল না! এবার জগার সূত্র ধরে রণজয় আবার বিভিন্ন জায়গাতে যোগাযোগে কাজ শুরু করবে। আবার শুরু হবে ঝামেলা, বাপরে! কদিন ধরে বাড়িতে যা হামলা হল, ঘরের জানালার একটা কাঁচও আস্ত নেই। বাইরে দাঁড়ানো স্কুটারটাও ওরা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নিচের তলার ঘরের টেবিল, চেয়ার, টিভি, ফ্রিজ, গ্যাস সিলিন্ডার আর কিছুই নাই, যা ভাঙার তা ভেঙে দিয়েছে, আর যেগুলো লুঠ করার করে নিয়ে গিয়েছে—শাসক দলের লোকেরা।

কয়েকদিন রণজয় চুপচাপই আছে, খুব একটা বাইরে বের হয় না। রচনা মনে মনে ভেবেছিল যাকগে আপদ গেল, রণজয় যে কটা দিন ঘরে চুপচাপ থাকে ততই ভালো। অবস্থা নর্মাল হোক তারপর না হয় যা করার করবে। তখন বাধা দেবে না। কিন্তু আজকে জগাকে দেখে রচনার মনে হল ওরা আবার সাহসে ভর করে জোট বাঁধার চেষ্টা করছে। তা না হলে ঐ বাবলা গাছের পাতার রস খাওয়াবার জন্য জগার এত দরদ উথলে উঠল কেন? জগা নিশ্চয়ই বোঝাতে এল যে ওরা ঠিক আছে। আর এই ছুতোটাই খুঁজছে রণজয়। রচনা কিন্তু একটা অজানা আশঙ্কা অনুভব করে মনে মনে ঠিক করে এখন রণজয়কে কয়েকদিন চুপচাপ থাকার কথা বলবে। স্নান করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বিনুনি বাঁধার সময় লম্বা ফিতের একটা অংশ দাঁত দিয়ে ধরে চুলের গোড়াতে শক্ত করে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলতে শুরু করে 'তুমি কিন্তু এখন কিছুদিন একটু চুপচাপ থাক। এখনই কোথাও বার হতে হবে না। দেখলেই তো কী কাণ্ডটা হল? ঐ জগাকে দেখে তোমার হয়ত মনে হচ্ছে আবার কিছু করা যাবে, কিন্তু এখন না বেরোনোই ভালো।' —রণজয় বেশ বুঝতে পারে রচনা ওর মনের ভাব ধরে ফেলেছে, অশান্তির ভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে কিছু ভাবে, তারপর বলে 'ক্ষেপেছ? এখন পার্টির কাজ করতে গেলে এক ঘাও মাটিতে পড়বে না' বলেই পায়ের ক্ষতটায় হাত বুলতে থাকে। ক্ষতটা কয়েকদিন আগে ক্ষমতাসীন দলের ছেলেদের উপহার—ক্ষতটা এখনো সারেনি, ওষুধ খেতে হচ্ছে।

রণজয়ের জবাব শুনে মনে মনে খুশিই হয় রচনা। ভাবে যাকগে সুমতি হয়েছে। সে দিনটা সারাদিনই ঘরের মধ্যেই কাটল, এভাবে বেকার বসে থাকতে আর ভালো লাগে না রণজয়ের, কী রকম যেন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব চারদিকে, সহজভাবে কেউ কথা বলতে চায় না, ফোন করলেও অনেকেরই ফোন বেজে চলে আবার যদিও বা ফোন কেউ ধরে তাহলে যাকে করা হয় সে না ধরে হয়ত তার মা অথবা স্ত্রী ফোন ধরে উত্তর দেয় 'সে এখন নেই কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছে, অথবা শরীর খারাপ।' এই ধরনের নানা উত্তর। পরিচিত মানুষগুলোর এভাবে বদলে যাওয়া বড়ই আশ্চর্যের লাগে রণজয়ের। তবু বেহায়ার মতো একে তাকে ফোন করে—চেষ্টা করে খানিকটা হালকা হওয়ার, কিন্তু হতাশ হয়ে ফোনটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে আগামী পরিকল্পনার কথা ভাবে।

কোনো রাস্তাই খুঁজে পায় না রণজয়। রাত্রে শুয়ে রণজয় বিছানায় শুধু এপাশ ওপাশ করে, ঘুম কিছুতেই আসতে চায় না, রচনা শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ করে, বুঝতে পারে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় মানুষটা কাতরাচ্ছে, একবার ভাবে ওকে পার্টির কাজ করা থেকে বারণ করা বোধ হয় ভালো হয়নি। আবার ভাবে কী দরকার এসব ঝামেলার মধ্যে থাকার? কোনো অসুবিধা তো নেই, নিজের মাস্টারি, ওর পেনশন সবই তো আছে, সামান্য মিলেমিশে যদি থাকা যায় ক্ষতি কী? তাছাড়া এখন যাদের সরকার চলছে তাদের পক্ষে না থাকলেও চুপচাপ থাকা তো যেতে পারে, মাঝে মাঝে যদি টাকা পয়সা চাইতে আসে দিতে হবে। আরো পাঁচটা বছর এই সরকার থাকবে, তারপর কী হবে কে জানে? এতদিন লড়াই করে থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব? না-না যতই কষ্ট হোক রণজয়কে আর পার্টির কাজ করতে হবে না। বাধা দেবে, কতজন তো এইভাবে আছে, কেমন ভালো আছে—আরামে আছে, নাম কা ওয়াস্তে কাগজে কলমে পার্টির খাতাতে নাম রেখে বসে আছে, তেমন থাকলে ক্ষতি কী? এখন 'যেমন কলি তেমন চলি' নীতি নিয়েই থাকা ভালো।

রচনা প্রশ্ন করে, 'কি ঘুম আসছে না?' —'না'—রণজয়ের উত্তর। রচনা আবার বলে 'তুমি তো এক কাজ করতে পারতে?' 'কোন কাজ?' রণজয় প্রশ্ন করে। 'সংসার না করলেই পারতে, বাধা দেবার কেউ থাকত না?' এবার মাথা খারাপ হয়ে যায় রণজয়ের—রূঢ় ভাবে বলে ওঠে 'সংসার করতে চাপ কার ছিল? আমার না তোমার? ইউনিভারসিটিতে চিটে গুড়ের মত লেগে থাকতে আমি ডেকেছিলাম? নাটকের ট্রেনিং নেবার নাম করে তুমি

ঘুরুঘুর করতে, কতবার হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম, মনে নেই? শেষে ইউনিয়নের নেতাদের ধরে আমাকে বাধ্য করেছিলে তোমরা কয়জন—মনে নেই?' 'মনে থাকবে না কেন? আর তার জন্য ট্রেনিং-এর সময় ভুল হলেই যত বকাবকি সব আমার ওপর হত—মনে আবার নেই—মনে আবার নেই—সব মনে আছে'—রচনার উত্তর। তারপরও তো পিছু ছাড়নি—আর আমিও তো মানুষ নাকি?'—পাল্টা মুখিয়ে ওঠে রণজয়। 'তাহলে আমার শুধু একা দোষ?'—রচনা প্রশ্ন করে। দোষ নয়? আমি তখন ওড়িশয় ট্রেনিং নিচ্ছিলাম, আমার মেসে কে হাজির হল এক বস্ত্রে? আমি? কথাগুলো মনে পড়ে?' এবার রণজয়ের এই মনে পড়িয়ে দেওয়ার কথা শুনে রচনা উত্তর দেয় 'কী করব? ওদিকে বাবা হঠাৎ আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলল—আমার কী উপায় ছিল? আর তাই যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।' 'তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন? কেন তখন যে সব শর্ত ছিল ভুলে গেলে?—কথা ছিল কেউ কারো স্বাধীনতার হাত দেব না—আর এখন কী করছ?' রণজয় বলে ওঠে। একবার মনে হল উঠে গিয়ে পাশের ঘরে সোফাটাতে শুয়ে পড়ে, আবার ভাবল মাঝরাতে এটা ঠিক হবে না। তবুও উঠে বসে।

রচনা প্রশ্ন করে—'কী হল?' কোনো উত্তর দেয় না রণজয়। বিছানা থেকে নেমে জগ থেকে জল নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ঘুম আর আসে না, ভোরের দিকে রচনার ঘুম ভাঙে, দেখে তখনো জেগে আছে রণজয়, আলতো করে কপালে হাত রেখে অবাক হয়ে বলে—'এখনো ঘুমোওনি?' —'না' বলেই রণজয় ওর হাতটা কপাল থেকে সরিয়ে পাশ ফিরে শোয়। এবার রচনা নিজের ভুল বুঝতে পারে, জোর করে রণজয়ের মুখটা ঘুরিয়ে নেয়, বলে—'ঠিক আছে বাবা আমার ভুল হয়েছে। সব মনে আছে, তুমি তোমার মতো করে, শুধু আমার বিষয়টা দেখো।' 'সেটা আমি কোনোদিন দেখিনি রচনা?'—খানিকটা অভিমানের সুরে বলে ওঠে রণজয়। রচনার উত্তর 'দ্যাখো তবুও কেমন ভয় হয়।' —'ভয়ের কী আছে? সাহস রাখ, মনের মধ্যে হিম্মত রাখ, দেখবে সব হতাশা কাটবে, একদম ভেবো না,' সান্ত্বনা দেয় রণজয়। রচনা চুপ করে থাকে।

রণজয় বেশ বুঝতে পারে এ যাত্রায় রচনার কাছে জিতলেও রচনা কিন্তু এখনো সবটা মানিয়ে নিতে পারছে না—তবুও মন্দের ভালো। সারা রাত্রির ক্লান্তিতে আবেশে রণজয়ের চোখ জড়িয়ে আসে, হঠাৎই রচনার ধাক্কাতে ঘুম ভাঙে, রণজয় দেখে রচনা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধড়মড় করে উঠে বসে রণজয়, টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা দশটা। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগে রণজয়ের—এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় থাকার জন্য। চা খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে, পা-জামা পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নেয় রণজয়, রচনা প্রশ্ন করে কোথায় যাচ্ছ? রণজয় বলে 'খানিকটা বাইরে যাচ্ছি, ঘরে বসে থেকে থেকে হাতে পায়ে জং ধরে গিয়েছে। আর ভাবছি বাবলা গাছটা দেখতে কেমন, চিনে আসি, যদি কখনো দরকার পড়ে?' স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়ে রণজয়।

পিছন থেকে রচনার গলার আওয়াজ ভেসে আসে 'একটু তাড়াতাড়ি এস, না হলে আবার শরীর খারাপ হয়ে পড়বে।' —'ঠিক আছে' বলেই বেরিয়ে পড়ে রণজয়। ওরা বাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরেই জগার বাড়ি, বাইরে থেকে রণজয় হাঁক পাড়ে 'জগা বাড়ি আছিস নাকি?' জগা ঘরেই ছিল, হাট থেকে পাঁচ টাকা করে দাম দিয়ে দুটো পোলট্রি মুরগির ছাল নিয়ে এসে গরম জলে ভিজিয়ে ছাল থেকে মুরগির পালক পরিষ্কার করছিল, ছাল দুটোকে ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে পরনের গামছাতে হাত মুছতে মুছতে বার হয়ে আসে, প্রশ্ন করে 'কী ব্যাপার, ভালো আছ?' 'হ্যাঁ আছি,' রণজয় উত্তর দেয়। এবার রণজয় জগাকে জিজ্ঞাসা করে 'কী করছিলি?' 'এই মুরগির ছাল পরিষ্কার করছিলাম'—চাট বানাব, রাতে খাব।' রণজয় প্রশ্ন করে 'শুধুই ছাল না সাথে মালও থাকবে?' মাথা চুলকে জগার উত্তর 'তা থাকবে'—আমি কুটুরে আর ফুটুরে তিনজনে খানিক করে খাব।

এবার জগা পাল্টা প্রশ্ন করে 'কিন্তু তুমি হঠাৎ এদিকে কেন?' রণজয় ওকে বলে 'চল না একবার ঐ বাবলা গাছটা দেখে আসি?' জগা হাসতে হাসতে বলে 'ঐ গুয়ে বাবলা গাছটা? চল।'

ওরা হাজির হয় গুয়ে বাবলা গাছটার কাছে। গাছটা বাবলা গাছের মতই সামান্য একটু ঝাঁকালো, গাছটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে চেয়ে গাছটা ভালো ভাবে চিনে রাখার চেষ্টা করে রণজয়। এই গাছটার থেকে খানিকটা দূরে একজন চাষি তখন আলের ওপর বসে ভাত খাচ্ছিল, ওর হালের গরু দুটো অলসভাবে ঘাস চিবোচ্ছে। ঐ কৃষকের পাশে তার স্ত্রী মাথায় কাপড় দিয়ে বসে আছে। রণজয় ওদিকে এগুতেই জগা বলল, 'তুমি এখন কথা বল আমি যাই—ছালটা পড়ে আছে আমাকে ছাড়াতে হবে।' 'ঠিক আছে' বলে কুটুরের দিকে এগিয়ে চলে রণজয়। 'এই কুটুরে কী করছিলি?—কবে এলি রে?' —রণজয় প্রশ্নটা করতেই খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক গ্রাস ভাত হাতে রেখেই বলল 'পরশু এসেছি।' 'ঠিক আছে তুই খেয়ে নে' বলেই রণজয় একটু সরে এসে আবার বাবলা গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে।

খাওয়া শেষ হলে হাত মুখ ধুয়ে একটা কৌটো থেকে দুটো বিড়ি বার করে কুটুরে একটা রণজয়কে দিয়ে নিজেরটা ধরিয়ে আগুনটা রণজয়ের দিকে এগিয়ে দেয়, বিড়ি টানতে টানতে কুটুরে রণজয়কে এদিকে হঠাৎ করে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রণজয় সবটা উল্লেখ করে, জিজ্ঞাসা করে 'হ্যাঁ রে কুটুরে এই নতুন বৌটা কোথা থেকে জোগাড় করলি? আগেরটা কোথায়?' কুটুরে খানিকটা অবাক হয়ে বলল 'জানিস না ভোটে পোলিং এজেন্ট হলাম, তারপর ওরা আমার ঘর লুঠপাট করল, কাঁড়া দুটো লুঠ করে নিয়ে গেল। তোরা তো কিছু করলি না, একবার এলিও না, আর আসবিই বা কী করে? যাকগে সে কথা, সব লুঠ হল তারপর আমি তো কোনো রকমে পালালাম। বৌটাও তো ছিল না—তখন বাপের বাড়িতে ছিল। আমি ঐখানে গেলাম, অনেক করে বললাম সাথে আসতে, রাজি হল না। ঐখানে আমাদের মাঝি পাড়ার মঙ্গলা, এখানে আমার বাড়িতে আসা যাওয়া করত, আমি কী করে বুঝব ওদের ভাব ছিল? এখন ওখানেই মঙ্গলা মাঝির সাথে থাকছে, আর আসবে না, আর মঙ্গলা এবার ভোটে আমাদের বিরুদ্ধে মাঝি পাড়ার সবাইকে ভোট দেওয়া করিয়েছে। ওর এখন অনেক টাকা। একশো দিনের কাজ, ঘর আরো কত কি আমার মতন লোকের সাথে ক্যানে থাকবে? আর এলো না, শেষে এই বুড়িটাকে যোগাড় করলাম, এর কেউ নেই। ভালো করিনি?'

রণজয় মনে মনে ভাবে, আর ভালো! এই নিয়ে তিনটা হল। বিড়িটাতে একটান মেরে কুটুরের দিকে তাকিয়ে বলে—'ভালোই করেছিস, তোদের তো এসব চলে, আমাদের হলে কবে পার্টি থেকে বার করে দিত।' 'খুব দিত, আমাদের কত ক্ষমতা খুব দেখলাম' ক্ষোভের সুরে কথাটা বলেই কুটুরে আবার শুরু করে 'এই

যে আমাদের ঘর ছেড়ে পালাতে হল, কেউ এল ঢুকাতে? শেষে আমাকেই সাহসে ভর করে ঢুকতে হল নানা কায়দা করে।' 'কী রকম?' প্রশ্ন করে রণজয়। 'কী রকম আবার, শেষে আমার কাকার ছেলে ফুটুরের সাথে যোগাযোগ করলাম—তুই তো জানিস ফুটুরে ওদের পার্টি করে। এখন তো আবার বেশ দু-পয়সা কামাচ্ছে। রোজ রাতে দুটো করে সিক্সটি—দাম ধর পঁচাত্তর টাকা মানে একশো পঞ্চাশ টাকা করে ওর হাতে দেয়—আরামেই থাকে, আমি ওকে খবর পাঠালাম। ফুটুরে আসতে বলল, 'এখন সব ওর দায়িত্ব, কোনো ঝামেলা নাই—শুধু মুখে বলে দিয়েছি, ওদের পার্টিকে সমর্থন করব, আর পাড়াতে মিটিং সিটিং হলে থাকতে হবে থাকব।' রণজয় তখন আবার প্রশ্ন করে 'এটা কি ভালো করলি? তুই পার্টির একজন নেতা, তুই এমন করলে চলবে? বাকিরা তো তোর দ্যাখাদেখি ওদিকে চলে যাবে? পার্টি ভেঙে যাবে না?' উত্তর যেন কুটুরের মুখেই ছিল 'অত সহজ লয় পার্টি ভেঙে যাওয়া—আমরা কি ওদের মিটিং-এ থাকব মানে ওদের দিকে চলে গেলাম? বাপ একটাই, আর এই সুযোগে খানিক দম নিয়ে আবার যা করার তাই করব। ভিতর ভিতর সবাই আছে, এখন শুধু পেটের তাগিদে এরকম করতে বাধ্য হচ্ছে। তার মানে ভাবিস না পার্টি শেষ হয়ে গেল।' একদমে কথাগুলো বলে আবার শুরু করে—'দ্যাখ এদের তাড়াতে হবে আমরা জানি। আমাদের সরকার আবার হবে, কিন্তু এখুনি এখুনি কিছু করতে আমরা পারব না। দম ফেলার সময় দরকার—সেটার জন্য আমাদের এই কায়দাতে তোদের আপত্তি কিসের?' রণজয় বলে, 'না আপত্তি নয় তবুও নীতির দিকটা কে ভাববে?' 'অবশ্যই ভাবব, কিন্তু তুই মনে কর জলে ডুবে যাচ্ছিস তখন তোর সামনে দিয়ে মরা পুড়া কাঠ ভেসে যাচ্ছে, তুই ধরবি না? এ কেমন কথা? আমরা তো জানছি, এটা ছোটো কাজ। মাথার ছাদ, ভাত কাপড়ের জন্য যা দরকার সেই কাজও তোরা দিতে পারবি না, তা তোদের ওপর সমর্থন রেখে যদি আপাতত এরকম করে থাকি তা হলে ক্ষতি কী?' আমাদের সময় এলে, সরকার নিয়ে আসতে পারলে, আমরা সবই করব। শুধু একটু কায়দা হিসাবে এই ছাড় কিন্তু দেওয়া দরকার।'

রণজয় বেশ বুঝতে পারে এই মানুষগুলো রণনীতি অক্ষুণ্ণ রেখে নিজের মত রণকৌশল নিয়ে ফেলেছে, এখানে এখনই কোনো যুক্তি কাজ করবে না। আর জোর করেও কোনো লাভ হবে না—শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে 'দেখি তোদের কৌশল কী করতে পারে।' —'পারে মানে পারবেই, এরকম অত্যাচার কোনোদিনও টিকে থাকবে না দেখে নিবি,' —বিরাট দার্শনিকের মত কথাগুলো বলে কুটুরে রণজয়ের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে।

বলার আর কীই বা আছে? ওদিকে বেলা বয়ে যাচ্ছে, কুটুরের সাথে গল্প করতে করতে ওর হাল দেওয়ার কাজটাও বন্ধ হয়ে আছে। খামোখা কেন ওর কাজ মাটি করা! রণজয় বলে ওঠে—'ঠিক আছে তোর সাথে পরে কথা বলব, আমার সাথে কথা বলতে বলতে তোরও কাজ বন্ধ, কাজ কর, আমি চললাম।'

রণজয় ফিরতেই লক্ষ করে কখন যে ফুটুরে এসে ওদের ঐ বাবলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল বুঝতেই পারেনি। ফুটুরের দিকে নজর পড়তেই ফুটুরে হেসে বলে ওঠে—'দাদা নমস্কার।' ওর সাইকেলে একটা কাপড়ের থলিতে দুটো বোতল সাইকেলের হ্যান্ডেলে ঝুলছে, সেদিকে তাকিয়ে রণজয় জিজ্ঞাসা করে—'রাতের ইনতেজাম নাকি? জগাকে দেখলাম খুব মুরগির ছালের চচ্চড়ির জন্য ব্যস্ত।' 'হ্যাঁ গো—আজ আমরা খানিক আমেজ করব,' বলেই ফুটুরে বলে ওঠে—'কোনো উপায় ছিল না দাদা—এটা না করলে টিকতে পারতাম না। গোটা পাড়াটার সর্বনাশ হয়ে যেত, তাই বাধ্য হয়ে 'স্যালেন্ডার' করতে হল।' রণজয় পাল্টা বলে ওঠে, 'স্যালেন্ডার করার পর তো ওরা তোদিকে আমাদের বিরুদ্ধে হামলা করাবার জন্য ব্যবহার করবে, তখন কী করবি?' তৎক্ষণাৎ ফুটুরের উত্তর 'তা হবে না—সেটা আমাদের দিয়ে করাতে পারবে না।' রণজয় আবার বলে 'ঐ জন্যই তো তোকে নানা সুবিধা দিচ্ছে?' ফুটুরের উত্তর 'কোনো সুবিধা নয়—কাজ করছি বেতন নিচ্ছি, আর হ্যাঁ জব-ওয়ার্কারদের কাজ দিয়েছে বটে তাতে খানিক দু-নম্বরি করতে হচ্ছে, সেটাতো তোমাদের ঐ পিরু ঠাকুর যখন ছিল ও তো করত—কতবার বলেছি তোমরা শুনছে? বলতে প্রমাণ চাই। এখন ভোটের আগেই পিরু কেমন পাল্টি মারল? প্রমাণ হল তো? আমরা তো তা করিনি পেটের দায়ে বাঁচবার জন্য, ওদের শুধু মুখে বলেছি যে হ্যাঁ তোমাদের সাথে থাকব—এর বেশি তো কিছু অন্যায় করিনি।' রণজয় প্রশ্ন করে 'তাহলে তোরা অন্যায় করেছিস বুঝছিস তো।' কুটুরে ফুটুরে দু-জনেই একসাথে বলে—'বুঝব না ক্যানে ভালোই বুঝছি—কিন্তু আমাদের তো কিছুই নাই, তোমাদের তাও কিছু আছে। ঘরে চাকরি বাকরি আছে, কাজ করার জায়গাটা আছে আমাদের তো খুব খারাপ অবস্থা, যেখানে যাচ্ছি বলছে তোদের কাজ হবে না—বন্ধ, কী করব? মরে যাব? এই কথাটা বুঝছ না?' 'ঠিক কথা', ফুটুরে আবার বলে, 'আমাদের বুকের ভেতরটা যদি দেখাতে পারতাম তা হলে বুঝতে ভিতরটা কেমন জ্বলছে, ঐ হারামিগুলোর দয়াতে বেঁচে থাকতে হচ্ছে, এটা কি কম লজ্জার—সব শোধ আমরা তুলব, শুধু একটু দম নিতে দাও, দেখ আমরা বেইমানি করব না। লেখা পড়া বেশি বুঝি না, কিন্তু এটা জানি, ওরা মালিকদের দালাল, আমাদের বন্ধু নয়।'

কুটুরে রণজয়কে জিজ্ঞাসা করে 'বাড়ি যাবে না, বেলা তো একটারও বেশি হল?' চমকে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে রণজয়, ফিরবার উপক্রম করতেই পিছন থেকে ফুটুরে বলে ওঠে, 'এই রে, কী হবে কে জানে, দাদা ঐ দ্যাখ দালালটা এদিকেই আসছে।'

দালালটা কে বুঝতে পারে না রণজয়। ভালো করে দেখতে চেষ্টা করে, এবার পিরু ঠাকুরকে এদিকে আসতে দেখে ওকে উদ্দেশ্য করেই একথা বলা হল তা বেশ বুঝতে পারে রণজয়। ততক্ষণে পিরু ঠাকুর ওদের কাছে চলে এসেছে, এসেই কুটুরে আর ফুটুরের দিকে চোখ পাকিয়ে বলে ওঠে—'এই শালা তোরা এর সাথে কী করছিস? বলেছিলাম না আমাদের পার্টিতে বেইমানি চলে না। আবার লালঝাণ্ডার সাথে যোগাযোগ? ভাবছিস বুঝতে পারব না? —তোরা অনেকক্ষণ ধরে কার সাথে কথা বলছিস সেটা খবর পেয়েছি, কিন্তু কার সাথে বলছিলি জানতে পারছিলাম না, তাই নিজে এলাম দেখতে।' কুটুরে কী যেন বলার চেষ্টা করে, 'চোপ শালা' —বলেই থামিয়ে আবার পিরু ঠাকুর রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কুটুরের দিকে তাকিয়ে তাকে মারতে এগিয়ে যায়—কুটুরে হুড়মুড় করে কাদা ধান জমিতে নেমে পড়ে, এদিকে জমিতে নামলে পায়ে কাদা লাগবে, সবুজ পাঞ্জাবি সাদা পাজামা, চটি নষ্ট হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় জমির আলে দাঁড়িয়ে থেকে পিরু ঠাকুর ফুটুরের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে, 'তোকে বলেছিলাম না, এই কুটুরেটা একটা কালসাপ। এই শালাকে ঢুকতে দিবি না, তুই তো বললি যে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে, পাড়া থেকে লালের নাম নিশানা মুছে গিয়েছে—আবার লুকিয়ে লুকিয়ে মাঠে

ঘাটে পার্টি করার চেষ্টা করছিস? তোরা শালা ডালে ডালে হাঁটিস তো আমিও পাতার শিরায় শিরায় হাঁটি।'

ফুটুরে বলে ওঠে—'তুমি শান্ত হও দাদা, আমরা লই, এই রণজয় দাদাই এখানে আজ হঠাৎ করে কুটুরের কাছে চলে এসেছে। আরে আমি তো দুটো মাল আনতে গিয়েছিলাম, রাতে পাড়াতে বসব বলে'—এই দ্যাখ বলেই খলিতে সিক্সটির বোতল দুটো দেখিয়ে আবার বলতে শুরু করে—'মাল নিয়ে যখন দাদার কাছে আসছি তখন দেখছি আমার সামান্য আগে এই জমির ঐ গুয়ে বাবলাটার পাশ দিয়ে রণজয়দা আসছিল, পুরোনো লোক দু-চার কথা হতে হতে সামনে কুটুরেকে দেখে এই জমি চাষ, ধান-বীজ এ সব নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

পিরু আরো রেগে যায় বলে, 'মিথ্যা বলছিস।' —কুটুরে কাদাতে দাঁড়িয়ে আবার বলে 'বিশ্বাস কর এই হাল-বলদের দিব্যি, তুমি বামুন মানুষ তোমার দিব্যি। আমরা তো বললাম রণজয়দাকে—তুমি বাবু ইদিকে আর আসিও না, এখনই পাড়ার সবই লালপার্টি ছেড়ে দিয়েছে, আমরা এখন সবাই পিরুর দলে, আমাদের একশো দিনের কাজ ফাজ সবই ওই ঠিক করে দিয়েছে, বড় ভালো পিরু ঠাকুরদাদা।' —নিজের সুনাম শুনেই হোক বা অন্য কারণেই হোক এবার পিরু খানিকটা নরম হয়। কুটুরেকে জমি থেকে উঠে আসতে বলে। বাধ্য ছেলের মত কুটুরে উঠে আসে। প্রচণ্ড ধমকে পিরু রণজয়কে দেখিয়ে বলে, 'আর ওদের সাথে কোনো যোগাযোগ রাখবি না—তা হলে খুব খারাপ হবে।'

পাশে দাঁড়িয়ে রণজয় সব শুনছিল। 'কেমন আছিস পিরু?' —কথাটা হেসে পিরুকে বলার চেষ্টা করতেই পিরু বলে ওঠে, 'থাক আর বন্ধুত্ব করতে হবে না—আপনি এদিকে আসবেন না। পুরোনো পরিচিত মানুষ, এক সাথে কাজ করেছি, তার ওপরে এক সময়ের পার্টি কমরেড বলে কিছু বললাম না—সম্মান নিয়ে ফিরে যান।'

রণজয়কে কোনো কথা বলতে না দিয়েই কাকে যেন ফোন করে ডাকতে থাকে পিরু। রণজয়ের আর কী করার ছিল? আস্তে আস্তে ঐ গুয়ে বাবলা গাছটার দিকে এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যেই একটা ছেলে মোটর সাইকেল নিয়ে এসেই ও গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। পিরু ওকে হাঁকিয়ে বলে—'একে একটু ছেড়ে দিয়ে আয়—আর যাবার সময় আমাদের ঝাণ্ডাটা ঠিক করে বেঁধে দিয়ে যাবি।' ছেলেটাকে মোটর সাইকেল নিয়ে গাছটার কাছে দাঁড়াতে দেখেই রণজয় বলে ওঠে—'ওকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।' 'না, ওই আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসবে' —পিরু আবার কঠোর কণ্ঠে বলে ওঠে। এবারও রাজি হয় না রণজয়। মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদের চেষ্টা করে। কিন্তু পিরু গাছটার দিকে এগিয়ে এসে হুকুমের সুরে—'উঠুন, উঠুন,' বলে রণজয়কে ছেলেটার মোটর সাইকেলে চাপতে বাধ্য করে।

পিছন ফিরে রণজয় দেখ কুটুরে ফুটুরে আর কুটুরের ঐ নতুন ঘরণী অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ওদের যাওয়া দেখছে। মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দিয়েই ছেলেটা মনে মনে বলে ওঠে—'শালা বাঞ্চো...।' রণজয় প্রশ্ন করে 'আমাকে বললে ভাই?' ছেলেটির উত্তর 'না না আপনাকে নয়, ঐ শালা পিরু ঠাকুরকে। এক নম্বরের বেইমান। কী করবেন, চলুন, দেখবেন আমরাই ওদের জব্দ করব, চলুন।' মোটর সাইকেল এগিয়ে চলে। বেশ খানিকটা এগিয়ে কুটুরেদের পাড়ার সামনে একটা বাঁশে টাঙানো ঝাণ্ডাটার থেকে একটু সরে রণজয়কে একটা গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে বলে—'একটু দাঁড়ান ঝাণ্ডাটা ভালো করে বেঁধে দিয়ে আসি—ওটা ঠিক করতে হুকুম হল।' রণজয় গাছতলায় নেমে পড়ে, দ্যাখে ঐ ঝাণ্ডাটার থেকে খানিক দূরে একটা লাল পতাকা উড়ছে—তবে বেশ খানিকটা নেমে গিয়েছে। ছেলেটা পতাকাটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, আবার এগিয়ে যায় পিরুদের ঝাণ্ডার দিকে ভালো করে বেঁধে ঠিক করে দেয়। এবার আবার ছেলেটার কী মনে হল কে জানে? লাল পতাকাটার দিকেও এগিয়ে গিয়ে ওটাও সোজা করে ঠিক করে দেয়। কাণ্ড কারখানা বুঝতে পারে না রণজয়। ছেলেটি এগিয়ে আসে রণজয়কে বলে 'চাপুন।' রণজয় মোটর সাইকেলে চেপে বসে। মোটর সাইকেলে এগিয়ে চলছে, লুকিং গ্লাস দিয়ে ছেড়ে আসা পিছন দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া কোথা থেকে এসে পাশের সারগাদার ছাই, খড়কুটো, উড়িয়ে ওদের শরীরটা ঢেকে দিল, মোটর সাইকেলে বসে বসেই প্রথমে ছেলেটার গায়ের ময়লা, তারপর নিজের ময়লা পরিষ্কার করতে করতে লুকিং গ্লাস দিয়ে পিছনে তাকিয়ে দ্যাখে, হাওয়ার দাপটে পিরুদের ঝাণ্ডাটা সরসর করে পড়ে গিয়ে বেশ খানিকটা দূরে উড়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল, লালটা তখনও সোজা হয়ে পত-পত করে উড়ছে।'

'এই যা', বলে উঠল রণজয়। ছেলেটি বলে উঠল—'কী হল?' তোমাদের ঝাণ্ডাটা যে হাওয়ায় খুলে কোথায় উড়ে গেল? —আমি দাঁড়াচ্ছি তুমি গিয়ে দেখে এসো কী হল?।

মোটর সাইকেল চালাতে চালাতেই ছেলেটি বলল, 'ছাড়ুন তো এইসব, ও শালা পিরু ঠাকুর বুঝবে, আমি তো ঠিক করে দিয়ে এসেছি, এখন উড়ে গেল না কী হল আমি কী করে বুঝব?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি মোটর সাইকেল নিয়ে রণজয়ের বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে বলল—'এই তো চলে এসেছি, নামুন।' নেমেই রণজয় ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে 'ভাই তোমার নাম কী? কী কর?' ছেলেটি হেসে উত্তর দেয়—'বাবলা, ঐ পাড়াতেই থাকি, এখন আমি কলেজে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ি, ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—আজকে তো ছুটির দিন বাড়িতে আছি। আর যেদিন বাড়িতে থাকি সেদিন বিকেলে তো আমরা সব বন্ধুরা ঐ বাবলা গাছটা, যেখানে থেকে আপনাকে আমার গাড়িতে চাপালাম, ওখানেই আড্ডা মারি। এদিকের পার্টির লোকজন তো ওখানেই আমাদের সাথে বসা ওঠা আলোচনা সবই করে, যতটা পারি সাহায্যও করি। দেখবেন ঐ ব্যাটা বেইমান পিরু ঠাকুরদের দলবলকে শেষ করার ব্যবস্থা আমরাই করবো।'

আর কোনো কথা না বলে শুধু 'চলি' বলেই জোরে মোটরসাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাবলা। খানিকক্ষণ ঐদিকেই তাকিয়ে থাকে রণজয়, মনে মনে ভাবে তাহলে সবই ঠিক আছে কিছুই ফুরোয়নি।

With best compliments of

M/s. Bengal Construction & Co.

T.C. Road, Chaulpatti
P.O. Tarakeswar, Hooghly, PIN : 712410

Sl. No. 18

With best compliments of

M/s. DEEP ASSOCIATES

(CONTRACTORS)

Shankar Plaza, 2nd Floor, S.P. Mukherjee Road
Murgasol, Asansol, PIN : 713303

Sl. No. 50

সাদা কাপড়

কাকলি ঘোষ

১.

—এ মিতুয়া যাবি? আজ লাটমন্দিরে পুজো চড়ানো হয়েছে। যাবি?

—তুই থাম সূরজ। আমাদের মন্দিরে ঢুকতে দেবে? পাশ দিয়ে গেলে পূজারিগুলো তাড়া করে।

—আরে এখন দুপুর বেলা। পূজারিরা ঘরে দুয়ার এঁটে ঘুমোচ্ছে।

—তা দুপুরে কী পাবি?

—ঠাকুরের ভোগ তো পাব। চল চল। দু-দিন কলের জল খেয়ে আছি। মা লাইনে যেতে পারেনি। মায়ের বুখার। মাকেও পেরসাদ দোব।

মিতুয়া, সূরজ ওদের ছেঁড়া প্যান্টটা একটু কোমর পর্যন্ত টেনে নেয়। কুয়োর জলে পা ধুয়ে নেয়। তারপর পা টিপে টিপে ঠাকুর সিং-এর নাটমন্দিরের দিকে এগোয়। ঠাকুর সিং-এর তুলোট করে প্রতিষ্ঠা করা এই নারায়ণ মন্দির। দুবেলা ভোগ হয়। ভোগের প্রসাদও দেওয়া হয়। কিন্তু তার নাগাল মিতুয়ারা পায় না। ওরা যে অচ্ছুত। ওদের মন্দিরে পা দেওয়া মানা।

মন্দিরের কাছে এসে মিতুয়ার বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করে। যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে চামড়া তুলে নেবে।

—সূরজ, চল ফিরে যাই—মিতুয়া বলে।

—চাপ যা। পেরসাদ নিয়েই ফিরব। মা বলে দু-দিন কিছু খায়নি। চল চল আস্তে আস্তে এগোই।

নিঝুম মন্দির। মন্দিরের পিছনের বেল গাছটায় একটা কাক ডেকেই চলেছে। গ্রীষ্মের জ্বলন্ত দুপুর ওদের পেটের মতোই খিদেয় হাঁ হাঁ করছে। মিতুয়া খুব আস্তে মন্দিরের ভেজানো দরজাটা খোলে। মিতুয়া আর ধৈর্য ধরতে পারে না। খিচুড়ির গামলায় হাত ডুবিয়ে মুঠি ভরে যতটা পায় হাম হাম করে খেতে থকে। সূরজ একটা প্যাকেটে খানিকটা ভরে নিতে যায়। হঠাৎ হাত লেগে পিলসুজটা পড়ে যায়। আওয়াজ শুনে ওপাশের পুরোহিতের ঘর থেকে কে যেন সাড়া দেয়—কে রে? ঠাকুর দালানে কে?

ভয় পেয়ে সূরজ, মিতুয়া ছুটে পালাতে গিয়ে চৌকাঠে পা লেগে পড়ে যায়।

পুরোহিত দরজা খুলে বেরিয়ে আসে—হায় রাম! ঠাকুরের প্রসাদ চুরি! হায় হায় চাঁড়াল এসে ঠাকুরের ভোগ ধরলে। অপবিত্র করে দিলে মন্দির। ধর ধর, গু-খেকোর ব্যাটাদের।

পুরোহিতের চিৎকারে ভেতরবাড়ির লোকজন বেরিয়ে আসে। চারিদিকে মার মার রব...

মন্দিরে সন্ধে দেবার সময় হল। মা ঠাকরুণ এসে বাছাদুটোর কাছে দাঁড়ায়—কে জানে কার কোল খালি হল। পরনের একটা সাদা কাপড় এনে ওদের ঢেকে দেয়।

২.

—মা, তাড়াতাড়ি ভাত দাও। ইস্কুলে দেরি হয়ে যাবে।

—এই যে মা, ভাত বাড়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। রুনু সাইকেল নিয়ে বেরোতে বেরোতে মাকে বলে—

মা, আজ শ্রাবণীদের বাড়ি যাব। ফিরতে একটু দেরি হবে।

—তাড়াতাড়ি ফিরিস। আলো থাকতে থাকতে বাড়ি চলে আসিস মা। দিনকাল খুব খারাপ।

রুনু চলে গেলে সুলতা সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে নেয়। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল সুলতা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। পাঁচটা বেজে গেছে। এত ঘুমিয়ে গেছে ও। কিন্তু এখনো তো রুনু ফিরল না। মনের মধ্যে চিন্তা এসে দানা বাঁধে। একবার ঘর একবার বার করে সুলতা। সাড়ে ছটা বেজে গেল। এখনো এল না। ওর বাবাও নেই। দোকান থেকে ফিরতে ফিরতে সাড়ে নটা বেজে যাবে। সুলতা অস্থির হয়ে যায়। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পাশের বলরামদের বাড়ি যায়।

—বলরাম, দেখো তো মেয়েটা এখনও ফিরল না। ফোন করছি, উত্তর আসছে সুইচ্‌ড অফ। কী করি বলতো?

—দাদাকে খবর দিয়েছেন বৌদি?

—তোমার দাদাকে ফোন করলাম তো দুবার। রিং হয়ে গেল। দেখি আর একবার।

—যাক আর ফোন করতে হবে না। আমি দেখছি।

সারা রাত ধরে রুনুকে খোঁজা হল। ভোরবেলায় কুসুমপিসি মাঠে শাক তুলতে গিয়ে রুনুকে দেখতে পায়—ছুটে আসে বাড়িতে।

—ও সুলতা একখান কাপড় দে-মা, কাপড় দে। হায় ভগবান। এ কী হল! মানুষগুলো সব হায়না হয়ে গেছে। এ কী দিন এল! ওইটুকু দুধের মেয়ে একটুও মায়া হল না!

রুনু শুয়ে আছে ক্যানেলের ধারে। চিরঘুমে। অনেক যন্ত্রণার পরে। তাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে সাদা কাপড়ে।

৩.

ফটফটে জ্যোৎস্নায় সারা মাঠ ভেসে যাচ্ছে। অনন্ত মাঠ পেরিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে। এতক্ষণে কীর্তন নিশ্চয়ই শুরু হয়ে গেছে। কীর্তন শোনা অনন্তর এক নেশা। টিভিতে সা-রে-গা-মা-পা'তে কীর্তন হচ্ছিল। তাই ক-দিন মন দিয়ে দেখছিল। আজ চৌধুরী বাড়ির কীর্তনের আসরটা আর ছাড়তে চায় না অনন্ত। দ্রুত পা চালায়।

গানের সুরে মোহিত হয়ে যায় অনন্ত। বড় কৌতূহল হয়। কে গাইছে? এ গানটা তো আগে শোনেনি। অনন্ত দরদালানের সামনে এসে যায়। এ কে? অদ্ভুত বেশ। সাদা লুঙ্গি, সাদা ফতুয়া, মাথায় পাগড়ি। একমুখ দাড়ি আর হাতে খঞ্জনি। বাউল গান সবাই গায়। কিন্তু কীর্তন এক মুসলমান ভাইয়ের গলায় শুনছে ভেবে একটু থমকে যায় অনন্ত। তারপর ভাবে গান তো হৃদয়ের, ধর্মের নয়। গান শুনতে শুনতে মোহিত হয়ে গেছিল অনন্ত। হঠাৎ

পিঠে খোঁচা খেয়ে চমকে তাকায়। তারিণীখুড়ো—

—আর চৌধুরীরা একেবারে মেলেচ্ছ হয়ে গেল। ছ্যা ছ্যা! কীর্তন গাইছে মুসলমানের বেটা?

—ছিঃ খুড়ো। গান গানই। গানের কোনো জাত নেই। গায়কেরও তেমনি কোনো জাত নেই। যে গান গায় সে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়েই গায়। তার দুনিয়ায় কাওয়ালি—কীর্তন সবই এক।

—রাখো তোমার আশীর্বাদ। জাতধম্মো আর কিছু রইল না। আমার এই আশি বছরের জীবনে এই প্রথম এমন কাণ্ড দেখলুম।

নেপথ্যে আর একটি ঘটনা দানা বাঁধতে থাকে। তারিণীঘুড়োর নাতনি নীরার বুকে দুধ নেই। বাচ্চাটা খিদের জ্বালায় দিনরাত কাঁদে।

—ওঃ বাচ্চাটাকে একটু চুপ করাও না। তারিণীখুড়ো গিন্নিকে ধমক দেয়।

—পেটে খিদে থাকলে চেঁচাবে না। তুমি বসে থাক। আমি দেখি কী করতে পারি।

সন্ধের আলোছায়ায় খুড়িমা ঠুক ঠুক করে এগোয়। আসমানির বাড়ির কাছে এসে হাঁক দেয়—আসমানি—ও আসমানি—

—কী হল খুড়িমা?

—মা তোর কাছে একটা জিনিস চাইতে এসেছি মা। আমাকে ফেরাস না।

—আমি ঘুঁটেকুড়ানি। আমি আপনাকে কী আর দিতে পারি খুড়িমা।

—তোর বুকের দুধ মা। নীরার বুকে দুধ নেই। কৌটোর দুধ খাওয়াতে ডাক্তার নিষেধ করেছে। তোর ছেলেটা তো ছোটো। তোর বুকে দুধ আছে। আমার নীরার বাচ্চাকে বাঁচা মা।

—কিন্তু খুড়িমা, ছেলেটার আব্বার ইন্তেকালের পর আমি তো রাতবিরেতে কোথাও আর যাইনে।

—আমি তোকে নিয়ে যাব। এই নে এই সাদা শাড়িখান পরে নে।

দুজনে যখন বাড়ি ঢোকে তখনও বাচ্চাটা কাঁদছে। তারিণীখুড়ো বারান্দায় বসে হুঁকো খাচ্ছেন। এ নেশাটা বাড়ির সাবেককালের জিনিসের মতো সযত্নে রক্ষা করে আসছে তারিণীখুড়ো।

ওদের দেখে চেঁচায়—ও গিন্নি, কোথায় গেছিলে? সঙ্গে করে কাকে নিয়ে এলে?

—কাকে আবার? তোমার পুতির দুধ-মাকে।

আসমানি শাড়ির আঁচল টেনে নীরার ঘরে ঢুকে যায়। সাদা কাপড়ের আশ্রয় সবাকে নিতে হয়। শুধু তফাতটা সান্ত্বনার আর বাঁচার।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মণিকাঞ্চন হাজরা

কন্ট্রাকটর এবং জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার

Sl. No. 44

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দে পেপার অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন সেন্টার

এখানে যাবতীয় স্কুল, অফিসের স্টেশনারি দ্রব্য ও উপহার সামগ্রী পাইকারি ও খুচরা ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়।

সাতগাছিয়া রোড, কালনা রোড, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৩৩৩১৫৫০৮৮, ফোন : (০৩৪২) ২৭০০৬০৫

Sl. No. 33

গ্লোরিয়াস রিট্রিট

শিবানন্দ পাল

মদনদা বললেন, আজ তোদের একটা মজার গল্প বলব। গল্প ঠিক নয়। আমার পূর্বপুরুষের জীবনের ঘটনা।

আমরা হৈ হৈ করে বললাম, বলো। এখনি বলো। এখনই আমরা শুনতে চাই। মদনদা খুব ভালো গল্প বলতে পারেন। সত্য-মিথ্যা জানি না, সে-সব কাহিনি শুনতে আমাদের খুবই ভালো লাগে।

মদনদা বলতে শুরু করলেন—সে প্রায় দেড়শো বছরের আগের কাহিনি। কিংবা আরও বেশি হতে পারে, হিসেব কষিনি! আমাদের গাঁয়ের হরি মল্লিকের বাড়ির সামনে বাস ছিল পচা স্যাকরার। হরি মল্লিককে চিনিস তো? পল্লিকবি কুমুদরঞ্জনের জ্ঞাতি। যাই হোক, পচা জাতিতে বাগদি। কোথা থেকে স্যাকরার কাজ শিখেছিল কে জানে! পয়সা হওয়ায় বদ্যিপাড়ায় বাড়ি করেছিল। বাড়িতে সোনা-চাঁদির দোকান। গ্রামের মধ্যবিত্ত মানুষ মেয়ের বিয়ে দিতে সোনা-রুপোর গয়না তৈরি করতে তার দ্বারস্থ হত। পচা স্যাকরার আবার বন্ধকি কারবারও ছিল। সোনা-রুপোর গয়না বন্ধক রেখে সে লোককে টাকা ধার দিত। এসব নিয়ে গাঁয়ে খুব মনোমালিন্য হয়, এমনই কোনো ঘটনায় পচা স্যাকরা গ্রামে একঘরে হয়েছিল।

ধনী পচা স্যাকরা বদ্যিপাড়ায় বাড়ি করে যেমন বাগদিদের বিষ নজরে পড়েছিল, তেমনি বদ্যিদেরও আপন হতে পারেনি। গ্রামে একঘরে হয়ে তার ব্যবসা প্রায় ডুবতে বসেছিল। গ্রামে আরও দু-চারজন স্যাকরার বাসও অবশ্য ছিল। এমন সময় পচার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। তার মা স্বর্গবাসী হলেন। কিন্তু তাঁর দেহটাকে তো শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। সে ব্যবস্থার এবার কী হবে? জ্ঞাতি এবং জাতভাইয়েরা তো পচাকে একঘরে করে রেখেছে। অন্যেরা তো কেউ তার মায়ের মৃতদেহ ছোঁবে না। স্যাকরা হলেও জাতে সে বাগদি। নিচু জাত।

অগত্যা কী করা যায়! খেজুর পাতার পাটি দিয়ে পচা মা-র দেহটাকে একটা বাঁশে কলার ছোতোর দিয়ে পিঠমোড়া করে বাঁধল। তারপর বাঁশের এক প্রান্ত ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল গ্রামের এক প্রান্তে শুয়োরবাঁধি বিলের ধারে বাগদিদের শ্মশানঘাটের দিকে। মৃত মায়ের সৎকার তো করতে হবে। সমাজের বিধান না মানলে চলে!

জ্যৈষ্ঠ মাসের পড়ন্তবেলা। হাড়

মড়মড়ে, শিঁয়াকুল আর বৈঁচির কাঁটা সরিয়ে সরিয়ে পথ করে হৈ হৈ করে জঙ্গলে চলছিল একদল ছেলে। লক্ষ্য তাদের সামনের কালী বাঁড়ুজ্যের কাঁচা মিঠে আমের বাগান। সবাই সম্ভ্রান্ত কুলিন কায়স্থ, বামুন বংশের সন্তান। গণেশ, কার্তিক, নিশি, গৌর, ব্রজ, পুঁটি আর আমাদের নাড়ুগোপাল। সবার সামনে সর্দার বীরু। বীরুর চোখেই পড়ল ওই হৃদয়বিদারক দৃশ্য।

—কী ব্যাপার? জানতে চাইল বীরু।

বীরুকে সামনে পেয়ে, পচা যেন হাতে স্বর্গ পেল। মায়ের মৃতদেহ টানতে টানতে পরিশ্রান্ত পচা সামনে দেখতে পেল সংকটতারণ হয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন তার সামনে উপস্থিত। গাঁয়ের কেষ্টযাত্রায় বীরু কৃষ্ণ সাজত। মানাত খুব। বডিবিল্ডার ছিল। তেমনি তার গায়ের রঙ। অন্ধকারে মিশকালো। সেই বীরুর চরণে আন্তরিক ঢঙে পচা সব কথা নিবেদন করল এবং শেষে কান্নায় ভেঙে পড়ল। মা-র মৃতদেহ সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে যেন সে নিজেরও সৎকার চেয়ে আকুতি জানাল—'হে ধরণী দ্বিধা হও!'

সর্দার পোড়োর হুকুম হল—এ মড়ার সৎকার আমরাই করব বুঝলি!

যেমন কথা তেমনি কাজ। কালী বাঁড়ুজ্যের বাগানের কাঁচামিঠে আমের কথা ভুলে গেল সকলে। সবার জন্য আনা হল নতুন গামছা। তৈরি হল কাঁচা বাঁশের নতুন মাচা। 'বলো হরি, হরিবোল! পচা-র মা মরেছে কাঁধে তোল!' ধ্বনি তুলে অবলীলায় ছেলের দল কাঁধে তুলে নিল বাগদি মায়ের নশ্বর দেহটাকে। মরার মাচা কাঁধের ওপর যত দোলে, হরিবোল তত তীব্র হয়। শিহরণ জাগানো এই অভাবনীয় দৃশ্য হাটতলায় বিশাল বটবৃক্ষের নিচে বসে থাকা তৎকালীন গ্রামের সমাজপতিরা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আস্পর্ধা তো কম নয়! তাদের হাতের গড়গড়ার নল খসে পড়ল, হুঁকোর আগুন নিভে গেল।

—হায় হায় এ কী হল! এ যে ঘোর কলিকাল এল!

—কুলিন সন্তানদের ঘাড়ে কিনা হাড়িবাগদির মড়া! এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না!

—কিন্তু সবাই যে বড় ঘরের ছেলে ছোকরা!—অন্য জনের উক্তি।

—হলই বা বড়ঘরের! তা বলে কি শাস্ত্র থাকবে না! পিতৃপুরুষের ধর্ম রসাতলে যাবে?

—উৎসন্নে যাবে সব! এ হচ্ছে ঘোর কলি! ফোড়ন দিলেন অন্যজন।

হাটতলার ভিড় জমে ক্ষীর হয়েছে। জমজমাট ভিড়ে সকলে সমাজপতিদের নিদান শুনল—ওদের প্রায়শ্চিত্ত করাতেই হবে! না হলে একঘরে করা হবে।

হ্যাঁ। গ্রামের সমাজকুলপতি কাশীর টোলের পণ্ডিত ন্যায়রত্ন শ্রীব্রজকিশোর ভট্টাচার্য এবং বাচস্পতি শ্রীযুক্ত শ্রীল বাবু আশুতোষ চক্রবর্তী মহাশয়ের এই হল নিদান।

মড়া পুড়িয়ে ঘরের ছেলেরা সব ঘরে ফিরল। তার আগেই ঘরে ঘরে এই নিয়ে অশান্তি ঘনিয়ে উঠেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে গুজগুজ ফিসফিস কানাকানি শুরু হল। কী হবে? কী হবে এবার?

হুকুম তো হল! কিন্তু হুকুম মানছে কে? গ্রামের সব থেকে বড় পুকুর ঈশরে, তার উত্তর পাড়ে বিশাল এক তেঁতুল গাছ। তাতে নাকি শাঁকচুন্নির দেখা মেলে। সেই তেঁতুল গাছের তলায় বিদ্রোহী ছেলেদের সভা বসল।

—আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি। তাই প্রায়শ্চিত্ত করব না!

ছেলেদের সাহায্যে গোপনে এগিয়ে এলেন আর একজন। স্নান সেরে শিবমন্দিরে জল ঢেলে তুলসি মঞ্চে জল দিয়ে ছেলেদের সামনে হাজির হলেন। বললেন, চালিয়ে যা ভায়া। ভয় পাবি না মোটে। কোমর কষে বসে থাক! দেখছি কী করা যায়!

ছেলের দল হতবাক! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল! সমাজকুলপতি শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ অধিকারী। বিধুখুড়ো তাদের দলে! মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে বেগম সাহেবার নানির নিজের হাতে তৈরি করা পান খেয়েছেন এই বিধুখুড়ো! স্বয়ং নবাবের পরে একমাত্র যার খাওয়ার অধিকার! এ তল্লাটে আর এমন আছে কৈ! চলল দু-পক্ষের জোর লড়াই। টান টান উত্তেজনা। কেউই তাদের নিজের নিজের অবস্থান থেকে এক চুল সরতে রাজি নয়। একেবারে ধনুকভাঙা পণ সকলের।

এইভাবে জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় গেল। কেটে গেল শ্রাবণ-ভাদ্র মাসও। এলো আশ্বিন। চারদিকে শরতের হাতছানি। নীল আকাশে ভেসে এসেছে সাদা মেঘের ভেলা। শিউলি সকালে মেয়েদের ফুলকুড়োনোর দৌড় শুরু হল। বোসবাড়িতে দুর্গা প্রতিমায় রঙ চড়েছে। ডাকের সাজ উঠবে! পুজোর যোগানদার ওই বাগদি মায়ের সৎকার করা নিশিকান্ত। নিশিরা বোসবাড়ির গোমস্তা। কিন্তু নিশি একঘরে। প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

—নিশির জোগাড়ে মায়ের পুজো হবে না! হাঁক ছাড়লেন বোসবাড়ির কুলপুরোহিত আশু চক্কোত্তি।

—হবে না মানে!

—হবে না!

বিচার গিয়ে পৌঁছালো জমিদারের কাছারিবাড়িতে। নতুন জমিদার ক-দিন আগে মাত্র উনিশ বছর বয়সে জমিদারির দায়িত্ব নিয়েছেন। নায়েব কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, ছেলেমানুষ! ও আবার কী জমিদারি সামলাবে! সেদিনের ছোঁড়া! দুগ্ধপোষ্য শিশু! গাল টিপলে এখনো দুধ বেরোবে!

কিন্তু জমিদার যে সে নন! এ জমিদারের একান্ত ইচ্ছে, অসাধারণ সুন্দর একটা কলেজ তৈরি করতে হবে। আনন্দ-ফুর্তি-বিলাসব্যসন নয়, সেই কলেজে পড়ানো হবে ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যা। না, কলকাতায় নয়! কলকাতা থেকে অনেক দূরে ভাগীরথী তীরে মুর্শিদাবাদে স্থাপিত হবে সেই কলেজ। নব-জাগরণের তীব্র স্পন্দন তাঁর বুকের মধ্যে রিনিরিনি সুরে অহরহ ধ্বনিত হয়। তাই অন্য জমিদারদের মতো ফুর্তির গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে নয়, তিনি কলকাতায় ছুটে গেছেন ডেভিড হেয়ারের স্মরণসভার আয়োজন করতে। তিনি ওই স্মরণসভার অন্যতম আহ্বায়ক।

—মহাত্মা ডেভিড হেয়ার? পলটু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল।

মদনদা বললেন, হ্যাঁ। এদেশে আধুনিক শিক্ষার জনক মহামতি ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়েছে ১৮৪২ সালের ১ জুন। আজ থেকে ১৭৪ বছর আগের এই কাহিনি। ডেভিড হেয়ার জন্মেছিলেন স্কটল্যান্ডে ১৭৭৫ সালে। বলতে পারিস তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত আমার এই কাহিনি।

—বাঃ! বেশ! তারপর কী হল?

মদনদা ফের শুরু করলেন। বললেন, সব উপাখ্যান শুনে জমিদার হুকুম দিলেন, পুরোহিত বদল হবে! পুজোর যোগানদার একই থাকবে!

কাছারিতে যেন বজ্রপাত ঘটল! এ কী কথা? এ তো মহা সর্বনাশ! ঘোর কলি! ঘোর কলি! আশু চক্কোত্তির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। পুজোর প্রাপ্তি পাওনা-গণ্ডা সব মিলিয়ে তা প্রায় মাস ছয়েকের সংস্থান! সব হাতছাড়া হয়ে যাবে! মা গো! তুমি জগজ্জননী মা, উদ্ধার কর! চক্কোত্তি সুর নরম করে বললেন, ছেলেদের একটু বিশুদ্ধ গোবর ভক্ষণ করালেই হবে!

সব ছেলের এক রা! শুদ্ধ বা অশুদ্ধ কোনো গোবরই আমরা ভক্ষণ করব না। তাতে যা হবার হবে!

মহালয়া পার হয়ে গেছে। দুদিন বাদে ষষ্ঠী। ঘট আনা হবে। দেবীর আবাহন। ঢাকে কাঠি পড়তে শুরু করেছে—ঢ্যাম কুড়কুড় কড়াৎ!

অগত্যা সুর আরও নরম করে চক্কোত্তি আবদার করলেন, তাহলে অন্তত সবাই একটু গঙ্গাজল সেবন করে মন্ত্রপাঠ করে নিক! তাহলেই ল্যাটা চুকে যাবে!

অবাধ্য ছেলেরা তাতেও রাজি নয়।

বাচস্পতির মাথায় হাত। কঁকিয়ে উঠলেন শেষে—তাহলে অন্তত অন্যায় করেছি, ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করব না, মায়ের সামনে নিচু হয়ে কথাটা একবার বল সবাই!

ছেলেদের উত্তর—না। তাও বলব না! আমরা কোনো অন্যায় করিনি।

—তাও বলবি না? তবে রে!... অভ্যাসবশত অভিশাপ দেবেন বলে পৈতে হাতে নিয়ে ফেলেছিলেন! কিন্তু থেমে গেলেন। হিসেবি চক্কোত্তির মনে পড়ে গেল শাস্ত্রবচন—'বিপৎকাল সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ'। মনে মনে সেটা আউড়ে উপস্থিত সকলের সামনে মুখে শুধু বললেন, তাহলে আর কী করা যাবে! ছেলেদের গোঁয়ে তো আর মায়ের পুজো আটকে থাকতে পারে না। ওরা ছেলেমানুষ! প্রথম অপরাধ করেছে। ওদের ক্ষমা করে দেওয়া হল।

সেবার পুজো শেষ হল খুবই ধূমধাম করে।

—কিন্তু পুজোটাও তো কুসংস্কার! পটলা বলল।

—কী আর করা যাবে! ছেলেমানুষ সবাই! মদনদা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, একটা হার্ডল পার হওয়া... সমাজে এমন কত হার্ডল আছে... প্রতিদিন আমাদের পার হতে হয়! এখন তো সেই পুজো আবার চেগে বসেছে!

—'গ্লোরিয়াস রিট্রিট' বোধহয় একেই বলে। ব্রজদা চুপ করে বসে কাহিনি শুনছিলেন। এতক্ষণে মন্তব্য করলেন।

—মানে? জানতে চাইলাম আমরা।

ব্রজদা হাসতে হাসতে বললেন, সাফল্যের সাথে পশ্চাদপসরণ রে! যেটা এখন অনেকেই ভুলে গেছে!

—সাফল্যের সাথে পশ্চাদপসরণ! বেড়ে বলেছ!

—রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির জয়লাভ বল! ক্যাবলা বলল।

—লড়াই সব সময় এগিয়ে দেয় না, তোরা এখন এসব বুঝবি না! মদনদা নস্যির ডিবে খুঁজলেন।

With best compliments of

M/s. SIXER ENTERPRISE

Andal, Burdwan

Sl. No. 114

With best compliments of

Allied Electricals & Switch Fuses

(An ISO 9001:2000 Certified Company)

ENGINEERS : MANUFACTURERS : FABRICATORS

● LT SWITCHGEAR ● CONTROL PANEL ● STEEL FABRICATED ITEM

OFFICE
62/1A, Netaji Subhas Road
2nd Floor, Room No. 16
Kolkata-700 001
Ph : 033-22689556 / 65251544

WORKS
Baidyapur, Burdwan
West Bengal
Ph : (03454) 245234 / 245108

Fax : 033-22689556, E-mail : allied1963@yahoo.co.in

Pulak Ghosh, M : 9830358135

Sl. No. 21

With best compliments of

A

Well Wisher

from
Dhatrigram, Burdwan

Sl. No. 68

ঝড়ের পাখি ঝড়ের গান

রথীন ব্যানার্জী

কয়েকদিন ধরেই কথাটা বলব বলব করেও মিনতি বলতে পারছিল না। সকালের ঘটনার পর থেকে ভাবছিল কী করবে সে। অপমানের তীব্র জ্বালা তাকে বিদ্ধ করছিল। সরলার কথাগুলো বারবার কানে অনুরণিত হচ্ছিল, ‘‘বলি, ছেলেকে একটু শাসন করতে পার না? যেই একটু বাথরুমে গেছি সেই ফাঁকে রান্না ঘুরে ঢুকে খানিকটা চিনি মুখে পুরে দৌড়! আমরাই বা জোটাবো কোত্থেকে বল?’’

ছেলেটার দস্যিপনার জন্য অনেকের কাছেই কথা শুনতে হয়। গা-সওয়া হয়ে গেছে। আজ কী যে হল! ছেলেটা ঘরে ঢুকতেই বেশ কয়েক ঘা দিল। মার খেয়ে কিছুক্ষণ কাঁদার পর বেহায়ার মতো অনুযোগ করল, ‘‘খুব খিদে পেয়েছিল। একটা রুটি দাও না!’’

মায়ের মন, ক্ষণিকের অনুশোচনায় ছেলেকে কোলে টেনে নিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলল। ঘরে সবই বাড়ন্ত। মাস দুয়েক আগে শেষ চুড়িগাছাটা বন্ধক রেখে যা পাওয়া গেছিল তা দিয়ে কোনোভাবে আধপেটা খাবার জুটছিল। তের মাস ক্লোজার থাকার পর মার্চ মাসের শেষে কারখানা খুলেছে। কিন্তু স্বামী টুলু মুন্সি এখনও কাজে যোগ দিতে পারেনি। কারণ—ডাক্তারের ফিট সার্টিফিকেট না পাওয়া। ডান হাতের হাড় ভেঙেছিল গুণ্ডাদের বেধড়ক মারের চোটে। জটিল অপারেশনের কারণে কাজে যোগদানের জন্য ডাক্তারের ফিট সার্টিফিকেট পেতে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। ফিটনেস সার্টিফিকেট পাওয়ার পর কারখানায় যাচ্ছিল। কয়েকদিন পর জানাল, কাজে যোগ দেওয়া হয়নি। কারখানা খোলার পর থেকে কোম্পানির ডাক্তার কারখানায় এসে ফিট সার্টিফিকেট দিচ্ছিলেন। কিছুদিন আগে সে নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। লেবার অফিসার জানিয়েছেন, এজন্য ক্লিনিকে যেতে হবে।

পরিস্থিতি মিনতির অজানা নয়। কোয়ার্টার এলাকায় সন্ত্রাস চলছে। মস্তানরা বাড়িতে এসে ক্রমাগত শাসিয়ে যাচ্ছে। বলেছে, ‘‘কোয়ার্টার ছেড়ে চলে না গেলে তুলে নিয়ে যাবো।’’ তাই স্বামীর কথা শুনে আর কথা বাড়ায়নি। কিন্তু আজ ঠিক করল—আর চুপ করে থাকবে না। এভাবে চললে অনাহারে মরতে হবে। দুধের ছেলেটার কী দোষ? ওর কি বোঝার বয়স হয়েছে?

দুপুরে ছেলেটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে

নিজেরা যা ছিল ভাগ করে খেয়ে মিনতি উঠোনে গেল বাসন মাজতে। বাসন মেজে ঘরে ঢুকেই দেখল স্বামী বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় আধপোড়া বিড়ি ধরিয়ে টানছে।

''আবার বিড়ি খাচ্ছো? কাশি হলে কে দেখবে?'' মিনতির ধমক খেয়ে টুলু বিড়িটা দেওয়ালে নিভিয়ে আবার জানালার ধারে যত্ন করে রেখে দিল। মিনতি ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। টুলু সস্নেহে মাথায় রাত বুলিয়ে মৃদুকণ্ঠে কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় মিনতি সকালের ঘটনার কথা বলল। কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর চোখের জল মুছে স্বামীকে বলল, ''হ্যাঁ গো! আজ বিকেলে মেসবাড়ির মিটিং-এ সুজিতদা আসছেন না? তাঁকে একবার বলে দেখো না। উনি কিছু একটা উপায় বের করবেনই।''

দু-জনের কথাবার্তার পর ঠিক হল—সভা শেষ হওয়ার পর সুজিত চক্রবর্তী মেসবাড়ি থেকে বের হলে মিনতি তাঁকে ঘরে ডেকে এনে কথাটা পাড়বে। কোয়ার্টার থেকে বিতাড়িত সাত-আট জন শ্রমিক এখন মেসবাড়িতে থাকে। মেসের উল্টোদিকে একটা লম্বা ব্যারাক। চারটি পরিবার থাকে একফালি বারান্দার একপাশে রান্নাবান্না ও ভাঁড়ারের জিনিসপত্র রাখার ব্যবস্থা। ব্যারাক থেকে একটু দূরে সবার জন্য একটা খাটা পায়খানা। উঠোনের মাঝখানে একটা পাতকুয়ো, তার পাশে চাটাই দিয়ে ঘেরা জায়গায় মেয়েদের স্নান করার ব্যবস্থা। টুলু মুন্সি আর শিবসাধন বাগচীর পরিবার কোয়ার্টার থেকে বিতাড়িত হয়ে পাশাপাশি দুটো ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছে।

রবিবার, কারখানায় ছুটির দিন। প্রখর রৌদ্রতাপের কথা মাথায় রেখেই বিকাল ৬টায় সভা ডাকা হয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পঞ্চাশ-ষাট জন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই একে একে মেসবাড়িতে ঢুকল। দল বেঁধে না আসারই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। টিকটিকিরা জানতে পারলে মিথ্যা মামলায় আটক করবে। গোটা রাজ্যেই অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। প্রবীণ শ্রমিকনেতা দেবনারায়ণ রায়ের নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাবিত হতে তিনি সুজিত চক্রবর্তীকে বক্তব্য রাখোর জন্য বললেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সংগঠনের কর্মীদের কীভাবে কাজ করতে হবে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ''সিআইটিইউ সর্বশক্তি নিয়ে আক্রান্তদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শত আক্রমণ সত্ত্বেও মালিকশ্রেণির কাছে মাথা নত করবে না। দমনপীড়ন চালিয়ে, প্রতিবাদের কণ্ঠ রোধ করে মালিকপক্ষ কার্যসিদ্ধি করতে চায়। তেরো মাস কারখানা বন্ধ রেখে শ্রমিকদের জব্দ করতে চেয়েছিল। ক্লোজার-বিরোধী সংগ্রাম শ্রমিক আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। কিছু শ্রমিককে বিভ্রান্ত করতে পারলেও অধিকাংশ শ্রমিক আমাদের সাথেই আছে। ধৈর্যের সাথে বর্তমান অবস্থাকে মাথায় রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। সংগঠনের অনেক কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কেস রুজু করায় মামলা চালাতে হচ্ছে। এখনও অনেকে মিসা আইনে আটক। কয়েকজনকে আত্মগোপনে থাকতে হচ্ছে। জগৎপতি রায় মিসায় আটক থাকাকালীন বর্ধমান জেলে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। এ সবের জন্য অর্থের প্রয়োজন। শ্রমিকদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতে হবে।''

ইন্দ্রনীল দেবরায়। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। সংগঠনের সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলেন। শ্রমিকশ্রেণির দর্শন মার্কসবাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। তত্ত্ব ও প্রয়োগের মেলবন্ধন ঘটানোর পারদর্শিতা তাঁকে সিআইটিইউ-র রাজ্য ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান করে দিয়েছে। সুজিত চক্রবর্তীর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর কিঙ্কর সভাপতির অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন রাখল—

''কংগ্রেসিদের আমরা সবাই চিনি। আইএনটিইউসি বরাবরই মালিকের দালালি করে। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টির লোকগুলো কী করে তাদের সাথে মিলে ইউনিয়ন অফিস দখল করে নিল? দুদিকে দুটো অফিস। একটাতে লাল ঝাণ্ডা, অপরটিতে কেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়ছে! ওরাও গলা মিলিয়ে বলছে—শ্রমিকদের চাঁদার টাকায় তৈরি হচ্ছে বিল্ডিং, এখন সবাই ওদের মেম্বার তাই এটা ওদের সম্পত্তি। আবার বলছে দিব্যেন্দু নাকি বিল্ডিংটা নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নিয়েছে!

নিবেশ প্রশ্ন করল, ''কোনোভাবেই কি ক্লোজার এড়ানো যেত না? বন্ধ হওয়ার আগে তো অন্য কোনো ইউনিয়নের অস্তিত্ব ছিল না। ম্যানেজমেন্টের সাথে দরকষাকষি করে ছাঁটাই সংখ্যাটা কিছু কমিয়ে এই বজ্জাতগুলোকে তাড়িয়ে দিলে কারখানার সংকট কেটে যেত।''

বেশি রাত হলে ফিরতে অসুবিধা হবে, তাই সভাপতি পরামর্শ করে সুজিত চক্রবর্তীকে জবাবি ভাষণ দিতে বললেন।

সুজিত চক্রবর্তী আর কাউকে বলার সুযোগ না দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে সভায় উত্থাপিত বিষয়গুলির জবাব দিলেন— ''অজয়দা আসানসোলের আইনজীবী শ্রীধর মুখার্জীর সাথে কথা বলেছেন। অফিস দখলের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হবে। ইন্দ্রনীলদা সম্পাদক হিসেবে আইএলও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আমাদের দেশের সরকারের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে। শ্রমিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ওরা এসব কথা বলবেই। ওরা ভালোভাবেই জানে যে কাজটা বেআইনি।''

সভা শেষ। একে একে সকলে চলে যাওয়ার পর বিপিন পা বাড়ালো। এমন সময় টুলু মুন্সি মৃদুস্বরে বলল—''আমার ঘর হয়ে যেও, দরকার আছে।''

বিপিনের নজরে এলো দরজার সামনে মিনতি বৌদি। সুজিত চক্রবর্তী মেসের দরজার বাইরে বের হওয়া মাত্র মিনতি তাঁকে ডেকে ঘরে ঢুকলেন, পিছন পিছন টুলু মুন্সি। মিনতির ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর—

''সবাই কাজে যোগ দিল, কিন্তু আপনার ভাই কী দোষ করল? সংসারে খাবার জুটবে কীভাবে?''

''টুলু, তুমি জয়েন করনি কেন?''

টুলু প্রথমটায় একটু হক্‌চকিয়ে গেল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ''লেবার অফিসার অতীন বকশী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ক্লিনিকে গিয়ে ডাক্তারের কাছ থেকে ফিট সার্টিফিকেট আনলে তবেই কাজে জয়েন করা যাবে।''

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডা. সোম কারখানার ফার্স্ট-এডে আসছিলেন। এখন আসা বন্ধ। ক্লিনিকে যেতে হবে।

''কীভাবে যাব ওখানে? সেদিন যে গুণ্ডাগুলো হাতটা ভেঙে দিয়েছিল, তারা এবার মেরেই ফেলবে। ডাক্তারের অপেক্ষায় যে ক-দিন লেবার অফিসে বসেছিলাম সবসময় নজরদারি করেছে। বিপিন কিছুক্ষণ সঙ্গ দিত বলে ওকে কারখানার ভিতরেই শাসিয়েছে। বাইরে পেলে ছাড়বে?''

—তুমি একা যাবে কেন? সঙ্গে কেউ যাবে।

—কী যে বলেন! কে যাবে আমার সঙ্গে?

—কেউ না গেলে আমি যাব। কালই কাগজপত্র নিয়ে জেনারেল শিফ্‌টের বাসে চল।

কোম্পানির অফিস স্টাফদের বাসটা এ-ব্লকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বিপিনের নজর পড়ল অপেক্ষমান দু-জনের ওপর। ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর গণপতি রায়, মোহন বোস ওদের ফলো করছে। আশঙ্কার কথা কাউকে বলা যাবে না। শম্ভু চট্টরাজ আজ অনেকটা দূরের সিটে বসেছেন। আর কেউ তো ভয়ে কথা বলে না। বাস কারখানায় ঢোকার পর, বিপিন শম্ভু চট্টরাজ-এর কাছাকাছি গিয়ে আনুপূর্বিক ঘটনাটা বলল। তাঁর সাথে পরামর্শ করে ঠিক হল—হাজিরা খাতায় সই করে বিপিন দ্রুত সবার কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে। দিব্যেন্দু ভট্টর অফিসের কাছে সকলকে জড়ো হতে বলা হয়েছিল। জায়গাটা শেডের ঠিক মাঝখানে। কোনোরকম হৈ চৈ না করে নেতৃস্থানীয় কর্মীরা সেখানে জড়ো হল। জীতেন বিশ্বাস এল একটু দেরি করে। তার কাছ থেকে জানা গেল গুণ্ডারা ইতিমধ্যে দু-জনকে মারতে মারতে বারমুণ্ডিয়ার দিকে নিয়ে গেছে। বিশু চক্রবর্তী কোয়ার্টার থেকে এসে সন্তর্পণে ওকে খবরটা দিয়ে গেছে। এতক্ষণ যেটা ছিল অনুমান এখন সেটাই সত্য প্রমাণিত হওয়ায় সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রাণরক্ষার উপায় খুঁজতে লাগল। জীতেন বডিবিল্ডার, প্রচণ্ড সাহসী, প্রস্তাব করল—''চলুন, আমরা সবাই মিলে ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করি।''

অভিজ্ঞ ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা সুভাষ চ্যাটার্জির মতামত শোনার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিল। জীতেনের কথা শেষ হতেই তিনি বললেন—''সশস্ত্র গুণ্ডাদের হাত থেকে এভাবে তাদের বাঁচানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের কাউকে গেট পাস দেবে না। এত লোককে একসাথে তো নয়ই। অন্য কোনো উপায় খুঁজতে হবে।''

কেউই ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না। কী সে উপায় যার দ্বারা ওদের জীবন রক্ষা করা যায়! অবশেষে জীতেনই সকলের উদ্দেশ্যে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, ''তিমির পালকে গিয়ে বলব?''

সুনীল সিংহ বলল, ''ও তো এখন আইএনটিইউসি করছে।''

—কথাটা ঠিক। কিন্তু তিমিরদা আমাকে ব্যায়াম শেখান। ওনার মুখে বহুবার সুজিতদার প্রশংসা শুনেছি। খুব শ্রদ্ধা করেন সুজিতদাকে।

অনুমতি পেয়ে জীতেন হন হন করে হ্যান্ডলবার অ্যাসেম্বলি ডিপার্টমেন্টের দিকে গেল। কিছু করতে না পারার গ্লানি নিয়ে সকলেই চিন্তামগ্ন কিছুক্ষণের মধ্যেই জীতেন ফিরে এসে যা খবর দিল তাতে কিছুটা আশার আলো পাওয়া গেল।

খবরটা শুনে তিমিরদা তেলকালিমাখা হাতে জামাটা গলিয়ে ছুটলেন গেটের দিকে। বলে গেলেন যে তিনি বালমুণ্ডিয়া যাচ্ছেন।

এক একজন এক একদিকে বেরিয়ে পড়লেন। সকলেই ছিলেন ভীত সন্ত্রস্ত। কারণে-অকারণে ইউনিয়ন বিল্ডিং-এর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ধোলাই দেওয়া হত। কারখানার সব ডিপার্টমেন্টে শ্রমিকদের কানে খবরটা পৌঁছে দিয়ে সকলেই আবার ফিরে এসে অপেক্ষা করছিল। বিপিনই প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল— ''সেদিনের আওয়াজ হঠাৎ কমে গেল মনে হচ্ছে! সকলে কাজ বন্ধ করে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মনে হচ্ছে? কী আশ্চর্য! এ-তো আমাদের কল্পনারও বাইরে ছিল!''

কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যিই বোঝা গেল সব মেসিনগুলোতেই উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কারখানা নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সবার মুখে মুখে উৎকণ্ঠা দেখা গেল। সবার দু-চোখে একটাই প্রশ্ন—কোনো খবর পাওয়া গেল? বেঁচে আছেন তো? নাকি গুণ্ডাগুলো মেরে ফেলেছে?

কতক্ষণ এভাবে কাটলো কে জানে! তবে কয়েকজন অফিসারের তৎপরতা দেখে মনে হল কর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। বেলা এগারোটা নাগাদ সুজিত চক্রবর্তী হাজির হলেন দিব্যেন্দু ভট্ট-র ডিপার্টমেন্টে। ইশারায় সকলকে ডেকে নিলেন। বিপিন কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—''টুলুদা কোথায়?''

''প্লেটিং ডিপার্টমেন্টে গেছে, কাজে জয়েন করার জন্য।''

সুজিত চক্রবর্তী যা রিপোর্ট করলেন তা গল্পের মতোই রোমহর্ষক।

''টুলু ডাক্তারের কাছ থেকে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে এল। ক্লিনিকের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। দু-জনে কারখানার দিকে হাঁটা শুরু করলাম। কালীবাড়ির কাছে আসতেই গণপতি পথ আটকে কিল-চড়-ঘুঁসি মারতে শুরু করে, সেই সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। মারতে মারতেই বি-ব্লকের ভেতর দিয়ে বারমুণ্ডিয়ার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝপথে শরৎ মিশ্র ওদের সাথে যোগ দিল। তিনজনের মার খেয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখি একটা পরিত্যক্ত কয়লা খনিমুখের সামনে চলে এসেছি। এই সময় ওদের মধ্যে একজন বলল, 'এবার এ-দুটোকে ধাক্কা মেরে ফেলে দে।' আর একজন আপত্তি জানিয়ে বলল, 'না রে, মড়াদুটো ভেসে ওঠার পর আবার পুলিশের ঝামেলায় পড়তে হবে। তার থেকে বরং কোলিয়ারির বয়লারে ফেলে দেওয়া হোক। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' শেষ পর্যন্ত ওরা আমাদের নিয়ে চলল মিলনের বাড়ির দিকে। কংগ্রেসের পার্টি অফিস। ওখানে মানিকের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিবেশ্বর ঘাঁটি। শিবেশ্বরবাবু আমাদের দেখতে পেয়ে মস্তানদের জোর ধমক দিয়ে বললেন, 'করেছিস কী তোরা, কাকে ধরে এনেছিস? ছিঃ ছিঃ কী লজ্জার ব্যাপার, সুজিতবাবু আপনারা চলে যান। আর আপনাদের কেউ কিছু বলবে না।' তখনই আন্দাজ করলাম কারখানায় কিছু একটা ঘটেছে। আর চাপে পড়ে ম্যানেজমেন্ট শিবেশ্বরবাবুকে খবর পাঠিয়ে আমাদের উদ্ধারের কাজে লাগিয়েছে। এখন তোমরা নিজের নিজের ডিপার্টমেন্টে চলে যাও।''

সুজিত চক্রবর্তী নিজেও উঠলেন। যাবার সময় বিপিনকে বললেন, ''ক্যান্টিনে খেতে যাওয়ার সময় ফ্রেমশপে এসো, এক সাথে যাব।''

বিপিনের মাথায় যে প্রশ্নটা এতক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছিল যেতে যেতে সেটা বলে ফেলল—''এই যে আপনি এককভাবে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা কি সঠিক হয়েছে?''

—এছাড়া আর কী উপায় ছিল বলতো? তুমি তো গতকাল মিনতির সব কথাবার্তা শুনেছ।

—তাবলে আপনি এত বড় ঝুঁকি নিলেন! যদি আপনার কিছু হয়ে যেত?

—আমার বিশ্বাস ছিল শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হবেই। প্রতিবাদই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। সেটাই ঘটেছে। ম্যানেজমেন্ট হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে।

বিপিন অবাক বিস্ময়ে সংগ্রাম পরিচালনায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা অকুতোভয় এক সেনাপতিকে সামনে দেখতে পেল।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

চকদিঘী, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 46

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

চণ্ডীমাতা হিমঘর

আঝাপুর, বর্ধমান

এখানে যত্নসহকারে চাষির জন্য বীজ আলু ও খাবার আলু সংরক্ষণ করা হয়।
আলু ব্যবসায়ীদের আলুও যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়।

Sl. No. 45

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

তিরুপতি রেফ্রিজারেশন প্রাইভেট লিমিটেড

কাড়ালাঘাট, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 48

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শান্তি ব্রিক ফিল্ড

চৌবেড়িয়া, পাঁচড়া, বর্ধমান

Sl. No. 47

ঔপনিবেশিক যুগে বর্ধমান শহরে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার : একটি অবলোকন

প্রবাল সেনগুপ্ত

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগেই বর্ধমানে শিক্ষার একটি ধারা প্রবাহিত ছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বর্ধমান শহরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় যথেষ্ট সংখ্যক পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। সে সব পাঠশালায় '3Rs' অর্থাৎ 'রিডিং', 'রাইটিং' ও '(অ্যা)রিথমেটিক' শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের 'বাস্তব জগতের' শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে আমরা বর্ধমান মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতাধীন সংস্কৃত পাঠশালার অস্তিত্বও বর্ধমান শহরে ছিল—তা জানতে পারি। এর পাশাপাশি মোঘল শাসনের সময় থেকে শহরে মাদ্রাসা-মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষাধারাও বর্ধমান শহরে ছিল। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে শহরে দুটি ভার্নাকুলার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর মাধ্যমেই বর্ধমানে পাশ্চাত্য ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা প্রথম প্রচলিত হয় বলে মনে করা হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে নিজেদের প্রয়োজনীয় দেশীয় কর্মচারী তৈরির স্বার্থে ও 'রক্তে চামড়ায় ভারতীয় অথচ চরিত্রে, পছন্দে' ইংরেজায়নের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক সরকার, বিশেষ করে বাংলার সর্বত্র, সীমাবদ্ধ শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছিল। 'ক্রমনিম্ন পরিশ্রুতি মতবাদ' অনুযায়ী তখন প্রাথমিক শিক্ষার উপর নয়, জোর পড়েছিল উচ্চশিক্ষা, বিশেষত, মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর। শিক্ষা বিস্তারের এই ধারায় বেশ কিছুটা ব্যতিক্রমী ছিল বর্ধমান—বিশেষ করে শহর বর্ধমান। আসলে 'জমিদার' হয়েও বর্ধমান মহারাজারা ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে প্রায় অর্ধ-স্বাধীন নৃপতির মর্যাদা পেতেন। এই শহরের প্রশাসনও মূলত রাজার তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হত। তাই ঔপনিবেশিক শক্তি প্রথম থেকেই রাজাদের শাসনকেন্দ্র বর্ধমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেনি। যেমনটি তারা নিতে পেরেছিল কলকাতা, চুঁচুড়া থেকে সুদূর উত্তরের জলপাইগুড়িতে।

এটা স্মর্তব্য সারা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানেও ঔপনিবেশিক আমলে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির আংশিক ভাঙন এবং পুঁজিবাদের ক্ষীণ অনুপ্রবেশ সংঘটিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় এখানে সামন্ততান্ত্রিক আর্থসামাজিক শক্তি একটু বেশিই শক্তিশালী ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-জাত জমিদার এবং তাদের অধীনস্থ বিভিন্ন পর্যায়ের জোতদাররা নিজেদের কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোর প্রয়োজনে শহরে একটি আর্থ-রাজনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই উপরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনেই দরকার হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষাজাত নায়েব-গোমস্তা তৈরির। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি চাকরি, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা বর্ধমান শহরের পেশাজীবী শ্রেণিও নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের ভবিষ্যতের স্বার্থে, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার কামনা করেছিল, বর্ধমানে।

বর্ধমানের ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা, তেজচন্দ্ বাহাদুর অবচেতনের শ্রেণিস্বার্থ ছাড়াও আদর্শগত ভাবেও সারা জেলা সহ বর্ধমান শহরে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। শুধু নিজ 'রাজ্যে' নয়, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়, সেই আমলে তিনি ১২ হাজার টাকা দান করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বর্ধমান শহরের প্রথম অ্যাংলো-ভার্নাকুলার বিদ্যালয়টি গড়ে ওঠে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। এই বিদ্যালয়ে ইংরাজির পাশাপাশি বাংলা, আরবি ও ফার্সি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়টি বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল নামে ভারতখ্যাত হয়। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দ্-এর আমলে বিদ্যালয়টি 'মহারাজার হাইস্কুল' নামে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

এদিকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শহরে ইংরাজ সরকারের সহায়তায় একটি উচ্চ ইংরাজি 'জেলা বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। মহারাজার স্কুলে বিনা বেতনে পড়ানো হলেও, শেষোক্ত বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিদ্যালাভের বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ বেতন দিতে হত। বর্ধমানের মহারাজারা এমনিতে 'ইংরেজভক্ত' হলেও, শহরের শিক্ষাক্ষেত্রে ইংরাজ সরকারের এই অনুপ্রবেশকে মেনে নিতে পারেন নি। হয়তো এই হস্তক্ষেপে তাঁদের রাজমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। জেলা স্কুলের প্রভাবকে খর্ব করার জন্য মহারাজার স্কুলে তাই সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়ানো ছাড়াও ছাত্রদের জন্য নানা জল-পানির বন্দোবস্ত করা হয়। অচিরাৎ বর্ধমান রাজাদের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। একটা সময় এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, মহারাজার স্কুলের ছাত্রসংখ্যা যেখানে তিনশো ছাড়িয়ে যায়, সেখানে সরকারি স্কুলের ছাত্রসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় সাকুল্যে বাহান্ন জন। রামতনু লাহিড়ীর মতো স্বনামধন্য মানুষ প্রধান শিক্ষক থাকলেও, জেলা স্কুল রাজাদের আর্থ-সামাজিক চাপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে মহারাজা মহতাবচন্দ্ সরকারকে জানান, "...if the Government institution is withdrawn he would place his school upon a better footing and guarantee that no one really desirous of free education in Burdwan should be deprived of it." পরবর্তীকালে মহারাজার চাপেই জেলা স্কুলটি রাজ কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে মিশে যায়। 'সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়'-এর ১৮৫২ সালের ২৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় লেখা হয়—'বর্দ্ধমান হইতে আগত হইল,

রাজ স্কুল

ভদ্রস্থ গভর্ণমেন্ট বিদ্যালয়ের বিলোপান্তর বিদ্যার্থীগণ মহারাজবাহাদুরের প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং মহারাজার প্রযত্নে ও বিদ্যার্থী বাহুল্যে উক্ত বিদ্যালয় দিনদিন মহোন্নতিশালিনী হইতেছে।'

পরবর্তীকালে মহারাজাধিরাজ আফতাবচন্দ্-এর আমলে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয়টির প্রাসাদোপম ভবন গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়গৃহ উদ্বোধনের দিন তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল মিস্টার বিলিংসের বক্তৃতা থেকে জানা যায় ১৮৫৩-এ যেখানে বিদ্যালয়টির ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৭৩ জন, সেখানে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫২০তে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সেক্সন ১২; অ্যাক্ট-২ অনুযায়ী ভারত সরকারের সেক্রেটারি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে একটি পত্রে জানান— '...the Governor General in Council is pleased to authorise the affiliation of the Maharaja's high school, Burdwan to the Calcutta University upto the standard of first examination in arts, with effect from the first Juanuary 1882.' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটি থেকে 'রাজ কলেজ' পৃথক হবার পর সরকারিভাবে এটি রাজ কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত হয়। দ্বিশত বর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ানো এই স্কুলটি আজও বর্ধমান শহরের গর্ব।

ইতোমধ্যে খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো বর্ধমানেও শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহী হন। এটা অনস্বীকার্য যে এর পিছনে নিজেদের ধর্মের প্রভাব বিস্তার করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আবার এটাও সত্য 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র' হিসেবে তাঁদের এই কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষাধারারই উন্নতি হয়েছিল। এই শহরে এর ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ ছিল না। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দেই চার্চ মিশনারি সোসাইটি যাজক ওয়েটব্রেখটের নেতৃত্বে বর্ধমানে একটি ইংরাজি স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। ওয়েটব্রেখটের মতো যাজকরা বুঝছিলেন বর্ধমানের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সেখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই চার্চ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য মহারাজার সম্মতি আদায় করেন। রাজা মহতাবচন্দ্ সম্মতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় তহবিলে এক হাজার টাকা সাহায্য করেন। চার্চ পরিচালিত বিদ্যালয়টির নাম হয় 'চার্চ মিশনারি সোস্যাইটিজ ইংলিশ স্কুল'। স্কুল প্রাঙ্গণের একটি প্রস্তরফলকে এই বদান্যতার কথা স্মরণ করে উৎকীর্ণ আছে : 'Church Missionary Society's English School, created through the liberal aid of Maharajah Mahtabchand Bahadur, and other benevolent friends by the Revd Weitbrecht, 1834.' এই বিদ্যালয়টি পরে সি.এম.এস. স্কুল বা চার্চ মিশনারি সোস্যাইটিজ স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হয়। খোসবাগে অবস্থিত এই বিদ্যালয়ে প্রথমাবধি ইংরাজি, ফার্সি, আরবি এবং সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বিনা বেতনে নয়, স্কুলটিতে ছাত্রপিছু দুই টাকা করে মাসিক বেতন নেওয়া হত। এছাড়া 'নগর হইতে দূরে' সাধনপুরেও মিশনারিদের চেষ্টায় একটি বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

সি.এম.এস. স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র জীতেন্দ্রনাথ মিত্রের স্মৃতিচারণে জানা যায়, খ্যাতিমান এই স্কুল থেকে এম.ই. পরীক্ষায় অনেক ছাত্রই প্রতি বছর স্কলারশিপ পেত। এই বিদ্যালয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল খেলাধূলা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেওয়া। স্কুলের এককালীন ক্রীড়া শিক্ষক ক্লার্ক সাহেব এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত সি.এম.এস. স্কুল ধাপে ধাপে ১৯৪৮-এ জুনিয়র স্কুল এবং পরবর্তীকালে ১৯৬০-এ উচ্চবিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আর একটি ক্ষেত্রে সি.এম.এস. বর্ধমানের শিক্ষায় মাইলফলক হিসেবে গণ্য হতে পারে। ঔপনিবেশিক যুগে এই শহরের এই বিদ্যালয়েই প্রথম ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সহ-শিক্ষা চালু হয়েছিল।

এই স্কুলের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এর যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী। এখানে ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট ছাড়া কোনো প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হতে পারতেন না। প্রাথমিকভাবে সত জন শিক্ষক ছিলেন বিদ্যালয়ে। এদের বেতন মাসিক ২৮ টাকা থেকে ৭৮ টাকা ছিল পর্যায়ভেদে। ১৯৪৫-এর একটি পরিদর্শন রিপোর্ট অনুযায়ী সেই সময় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৪২১ জন। এর মধ্যে ৩৬৯ জন হিন্দু, ৫০ জন মুসলমান এবং দুইজন খ্রিস্টান। কঠোর শৃঙ্খলা এই বিদ্যালয়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। স্কুলের গ্রন্থাগারটি ছিল সমৃদ্ধ। বর্ধমান মহারাজা এই গ্রন্থাগারে বহু পুস্তক দান করেছিলেন।

বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন বৈকুণ্ঠেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ড্যানিয়েল অবনী কাজী, রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের মতো স্বনামধন্য মানুষেরা। ১৯২৫ থেকে ১৯২৭—এই দু-বছরে মোট ছ-জন ছাত্র এই বিদ্যালয় থেকে সরকারি বৃত্তি লাভ করেছিল। এর থেকেই স্কুলটির উচ্চমানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেষে, এক সময়ের সি.এম.এস.-এর সেক্রেটারি এল.এম.-দে-র বিশেষ অবদানের কথা বলতেই হয়। তাঁর আমলে স্কুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। তবে স্কুলে খ্রিস্টান শিক্ষক নিযুক্তিতে তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সংকীর্ণতাদোষে দুষ্ট—যা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মূল আদর্শকেই আহত করেছিল। আজও বর্ধমান শহরে সি.এম.এস. স্কুলের গৌরব অস্তমিত হয়নি।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানে আরও একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১১ ফাল্গুন, ১২৮০ বঙ্গাব্দের 'সাধারণী' পত্রিকায় এই বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে বলা হয়েছিল—'বর্ধমানে ইউনিয়ন বিদ্যালয় নামে একটি উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। গত সপ্তাহে হপকিন্স্ সাহেব এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।' পরবর্তীকালে অবশ্য এই বিদ্যালয়টির অবস্থা সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

এর পরে যে স্কুলটি বর্ধমান শহরে শিক্ষাক্ষেত্রে জোয়ার এনেছিল, সেটির নাম 'টাউন স্কুল'। এই স্কুলটি স্থাপনের পিছনে যে একটি বড় প্রেক্ষাপট আছে, আগে সেটি জানার প্রয়োজন। বাংলার নবজাগরণের প্রভাবে এদেশের দিকে দিকে শিক্ষা বিস্তারের একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্ধমানেও এই ঢেউ আছড়ে পড়েছিল। প্রথমে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কিছু পরে রামতনু লাহিড়ী বর্ধমানে রেনেসাঁস-প্রসূত শিক্ষাধারা ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা

গ্রহণ করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন, বিদ্যাসাগর জেলায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানকার শিক্ষাকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে মহারাজাধিরাজ মহতবচন্দ্-এর ব্যক্তিগত বন্ধু স্বনামধন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বর্ধমান শহরে আগমনের মধ্য দিয়ে, সেখানে ইংরাজি শিক্ষার আর একটি ধারার জন্ম হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাজার আনুকূল্যে শহরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ওই বছরই সমাজের চেষ্টায় একটি উচ্চ বালক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ভগবানচন্দ্র বসু সরকারি কর্মচারী হিসেবে বর্ধমানে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁর পুত্র ও পরবর্তীকালের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। এছাড়া এই সময় মুরাদপুর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্ধমানে গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়।

যাই হোক, ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মহতবচন্দ্-এর প্রয়াণের পর, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা-বঞ্চিত ব্রাহ্ম স্কুলটি, বর্ধমান পৌরসভার সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। তখন বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চৌধুরী। পরবর্তীকালে দেনার দায়ে বিকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, পৌরসভা বিদ্যালয়টিকে সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসে। সময়টা ছিল ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ। পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান ডব্লু.আর লারমাইনের চেষ্টায় বাক্‌লে সাহেবের কুঠিতে বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হল। নতুন নাম হল 'বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল'। পরবর্তীকালে পার্কার রোডস্থিত রসিককৃষ্ণ মল্লিকের গৃহে প্রতিষ্ঠানটি উঠে আসে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় চেয়ারম্যান লারমাইন ছাড়াও ডব্লু.সি. ম্যুলার, সি. রাবান, ডা. এইচ.বি পারভেস প্রমুখ বিশিষ্টজনেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান টি.ই. কক্‌সহেড-এর আমলে বিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করে। আঞ্চলিক মানুষদের মধ্যে জগবন্ধু মিত্র, অন্নদাপ্রসাদ মল্লিক, নলিনাক্ষ বসু প্রমুখরা স্কুলটির শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই সময় বিদ্যালয়টি নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করতেও শুরু করে। ১৮৮৪-এ মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পরিচালকদের মধ্যে মতভেদের কারণে স্কুলটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। নবগঠিত অংশের নাম হয় 'অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়া ইনস্‌টিটিউশন' বা 'নিউ স্কুল'। পরবর্তীকালে অবশ্য এই অংশটি পুনরায় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'নিউ স্কুল'-এ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল কিছুদিন পড়েছিলেন। আমাদের কালের অন্যতম ভাষাবিদ্ সুকুমার সেন ও বিশিষ্ট বামপন্থী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ শাহেদুল্লাহ এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন।

পড়াশোনার পাশাপাশি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্রশিক্ষকেরা বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়ও দিয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষকদের অসহনীয় আর্থ-সামাজিক দুর্দশা দূরীকরণের লক্ষ্যে 'এ.বি.টি.এ.' গঠিত হয়। সেই বছরেই মূল সংগঠনের আদর্শকে সামনে রেখে, উক্ত বিদ্যালয়ে মিউনিসিপ্যাল শিক্ষক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়—নাম হয় 'বর্ধমান শিক্ষক সমিতি'। নানা টানাপোড়েনের পর এই সমিতিকে স্বীকৃতি দিতে এবং স্কুলের একটি ঘর সমিতির কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়। বিভিন্ন সময়ে পরিচালক সমিতি শিক্ষকদের ওপর যে অন্যায় অত্যাচার চালাতো, তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এই সমিতি।

১৯৩০-এর 'ডান্ডি অভিযান'-এর সময় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্ররা বেআইনিভাবে কলাগাছের রস থেকে লবণ তৈরি করেছিল বলে যানা যায়। স্বদেশি আন্দোলন নিয়ে রসিকতা করার জন্য স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার দানরত জাঁদরেল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম. স্টুয়ার্ট-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল এখানকার ছাত্ররা। ঔপনিবেশিক যুগের শেষ ভাগে এই স্কুলের মেধাবী ছাত্র ও পরবর্তীকালের জনপ্রিয় বামবন্থী নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায়ের মতো অনেকেরই বামপন্থী চেতনার সূতিকাগার ছিল এই স্কুল।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন ডি.পি.আই. স্কুলটির উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য তের হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। ঢলদীঘির পাড়ের সেই ভবন ছিল সৌকর্যমণ্ডিত। শিক্ষক সম্পদেও সমৃদ্ধ ছিল বিদ্যালয়টি। প্রধান শিক্ষক হবার ন্যূনতম যোগ্যতা সেই সময়েই ছিল ইংরেজিতে এম.এ. উত্তীর্ণ। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন কুঞ্জবিহারী মিত্র। পরবর্তীকালে রসময় মিত্র, ননীলাল ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও সত্যশরণ সরকারের মতো প্রথিতযশা শিক্ষাবিদরা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হয়েছিলেন। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের প্রেরিত সব ছাত্রই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিল। আজও বর্ধমান শহরের বুকে এই বিদ্যালয় সগর্বে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করে চলেছে।

ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্বে বর্ধমান শহরে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে আরও একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল—সেই স্কুলটি টাউন স্কুল নামে পরিচিত। সময়টা ১৯২০-২১ খ্রিস্টাব্দ। তখনকাল বাংলাদেশের ২৮টি জেলার মধ্যে ২৬টিতেই সরাসরি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন অন্তত পক্ষে একটি জেলা স্কুল ছিল। ব্রিটিশ খয়েরখাঁ-দের জন্য নির্মিত এই মডেল বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররা মূলত সরকারি কর্মচারী ও ইংরাজ সরকার-ভক্ত পরিবার থেকে আসত। তবে কিছু দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রও যে থাকত না—এমনটা নয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বর্ধমান শহর ছিল ব্যতিক্রম। মহতবচন্দ্-এর অসহযোগিতায় কীভাবে পূর্বেই এই প্রচেষ্টায় সরকার অসফল হয়েছিল তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু স্বদেশির নতুন যুগে, ইংরাজ সরকারের ভক্ত প্রজাকুলের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য, গত শতকের বিশের দশকে সরকার পুনরায় বর্ধমানে একটি জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে স্বনামধন্য মৌলভি আবুল কাশেম শহরে একটি জেলা স্কুল না থাকাটা ইংরাজদের বর্ধমানের প্রতি অবহেলার নিদর্শন বলে মনে করতেন। তিনিও ওই সময় জেলা স্কুল স্থাপনের জন্য জোরদার প্রচার করতে থাকেন। যাই হোক, শীঘ্রই এ সম্বন্ধে অনুকূল সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শহরের বিখ্যাত ধনপতি লালা বংশগোপাল নন্দের বংশধরদের কাছ থেকে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করা হল। ভবনের প্ল্যানও প্রস্তুত হল। সেখানে লেখা হল 'Plan for the proposed Burdwan Zilla School building'।

হঠাৎ করেই অবশ্য পরিস্থিতির পরিবর্তন হল। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের ত্বরণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণ সরকারি স্কুলের সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠল। শহরের মানুষও নতুন করে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করল। সরকারও এ-ব্যাপারে জোর খাটাতে চাইল না। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বর্ধমান শহরের কয়েকজন গণমান্য ব্যক্তি একত্রে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রস্তাবিত জেলা স্কুলের পরিকাঠামো ব্যবহার করে একটি সরকার-পোষিত বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক। এদিকে ওই সময় মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা নানা কারণে এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পরিকাঠামোর অভাবে সব ছাত্রের স্থান সংকুলান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৯২৫-এর ৭ ফেব্রুয়ারি নবগঠিত টাউন স্কুল কর্তৃপক্ষ ও মিউনিসিপ্যাল স্কুলের কর্তৃপক্ষের একটি মিটিং ডাকা হয় জেলা শাসকের কার্যালয়ে। সভায়

সিদ্ধান্ত হল মিউনিসিপ্যাল স্কুলের চাপ কমানোর জন্য নবগঠিত স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথমোক্ত স্কুল থেকে ২৫০ জন ছাত্রকে টাউন স্কুলে স্থানান্তরিত করা হবে।

টাউন স্কুলের ব্যয়ভার যেহেতু সরকারই পুরো বহন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাই প্রকারান্তরে এটি সরকারি স্কুল হিসেবেই প্রতিভাত হল। ফলত, জেলার সরকারি কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা মিউনিসিপ্যাল স্কুল ছেড়ে এই স্কুলেই ভিড় জমাল। নতুন স্কুলে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পাঁচজন শিক্ষককেও বদলি করা হল। এঁরা হলেন মুরারীমোহন ঘোষ, বিজয়কৃষ্ণ মণ্ডল, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ধর্মদাস চৌধুরী ও ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী। বিভাগীয় শিক্ষা পরিদর্শক মৌলভি আল্‌ফাজুদ্দিন আহ্‌মেদ আদেশ দিলেন যে, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের যে-সব ছাত্র স্কুল ছেড়ে টাউন স্কুলে আসবে তাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য কোনো 'ফি' দিতে হবে না। সরকারি আদেশনামাটি নিম্নরূপ—

> The boys applying for transfer to the new school (Town) will not be charged withdrawal fees as usual to the additional tuition frees to avoid congestion in your (Municial) school which has grown upto an unmanagable size and to ensure an efficient management of the latter (Town School).

নতুন টাউন স্কুলে যে নতুন পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হল, তার সভাপতি হলেন স্বয়ং জেলাশাসক। এছাড়া জেলা জজ, জেলা শিক্ষা পরিদর্শক, পৌরসভার চেয়ারম্যানরা পদাধিকারবলে পরিচালন সমিতির সদস্য হলেন। প্রথমবারে কমিটিতে সরকার মনোনীত বেসরকারি সদস্য হিসেবে এলেন মৌলবি আবুল কাশেম। নতুন স্কুলের উন্নয়নের দিকে সরকারের কড়া নজর ছিল। স্কুলের প্রাত্যহিক পড়াশোনা পরিদর্শন করবার জন্য বিভিন্ন সময়ে তৎকালীন শিক্ষা অধিকর্তা বিখ্যাত (কুখ্যাত?) ওটেন সাহেব ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহেব উপাচার্য এরেনআর্ট প্রমুখ টাউন স্কুলে এসেছিলেন। প্রথম প্রধান শিক্ষক পাঁচকড়ি সরকারের আমলে সমগ্র শহরকে কতকগুলি কাল্পনিক ওয়ার্ডে ভাগ করে, সেই সেই অঞ্চলের টাউন স্কুলের ছাত্রদের দৈনন্দিন পাঠ পরিদর্শনের জন্য দু-জন করে শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বোঝা যায় তখনকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক মান উন্নয়নের জন্য কতটা সচেতন ছিল।

রায়সাহেব বেণীমাধব ভট্টাচার্যের প্রধানশিক্ষকতার সময় থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা চর্চার ওপর স্কুলটি নজর দেয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তঃবিদ্যালয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হয় টাউন স্কুল। ফুটবলে মৃত্যুঞ্জয় সেনগুপ্ত, মহম্মদ আজিম, বিশ্বনাথ সেন ছাড়াও অ্যাথলেটিক্‌সে মথুরানাথ দে, সাঁতারে ষষ্ঠীকালী কেওড়া, ভলিবলে ভূতনাথ দে প্রমুখ বিভিন্ন সময়পর্বে বিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করেছেন। এদিকে মনন চর্চার চেষ্টায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ছাত্রদের লেখায় সমৃদ্ধ 'বিদ্যালয় পত্রিকা' প্রকাশিত হতে শুরু করে।

পড়াশোনা, খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কাজেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এই স্কুলের ছাত্ররা। ১৯৩০-এর জুলাই সংখ্যার বিদ্যালয় পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে মন্তব্য করা হয়েছিল— 'ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্থিরতা চলছে। তারা দেশের কাজে লাগতে চায়। আমরা জানি না, তারা স্কুলের পড়ুয়া হয়ে বড়দের সঙ্গে কি করে এ কাজে নামবে। আবার Provincial Students' Convention-এ বিষয়টি District Association-এর উপর ছেড়ে দিয়েছে। আমরা শুনছি, স্থানীয় সমিতি ছেলেদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের অগ্রভাগে আনতে চায়। মঙ্গলের বিষয় এখানকার অভিভাবকরা মি: এস.কে বোসের নেতৃত্বে মিলিত হয়ে ঠিক করেছেন যে ছেলেদের স্কুল ছেড়ে দিতে হবে না (য:দৃ:)। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন উদ্ধত নেতা স্কুল ও কলেজের ফটকে পিকেটিং চালাচ্ছে, তাতে অবশ্য বিশেষ লাভ হচ্ছে না তাদের।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে, বাংলার অন্যান্য স্থানে ইংরেজ সরকার, মিশনারি এবং নাগরিক গোষ্ঠীই পাশ্চাত্য শিক্ষায় নতুন ভোরের সূচনা করেছিল—বর্ধমানে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রাজবংশের প্রচেষ্টায়। শুধু রাজস্কুল নয়—ঔপনিবেশিক যুগে প্রতিটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে বর্ধমানের রাজাদের অবদান ছিল। এর পিছনে তাঁদের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও স্বার্থবুদ্ধির অস্তিত্ব হয়তো ছিল, কিন্তু বর্ধমান শহরের আপামর মানুষ তাঁদের এই কাজের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল, এটা সন্দেহাতীতভাবে সত্য।

এইভাবে আলোচনার আলোকে আমরা দেখতে পেলাম, ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ স্কুল, ১৯৩৪-এ সি.এম.এস স্কুল, ১৮৮৩-তে মিউনিসিপ্যাল স্কুল এবং সবশেষে ঔপনিবেশিক যুগের প্রান্তলগ্নে ১৯২৫-এ টাউন স্কুল—এই চারটি স্কুলের চতুঃস্তম্ভের উপরই মূলত বর্ধমান শহরের পাশ্চাত্য শিক্ষার সৌধ রচিত হয়েছিল। এর সূত্র ধরেই স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে-পরে হরিসভা বালিকা বিদ্যালয়, মহারানি অধিরানি বিদ্যালয়, মিউনিসিপ্যাল গার্লস এবং দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরে বাণীপীঠ, বিদ্যার্থী ভবন, আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যালয়, রেলওয়ে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রাজ স্কুলের সিনিয়র বিভাগ রাজ কলেজে রূপান্তরিত হলে, শহরে কলেজীয় শিক্ষাও শুরু হয়ে যায়। এইভাবে যে শিক্ষাকাঠামো ঔপনিবেশিক যুগে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্ধমান শহরে, নানা ঝড়ঝাপটা সহ্য করে তা আজও বেগবতী স্রোতস্বিনী হয়ে বয়ে চলেছে। এটাই আনন্দের। গর্বেরও বটে।

তথ্যসূত্র

১. বর্ধমান রাজ কলেজিয়েট স্কুল, ১২৫ বর্ষপূর্তি উৎসব স্মরণিকা, ১৯৮৩
২. বর্ধমান সি.এম.এস স্কুল, সার্ধশতবর্ষ স্মরণিকা, ১৯৮৪
৩. বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল, শতবর্ষ স্মরণিকা, ১৯৮৩
৪. বর্ধমান টাউন স্কুল পত্রিকা (নবারুণ), ৭৫ বছর পূর্তি স্মরণিকা, ২০০০
৫. বর্ধমান সি.এম.এস. স্কুল উচ্চবিদ্যালয় (প্রাতঃ), রজতজয়ন্তী স্মরণিকা, ১৯৯৫
৬. বর্ধমান পৌর শতবার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৬৫
৭. *পশ্চিমবঙ্গ*, বর্ধমান জেলা সংখ্যা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
৮. সুধীরচন্দ্র দাঁ, *বর্ধমান পরিক্রমা*
৯. সুশীলচন্দ্র সেন, *বর্ধমানের কথা*
১০. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, *বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি*
১১. বর্ধমান সহায়িকা, ১৯৯৯
১২. বর্ধমান চর্চা, ২০০১
১৩. নীলা কর, *শিক্ষার চালচিত্র : বর্ধমান*
১৪. এককড়ি চট্টোপাধ্যায়, *বর্ধমান জেলার ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি*, প্রথম খণ্ড, ২০০১
১৫. JCK Peterson, *Bengal District Gazetteers: Burdwan*, reprint 1997
১৬. S.B. Choudhury *et.al.*, *West Bengal District Gazetteers : Burdwan*

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

নতুনপল্লি, বর্ধমান নিবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং মনীশ সেনগুপ্ত

কিংবদন্তী-জনশ্রুতি-লোককথায় বর্ধমানের দুর্গা

সর্বজিৎ যশ

কিংবদন্তী কথাটির ইংরেজি প্রতিরূপ 'Legend'। এই 'Legend' কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Legender' থেকে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান পণ্ডিতরা 'Legend' শব্দটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ল্যাটিন 'Legender' শব্দটিকে তাঁরা নানাভাবে কাজে লাগিয়েছেন। মধ্যযুগের শেষের দিকে 'Legend' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হত অপ্রাকৃত তথ্য অথবা একটি অসম্ভব গল্প। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পোপ-বিরোধী খ্রিস্টীয় ধর্ম-বিপ্লবের সময় থেকে এটি বোঝাত মিথ্যা অথবা কাল্পনিক কোনও সত্যকে। মার্টিন লুথার 'Legend' শব্দটিকে মজা করে মিথ্যার একটি প্রতিশব্দ দেখিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায়, ধর্মীয় বিতর্কে 'Legend'-এর কোনো উচ্চস্থান নেই। এ ধারণায় 'Legend' হল এমনই একটি কাল্পনিক কাহিনি, যা বোকারাই বিশ্বাস করে। Alexander H. Krappe তাঁর 'The Science of Folklore' গ্রন্থে 'Legend' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য 'Legend'-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'ইতিকথা' শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। যদিও এই শব্দটি বহুজন গৃহীত বা স্বীকৃত হয়নি। অবশ্য 'Legend'-কে ইতিহাস বলে মনে করারও কোনো কারণ নেই। আবার তাকে 'বাজেকথা' কিংবা 'অশ্রদ্ধেয় উক্তি' বলে মনে করারও কোনো কারণ নেই। প্রকৃতপক্ষে 'Legend' শুদ্ধ ইতিহাস তো নয়ই, যদিও তার ভিত্তিভূমিতে ইতিহাস থাকা সম্ভবপর বলেই বিশ্বাস করা হয় এবং 'Legend' বিচারের ক্ষেত্রে আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিদ্ এবং নৃতত্ত্ববিদ্গণ তার ইতিহাসগত সত্যতাকে একেবারে বর্জনও করেন না। সুধীর কুমার করণ 'Legend' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'অবদান' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে মূলত ইউরোপীয় পরিমণ্ডলের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বা ধর্মসভায় সাধুসন্ত বা শহিদদের যে জীবনী পর্যালোচনা করা হত তাকেই বল হত 'Legend'। এইসব সাধুসন্ত কিংবা ধর্মীয় ব্যাপারে আত্মোৎসর্গকারী শহিদরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিন্তু বাস্তবতা অপেক্ষা অতিরঞ্জিত ছিল এইসব কাহিনির ভিত্তি এবং তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে অতিরঞ্জিত কাহিনিকেই 'Legend' বলা হত। পরবর্তীকালে জাতীয় বীরপুরুষদের কাহিনিও 'Legend'-এর অঙ্গীভূত হয়। সেই দিক থেকে তিনি 'Legend' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে 'অবদান' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। যদিও এই অবদান শব্দটি প্রাচীন ভারতবর্ষে যথাযোগ্য অর্থেই গৃহীত হয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মীয় অনেক চরিত্রগ্রন্থের নাম ছিল 'অবদান'। যেমন—অশোকাবদান, বোধিসত্ত্বাবদান প্রভৃতি। অবশ্য লোকজীবনের প্রেক্ষিতে 'Legend'-এর প্রসার ঘটেছে ব্যাপক অর্থে, যার মধ্যে জনশ্রুতিমূলক অসংখ্য প্রাচীন কাহিনি অবদানিক ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে গেছে। এইসব কাহিনিকেও সত্য বলে মনে করা হয়—তা যতই অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব হোক না কেন। ভূত-প্রেত, দত্যি-দানো, ডাইনি-পরী বা অনেক কিছুই যা আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব, 'Legend'-এ তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। যাই হোক, ইংরেজি 'Legend' শব্দের বহুপ্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ হল 'কিংবদন্তী'। এক কথায় বলা যায়, 'ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে লৌকিক কথাসাহিত্যের রূপ ধারণকারী লোককাহিনিকে কিংবদন্তী বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।' মুহম্মদ ফরিদউদ্দিন তাঁর 'কাহিনি-কিংবদন্তী' গ্রন্থে কিংবদন্তীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"যুগের পর যুগ যেসব সাহিত্য মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে সেইসব লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখাকাহিনি কিংবদন্তী বা জনশ্রুত কাহিনি।" সুবোধ ঘোষ তাঁর 'কিংবদন্তীর দেশে' গ্রন্থে কিংবদন্তীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক কোনো বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় করে যে কাহিনি জনগণের কোনো কল্পনার রূপ গ্রহণ করে সেই কাহিনিকেই যথার্থ কিংবদন্তী বলা যায়।"

মন্দির, পূজার থানকে কেন্দ্র করে যে কল্পকাহিনি শোনা যায় তাকে দেবস্থানকেন্দ্রিক কিংবদন্তী বলে। এই শ্রেণির কাহিনিতে অনেক অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য কাহিনিও দুষ্প্রাপ্য নয়। দেব-দেবীর মূর্তি বা অবয়ব বা প্রতিমাকে কেন্দ্র করে যে কল্পকাহিনি জনমানসে প্রচলিত আছে তাকে দেব-দেবীর মূর্তি বা প্রতিমাকেন্দ্রিক কিংবদন্তী বলা হয়। বিভিন্ন দেব-দেবী সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী জনশ্রুতি লোককথা পাওয়া যায়। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় বর্ধমান জেলায় দেবী দুর্গা সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী-জনশ্রুতি-লোককথাগুলি।

রাঢ়েশ্বরী সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত

বর্ধমান শহরের দুটো পাড়ার নাম জড়িয়ে আছে এই দেবীর নামে, সর্বমঙ্গলাপাড়া এবং বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া। এই বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়া থেকেই দেবীকে আজকের সর্বমঙ্গলা পাড়ায় নিয়ে আসা হয়—এমনই কিংবদন্তী। জনশ্রুতি অনুযায়ী বাহির সর্বমঙ্গলা পাড়ার চুনারিপুকুরে (এখনও বর্তমান) জলের তলায় দেবীমূর্তিটি পড়ে ছিল। সেখানকার বাসিন্দা বাগ্দিরা পুকুরে মাছ-গুগলি ধরার সময় মূর্তিটি খুঁজে পান। মূর্তিটি পেয়ে তাঁরা যখন বিস্ময়ে দিশেহারা তখন নাকি পুকুরের পাশ দিয়ে দু-জন বা তিনজন ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। তাঁরা পাপের ভয় দেখিয়ে মূর্তিটি বাগ্দিদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেন। বর্ধমানের মহারাজ তার আগের রাতে এই দেবীর স্বপ্ন দেখেন। কথা প্রসঙ্গে মহারাজের কানে এল বাগ্দিদের মূর্তি প্রাপ্তির সংবাদ। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে শোনেন বাগ্দিদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণেরা মূর্তি নিয়ে চলে গেছেন। আবার পিছু ধাওয়া করে মহারাজ তাদের ধরে ফেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা মূর্তি দিতে রাজি নন। শেষ পর্যন্ত মন্দির তৈরি করে দেবীর প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ

করে জমি, হীরে আর জহরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে তাঁরা সম্মত হন। এইভাবেই দেবী সর্বমঙ্গলার প্রতিষ্ঠা হয় বলে কিংবদন্তী প্রচলিত।

ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবীর খুবই খ্যাতি। এই দেবী সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতি বিশেষ প্রচারিত। সেটি হল, এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হ্রদ-সদৃশ বিশাল ধামাচিয়া দীঘি বর্তমান। এই দীঘির ঘাটে এক কন্যা দেবীপূজারী ব্রাহ্মণ তনয়া পরিচয় দিয়ে ভানু দত্ত নামে এক শাঁখারির কাছে শাঁখা পরেন। শাঁখার দাম চাইলে সেই কন্যা বলেন শাঁখারির বাড়ির কুলুঙ্গিতে তিনি এই শাঁখার দাম রেখে এসেছেন। অবিশ্বাস সত্ত্বেও শাঁখারি নিজের বাড়ি গিয়ে দেখেন সত্যই কুলুঙ্গিতে দাম রাখা আছে। অবিশ্বাস্য ঘটনায় চমকিত হয়ে শাঁখারি পুনরায় ঘাটে ছুটে আসেন, তখন সেই কন্যার শাঁখা পরা হস্তযুগল পুকুরের মাঝে দেখতে পান। এতক্ষণে শাঁখারি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। দেবী যোগাদ্যাই তাঁর কাছে শাঁখা পরেছেন, তিনি তখন তাঁকে চিনতে পারেন নি, এই কথা বুঝে তিনি ঘাটে বসে প্রণাম করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন।

শাঁখারি গ্রামের শংকরী মা

বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের শাঁখারি গ্রামের গ্রামদেবী অষ্টভূজা দুর্গা শংকরী মা। লোককথা অনুযায়ী বাসুদেবপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত রায় পরিবারের কোনো পূর্বপুরুষ এক রাতে স্বপ্ন দেখেন, গ্রামের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ওয়ানিয়া ও চক গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবহমান দামোদরের এক খালের পূর্ব গায়ে শংকরী বাঁধ নামক পুষ্করিণীগর্ভে দেবী শংকরী নিমজ্জিত রয়েছেন। তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে গ্রামে প্রতিষ্ঠা পূর্বক পূজা করার নির্দেশ পান। তিনি দেবীকে উদ্ধার করে সুউচ্চ বেদি নির্মাণ করে তার ওপরে দেবীর মন্দির নির্মাণ করে তাঁকে স্থাপন করেন। ১২টি সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দির চত্বরে উঠতে হয়। তারপর আরও দুটি সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে। প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের সামনে একটি সুশোভন নাটমন্দির বর্তমান মন্দির-অভ্যন্তরে চারুদর্শনা কষ্টি পাথরে নির্মিত নয়নমনোহর অষ্টভূজা দেবী দুর্গা রয়েছেন।

এরুয়ার গ্রামের সিংহবাহিনী

লোকশ্রুতি অনুযায়ী একদা ভাতাড় ব্লকের এরুয়ার গ্রামের প্রখ্যাত জমিদার রায় পরিবারের কোনো পূর্বপুরুষ হঠাৎ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী দুর্গা তাকে বলছেন আমি দেবী সিংহবাহিনী, গ্রামের দক্ষিণে তোমাদেরই বড় পুকুর কাজুলেতে দীর্ঘদিন নিমজ্জিত আছি। তুমি সত্বর আমায় তুলে নিয়ে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে পূজা কর। ঘুম ভাঙলেই জমিদার ছটফট করতে থাকেন ভোরের অপেক্ষায়। সকালে বাগদিদের জলে নামিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেবী সিংহবাহিনীকে উদ্ধার করেন, দেবীমূর্তি চৌধুরীদের দালানের তিনতলায় প্রতিষ্ঠা করেন।

সাঁকতোড়িয়ার মাজি পরিবারের ঈশ্বরী মা

আসানসোল শিল্পাঞ্চলের কুলটির সাঁকতোড়িয়া গ্রামে মাজি পরিবারের কৌটোয় রাখা ঈশ্বরী মা সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি বহুল প্রচলিত। সেটি হল—একদা গ্রামের এক মহিলা দেবীর অবয়ব দেখার জন্য ১৮ ভরি বড় রুপোর কৌটোর মধ্যে ছোটো এক কৌটোয় রাখা দেবী প্রতিমা কৌটো খুলে দেখতে চেষ্টা করলে তাঁর চোখদুটি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে আর কেউ সে চেষ্টা করেনি। ফলে অধরা মাধুরীর মতোই দেবীমূর্তির আকার অজানাই থেকে যায়।

মাহাতা গ্রমের ঈশানী দেবী

বর্ধমান জেলার ভাতাড় ব্লকের মাহাতা গ্রামের ঈশানী দেবী সম্পর্কে একটি লোকশ্রুতিতে জানা যায়, একদা এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত কবিরাজ পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে দেবী স্বপ্নাদেশে জানান, তিনি দীর্ঘদিন ঠাকরুণ-কুড়ি পুকুরের জলে নিমজ্জিত আছেন, তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে পুজোর ব্যবস্থা করতে। কবিরাজ কর্তা পরের দিনই পুকুরে খোঁজাখুঁজির করে এক অপূর্ব শ্রীময়ী প্রস্তরমূর্তির দেবী ভদ্রকালীকে উদ্ধার করেন এবং পুকুরের পাড়েই তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু এই পুকুর গ্রামের ঈশান কোণে অবস্থিত তাই দেবী 'ঈশানী' নামেই খ্যাত হন।

সোঁয়াই গ্রামের দুর্গা

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বর্ধমান জেলার গলসি ব্লকের সোঁয়াই গ্রামে কাটোয়ার বাকলসা থেকে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় এসে বসবাস শুরু করেন। এক রাত্রে বাসুদেব স্বপ্ন দেখেন পৈতৃক বাড়ি বাকলসার দেবী দুর্গা তাঁকে বলছেন—তুই আমাকে সোঁয়াই গ্রামে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা কর। এই আজ্ঞা পেয়ে বাসুদেব তাঁর তিন পুত্র—ভবানী, রামনারায়ণ ও রামকিংকরকে নিয়ে বাকলসা যাত্রা করেন। চার বাপ-বেটা মিলে বাকলসা থেকে কাঁধে করে বাদশাহী সড়ক ধরে সোঁয়াই ফিরছিলেন। পথে বর্ধমানরাজের সেপাইরা তাঁদের পথরোধ করেন এবং বলেন, এই পথ দিয়ে সেপাইরা যাচ্ছেন তাই তাঁরা এই পথ দিয়ে আসতে পারবেন না। রাজা এসে সব কথা শুনে ব্রাহ্মণদের নিষ্ঠা দেখে তাঁদের দেবী প্রতিষ্ঠার জন্য সোঁয়াই গ্রামে এক বিরাট ভূসম্পত্তি দেবীর সেবায় দেবোত্তর করে দেন। তবে উল্লেখ্য সেই বর্ধমান শাসক ছিলেন জমিদার কৃষ্ণরাম রায়, তিনি 'রাজা' ছিলেন না।

কলিগ্রামের জয়দুর্গা

মন্তেশ্বর ব্লকের কলিগ্রামের দেবী জয়দুর্গা সম্পর্কে লোককথা হল, একদা মির্জাপুরের এক চাষি জমিতে কোদাল চালাতে চালাতে এই অষ্টভূজা দেবী জয়দুর্গা উদ্ধার করেন। বর্ধমানরাজ মির্জাপুরে হাজির হয়ে ঘোষণা করেন, যে-ব্যক্তি এই এই মূর্তি মাথায় করে নিজ গ্রামে নিয়ে যেতে পারবে এই দেবী সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হবে। অনেক প্রচেষ্টার পর কলিগ্রামের সাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্যানার্জী পরিবারের এই ব্যক্তি অবলীলাক্রমে এই মূর্তি বহন করে নিজ গ্রামে নিয়ে যান। ফলে রাজার প্রচেষ্টায় কলিগ্রামে মন্দির তৈরি হয়ে সেখানে ওই দেবী অষ্টভূজা সিংহবাহিনী জয়দুর্গা নামে খ্যাত হয়ে পূজিত হতে থাকেন।

মন্তেশ্বরের দেবী চামুণ্ডা

মন্তেশ্বর ব্লকের মন্তেশ্বর গ্রামের দেবী হলেন চামুণ্ডা। এই দেবীর প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত জনশ্রুতি হল—এই দেবী গ্রামের কাছে জামার বিলে নিমজ্জিত ছিলেন। একদিন গ্রামের চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ পরিবারের এক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হন দেবীকে উদ্ধার করে পুজো করার জন্য। সেই ব্যক্তি বাগদি ও কৈবর্তদের নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেবীকে উদ্ধার করেন এবং দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন।

মির্জাপুরের জয়দুর্গা

বর্ধমান শহরের কাছেই মির্জাপুর গ্রাম। লোককথা অনুসারে

বর্ধমানরাজ তেজচাঁদ (১৭৭০-১৮৩২ খ্রি.) একদা দেবীর স্বপ্নাদেশ পান যে, মির্জাপুরে পেঁকো পুকুরে দেবী জয়দুর্গা নিমজ্জিত আছেন। দেবী স্বপ্নে তাঁকে উদ্ধার করতে বলেন। সেই মতো রাজা মির্জাপুরে যান এবং ওই পুকুর থেকে মাত্র ছয় ইঞ্চির জয়দুর্গা দেবীর প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর সেবার জন্য কিছু ভূমিও দান করেন। জনশ্রুতি আছে, দেবীরা নাকি সাত বোন, বাকিরা কলিগ্রাম, শুনুর, আমারুন ইত্যাদি গ্রামে পূজিত হচ্ছেন।

কাঁকসার শ্যামারূপা দেবী

বাংলার পাল রাজত্বকালে প্রথম মহীপালের শাসনকালে (৯৭৭-১০২৭ খ্রি.) বর্ধমান জেলার গোপভূম পরগনার শাসক ছিলেন ইছাই ঘোষ। তিনি কাঁকসার জঙ্গলে প্রতিষ্ঠা করেন দেবী শ্যামারূপাকে। কথিত আছে ইছাই ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দশভূজা সিংহবাহিনী দুর্গা পরবর্তীকালে দেবী শ্যামারূপা নামে পরিচিত হন। শ্যামারূপা নামকরণ সম্পর্কে একটি লোককাহিনি প্রচলিত আছে। একদা অজয় নদের দক্ষিণে গহন অরণ্যের আবর্তে বীরাচারী কাপালিকদের হাতে ইছান পূজিত দেবী ভবানীর পূজার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায়, সে পূজায় নরবলি প্রদানে মাতৃ আরাধনা শুরু হয়েছিল। অন্যদিকে, অজয়ের ঠিক উত্তর দিকে কেন্দুবিল্বের কদমখণ্ডিতে বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা লক্ষ্মণ সেনের এক সময়ের সভাসদ তথা প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক কবি জয়দেবের সাধনস্থল। সেই প্রেমপূজারী পরম বৈষ্ণব কবি জয়দেব নরবলি সহ মাতৃপূজা কোনো মতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি নরবলি বন্ধের উদ্দেশ্যে একদিন কাপালিকের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন যে কাপালিক যে শ্যামা মাকে তুষ্ট করার জন্য নরবলি দেন, সেই শ্যামা মাকে উপস্থিত হয়ে বলতে হবে তিনি তুষ্ট হন এই নরবলিতে। তা না হলে জয়দেব দেখাবেন তাঁর শ্যামকে এবং কাপালিককে নরবলি বন্ধ করতে হবে। কাপালিক শর্তে রাজি হলেন কিন্তু, মাকে দেখাতে পারলেন না। তখন কবির কাতর প্রার্থনায় তাঁর ইষ্ট শ্যামসুন্দরের আবির্ভাব ঘটে। শ্যামসুন্দরের বিশ্ববিমোহন রূপ দেখে বিমোহিত হয়েই পরাজয় স্বীকার করলেন। ফলে মায়ের কাছে নরবলি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। আর যেহেতু শ্যামা মা রূপ পরিবর্তন করে হয়েছিলেন শ্যাম, তাই তখন থেকেই দেবী হলেন শ্যামরূপা > শ্যামারূপা।

দিগনগরের দেবীদুর্গা

আউসগ্রাম থানার দিগনগরে পাল পাড়ায় পাল পরিবারে দেবী দুর্গার কাটা মুণ্ডু পুজোর রীতি দেখা যায়। কেন কাটা মুণ্ডু পুজো হয় সে সম্পর্কে দুটি লোকশ্রুতি চালু আছে। একটি হল পাল পরিবারের পূর্বপুরুষ ঠাকুরদাস পালের স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় সহমরণে তোলা হয়, যা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না, তাই তিনি ক্রোধে দেবীর মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন। সেই থেকে কাটা মুণ্ডু পুজো শুরু হয়। দ্বিতীয় লোকশ্রুতিটি হল, দেবীর এক সময় প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল এবং ক্ষুধার জ্বালায় তিনি নিজের দেহ খেয়ে ফেলেছিলেন, তাই কাটামুণ্ডু অবশিষ্ট থাকায় সেটাই পুজো করা হতে থাকে।

শিলাকোটের মা দুর্গা

ভাতাড় ব্লকের শিলাকোট গ্রামে মা দুর্গার পূজা হয় পরম শ্রদ্ধায়। এই দেবীর বলিদান প্রসঙ্গে একটি লোককথা উল্লেখযোগ্য। একবার পুজোর বলিদানের সময় সকলে উপস্থিত। কিন্তু ঘড়িতে বলিদানের ক্ষণ আসে না। খবর আসতে থাকে আশপাশের গ্রামের বলি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু শিলাকোটের মায়ের থানে উপস্থিত কারও ঘড়ির কাঁটা আর এগোয় না। তখন সকলে হাতঘড়ি বাড়িতে খুলে এসে বলিদান সম্পন্ন করেন। সেই থেকে লোকবিশ্বাস শিলাকোটের মা বলিদানের সময় ঘড়ি পরা অপছন্দ করেন। তাই ওই সময় ঘড়িপরা বারণ।

দক্ষিণখণ্ডের চ্যাটার্জী পরিবারের মা দুর্গা

অণ্ডাল ব্লকের দক্ষিণখণ্ড গ্রামে বহুকাল পূর্বে পণ্ডিত ঋষিকেশ ভট্টাচার্য দুর্গাপূজার সূত্রপাত করেন। লোককথা অনুযায়ী একবার পূজা চলাকালীন এক শিশুকন্যা এসে হালুইকরের কাছে বার বার মাংস খাবার আব্দার করলে বিরক্ত হালুইকর তাকে গরম হাতার ছেঁকা দিয়ে দেয়। সেই কন্যা যন্ত্রণায় কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। সেই রাতেই গৃহকর্তা স্বপ্ন দেখেন যে, সেই শিশুকন্যা বলছে, আমি দেবী দুর্গা, মাংস খেতে চেয়ে হাতে ছেঁকা নিয়ে ফিরেছি। তোর বংশ নির্বংশ হবে। সেই দেবীর বাক্য অনুযায়ী ভট্টাচার্য বংশ নির্বংশ হয় এবং ওই বংশের দৌহিত্র হিসেবে পুজোর উত্তরাধিকার পায় কামদেব চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার দেবী আরাধনার ব্যবস্থা করে থাকে।

রাজকুসুমের হরগৌরী

প্রায় তিনশ বছর আগে সাধক ভগবতী ব্যানার্জী কাঁকসা থানার রাজকুসুম গ্রামে হরগোরী দেবীর পূজা শুরু করেন। এই দেবী সম্পর্কে বহুশ্রুত শাঁখা পরার কাহিনি যুক্ত। কাহিনিটি এরূপ : ভগবতী ব্যানার্জীর কাছে এক শাঁখারি একদিন দুপুরবেলা এসে বলেন তাঁর কন্যা কাছেই বাঁধের ঘাটে তার কাছে শাঁখা পরেছে এবং বলেছে তাঁর পিতা ভগবতী ব্যানার্জীর কাছ থেকে দাম নিতে। এই কথা শুনে ভগবতী ব্যানার্জী খুব রেগে যান এবং বলেন, তাঁর কোনো কন্যা নেই। তবুও শাঁখারি বলেন, তাঁর কন্যা তাঁকে বলেছে, শাঁখার দাম কুলুঙ্গির কৌটোয় রাখা আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভগবতী ব্যানার্জী কুলুঙ্গিতে গিয়ে দেখেন কৌটোয় শাঁখার দাম অনুযায়ী টাকা রাখা আছে। তখন ভগবতী ব্যানার্জী দেবীর ছলনা বুঝতে পেরে ছোটেন বাঁধের ঘাটে। তাঁর কাতর আহ্বানে জলের ওপর দুটি শঙ্খপরিহিত হাত দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের জীবন সার্থক হয়ে যায়। সেই ভাগ্যবান শাঁখারির বংশধরেরা বাঁকুড়ার খুটগড় গ্রাম থেকে প্রতিবছর ষষ্ঠীর দিন এসে বিনামূল্যে শাঁখা পরিয়ে যান।

রণডিহার ব্যানার্জী পরিবারের দুর্গা

বুদবুদ থানার রণডিহার বানার্জী পরিবারের দুর্গাপূজা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত। সেটি এরূপ : এই ব্যানার্জী পরিবারের এক পূর্বপুরুষ দুর্গাপূজার সময় একদিন শাঁখা বিক্রি করতে কোটা গ্রামে যান। সেখানে ক্ষুধা-পিপাসা নিবারণের জন্য কোটার মিত্র পরিবারের দুর্গা মন্দিরে হাজির হলে মিত্ররা তাঁকে তাড়িয়ে দেন। ক্ষুধাতুর হয়ে তিনি এক গাছতলায় বসে পড়েন। তখন এক কিশোরী কন্যা দু-জোড়া মণ্ডা আর এক গেলাস জল দেয়। তখন শাঁখারি বলে, তার বাড়ি যাবার শক্তি নেই। তখন সেই কিশোরী কন্যা তাকে বলে চোখ বন্ধ করে রাখতে। কিছুক্ষণ পর শাঁখারি চোখ খুলে দেখেন তিনি নিজের বাড়িতে রয়েছেন। সেই রাতে তিনি স্বপ্নাদেশ পান। ওই কিশোরী বলছে আমি কোটার মিত্রদের দুর্গা। আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে আয়। এছাড়াও কন্যা বলে, মিত্রদের আমি স্বপ্ন দেব তারা দেবী ছেড়ে দেবে। তুই আমাকে নিয়ে এসে পুজো কর। পুজোর খরচ আমিই যোগাবো। একথা শুনে পরের দিন শাঁখারি ব্যানার্জী কোটায় যান এবং মিত্রদের বাড়ি থেকে দুর্গাকে নিয়ে এসে পুজো শুরু করেন। সেই পুজো এখনও চলছে। একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই দুর্গাপূজা হয় পুরো একমাস ধরে।

বহুলার পালবাড়ির দুর্গা

বহুলা গ্রামের পাল পরিবারের দুর্গাপূজা সম্পর্কে যে লোককাহিনি পাওয়া যায় সেটি হল—পূর্বপুরুষ ক্ষেত্রনাথ পাল তাঁর নিকটবন্ধু উখরা নিবাসী জমিদার মলিন্দ্রবিহারী হাণ্ডার সিং-এর বাড়িতে রথযাত্রা উৎসব দেখতে যান। ফেরার সময় শীতলপুরের বাঁধের কাছে পা পিছলে পুকুরে পড়ে গিয়ে দুদিন জলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন। বেঁচে বাড়ি ফিরে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন দেবী দুর্গা তাঁকে বলছেন—শীতলপুরে বাঁধের ধারে একটি টাট পড়ে আছে। সেটি নিয়ে এসে মূর্তি গড়ে আমার পুজো কর। সেই মতো পরের দিন শীতলপুরের বাঁধের ধারে গিয়ে ক্ষেত্রনাথ পাল টাট সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দুর্গাপূজা শুরু করেন। সেই পুজো এখনও চলছে।

এছাড়াও দেবী সম্পর্কে বহুশ্রুত একই ধরনের বহু কাহিনি শোনা যায়, যেগুলি অন্য দেবীর লোককথা-কাহিনির সাথে প্রায় মিলে যায়। কোথাও শোনা যায়—মাটিতে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারতেই দেবী দুর্গার স্বর্ণমূর্তি বেরিয়েছিল, কিন্তু সেই মূর্তি তারা দেখাতে পারেন না। কোথাও শোনা যায় অষ্টমীর ক্ষণে অন্তরীক্ষ থেকে গোলার আওয়াজ পাবার কথা। এভাবে দেবী দুর্গা সম্পর্কে বহু কিংবদন্তী, লোককথা, লোকশ্রুতি শত শত বছর মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। এসব পেরিয়ে দেবী দুর্গা সকলের মা দুর্গা হয়ে ওঠেন বছরের কটা দিন। বাঙালির সর্ববৃহৎ পরবে কিংবদন্তী লোকশ্রুতি-লোককথা-জনশ্রুতি মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১. শ্যামসুন্দর প্রধান, *কিংবদন্তী : উৎস নির্ণয় ও বিশ্লেষণ*, কলকাতা, ২০১১
২. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, *পূজা-পার্বণ*, বিশ্বভারতী, ১৪১০
৩. সুবোধ ঘোষ, *কিংবদন্তীর দেশ*, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৬৮
৪. সুধীরকুমার করণ, *লোককথার দিক-দিগন্ত*, পাটনা, ১৯৯৯
৫. শিবশংকর ঘোষ, *বঙ্গের শারদোৎসব ও ব্যতিক্রমী দুর্গাপূজা*, কলকাতা, ২০০৯
৬. প্রদীপ কর ও তুলসীদাস মাইতি (স.), *বাংলার ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো*, 'টেরাকোটা', শারদীয়া, ২০১১
৭. মৃণালজিৎ গোস্বামী (স.), *দক্ষিণবঙ্গে দেবী দুর্গা*, আস্থা কমিউনিকেশন, পানাগড়, ২০০৫

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হামুনপুর এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

আমাদের সমবায় আমানত সঞ্চয় প্রকল্প ও সার, কীটনাশক বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

দীনবন্ধু হালদার

ম্যানেজার

Sl. No. 3

With best compliments of

Mukherjee Construction Co.

COVT. CONTRACTOR

মুখার্জী কনস্ট্রাকসন কোং

Civil, Structural, Mechanical Contractor & General Order Suppliers

Kalajharia Road, Satyajit Nagar, Asansol-713304
Phone : (0341) 2283396, Mob. 9734777842, 9434237165
Fax No. +91341-2283396, E-mail : mcc.asansol@gmail.com

Sl. No. 51

এক পথে দুটি বুগিয়াল : নওয়ালী ও বাগচী

বিলাস চ্যাটার্জি

হিমালয়ের কোলে এমন অনেক জায়গা রয়েছে যার সন্ধান এখনও ট্রেকারদের কাছে নেই। সেইসব জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দারা চলাচলে সড়গড়। এমনই অজানা পথের সন্ধান করতে গিয়ে অনেক নতুন ট্রেকিং রুটের সন্ধান পাই। বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারণে চেনা ট্রেকিং রুট যখন সঙ্গ দেয় না তখন এই সব স্বল্প উচ্চতার অজানা ট্রেকিং রুটই আমাদের চলার পথ দেখায়। সপরিবারেও যাওয়া যায় সেখানে।

গাড়োয়াল হিমালয়ে বিভিন্ন জায়গায় অনেক বুগিয়াল আছে। চারদিক তুষারাবৃত শৃঙ্গ ঘেরা প্রায় ১০-১৫ হাজার ফুট উচ্চতার এই বুগিয়ালগুলো হিমালয়ের প্রাণবিন্দু। বলে রাখি, বুগিয়াল হল 'চারণক্ষেত্র'। যাই হোক, এমনই এক ছোটো ট্রেকিং-এর সন্ধানে গত অক্টোবর মাসে রওনা দিই। এই যাত্রায় আমার সাথী সুমিত, সুমিতের স্ত্রী বনানী, তাদের ১২ বছরের কন্যা ঈশিতা, আমার দীর্ঘদিনের ট্রেকিং-পার্টনার সত্তর বছরের সুকোমল রায় ওরফে নয়নদা। সেই ট্রেকিংএ আমরা দুটি বুগিয়াল ঘুরে অন্য পথে নেমে আসার পরিকল্পনা করি। 'নওয়ালী' ও 'বাগচি' বুগিয়াল শীতের সময় বরফে ঢাকা থাকলেও এপ্রিল-মে মাস থেকে বরফ গলে গিয়ে এইসব জায়গা কচি ঘাস ও গুল্মে ভরে যায়। এরপর বর্ষার সময় এই বুগিয়ালগুলি রঙিন হয়ে ওঠে নানান জানা অজানা ছোটো ছোটো ফুলে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ছাগল ভেড়া চরে বেড়ায় সেই চারণক্ষেত্রে। যারা এইসব গবাদি পশু চরাতে বেরোয়, তাদের কাছ থেকেই নতুন নতুন যাত্রাপথের সন্ধান মেলে।

বর্ধমান থেকে দুন এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে দেবল গ্রাম। দেবল খুবই পরিচিত ও পুরোনো জনপদ। অতীতে এখান থেকেই 'রূপকুণ্ড' ট্রেকিং শুরু হত। দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক সহ জমজমাট এই জনপদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজও অমলিন। সবুজ বনানীর সাথে শ্বেতশুভ্র হিমশৃঙ্গের মিলিত রূপে মুগ্ধ হয়ে দু-একদিন এখানে অনায়াসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

এই যাত্রায় আমাদের পথপ্রদর্শক জয়বীর সিং। জয়বীর আমার পূর্ব-পরিচিত। রান্নার হাত বেশ ভালো। ফলে এই যাত্রায় খাওয়া-দাওয়ার কোনো সমস্যা হবে না ভেবে ভালোই লাগল। জনপদের শুরুতেই জি.এম.ভি.এন.-এর ট্রেকার্স হাট-এ ভোজন ও রাত্রিযাপন।

পরদিন সকালে বোরোতে একটু দেরি হল। সাড়ে আটটা নাগাদ গাড়িতে মালপত্র তুলে দেবল থেকে সাওড় গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। দেবল বাজারে সকালের খাবার হিসেবে আলুর পরোটা খেয়ে সাওড় গ্রামে পৌঁছাই বেলা ১১টা নাগাদ। দেবল থেকে এই সাওড় গ্রামের দূরত্ব মাত্র ১২ কিমি হলেও পথ অতি ভঙ্গুর ও বিপজ্জনক। এতটুকু পথ যেতে আমাদের এক ঘণ্টার ওপর সময়

লাগল। আমাদের সাথে দুটো ঘোড়া যাবে। এরা এখানে আগে থেকেই তৈরি ছিল। গাড়ি থেকে মালপত্র দুটো ঘোড়ার পিঠে তুলে বেলা সাড়ে-এগারোটা নাগাদ পদযাত্রা শুরু করি।

গ্রামের ভেতর দিয়ে কঠিন চড়াই বেয়ে ওঠা। গ্রাম শেষ হতেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। যতই এগোতে থাকি জঙ্গলের গভীরতা ততই বাড়তে থাকে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পাকদণ্ডী পথ। এই পথে যে মানুষজনের চলাচল আছে তা বোঝা যায় কোথাও পথ গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একাধিক দিকে চলে গেছে। বহুধাবিভক্ত এই পথে একা একা হাঁটা বিপজ্জনক। তাই গাইড বা পোর্টারের সঙ্গেই পথ চলা। দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেওয়ার সময় স্থানীয় মানুষজনের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। মন্দ লাগে না। জানতে পারি যে পাহাড়ের ওপর গরু, মোষ নিয়ে এখন অনেকে বাস করছে। তাই সারা দিন এই পথে মানুষজনের যাতায়াত।

যতই এগিয়ে চলি চড়াই তত বাড়তে থাকে। দিনের শেষে এমন চড়াই-এ উঠতে বেশ কষ্ট হয়। ক্রমশ জঙ্গল কমে আসে। একটা প্রায় সমতল জায়গায় পৌঁছাই। এখানে বেশ কয়েকটি গোট আছে। স্থানীয় ভাষায় বাড়িকে গোট বলা হয়। পাহাড়ের ওপর জঙ্গলের মাঝে এমন ছোট্ট ঘাসে ঢাকা একখণ্ড সমতল জায়গাকে খরগ বলে। এখানে কিছু অস্থায়ী ঘর বানিয়ে নীচের গ্রাম থেকে আসা মানুষ গরু, মোষ নিয়ে বসবাস করে। শীতের সময় তারা নিজেদের গ্রামে ফিরে যায়। এমনই কয়েকটা ঘরের মাঝে আমাদের তাঁবু খাটানো হল। একটি পরিত্যক্ত ঘর হল আমাদের রান্নাঘর। এই জায়গাটার নাম সোপানী খাল। আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় দূরের কিছুই নজরে আসে না। তবে নীচের দিকের গ্রামগুলি নজরে আসে। সোপানী খালের উচ্চতা বেশি নয়, ৭ হাজার ফুটের মধ্যেই হবে। তাই ঠাণ্ডা বেশি নয়। একটু জিরিয়ে নিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে বাইরে এসে বসলাম। কয়েকটা ফটো তোলা হতে না হতেই সন্ধ্যা নেমে আসে। অগত্যা তাঁবুর ভেতর বসেই আড্ডা জমল নৈশভোজ পর্যন্ত।

পরদিন সকালে উঠে তৈরি হয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে যাত্রা শুরু করতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। জয়বীর আমাদের পথপ্রদর্শক। পিছনে দুজন তাঁবু গুছিয়ে ঘোড়া নিয়ে আসবে। যাত্রা শুরু হতেই ধোঁয়ার মতো মেঘ এসে চারদিক ঢেকে দেয়। সেই মেঘের ভিতর দিয়েই এগিয়ে চলি। কঠিন চড়াই ভেঙে এগিয়ে চলা। পথ চলেছে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সকলে একসাথে হেঁটে চলি। এমন ঘন জঙ্গল, তার ওপর কুয়াশা ঢাকা। পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশি। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর পাহাড়ের একটা মাথায় উঠে আসি। একখণ্ড ঘাসে ঢাকা প্রায় সমতল জায়গা। নাম জিরিয়া ক্ষেত। জিরিয়াতে একটু জিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না। এই আবহাওয়ায় বসে থাকলেই শীত যেন শরীরকে কামড়ে ধরছে। গায়ের গেঞ্জি ঘামে ভিজে আছে। ধীর লয়ে এগিয়ে চলি। পরের পথে আর কঠিন চড়াই নেই। হাল্কা চড়াই-উৎরাই বেয়ে পাহাড়ের গায়ে পথ চলেছে। সাড়ে নটা নাগাদ সোপানী গ্রামে পৌঁছাই। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একখণ্ড সমতল জমিতে কয়েকটি গোট বা বাড়ি নিয়ে এই গ্রাম। এই বাড়িগুলো অস্থায়ী। বছরের কয়েক মাস এখানে পশুপালনের জন্যই বাস করে। যাই হোক, আমরা গ্রামে না ঢুকে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলি জঙ্গলের দিকে। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর এক ছোট্ট সুন্দর বুগিয়ালে পৌঁছাই। সবুজ ঘাসে ঢাকা এই সুন্দর জায়গাটার নাম সোপানী মাল্লার বা আপার সোপানী। রুটি, সবজি, মিষ্টি দিয়ে এখানে সকালের খাবার খাওয়া হল।

এগারটা নাগাদ আবার যাত্রা শুরু হল। কিছুটা পথ কঠিন চড়াই বেয়ে ওঠার পর চড়াই হাল্কা হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কষ্টও কমে। বড় গাছের জঙ্গলের শেষে ছোটো রডোড্রেনড্রন গাছের জঙ্গল দিয়ে এগিয়ে চলি। দেড়টা নাগাদ উঠে এলাম নওয়ালী বুগিয়াল-এ। অনেকটা জয়গা জুড়ে এই বুগিয়াল। হাল্কা চড়াই বেয়ে বুগিয়ালের মাথায় উঠে এসে সামনের পথ বেয়ে এগিয়ে চলি। উপর থেকে দূরের শৃঙ্গগুলি পরিষ্কার দেখা যায়—ত্রিশূল। নন্দাঘুণ্টি সহ আরও কয়েকটা শৃঙ্গও তাই পরিষ্কার দেখতে পেলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে একটু বাম দিকে ঘুরেই পৌঁছাই বুগিয়ালের শেষ প্রান্তে। এখানেই পানীয় জলের ঝরনা আছে দেখে তাঁবু খাটানো হল।

ক্যাম্প সাইটে পৌছানো মাত্রই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে গেল। পরিষ্কার আকাশ ঢেকে গেল কুয়াশায়। ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে বসা যায় না। তাঁবুতে ঢুকে জামা কাপড় পরিবর্তন করে ঘণ্টা

খানেক পর বাইরে আসি। নীচের দিকে কুয়াশা থাকলেও বুগিয়াল পরিষ্কার হয়। সামনেই শৃঙ্গগুলি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাই। বুগিয়ালের চারপাশ ঘুরে তার সৌন্দর্য ক্যামেরাবন্দি করি—সন্ধ্যা নামার আগে পর্যন্ত। আটটা নাগাদ রাতের খাওয়া শেষ করে চাঁদের আলোয় নাওয়ালী বুগিয়ালের রূপ দেখতে আবার তাঁবুর বাইরে চলে আসি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা সবাই সেই সৌন্দর্যের পূর্ণ রস আস্বাদন করি।

দ্বিতীয় দিন এল। সকাল যদি দিনের খবর বলে দেয় তাহলে আজকের দিনটা ভালো যাওয়া উচিত। ভোরের আলো ফুটতেই তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি আকাশ পরিষ্কার, মেঘের চিহ্ন নেই সারা আকাশে। দিনের প্রথম রক্তিম সূর্যালোক এক একে ত্রিশূল, নন্দাঘুণ্টির মাথাকেও রাঙিয়ে তুলেছে। দূরে চোখাম্বা, নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের দেখা পাওয়া যায় এই বুগিয়াল থেকেই। অপরূপ সৌন্দর্য এই বুগিয়ালের। গতকাল রোদ-মেঘের লুকোচুরিতে তা ঠিক বুঝতে পারিনি। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে আমরা এই সৌন্দর্য উপভোগ করি, ফটোও তুলি। আটটা নাগাদ জলযোগ সেরে সাড়ে আটটায় যাত্রা শুরু করি।

বুগিয়াল থেকে আবার আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করি। এবার পথ কঠিন উৎরাই বেয়ে নেমে গেছে। যতই নামতে থাকি জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হয়। যদিও পথরেখা পরিষ্কার দেখা যায়। তাই পোর্টার গাইড ছাড়াই আমরা এগিয়ে চলি। তবে বেশি দূর যাওয়া গেল না। বেশ কিছুটা নেমে এসে পথ দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এই গভীর জঙ্গলে পথ হারানোর আশঙ্কার আর না এগিয়ে সেখানেই বসে জয়বীরের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর জয়বীর এসে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। উৎরাই, উৎরাই আরও উৎরাই বেয়ে নেমে চলা। অনেকটা পথ নেমে এগারোটা নাগাদ পৌঁছোই একটা জলাশয়ের ধারে। একটি পরিবার ভেড়া, ছাগল আর মোষ নিয়ে এই জলাশয়ের পাড়ে গোট বানিয়ে বাস করছে। জায়গাটার নাম 'ঘোরাঘুণ্টি'। এটি একটি ক্যাম্পিং সাইট।

আমরা আজ আরও এগিয়ে যাব। জলাশয়ের পারে বসে আবারও এক প্রস্থ রুটি সবজি খাওয়া হল। গোট থেকে আমাদের এক গ্লাস করে চা দিল। কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু হয়। এবার চড়াই পথে হাঁটা। পাকদণ্ডী পথ বেয়ে ধীর লয়ে এগিয়ে চলি জঙ্গলের ভেতরের পথ ধরে। তিনটে নাগাদ আকাশ কালো করে মেঘ ঢেকে আসে। বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। চলার গতি একটু বাড়িয়ে বাগচি বুগিয়ালের এক প্রান্তে পৌঁছাই। এই সুন্দর ক্যাম্পিং সাইটে আজকের জন্য তাঁবু পড়ে। প্রায় সাথে সাথেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। শিলা সহ বৃষ্টি চলল ঘণ্টা দুই ধরে। অন্ধকার আরও ঘন হলে সাতটা নাগাদ রাতের খাবার পাওয়া গেল। আজ আর দেরি করা যাবে না। বৃষ্টি থামলেও আকাশ মেঘে ঢাকা। ভালো করে দেখা হল না এই সুন্দর বুগিয়ালটি। সারা দিন প্রকৃতি সহায় হলেও শেষ রক্ষা হল না।

পরের দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার। যদিও এই ক্যাম্পে রোদ আসতে অনেকটা দেরি হবে। ঠাণ্ডার প্রকোপ খুব বেশি। চা, বিস্কুট খেয়ে যাত্রা শুরু করি। জয়বীর সহ বাকিরা আসবে একটু পরে। রোদ উঠলে তাঁবুগুলো শুকিয়ে, গুছিয়ে আনবে ওরা। আমরা আছি বুগিয়ালের এক প্রান্তে। অনেকটা নীচে। মূল বুগিয়ালটি অনেকটা উপরে। আড়াআড়িভাবে কঠিন চড়াই বেয়ে অনেকটা উপরে উঠে এসে একটি পথ পাওয়া গেল। সেই পথ ধরেই বুগিয়ালের আর এক প্রান্তে যেতে হবে আমাদের। পথ দূর থেকে দেখা যাওয়ায় গাইড ছাড়াই আমরা এগিয়ে চলি। বাগচি বুগিয়ালও বেশ প্রশস্ত ও অনেকটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা তার একটা ধার দিয়ে হেঁটে চলি। অনেকটা উপরে বাগচি বুগিয়ালের এই প্রান্তে এসে সামনেই তুষারশৃঙ্গের মুখোমুখি হই। সুন্দর এই দৃশ্য অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকি। দশটা নাগাদ জয়বীর এসে পৌঁছায় আমাদের কাছে, একেবারে প্রাতরাশ তৈরি করেই নিয়ে এসেছে। এখানে বসেই খাওয়া হল।

বুগিয়ালে একটু বিশ্রাম নিই। জায়গাটির নাম 'দরাল ক্ষেত'। সুন্দর এই চারণক্ষেতটি লম্বালম্বি ভাবে পার হয়ে আবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উৎরাই বেয়ে নেমে চলা। আড়াইটা নাগাদ পৌঁছাই ঘেস গ্রামে। মূল গ্রামটি অনেকটা নীচে। উপরের এই অংশটিকে বলা হয় আপার ঘেস।

আকাশে মেঘ জমেছিল অনেকক্ষণ ধরেই। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই আপার ঘেস গ্রামে জয়বীরের বাড়ি পৌঁছালাম। ওদের বাড়িতে চা-বিস্কুট খেয়ে একটু জিরিয়ে নিতে নিতেই বৃষ্টি থামল। আবার যাত্রা শুরু করতেই হল। আধঘণ্টা হেঁটে ঘেস গ্রামে পৌঁছে আমাদের অভিযান শেষ হল।

রাস্তার ধারে এসে আমাদের গাড়ির দেখা পেলাম। সেই গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছালাম দেবলের জি.এম.ভি.এন.-এর বাংলোতে। এক অনাবিল স্বপ্নময় অনুভূতি নিয়ে শেষ হল এই পদযাত্রা। পদযাত্রা শেষ হলেও মনের ভেতর এই যাত্রার অনুভব আজও অমলিন হয়ে আছে, থাকবেও বহু দিন।

ছবি : সুস্মিত চ্যাটার্জি

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

প্রথম পুনর্মিলন উৎসব

মানকর ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ

মানকর, বর্ধমান, e-mail : miermankar@gmail.com

সম্ভাব্য তারিখ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭

অংশগ্রহণ করার জন্য যোগাযোগ করুন

দেবদত্ত গুহ, M : 9635327309
রাসবিহারী দাস, M : 9647325608
প্রলয় মণ্ডল, M : 9609776337

জীবাণু ও মানুষ

সুকুমার ঘোষ

সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না এমন সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবীয় বস্তু যারা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, ভূগর্ভে তথা প্রায় সমগ্র জীবমণ্ডলে বিরাজমান তাদের জীবাণু বা অণুজীব বলে। আনুমানিক ৪৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টি হলেও শুরুতে এই পৃথিবী ছিল বন্ধ্যা। বসুন্ধরার বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে এই গ্রহে প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় ৩৮০ কোটি বছর আগে। শুরুতে যে সব জীবেরা (মনেরা, প্রোটিস্টা এবং ছত্রাক) সৃষ্টি হয় তাদের বেশিরভাগই জীবাণু। এই সব জীবেরা পরিবেশের প্রেক্ষিতে তাদের বেঁচে থাকাকে সহজ ও সুনিশ্চিত করতে নিজেদেরকে পরিবর্তিত করতে লাগল এবং ক্রমান্বয়ে জীবের অনুকূল পরিবর্তনগুলি তাদেরকে নানারকম অভিযোজনের মাধ্যমে পরিবেশে সফলভাবে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় জয়ী করল অর্থাৎ প্রকৃতি তাদের তখনকার মতো নির্বাচন করল। নির্বাচিত জীবেরা পাল্টে যাওয়া পরিবেশে আবার প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হল—এইভাবে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাচীন জীব থেকে উন্নততর জীবের উত্তরণ ঘটতে থাকল। সফল বিবর্তনের জন্য জীবেরা অন্যান্য পদ্ধতি ছাড়া আন্তঃক্রিয়া বা মিথস্ক্রিয়ার (reciprocal exchange) সাহায্যে নিজেদেরকে পাল্টাতে লাগল। উপরন্তু একই প্রজাতিতে যৌন জনন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তারের সময় বংশগতীয় বস্তুর (hereditary) উল্লম্ব প্রবাহ এবং কখনও কখনও বিশেষ ঘটনার ফলে ভিন্ন প্রজাতিতে বংশগতীয় বস্তুর আনুভূমিক প্রবাহও চলতে থাকল। বৈচিত্র্যময় এই সব ঘটনাবলীর ফলশ্রুতি হিসেবে দিন দিন জীবনের প্রকারভেদের হারও বৃদ্ধি পেতে থাকল। বর্তমানে এটা সুপ্রতিষ্ঠিত যে জীবাণুদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণও জীবের পরিবর্তনের সহায়ক হয়ে তাদের ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে। মানব জিনোমের (হ্যাপলয়েড কোষের সম জিনকে জিনোম বলে) ক্রম (sequence) পাঠোদ্ধারের পর Henry Gee ২০০১ খ্রিস্টাব্দে 'নেচার নিউজ' পত্রিকায় মানব জিনোমে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া জিনোমের বেশ কিছু অংশের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। ক্রমবিকাশের সময় কোনে কোনো জীবাণু তাদের জিনোমের অংশ অন্য কোনো উন্নত জীবকে প্রদান (আনুভূমিক প্রবাহ) করেছে, ফলে ওই উন্নত জীবের বিবর্তন আরও সহজ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই সব পদ্ধতিগুলির পুনরাবৃত্তি এবং আরও জানা-অজানা কারণের ফলেই ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর জীবের সৃষ্টি হল এবং অবশেষে আনুমানিক এক থেকে দুই লক্ষ বছর আগে এই গ্রহে আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটল।

আধুনিক মানুষের দেহের ভেতরে বাইরে প্রায় সর্বত্রই জীবাণুরা বিরাজমান এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের দেহে থাকা জীবাণুরা তার সারা জীবনের সঙ্গী। আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের সংখ্যা এবং প্রকারভেদ শরীরের অন্যান্য অংশে থাকা জীবাণুদের চেয়ে অনেক বেশি। তাই মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্রকে Madigan ও তাঁর সহকর্মীরা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী জীবাণু পালনের স্থান আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা মানুষের মুখ-গহ্বরে, পৌষ্টিক নালীতে, জননতন্ত্রে, রেচনতন্ত্রে থাকা মিউকাস পর্দায় বসবাসকারী জীবাণুদের উপকারী জীবাণু বলেছেন। সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে মাঝে মাঝে ওই জীবাণুদের প্রয়োজনের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। আমরা সবসময়ই জীবাণুদের সংস্পর্শে থাকি। শ্বাস গ্রহণ (প্রশ্বাস) করার সময় শত শত জীবাণু আমাদের শরীরের ভেতরে ফুসফুসে প্রবেশ করে আবার শ্বাস ত্যাগ (নিঃশ্বাস) করার সময় গৃহীত জীবাণুদের বেশিরভাগ বেরিয়ে আসে। কিন্তু মানব শরীরে বসবাসকারী জীবাণুরা সাধারণত শরীরের ভেতরে থাকে এবং বৃদ্ধি পায়। প্রাণীদেহে জীবাণুরা তাদের বসবাসের এবং বংশবিস্তারের জন্য অনুকূল পরিবেশ পায় বলেই তারা সেখানে স্থায়ী ভাবে থেকে যায়। সুস্থ প্রাণীদের রক্তে, লিম্ফে (fluid that circulates throughout the lymphatic system) এবং স্নায়ুতন্ত্রে জীবাণুদের দেখা যায় না কারণ এই অঞ্চলগুলিতে জীবাণুদের অবস্থান তথা বসবাসের অনুকূল পরিবেশ নেই। তাই ওইসব স্থানে জীবাণুদের উপস্থিতি মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়। মানুষের ত্বক সাধারণত শুকনো এবং আম্লিক (acidic)। তাই এই স্থান জীবাণুদের বৃদ্ধির সহায়ক নয়। তবে ত্বকের ঘর্মগ্রন্থির চার পশে প্রধানত ব্যাকটেরিয়াদের কলোনি থাকতে পারে। দাঁতের গাত্রদেশ জীবাণুদের অবস্থান ও বৃদ্ধির ভালো স্থান। এখানে ব্যাকটেরিয়াদের কলোনি স্তরীভূত হবার সুযোগ পেলে অ্যাসিড ক্ষরণের মাধ্যমে দাঁতের ক্ষতি করে, যাকে আমরা দাঁতের ক্ষয় (dental caries) বলি। পাকস্থলী অম্ল ক্ষরণ করে, ফলে এটি ভীষণভাবে আম্লিক, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাকস্থলী জীবাণুদের অবস্থান ও বৃদ্ধির সহায়ক নয়। নানারকম সরল (অর্ধ-পাচিত) খাদ্যবস্তু সমৃদ্ধ পৌষ্টিক নালী অতি অল্প

> আধুনিক মানুষের দেহের ভেতরে বাইরে প্রায় সর্বত্রই জীবাণুরা বিরাজমান এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের দেহে থাকা জীবাণুরা তার সারা জীবনের সঙ্গী। আমাদের পৌষ্টিকতন্ত্রে বসবাসকারী জীবাণুদের সংখ্যা এবং প্রকারভেদ শরীরের অন্যান্য অংশে থাকা জীবাণুদের চেয়ে অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা মানুষের মুখ-গহ্বরে, পৌষ্টিক নালীতে, জননতন্ত্রে, রেচনতন্ত্রে থাকা মিউকাস পর্দায় বসবাসকারী জীবাণুদের উপকারী জীবাণু বলেছেন।

মাত্রায় আম্লিক বা প্রশম (neutral)। এই পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার জীবাণুদের অবস্থান ও বৃদ্ধির চূড়ান্ত সহায়ক। ফলে পৌষ্টিক নালীতে বিভিন্ন প্রকারের অসংখ্য জীবাণু বাস করে এবং বংশ বিস্তার করে। দুটি মানুষের ডিএনএ যেমন সম্পূর্ণ একরকম হয় না, তেমনি দুটি মানুষের জীবাণুরাও একরকম নয়। পৌষ্টিক নালীতে খাদ্য বস্তুর পরিপাক ও শোষণ পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত জীবাণুর ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই জীবাণুদের একাংশ বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন তৈরি করে। মানবদেহের সব জীবাণুদের একত্রে 'মাইক্রোবায়োটা' বলে। পৌষ্টিক নালীর ব্যাকটেরিয়াদের একত্রে 'মাইক্রোবায়োম' বলে। এই 'মাইক্রোবায়োম' হার্টের রোগ থেকে পেটের রোগ তথা ডায়াবেটিস টাইপ-২ প্রভৃতি রোগের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মানবদেহে উপস্থিত জীবাণুরা মানুষের ওজন ও তার মানসিক স্থিতিকেও প্রভাবিত করে এবং খাওয়ার পর রক্তে সুগার-লেভেল কতটা বৃদ্ধি পাবে তাও নিয়ন্ত্রণ করে। Rochellys Diaz Heijtz ও তাঁর সহকর্মীরা ২০১১ খ্রিস্টাব্দে 'Proc Natt Acad Sci USA' পত্রিকায় বলেন যে নেংটি ইঁদুরের মস্তিষ্ক গঠন এবং ব্যবহারকে তাদের পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত জীবাণুরা প্রভাবিত করে। Moran Yassour ও তাঁর সহকর্মীরা ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে 'Genome Med' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে ব্যক্তির ওজন বৃদ্ধি ও টাইপ-২ ডায়বেটিস রোগের উৎপত্তি ব্যক্তির জিন, পরিবেশ এবং পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত মাইক্রোবায়োমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। Nathan D Mathewson ও তাঁর সহকর্মীরা ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে 'Nature Immunology' পত্রিকায় প্রকাশিত পত্রে দাবি করেন 'Graft-versus-host disease' (complication that can occur after a stem cell or bone marrow transplant)-এর ওপর স্থানীয় সুনির্দিষ্ট জীবাণুদের বিপাকীয় বস্তুর প্রত্যক্ষ উপকারী ভূমিকা আছে। যার ফলে ওই রোগের ভয়ঙ্করতা কিছুটা প্রশমিত হতে পারে।

Li H-t ও তাঁর সহকর্মীরা ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে 'International Journal of Obesity' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে দাবি করেন যে সিজারিয়ান শিশুর পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত জীবাণুদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ স্বাভাবিক ভাবে জন্মানো শিশুর পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত জীবাণুদের থেকে কম এবং সিজারয়ান শিশুর পৌষ্টিক নালীর জীবাণুরা পরবর্তীকালে ওজন বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে।

Chaysavanh Manichanh ও তাঁর সহকর্মীরা ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 'Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology' পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন যে পৌষ্টিক নালীতে উপস্থিত জীবাণুদের সংখ্যা ও প্রকারভেদ কোনো কারণে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলে পেটের বিভিন্ন রকম রোগ (Inflammatory bowel disease—IBD) যথা পেট ব্যথা, বমি-ভাব, ডাইরিয়া প্রভৃতি রোগ হয়। 'Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology' পত্রিকার সম্পাদক Katrina Ray ২০১২ খ্রিস্টাব্দে 'Married to our gut microbiota' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করেছেন, "...are we more microbe than man?"

মানুষ এই পৃথিবীতে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীব মনে করে প্রায় সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণকারী ভেবে যতই সন্তুষ্ট থাকুক না কেন, এই গ্রহে মানুষের আবির্ভাবে, বিবর্তনে, জীবন ধারণে, কার্যকলাপে তথা জীবন-ধর্ম প্রকাশের প্রতি পদক্ষেপে তারা জীবাণু দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জহর পাত্র

গুসকরা, বর্ধমান

গভর্নমেন্ট কনট্রাকটর

Sl. No. 4

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জী

Sl. No. 5

মাটি এবং মানুষ নিয়ে আমাদের পৃথিবী। মাটিতেই তৈরি হয় কৃষি ও শিল্প। আর ভারতের শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই সেই মাটিকে রক্ষা করে উৎপাদনকে বাড়ানোর লক্ষ্যে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং উৎপাদন খরচকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাই প্রয়োগ করতে হবে কৃষকের চিরাচরিত উপকারী বন্ধু কেঁচো সার **এ.টি.সি. গোল্ড**।

আপনার জমির মাটিকে দূষণ মুক্ত করে

এ.টি.সি. গোল্ড

কেঁচো সার

সরকারিভাবে পরীক্ষিত

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

মাধবপুর, বর্ধমান, যোগাযোগ : ০৩২১৩-২৫৮২১৯, ৯৭৩২৮০২২৬৪, ৯৭৪৮৭৪২৮৩৫, ৯১৫৩৫৪২৪৫৩

Sl. No. 49

With Best Compliments of

Sankar Mahadeb Nursery

Accredited by National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Govt. of India

Purbasthali Rail Station (South Railgate), Purbasthali, Burdwan (WB)
M: 8972113824, 9433261072, 9734250028, E-mail : sankarmahadebnursery@gmail.com

Prop. SANKAR DUTTA

শংকর-মহাদেব নার্সারী

Sl. No. 13

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লি.

রেজি. নং. ৪৬, তাং : ৩১-০৩-১৯৬১
ইসলামপুর, নাদনঘাট, বর্ধমান, ফোন : ৯৪৭৪৩৪০৫১৩

• নামমাত্র সুদে স্বল্পমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি ঋণ দেওয়া হয়। • বকেয়া ঋণ পরিশোধ করে নতুন ঋণ গ্রহণ করুন। • স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়। • সাবমার্সিবল পাম্প সহ সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা চালু আছে। • সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হয়। • সমস্ত প্রকার সার পাইকারি ও খুচরা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করা হয়।

আব্দুস সালাম সেখ
ম্যানেজার

Sl. No. 10

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

শাখা : সিংহজুলী ।। সমুদ্রগড়, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৬২৫৬, ৯৩৩৩২১২৬৭০

আমাদের পরিষেবা

• ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। • ব্যাঙ্কে সকল রকম আমানতের ব্যবস্থা। • কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। • অভাবি চাষিদের পাট ক্রয়। • মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা। • অ্যাম্বুলেন্স ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা। • হাসকিং মিলে ধান ভাঙানোর ব্যবস্থা। • কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় — *সভাপতি*
সাহাদুল খান — *সম্পাদক*
আব্দুস সালাম সেখ — *ম্যানেজার*

Sl. No. 11

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

সাহেব সোয়েল সাহিদ কেব্‌ল

যশাপুর, পোঃ মীনাপুর, বর্ধমান

Sl. No. 12

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

'নতুন চিঠি' পত্রিকার সাফল্য কামনায়

কাজী জাহেদুল ইসলাম (লাল্টু)

পার্ক সার্কাস, কলকাতা

Sl. No. 36

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

'নতুন চিঠি' পত্রিকার সাফল্য কামনায়

সেখ আনোয়ার আলি

তিলজলা রোড, কলকাতা-৩৯

Sl. No. 37

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

রানার হোটেল

পানাগড় (বাইপাস), বর্ধমান

প্রো. : টন্টু মণ্ডল

Sl. No. 142

With Best Compliments of

Suvankar Rice Mill

Virsin More, Bud, Bud, Burdwan, Mob. 9434177608

***Our Product* : SUPER QUALITY and RICE BRAN**

Sl. No. 141

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বৈরাগ্য ট্রাভেলস্

ছোটোহাতি, মারুতি, অ্যামবাসাডার ও ট্রাক্টর ভাড়ায় পাওয়া যায়।

প্রোঃ বাচ্চু বৈরাগ্য

পোঃ পিপলন, মন্তেশ্বর, বর্ধমান ।। যোগাযোগ : ৯৬৩৫৮৪২৫০০, ৯৭৩২১৯৫০৬৫

Sl. No. 139

With Best Compliments of

Sree Bishnu Rice Mill

Mankar Burdwan, Mob. 8629992188, 9153343945

***Our Brands*: Narayan Bhog, Narayan Bhog Gold, Anmol Rice, Cheif & Best**

Sl. No. 140

With Best Compliments of

Dilip Kumar Banerjee

Durgapur

Sl. No. 135

With Best Compliments of

Tarashakti Rice Mill

Paraj, Galsi, Burdwan, Mob. 8906507579, 9732142501

***Our Product* : BHUMI KONYA RICE**

Sl. No. 133

With Best Compliments of

Nupur Rice Mill

Paraj, Burdwan, Mob. 9626047217

***Our Product* : NUPUR BRAND MILKY SORTEX STONELESS RICE**

Sl. No. 132

With Best Compliments of

CLASSIC COMPUTER

Dharampur, Burnpur, Burdwan

Sl. No. 102

With Best Compliments of

Kazi Asraf Ali

Alalpur, Shyamsundar, Burdwan

Govt. Contractor & General Order Supplier

Sl. No. 78

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

অভিনব কনস্ট্রাকশন

দুর্গাপুর ও কলকাতায় সিভিল ও মেকানিক্যাল কাজ নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।
বর্ধমান ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় অনুরূপ কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
সকলের সহযোগিতা কামনা করি।
প্রোঃ নবদ্বীপ মাজি
কালাঝরিয়া, বার্নপুর, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৮৩২১৪২১৭৮

Sl. No. 55

With Best Compliments of

A Well Wisher

Subhaspally, Burnpur

Sl. No. 56

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

চাকতেঁতুল এস.কে.ইউ.এস. লি.

সমিতির মাধ্যমে আমানত প্রকল্প, ভোগ্যপণ্য ব্যবসা, কে.সি.সি., এম.টি., এস.এইচ.জি. লোন দাদন, সার ব্যবসা করা হয়।
সরকারি সহায়ক মূল্যে ধান খরিদ করা হয়।

ভৈরব রুইদাস
সভাপতি

সত্যদুলাল হাজরা
সম্পাদক

শিশুচরণ মেটে
ম্যানেজার

Sl. No. 131

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

মেসার্স আর.এস. অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

গলিগ্রাম, বর্ধমান

এখানে উৎকৃষ্ট মানের সকল প্রকার চাল পাওয়া যায়।
সততাই আমাদের মূলধন।

Sl. No. 124

With best compliments of

Saradamayee Rice Mill

UTKRISTO MANER BHATER CHAUL

Factory : 0342-2454228, 2454220
Mob. 9434003431

Sl. No. 130

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Sl. No. 125

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

নিবেদিতা রাইস মিল

রোকোনো, এন.এইচ.-২, বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৪৩৪০০৩৩৩৯, ৯৭৭৫২৪২১৭১

Sl. No. 128

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

নারায়ণী রাইস মিল

পারাজ মোড়, এন.এইচ.-২, বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৩৩২০৮২১২৮

Sl. No. 56

With best compliments of

Mahadeb Rice Mill

Manik Bazar, P.O. Jharul
Paraj, Burdwan, Ph. 9474638834

Our Products

BABA RICE
কৈলাশ ভোগ

Sl. No. 129

With best compliments of

M/s. Sukumar Chakraborty & Co..

Prop. Janardan Chakraborty

Civil, Mec. & General Order Suppliers,

IISCO Steel Plant, Eastern Rail

Radhanagar Road, Asansol-713325,
Mob. 9434253403

Sl. No. 52

With best compliments of

A.R. ENTERPRISE

Santinagar, Burnpur, Burdwan

Sl. No. 54

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

পিপলন এস.কে.ইউ.এস. লি.

পিপলন, বর্ধমান

সমিতির সকল সদস্য/সদস্যা তথা এলাকার সকল চাষি ও জনসাধারণের সেবায় সদা নিয়োজিত।

হাসু ঘোষ
সভাপতি

কার্তিক হাজরা
সম্পাদক

গোপাল দত্ত
ম্যানেজার

Sl. No. 60

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

দাঁ হার্ডওয়ার

মালডাঙ্গা, বর্ধমান

এখানে সমস্ত রকম সাবমার্সিবল ও টিউওয়েলের যাবতীয় ফিটিংস এবং বিভিন্ন নামি-দামি কোম্পানির মোটরপাম্প, জলের ট্যাঙ্ক সুলভ মুল্যে ও গ্যারান্টি সহ বিক্রয় হয়। পাকা বাড়িতে পাইপ লাইন সহ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রোঃ **সব্যসাচী দাঁ**

Sl. No. 62

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

কালেশ্বর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ৫৪ ।। তাং : ১৪-০৪-১৯৩০

আমাদের ব্যবসা

ব্যাঙ্কিং : এস.বি., আর.ডি., টি.ডি. ও কে.ভি.পি.। এন.এস.সি. সার্টিফিকেট বন্ধক রেখে লোন দেওয়া হয়।
কীটনাশক, সার, ধানবীজ, ট্রাক্টর ও ধানঝাড়া মেসিন ভাড়া দেওয়া হয় ও ১৮টি সাবমার্সিবলের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়।

অশোককুমার মণ্ডল *সভাপতি*

সুনীল নন্দী *সম্পাদক*

বিপিন রায় চৌধুরী *ম্যানেজার*

Sl. No. 61

With Best Compliments of

GHOSH BUILDERS

Prop. Santosh Ghosh

Dogachia (Hattla), Purbasthali, Burdwan, Mob. 9734707417

এখানে ইট, বালি, পাথর, রড ও সিমেন্ট সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

Sl. No. 98

With Best Compliments of

JMD ENGINEERING

FABRICATOR AND MECHANICAL ENGINEERS
Specialist in : **Castings, Machining jobs etc**.

Office : BK-32, ‘Shyamali’, RabindraPally (B Block), Durgapur-713201, Ph : 2553590
Durgapur Works : RIP Industrial Estate, Durgapur-713212
Howrah Works : P-292/1, Benaras Road, Belgachia, Howrah-711108

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

শ্রীপল্লী নার্শারি

প্রোঃ পরেশ মিত্র

সকলপ্রকার ফুল, ফল ও বৃক্ষজাতীয় চারা পাওয়া যায়।

বিঃদ্রঃ এখানে বাগান তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

সগড়াই বাজার, বর্ধমান

Sl. No. 121

With best compliments of

BURDWAN SPUN PIPE INDUSTRIES

Manufacturer of
RCC SPUN PIPE • COLLARS & S PIGOT TYPE NP2 / NP3 / NP4

Contact : Natun Pally, P.O. & Dist. Burdwan, Ph : 0342-2544640, Fax : 2662232
Office & Factory : Vill. P.O. Hossainpur, Maldanga, Burdwan, Phone : 0342-2324644

Sl. No. 63

With Best Compliments of

Daudar Rahaman Mia

Govt. Contractor & General Order Suppliers

Vill. Masdanga, P.O. Kaigram, P.S. Monteswar, Burdwan

Sl. No. 64

With Best Compliments of

M/s. NATIONAL TRADING

Sripur, Bazar, Dist Burdwan

Sl. No. 103

With Best Compliments of

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, BURDWAN

With Best Compliments of

ST. STEPHENS MODEL SCHOOL

Station More, Ukhra, Phone : 9475670890

SOUTH INDIAN BRANDED ENGLISH MEDIUM SCHOOL

Sl. No. 113

With Best Compliments of

M/s BHARAT BUILDERS

Building Materials Suppliers

Parulia Bazar, Purbasthali, Dist Burdwan, M : 9434661636

Sl. No. 94

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

পারুলিয়া ইন্ডেন গ্রামীণ বিতরক

পারুলিয়া, বর্ধমান

Sl. No. 75

With Best Compliments of

B.R.M.
TAJ BENGAL RICE

PREMIUM QUALITY SILKY SORTEX, GRADED AND STONELESS RICE

Vill. & P.O. : Pursa, P.S. Galsi, Dist. Burdwan, Ph. 9153533505

Sl. No. 58

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

সবার আশিষে

প্রোঃ সেখ তাজউদ্দিন

তিরেঙ্গে মোড়, গলসী, বর্ধমান, মোবাইল : ৯৩৩২০৫৪৯৭২, ৯৮৩২১৮৫৪১১

এখানে সিমেন্টের খুটি, পায়খানার পাট, ইট, বালি, পাথর ও কারী পাওয়া যায়।

Sl. No. 72

With Best Compliments of

Sethia Jain & Co. (P.) Ltd.

Debipur, Memari, Dist. Burdwan, Ph. (0342) 2263270

Sl. No. 107

With Best Compliments of

J. Kundu

Denha, P.S. Memari, Dist. Burdwan

Sl. No. 88

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

আবহমানকাল থেকে সমবায় দেশের আর্থসামাজিক উন্নতির সূতিকাগার

সৌজন্যে

উখড়া রিজিওন্যাল ওয়ার্কশপ এমপ্লয়িজ
কোঅপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পোঃ খাঁদরা, জেলা : বর্ধমান-৭১৩৩৬৩

Sl. No. 111

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বক্রেশ্বর সিমেন্ট প্রা. লিমিটেড

বালানপুর, জামুড়িয়া, বর্ধমান

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

রামপ্রসাদ ঘোষাল

Sl. No. 123

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

ভোলানাথ ট্রেডার্স

মণ্ডল কমপ্লেক্স, বিজয়া ব্যাঙ্কের নিচে, বর্ধমান

Sl. No. 122

With Best Compliments of

Rabin Nandy

Surekalna, Jamalpur Burdwan

Sl. No. 79

With Best Compliments of

COMPUTER ZONE

COMPUTER SALES & SERVICE

Argha Commercial Plaza, Burnpur Road, Asansol
Mob. 9434214534, 8629942110

Sl. No. 105

With Best Compliments of

S. Agarwal

Kolkata

Sl. No. 99

With Best Compliments of

Bohula Colliery Employees' Co-Operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 443, Dated : 22-3-96
P.O. Bohula, Bohula Colliery, Dist. Burdwan

Manas Kr. Banerjee
Chairman

Bhagwanji Pandey
Secretary

Sl. No. 118

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

তিরুপতি হিমঘর প্রা. লি.

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, বর্ধমান

Sl. No. 87

With Best Compliments of

MAGRA BRICK FIELD & CO.

Vill. Dehna Magra, P.o. Ghosh, Dist. Burdwan

Sl. No. 89

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লি.

গন্তার, বর্ধমান ।। রেজি. নং ৪০ তাং : ১২-০২-১৯৪৯

সোসাইটির কার্য সমূহ

আমানত : সেভিংস, ২. মেয়াদি, ৩. পৌনঃপুনিক ।। ঋণদাদন : ১. স্বল্পমেয়াদি, ২. মধ্যমেয়াদি, ৩. বন্ধকী, ৪. ব্যবসায়ী, ৫. সাইকেল/মোটর সাইকেল, ৬. পিতল-কাঁসা বন্ধকী, ৭. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী। ব্যবসা : ১. সমস্ত প্রকার রাসায়নিক সার, ২. খইল, ৩. কীটনাশক, ৪. উচ্চফলনশীল আলু এবং ধানবীজ, ৫. গানি ব্যাগ, ৬. স্বল্প ভাড়ায় ট্রাক্টর এবং ৪৭টি সাবমার্সিবল কৃষকের সেবায় নিয়োজিত, ৭. অ্যারিজ ডিস্ট্রিবিউটর

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন। আসুন আমরা এক সাথে এগোই এবং সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাই।

Sl. No. 85

With best compliments of

MAA BHABANI MINI RICE MILL

BEST QUALITY

Perboiling Rice Products

250 K.W. Gasification of Rice Husk Pulversed 250 M.S. Rice Husk Ash Base

Vill. Panchsimul, P.O. Keotara (Jhapandanga), Dist. Burdwan, PIN : 713166
Ph : (03451) 279-023/610 (Mill) 279361 (Resi), Mob. 9434021272

Sl. No. 80

With best compliments of

CHAND BRAND

STONELESS SILKY SORTEX RICE

Mfg. & Mktd. by:
DESHBANDHU RICE MILL
Bhasapool, Pursa, Galsi, Dist. Burdwan
Contact : 9153123223, 9153335523, 9153095292

Sl. No. 74

With best compliments of

A Well Wisher

MKG

Sl. No. 156

With best compliments of

R A D I S T A

Sl. No. 157

With Best Compliments of

SHYAM
GROUP

SHYAM SEL & POWER LTD.

With Best Compliments of

GAGAN FERRO TECH. LTD.

With best compliments of

Kunjabihari Sponge Pvt. Ltd.

Sekhpur, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 151

With best compliments of

Maan Steel Pvt. Ltd.

Ikrah, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 146

With best compliments of

M.B. Sponge & Power Ltd.

Shantinivas, Jamuria Hat, Burdwan

Sl. No. 150

With best compliments of

BHAGAWATI SPONGE

Ikrah, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 144

With best compliments of

BIOFINA WATER

Balanpur, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 149

With best compliments of

Rajashree Sponge Pvt. Ltd.

Sekhpur, Jamuria, Burdwan

Sl. No. 151

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

খড়দত্তপাড়া এস.কে.ইউ.এস. লি.

পোঃ হাপানিয়া, জেলা : বর্ধমান

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ও মাঝারি চাষিদের ঋণ দেওয়া হয়। মিনি ডিপ দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়।
স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন করে ঋণ দেবার ব্যবস্থা আছে।

সহিদুল ইসলাম মোল্লা
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ

Sl. No. 96

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

লোহাচুড়-বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ২১ কে. টি, তাং : ৩০-০৩-৬৩ ।। বড়গাছি, পোঃ মোয়াইল, জেলা : বর্ধমান, মোবাইল : ৮৯০০৫০২৪৩৪

অত্র সমিতির নিজস্ব এলাকার চাষিভাইদের উন্নয়ন ও সেবায় নিয়োজিত। চাষিদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে কৃষি ঋণ দেওয়া হয়। অত্র সমিতিতে সমস্ত রকম আমানত গ্রহণ করা হয়। ১৯টি সাবমার্সিবল দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি

জগন্নাথ মণ্ডল
ম্যানেজার

বাবলু মাহাতো
সম্পাদক

Sl. No. 97

With best compliments of

Oxford Mission English Medium School

Workshop Colony More, Mob. 9434676282,

Sl. No. 112

With best compliments of

SOMA MUKHERJEE

TRAVEL AGENT

Call for Luxury Car Any time anywhere

G. T. Road, Haldar Market, Birhata, Burdwan, M : 9832124150, 9378367878

With best compliments of

MONDAL ENTERPRISE

Prop. Bikash Mondal
Burnpur, Burdwan

Sl. No. 58

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.

শুঁড়েকালনা, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 81

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

কৃষি ও কৃষির সাথে যুক্ত মানুষজনের উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য

দেউলিয়া এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি. নং ৩২ তারিখ : ২৩-০৭-৪১

সেখ আবদুল আজিজ
সভাপতি

আবদুল মজিদ মল্লিক
ম্যানেজার

আবদুল আলিম মণ্ডল
সম্পাদক

Sl. No. 84

সকলকে শুভেচ্ছা জানাই

চকদিঘী অঞ্চল কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড

চকদিঘী, জামালপুর, বর্ধমান

Sl. No. 106

With best compliments of

A
Well Wisher

Vill. & P.O. Kulut, PS. Monteswar, Burdwan

Sl. No. 8

With best compliments of

A
Well Wisher

Kusumgram, Burdwan

Sl. No. 9

With best compliments of

Bipul Ghosh

(Govt. Contractor & Order Suppliers)

Vill. Bamunia, P.O. Khandra Parulia,
P.S. Monteswar, Burdwan, Mob : 9126305557

Sl. No. 7

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অগ্রসেন হিমঘর

সাতগেছিয়া, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এখানে উন্নত মানের আলু বীজ পাওয়া যায়।

Sl. No. 6

With best compliments of

N.K. Minerals

T/14A/1A, Dum Dum Road,
Kolkata, PIN : 700 030

LIME STONE SUPPLIER

With best compliments of

Maa Tara Minerals

Room No. 4B, Basement R.N.M. House,
3B, Lal Bazar Street, Kolkata, PIN : 700 001

SILICA SAND SUPPLIER

With best compliments of

R.N. Minerals

T/14A/1A, Dum Dum Road,
Kolkata, PIN : 700 030

LIME STONE SUPPLIER

With best compliments of

Balaji Industries

85, Netaji Subhas Road, R/No. 14,
2nd Floor, Kolkata, PIN : 700 001

RIVET SUPPLIER

With Best Compliments from

GIL

Sagarbhanga, Durgapur

With best compliments of

R I T U S H R E E

...for perfect colour printing at affordable price

54/1, Kachari Road, Burdwan
Ph : 0342-3290718

With best compliments of

Chandimata Enterprise

GENERAL ORDER SUPPLIER

Gantar, Memari, Burdwan

Sl. No. 119

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ বহুলা, বর্ধমান, ডাক সূচক : ৭১৩৩২২

মিশন নির্মল বাংলার উদ্যোগে বহুলা গ্রাম পঞ্চায়েত স্বাস্থ্যসম্মত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর।

Sl. No. 120

With best compliments of

DRUG STORES

Kajora Gram, Burdwan

Sl. No. 110

With best compliments of

BANERJEE ENTERPRISE

Established under SSI Unit, Govt. of W.B. & Registered in SAIL-ISP, Burnpur

Expert in : Typical Fabrication & Erection of Structural, Mechanical, Alliance & EOT Crane, Civil, ESP, Hydraulic, Gas, Oxygen & SS PIpeline Works & General Order Supplier

Workshop : Vill. Kuilapur (Maji Para), Purushottampur, P.O. Suryanagar, Burnpur-713361 (WB)
Head Office : Beni Madhab Nagar, 58, S.B. Garai Road, Asansol-713301, E-mail. be.isp@rediffmail.com
Site Office : Behind RCRD Building, SAIL-IISCO Steel Plant, Burnpur-713325

Sl. No. 53

With best compliments of

Modern Bearing Agencies

40, Strand Road, Kolkata-700 001
Room No. 40, 1st Floor, Ph : (033) 2210 3542
Mob. 9679724113, 9476270272

Sl. No. 109

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

M.R. DEALERS ASSOCIATION

Salanpur

আমাদের দাবি : (১) সমস্ত মানুষকে খাদ্য সুরক্ষায় যুক্ত করতে হবে। (২) সমস্ত মানুষকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) সমস্ত মানুষের জন্য মাথাপিছু চিনি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টনের উদ্যোগ নিতে হবে।

Sl. No. 71

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গলসী থানা গ্রাম উন্নয়ন সোসাইটি

গলসী, বর্ধমান

শিক্ষা চাই, স্বাস্থ্য চাই, চাই শৌচাগার
রোগ বালাই বলবে পালাই, সুখী হবে সংসার।

শান্তি রায়
সম্পাদক

Sl. No. 73

With best compliments of

INDIAN WATCH & MOBILE

Prop. Jahangir Kabir

Near Gopinath Nursing Home, Kalna, Burdwan
Mob. 9153832786, 9232328786, E-mail : jahangir.786.kabir@gmail.com

WATCH, MOBILE, SUN GLASS, FAN, CALCULATOR, IRON

Sl. No. 76

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

বাবা করমপীর হার্ডওয়ার

গ্রাম ও পোঃ চা গ্রাম, বর্ধমান

এখানে ইমারতীর সমস্ত রকম দ্রব্যসামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

Sl. No. 76

With best compliments of

SUHRID DE SARKAR

Old Patakura, Kalikadas Road, Cooch Behar

Sl. No. 66

With best compliments of

Sk. Abdur Rahaman

Susanta Kumar Ray

Contractor & Genral Order Suppliers

Kishorekona, Burdwan, Mob. 9434560216

Sl. No. 127

With best compliments of

HRISHITA ENTERPRISE

Prop. Mahadeb Ghosh

Manufacturer of All Kinds of Sanitory Goods, Bathroom Fittings (PVS)

Vill. Fazalpur, P.O. Katsihi, P.S. Monteswar, Dist. Burdwan
Mob. 9433395206, 9547132416

Sl. No. 65

With best compliments of

M/S. R.K. MONDAL & BROTHERS

Sand, Coal Transporter & Civil Contractor & General Order Suppliers

Vill. & P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan, PIN : 713338

Sl. No. 115

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে সফল করতে সকলের উদ্যোগ কামনা করি

মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ মেড়তলা, বর্ধমান

Sl. No. 59

সকলকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই

মোজাম্মেল হক

উখরিদ, বর্ধমান